সৈয়দ মুজতবা আলী জীবনকথা

নূরুর রহমান খান

সূচি

অধ্যায় : এক

সূচনা, শ্রীহট্ট জেলার পটভূমি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দ্বিধাবিভক্ত সম্প্রদায়ের অভিন্ন রক্তধারা, গুরু-মুর্শিদের অবদান, প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রতিবেশ। ১৭-৩৪

অধ্যায় : দুই

খানবাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলীর জন্ম, কর্ম ও বংশমর্যাদা, সমকালীন মুসলিম মানসিকতা এবং সিকন্দর আলীর পারিবারিক জীবনে কালিক প্রভাব। ৩৫-৪৩

অধ্যায় : তিন

ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম ও জন্ম তারিখ, শিক্ষাজীবন : সুনামগঞ্জ-মৌলবীবাজার-সিলেটে, সরকারি-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন ও শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন, আলীগড়ে, জার্মানির বার্লিন ও বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মিশরের আল্-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। ভাষাজ্ঞান এবং অগ্রন্থিত 'শিক্ষাব্রতীর আত্মকথা'। ৪৪-৬৮

অধ্যায় : চার

ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর কর্মজীবন : কাবুলে ও বরোদায় অধ্যাপনা, 'দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এর 'কলাম' লেখক, বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ ও বগুড়া ত্যাগের নেপথ্যচিত্র, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স'-এর সচিব, 'আকাশবাণী'তে যোগদান : দিল্লী-কোলকাতা-কটক-পাটনা-দিল্লী, শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন ও বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা, চাকুরি থেকে অব্যাহতি ও বোলপুরে বাস। ৬৯-১০৪

অধ্যায় : পাঁচ

সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্যিক জীবনের প্রেক্ষাপট, ছদ্মনাম, 'সত্যপীর' প্রসঙ্গ, প্রস্তুতি পর্বে স্বনামে ও ছদ্মনামে প্রকাশিত রচনাবলী, 'দেশে-বিদেশে' রচনার পটভূমি, সাপ্তাহিক 'দেশ' ও শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগে সাহিত্যিক জীবনের সমৃদ্ধি, 'পঞ্চতন্ত্র' ও অন্যান্য রচনা, 'কি করে সাহিত্যিক হলাম'—বেতার কথিকা, অসমাপ্ত রচনা ও অপূর্ণ সাহিত্যবাসনা, মুজতবা আলীর প্রিয় লেখক ও তাঁর গ্রন্থতালিকা। ১০৫-১৩৪

অধ্যায় : ছয়

দেশ পর্যটন, ছদ্মবেশী শিক্ষক, মুজতবা আলীর দ্বিতীয় বাসভূমি জার্মানি, ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা এবং সভা সমিতিতে বক্তৃতা। ১৩৫-১৪৬

অধ্যায় : সাত

মুজতবা-জীবনে রমণী ও বিবাহ, সন্তান বাৎসল্য এবং স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি ও কর্তব্যবোধ, বেগম রাবেয়া আলী, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে মুজতবা আলীর মন-মানসিকতা। ১৪৭-১৬৯

অধ্যায় : আট

বংশমর্যাদায় গৌরবান্বিত সৈয়দ মুজতবা আলী এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক, মুজতবাচরিতে দুঃখবোধ, সজ্জন ও বন্ধুবৎসল মুজতবা, নবীন সহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষণা, সৌজন্য ও বিনয়, মুজতবার শিশুমানস ও রসিকতা, মাইকেল-মুজতবা-নজরুল, মুজতবা ও প্রকাশক, হতাশা ও মৃত্যুচিন্তা, স্মৃতিশক্তি ও কথকতা এবং মুজতবা চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য। ১৭০-২২২

অধ্যায় : নয়

মুজতবা মানসে বাঙলা ও বাঙালি, ধর্মচেতনা : মনুষ্যত্বের সাধনা, ব্রিটিশ বিদ্বেষ, জাতীয়তাবাদী মুজতবার রাজনৈতিক চিন্তাধারা. ধ্যান ও মননের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং দেশজ সভ্যতা ও বৈদগ্ধ্যের প্রতি আস্থা। ২২৩-২৫৫

অধ্যায় : দশ

বিভাগোত্তর কালে মুজতবা আলীর চিন্তা-ভাবনা, স্বাধীন ভারতের নামকরণ, অখণ্ড ভারতের প্রতি আস্থা, ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের ভিত্তি : রাষ্ট্রভাষা-মাতৃভাষা-প্রাদেশিক সংস্কৃতি, মুজতবার 'দেশ', উভয় বঙ্গে সাংস্কৃতিক সেতু নির্মাণ এবং কোলকাতার শেষ দিনগুলো। ২৫৬-২৮৫

অধ্যায় : এগার

স্থায়ীভাবে কোলকাতা প্রত্যাবর্তন ও বসবাস, ঢাকায় পরলোকগমন ও সমাহিত। ২৮৬-২৯৫

পরিশিষ্ট ক :

ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। ২৯৬-২৯৭

পরিশিষ্ট খ :

সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা, সৈয়দ মুজতবা আলীকে লেখা এবং মুজতবা আলী সংক্রান্ত লেখা পত্রাবলী। ২৯৮

পরিশিষ্ট গ :

সাহায্যকারী গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং ব্যবহৃত পত্র-পত্রিকা। ২৯৯-৩০০

পরিশিষ্ট ঘ :

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, গ্রন্থে সংকলিত সৈয়দ মুজতবা আলী-রচনাবলীর রচনাকাল ও পত্র-পত্রিকা/গ্রন্থের সসূত্র বর্ণানুক্রমিক তালিকা। ৩০১-৩৩১

নির্ঘণ্ট ৩৩২-৩৩৭

খান বাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলীর পূর্ব ও উত্তর পুরুষ। ৩৩৮

সংকেত

সা : সাক্ষাৎকার [পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য]

প : পত্র সংখ্যা [পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য]

সৈয়দ মুজতবা আলী : জীবনকথা

সৈয়দ মুজতবা আলী : জীবনকথা

নূরুর রহমান খান

আগামী প্রকাশনী

আগামী প্রকাশনী কর্তৃক প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০

প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ মে ১৯৯০
প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১ ০০২১
প্রচ্ছদ শিবু কুমার শীল
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

ISBN 978 984 04 1280 8

Syed Mujtaba Ali : Jibon katha : :
by Nurur Rahman Khan
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Agamee First Edition : February 2010
Price : Tk. 400.00

আম্মার করকমলে

সৈয়দ মুজতবা আলী

প্রসঙ্গতঃ

কবি নজরুল ইসলামের পর উভয় বঙ্গে সমান সমাদৃত লেখক নিঃসন্দেহে সৈয়দ মুজতবা আলী। এবং ষাটের দশকের তিনি সর্বাধিক নন্দিত বাঙালি লেখকও বটে। 'দেশে-বিদেশে' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মুজতবা আলী পাঠকচিত্ত জয় করে নেন এবং শেষদিন পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি ছিলো অম্লান। আন্তর্জাতিক চেতনায় সমৃদ্ধ এই লেখকের বিশ্বমানবিকতা এবং অননুকরণীয় অনন্য শৈলীতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। বাঙলা সাহিত্যে মজলিশী বা আড্ডা-রসের একটি ধারার ঐতিহ্য ছিলো, কিন্তু খোশগল্প আলী সাহেবের রচনায় শিল্পসুষমামণ্ডিত হয়ে আর্টের পর্যায়ে উন্নীত। এবং তাঁর কৃতিত্বের মূলেও রয়েছে মজলিশী রস ও তার বাহন বাক্-নৈপুণ্য।

আধুনিক বাঙলা গদ্যের প্রাথমিক যুগের প্রবল দুটো ধারা—সাধু ও চলিত। চলিত বা কথ্যভাষা আবার দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে একটি খাতে হুতোম-দ্বিজেন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ ও তাঁদের অনুসারীদের চলার পথ নির্দেশিত, অপর সরণিতে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁদের অনুগামীদের সাবলীল স্বচ্ছন্দ পদচারণা। উভয় সরণির সঙ্গমস্থলে পরবর্তী মাইল-স্টোন সৈয়দ মুজতবা আলী। তদুপরি তিনি যে নৈপুণ্যের সঙ্গে বিদেশী চরিত্র ও আবহ বাংলা সাহিত্যে এনেছেন, তা' তুলনারহিত। সর্বোপরি রচনাশৈলীর মধ্যে মুজতবা আলীর প্রাণবন্ত ব্যক্তিত্ব বর্তমান। বাক্-প্রতিমায় ব্যবহৃত ধ্বনিসমষ্টিই তাঁর অনন্যতার স্বাক্ষর। সাবলীল বাগ্‌ভঙ্গিমা ও বিচিত্র শব্দভুবনের দৌলতে বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান অবিসংবাদিত। তিনি নিরলস পাঠক, নিরঙ্কুশ কথক। মজ্জাগত রসবোধ ও অর্জিত বৈদগ্ধ্যে সদা দীপ্র। এমন চমকপ্রদ মানুষ, আকর্ষণীয় মানুষ বড় দুর্লভ। তিনি আনন্দ বিতরণ করেছেন বাক্-এ, সৃষ্টি করেছেন বাক্যে। সেগুলো সব জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু যৌবনের উচ্ছলতায় প্রাণময়। সৈয়দ মুজতবা আলী ভাস্বর তাঁর রচনায়, তাঁর রচনা উদ্দাম ও স্নিগ্ধ লেখকের কোমল-মধুর ব্যক্তিত্বের পরশে। শিল্প ও শিল্পীর অভিন্ন সত্তার অদ্বয়রূপ মুজতবার জীবন ও সাহিত্য। এমন মণি-কাঞ্চন সংযোগ অতি বিরল। মুজতবা নাগরিক জীবনের প্রতিভূ ও রূপকার। তাঁর শব্দের ভুবন নগরচেতনায় প্রদীপ্ত—রচনায় প্রতিফলিত নাগরিক জীবনের ফেনিল উল্লাস, কখনো কিঞ্চিৎ নোনাজলে সিক্ত। নানা বৈপরীত্যে আশ্চর্য এই লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতাও বিচিত্রতর। রচনার মতোই আকর্ষণীয় তাঁর জীবন।

আলী সাহেবের পূর্ণাঙ্গ জীবন ও সাহিত্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা এ যাবৎ হয়নি। আমার শিক্ষক অধ্যাপক (প্রয়াত) ডঃ আহমদ শরীফ সাহেবের অনুপ্রেরণায় আমি সৈয়দ মুজতবা আলী সম্বন্ধে গবেষণায় উৎসাহিত হই। অতঃপর ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক (প্রয়াত) ডঃ সুরেশচন্দ্র মৈত্র মহোদয়ের সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে "সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবন ও সাহিত্যকৃতি" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির সূচনা ও সমাপ্তি। তাঁর নির্দেশনায় অধ্যায়-সূচিরও ব্যাপক পরিবর্তন করি।

প্রকাশকালে সঙ্গত কারণে শিরোনামও পরিবর্তিত হলো। পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে সর্বমোট একাদশ অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভটি পরিকল্পিত। লেখকের মনমানসিকতার গঠনে স্থানিক ও কালিক প্রভাব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, বংশমর্যাদা, সমকালীন মুসলিম মানসিকতা, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, কর্ম ও সাহিত্যজীবন, পারিবারিক বন্ধন, দেশজ ঐতিহ্য ও মাতৃভাষাপ্রীতি, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিভঙ্গি তথা জীবনদর্শন প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি।

সৈয়দ মুজতবা আলীর বর্ণাঢ্য জীবনের প্রামাণিক আলেখ্য নির্মাণ করতে গিয়ে প্রধানতঃ আমরা তাঁর আত্মীয়, বন্ধু ও ঘনিষ্ঠজনদের দ্বারস্থ হয়েছি। এ' ছাড়া তাঁর পত্রাবলী এবং রচনাবলীর সাহায্য গ্রহণ করেছি। অধ্যাপক (ডঃ) প্রীতীশ দত্ত, (প্রয়াত) কানাইলাল সরকার, (প্রয়াত) অধ্যাপক ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার, (প্রয়াত) সাগরময় ঘোষ, (প্রয়াত) গৌরকিশোর ঘোষ, শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী, (প্রয়াত) পশুপতি খান, সৈয়দ মহবুব আলী, শ্রীমতী সুলেখা দাশগুপ্ত, (প্রয়াত) গৌরী আইয়ুব, শ্রীসোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নিকট যে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি, অপরিশোধ্য ঋণ হিসেবেই আমি তা' গ্রহণ করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকার বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার, শ্রীহট্ট মুসলিম সাহিত্য সংসদ গ্রন্থাগার এবং আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। সর্বোপরি, কোলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, এই গ্রন্থাগারের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনোক্রমেই আমার আরব্ধ কর্ম সুসম্পন্ন হতো না। জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট যে সাহায্য-সহানুভূতি পেয়েছি, তা' প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত। উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রীহরিশ গুপ্ত এবং সহকারী গ্রন্থাগারিক শ্রীপাঁচুগোপাল মৈত্রের সক্রিয় প্রয়াসের ফলেই পশ্চিম জার্মানীর বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সৈয়দ মুজতবা আলীর ডি, ফিল, অভিসন্দর্ভের জেরক্স কপি সংগ্রহ এবং ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থাগারের সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ব্যতীত আমার ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার প্রতিও তাঁদের আত্মজনসুলভ দৃষ্টি এই সুযোগে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি। (প্রয়াত) অচিন্ত্যময় মল্লিক, শ্রী বি, মাইতি, শ্রীসুশীল বসু, শ্রীসুভাষ দাস (২) এবং গ্রন্থাগারের সহপাঠী শ্রীমুরারি ঘোষ, (প্রয়াত) ডঃ গৌতম সেন, আনিসুল হক, (প্রয়াত) সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সহৃদয় সান্নিধ্যে বিদেশ-বিভুঁইয়ে নিজেকে কখনো অনাত্মীয় পরিবেশে কল্পনা করতে পারিনি। (প্রয়াত) ডঃ গৌতম সেনের সঙ্গে আলোচনায় আমি প্রতিনিয়ত ঋদ্ধ হয়েছি। শ্রীপ্রতাপকুমার রায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহাগারে 'মাসিক কালান্তর' পত্রিকা দেখার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। (প্রয়াত) ডঃ সোমেন বসু একটি দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকা — 'Pakistan and Self Determination'—তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পড়ার সুযোগ দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এ' সুযোগে তাঁর সহৃদয় মহানুভবতার কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে সোসাইটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ যে নিষ্ঠা নিয়ে পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশের জন্য নিরলস শ্রম স্বীকার করেছেন, প্রথাগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার মূল্যায়ন সম্ভব নয়। গ্রন্থটিকে পূর্ণাবয়ব দানে বর্তমান

সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের আন্তরিক প্রয়াস ও অপূর্ণ প্রত্যাশার কথাও বিনয়নম্র চিত্তে স্বীকার করছি।

সৈয়দ মুজতবা আলী সংক্রান্ত নানা তথ্য ও পত্রাবলী তাঁর শুভানুধ্যায়ী এবং বিপুলসংখ্যক ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাঁরা যদি অনুগ্রহ করে সেগুলো [মূল অথবা অনুলিপি] দিয়ে সাহায্য করেন তাহলে ভবিষ্যতে আলী সাহেবের জীবনকথা অধিক প্রামাণিক ও পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে মুজতবা সুহৃদ্‌দের সহৃদয় সহযোগিতা কামনা করছি।

অনিবার্য কারণে মুজতবা আলী রচনাবলীর রচনাকাল ও পত্র-পত্রিকার সসূত্র বর্ণানুক্রমিক তালিকা—যা এ' গ্রন্থেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া সমীচীন ছিলো—আমার অপর গ্রন্থ 'মুজতবা-সাহিত্যের রূপ-বৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী'তে পরিশিষ্ট হিসেবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। প্রচুর মুদ্রণ-প্রমাদ রয়ে গেলো। সে-জন্য আমরা দুঃখিত। সংযোজিত শুদ্ধিপত্রের বাইরেও ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে। ভবিষ্যতে সেগুলো পরিমার্জিত হবে বলে আশা করি।

আমার স্ত্রী অধ্যাপিকা ফিক্‌রিয়া বেগম দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসরাধিক কাল এককভাবে পারিবারিক দায়-দায়িত্ব বহন করার ফলেই আমার পক্ষে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এই সুযোগে তাঁর নিকটও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অনুল্লিখিত শুভানুধ্যায়ীদেরও জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

নূরুর রহমান খান
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭

প্রথম আগামী সংস্করণের মুখবন্ধ

ঢাকার 'এশিয়াটিক সোসাইটি' এবং 'বাংলা একাডেমী' থেকে যথাক্রমে প্রকাশিত 'সৈয়দ মুজতবা আলী : জীবনকথা' এবং 'মুজতবা-সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী' গ্রন্থদ্বয় বাজারে না থাকায় উভয় বঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলীর গুণগ্রাহী বহু পাঠক পুস্তক দু'টি পুনর্মুদ্রণের জন্যে অনুরোধ করেন। ফলে গ্রন্থ দু'টির পরবর্তী মুদ্রণের কথা প্রকাশ করলে অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের পরামর্শক্রমে বাংলাদেশের অন্যতম নেতৃস্থানীয় প্রকাশনা সংস্থা 'আগামী প্রকাশনী'র স্বত্বাধিকারী জনাব ওসমান গনিকে মুজতবা আলীর জীবনীটি প্রকাশের জন্যে অনুরোধ করি। তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে এ অনুরোধ রক্ষা করেন। বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রতি তাঁর কোমল দুর্বলতারও এটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

অদ্যাবধি প্রাপ্ত মুজতবা আলীর রচনাবলীর রচনাকাল ও পত্র-পত্রিকা/গ্রন্থের সসূত্র বর্ণানুক্রমিক তালিকাটি এ গ্রন্থে 'পরিশিষ্ট ঘ'তে সংযোজিত হওয়ায় মুজতবা-অনুরাগী এবং গবেষকরা জীবনীগ্রন্থেই তাঁর রচনাবলীর নির্দেশ পাবেন।

গ্রন্থটির প্রথম আগামী মুদ্রণ সুচারু ও নিখুঁতভাবে প্রকাশের সার্বিক দায়-দায়িত্ব জনাব ওসমান গনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গ্রহণ করায় আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ও বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করছি। যাঁরা গ্রন্থটি প্রকাশের জন্যে নিরলস উৎসাহ যুগিয়েছেন, এ সুযোগে তাঁদেরও স্মরণ করছি।

প্রথম প্রকাশের ভূমিকায় উল্লিখিত যাঁরা আজ এ লোকে নেই তাঁদের নামের পূর্বে 'প্রয়াত' শব্দটি যুক্ত হয়েছে।

ঢাকা
ভাদ্র ১৪১৬, আগস্ট ২০০৯

বিনয়াবনত,
নূরুর রহমান খান
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যায় : এক

০১.

বাঙলা সাহিত্যের এক শুভলগ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন 'বিদ্রোহী'র কবি কাজী নজরুল ইসলাম। অবাক বিস্ময়ে বাঙালি বরণ করেছিল কবিকে। নিরুদ্ধকণ্ঠ দামাল কবির লেখনী নিস্তব্ধ হওয়ার অর্ধযুগের মধ্যেই বাঙলা গদ্যসাহিত্যে আরেক বিস্ময়—অনন্য প্রতিভার সরব সোচ্চার প্রতিষ্ঠা হলো। যিনি শব্দের দ্যুতিতে, বিষয়-বৈচিত্র্যে, ভাষার অসাধারণ নৈপুণ্যে, পাণ্ডিত্যের নিরহঙ্কার নিরাভরণ প্রকাশে তথা বাক্‌শিল্পের চরমোৎকর্ষ ঘটিয়ে পাঠক-সমাজকে বিস্ময়াভিভূত করেছেন—চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্র করেছেন অবারিত, দেশবিদেশে যাঁর বিচরণ ছিল অবাধ। যিনি অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত, বিদেশাহৃত জ্ঞান-গরিমার সঞ্চয় উজাড় করে দিয়েছেন স্বদেশে, অতি অক্লেশে। তেমনি কী গভীর দেশপ্রেম মমত্ববোধে আপ্লুত হয়ে বিদেশের নেত্রসীমায় সুপ্রকাশ করতে চেয়েছেন দেশীয় ঐতিহ্য—প্রকট করেছেন স্বদেশের মহিমান্বিত স্নিগ্ধকোমল রূপ-লাবণ্য। জাতিকে টেনে নিয়ে গেছেন আন্তর্জাতিক আসরে, আবার আন্তর্জাতিক সমাবেশে যে হৃদস্পন্দন আবিষ্কার করেছেন তা' শাশ্বত, চিরকালীন—সর্বকালের সর্বমানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হৃদয়ানুভূতি। কাজী নজরুল অবিভক্ত ভারতের সীমা অতিক্রম না করেও কল্পরাজ্যে মধ্য-প্রাচ্য পরিক্রমা করেছেন, সাহিত্যে বিমূর্ত তারই রুদ্রমধুর প্রতিরূপ। আর দ্বিতীয় বিস্ময়ের আবির্ভাব তো পরিব্রাজক হিসেবেই। নয়ন উন্মীলিত করেই দৃষ্টি হেনেছেন বহির্বিশ্বের পানে। অজানার আকর্ষণে সকৌতূহলে ছুটে বেড়িয়েছেন বিশ্বব্যাপী এবং একাত্ম এক প্রাণ হয়ে গিয়েছেন বিশ্ব তথা বিশ্বজনের সঙ্গে। বঙ্গ-সন্তান কখন যে হয়ে গেলেন বিশ্ব-সন্তান, বিশ্বনাগরিক। এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্বের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, তাদের ভাবসম্পদ, নিত্যদিনের আনন্দ-বেদনা, আশা-নৈরাশ্য, উদারতা-দুর্বলতা-সীমাবদ্ধতা তাঁর তুলির টানে সবাক প্রাণবন্ত করে তুললেন। বিদেশ ও বিদেশী আর আমাদের অপরিচিত রইলো না। কখন যে সর্ব শঙ্কা-সঙ্কোচ নির্মুক্ত হয়ে আমরাও গুটি গুটি পায়ে তাদের আঙ্গিনায় শুধু নয়, তাদের অন্দরমহল অতিক্রম করে একেবারে রন্ধনশালায় আসর জমিয়ে তাদেরই একজন হয়ে গিয়েছি—সেটা লক্ষ্য করবারও ফুর্সৎ মেলেনি, অন্দরমহল-বহির্মহল একাকার হয়ে গেছে। যাঁর লেখনীর প্রসাদে এই অসাধ্য সাধিত হয়েছে তিনি বাঙলা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শব্দভুবন নির্মাতা, আড্ডাধিরাজ, মজলিসীরসের সাধক, অদ্যাবধি বাঙলা ভাষায় শ্রেষ্ঠতম ভ্রমণ-সাহিত্য রচয়িতা ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী—যিনি বিশ্বনাগরিক হয়েও বারংবার ঘুরে ফিরে এসেছেন

চিরপরিচিত নিজস্ব গণ্ডীতে, যিনি বিশ্বের অপর প্রান্তে আড্ডারস উপভোগের চরমতম ক্ষণেও মানসপরিক্রমা করেছেন শুধুমাত্র বঙ্গদেশেই নয়, খাস্ 'বাঙাল' দেশে। কী পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গেই না পদ্মাপারের দৃশ্যাবলী উপভোগ করে করে তাঁর তৃষাতুর মন অবাধগতিতে ধাবিত হয়েছে সুরমা উপত্যকার পানে—যেখানকার সাধারণ মফঃস্বল শহরে ততোধিক সাধারণ কুটীরে অশ্রুমুখী মাতা সন্তান-সন্দর্শন প্রত্যাশায় ব্যাকুল আগ্রহে প্রহর গুনছেন। প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানের স্মৃতিমন্থন কি মধুর! কি করুণ! তাইতো দেখি বন্ধুজন পরিবেষ্টিত প্রচণ্ড হুল্লোড়ের ফাঁকে আড্ডাজনের অলক্ষ্যে অশ্রুচিহ্ন মুছে ফেলার প্রয়াস, হৃদয়নিঃসৃত দীর্ঘশ্বাস উদ্দাম হাসির আড়ালে গোপন করার দুঃসহ প্রচেষ্টা। পরক্ষণেই উচ্ছল হাসি, শব্দের ঝলক, অজস্র অবিরত বাক্যের ফুলঝুরিতে মজলিস গমগম করছে—আর এই মজলিসাধিপতিই হচ্ছেন সকল রসের রাজা সৈয়দ মুজতবা আলী।

দেশ-কাল-পরিবেশ মানবচিত্তের প্রসারে, ধ্যান-ধারণার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, পারিবারিক ঐতিহ্য। এবং সব কিছুর সুসমন্বয়ে একজন মনুষ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। যথাযথ পথে পরিচালন এবং দুর্বোধ্য মনকে নিয়ন্ত্রণের জন্যেও এই উপাদানগুলোর মূল্য অপরিসীম। কিংবা বলা যায় দেশ-কাল-পরিবেশের প্রভাবই জীবন-নিয়ন্ত্রক হিসেবে দেখা দেয়। এই বাতাবরণকে কোনো-ক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। শিল্পী-সাহিত্যিক তথা সৃজনশীল যে-কোনো প্রতিভার মানস-মণ্ডল পরিনির্মাণে এর ব্যাপক প্রভাব খুব সহজেই আবিষ্কার করা সম্ভব। শিল্পীর ভুবন নির্মাণে এই প্রভাবের ফলেই এবং যেহেতু দেশ-কাল-সমাজ নিরপেক্ষ তাদের কোনো সত্তা নেই—সে জন্যেই কবি-সাহিত্যিক-ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিতে সমাজ-প্রতিবেশের প্রতিবিম্বন অবশ্যম্ভাবী। তাই সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে যুগমানস, দেশজ ঐতিহ্য ও ভাবচেতনা বিবিধ পন্থায় ধরা দেয়। লেখকের মনন, মানসিকপ্রবণতা ও চিত্তের বিচিত্রগামী কৌতূহলের স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং তাঁর চিন্তাধারাকে অনুসরণ করতে হলে প্রথমেই সেই সূত্রটির সন্ধান করতে হবে, যে প্রভাবের ফসল সেই বিশিষ্ট লেখক তথা তাঁর রচনাবলী। যে-লেখক আমাদের কালের লোক নন, যাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসবার. ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত, তাঁকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করার পথ ও পদ্ধতি কি ? লেখকের জীবনী তো তাঁরই সৃষ্টির মধ্যে নিহিত। তাঁর মনস্বিতার ফসল থেকেই ধারণা করতে হবে তাঁর অবয়বের। লেখকের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতার সোপান তাঁর রচনাসম্ভার। সুতরাং, সৃষ্ট সাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ ও সুযৌক্তিক বিশ্লেষণের দ্বারা লেখকের ভাবজগতের গতিপথকে সুচিহ্নিতকরণ শ্রমসাধ্য হলেও দুরূহ নয়। তাঁর অন্তর্জগতের গঠন-কাঠামোর অনুসন্ধানের জন্যে লেখকের যুগ, তাঁর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বকাল, সে-কালের দেশ-সমাজ-মানুষ এবং সে-মানুষের প্রাত্যহিক কর্ম ও দৈনন্দিন জীবনাচরণের সঙ্গে নিবিড় পরিচিতি বাঞ্ছনীয়। তাহলেই একজন সৃষ্টিধর্মী লেখকের মানস-প্রবণতার ধারাবাহিকতা নিরূপণের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর চিন্তাধারার উৎসমুখ আবিষ্কারের গরজেই আমাদের দৃষ্টি ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রীহট্ট তথা সুরমা উপত্যকার দিকে প্রসারিত করা বাঞ্ছনীয়। পরিচিত হতে হবে সমকালীন মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ হতে হবে

তাদের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আচারিক নিত্য-দিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে। একই পদ্ধতিতে গোচরীভূত করতে হবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে। এরপরও যে যাবতীয় সংশয়, দোদুল্যমানতাকে অতিক্রম করতে পারবো—এমন দাবী আমাদের অভিপ্রায় নয়। আমরা শুধু প্রয়াসী হবো যুগের আলোতে যুগমানসকে আলোকিত ও কালের হৃদস্পন্দনকে অনুধাবন করতে।

০.২

সিলেট জেলা এক সময় প্রাচীন বঙ্গদেশেরই অংশ ছিলো। সিলেটের শিক্ষিত সমাজের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার প্রশাসনিক এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই জেলাটিকে নবপ্রতিষ্ঠিত আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১] শ্রীহট্টবাসীদের বিবেচনায় তাদের জেলাটিকে 'আসামভুক্ত করা গভর্নমেন্টের ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য হয় নাই।'[২] তখন থেকে বিংশ শতাব্দীর ৩য়-৪র্থ দশক অবধি তাঁরা আপন জেলাটি 'বঙ্গভুক্তি' করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন করেছেন। ১৯১৮ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীকামিনীকুমার চন্দ শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির প্রস্তাব করেন। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে শ্রীসচ্চিদানন্দ সিংহ যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাতেও শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তির কথা ছিলো। ১৯২১-এ সুরমা উপত্যকার প্রতিনিধি শ্রীগিরিশ চন্দ্র নাগ এবং ১৯২৪-এ শ্রীব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী যথাক্রমে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও আসাম ব্যবস্থাপক সভাতে উক্ত প্রস্তাব আনয়ন করেন। অতঃপর ১৩৩৩ সালে 'শ্রীহট্টের বঙ্গভুক্তি প্রস্তাব' অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হলে 'প্রবাসী' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়:

"দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর আন্দোলনের ফল এইরূপ বৃথা হইয়া গেল। এই প্রসঙ্গে শ্রীহট্টের জনশক্তি প্রকৃত কথা বলিয়াছেন। সহযোগী লিখিতেছেন:

"দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর আন্দোলনের ফলে একটা অশ্ব-ডিম্ব প্রসব হইল। লোকমত পদদলিত করিয়া আমলাতন্ত্র নিজ স্বেচ্ছাচারিতা ও দম্ভের পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীহট্ট আর বাংলায় গেল না, আমলাতন্ত্রের জেদ বজায় রহিল।"[৩] ১৮৭৪ থেকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে দেশবিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত সিলেট আসাম প্রদেশের সঙ্গেই যুক্ত থাকে। এর অন্তর্বর্তী সময়ে ১৯০৫-এ বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে উল্লিখিত জেলাটি ১৯১১ পর্যন্ত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাঙলার অঙ্গীভূত হয়। কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হওয়ার ফলে সিলেট পুনর্বার আসামের প্রান্তীয় জেলায় পরিণত হয়।

মাতা ধরিত্রী যেন পরম করুণায় আপন পেলব হস্তাবলেপনে শ্রীহট্টকে সুসজ্জিত করেছেন। শ্যামল সবুজ সমতল বঙ্গভূমির শ্রীহট্টই একমাত্র জেলা—ক্ষুদ্র-বৃহৎ টিলা, নিবিড় বনভূমি, অসংখ্য নদী-নালা-ঝর্ণা আর দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রসদৃশ 'হাওরের' সমন্বয়ে যে-জেলাটি আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ। প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য তা' বিশেষভাবে প্রতিফলিত সেখানকার জনজীবনে। মানুষে-মানুষে ভেদবুদ্ধি, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্মীয় সঙ্কীর্ণ-চেতনাজাত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অনতিক্রম্য হয়ে দেখা দেয়নি দীর্ঘদিন তাদের সম্মুখে, কল্যাণচেতনা অতন্দ্র প্রহরীর মতো তাদের রক্ষা করেছে সাময়িক

ক্ষুদ্রতার কুটিল মন্ত্রণা থেকে। এর পশ্চাতে সক্রিয় সিলেটের গৌরবোজ্জ্বল অতীত, শ্লাঘনীয় ঐতিহ্য। সেই অতীতে আবির্ভূত হয়েছেন বহু বরেণ্য পুরুষ—যাঁদের কণ্ঠে নিরন্তর ধ্বনিত হয়েছে মহামিলনের জয়গান, মানবতার মহামন্ত্র। গড়ে উঠেছে নোতুন ঐতিহ্য, ঋদ্ধ হয়েছে প্রাচীন যশোভাণ্ডার। আর এই ঐতিহ্যকে সগর্বে ধারণ করেছে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর শ্রীহট্ট।

শ্রীহট্ট জেলা প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল : ১ গৌড়, ২. লাউড় ও ৩. জৈন্তা। এবং তিনটি অঞ্চলই ছিলো স্বতন্ত্র নৃপতির কর্তৃত্বাধীন। এছাড়া ক. তরফ, খ. ইটা ও গ. প্রতাপগড় পরগণাও বহুকাল পৃথকভাবে শাসিত হয়েছে। উল্লিখিত পরগণাগুলো মুসলমান বিজয়ের পর গৌড়ের অঙ্গীভূত হয়। হজরত শাহ্ জালালের সময় তরফসহ শুধু গৌড় মুসলিম অধিকারে আসে এবং "After the death of Shah Jalal, the District (Sylhet) as then constituted was included in the Kingdom of Bengal, and put incharge of a Nawab, In the reign of Akbar it passed with the rest of Bengal into the hands of the Mughul Emperors, and from that time was ruled by an amil (Iocally known as a Nawab) subordinate to the Nawab of Dacca."[৪] ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র বাঙলার সঙ্গে সিলেটেও ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগকালে দ্বিধাবিভক্ত প্রকৃতির লীলানিকেতন সুরমা উপত্যকার বৃহদাংশ তৎকালীন পূর্বে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হয়ে বর্তমানে স্বাধীন বাঙলাদেশের সিলেট জেলায় রূপান্তরিত। অবশ্য পাকিস্তান আমলেও এই অংশ শ্রীহট্ট বা সিলেট নামেই পরিচিত ছিল। অপরার্ধ ভারতের আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলার রূপ পরিগ্রহ করে। করিমগঞ্জ মহকুমাও সে-সময় সিলেটের অঙ্গচ্যুত হয়ে কাছাড় জেলায় লীন হয়ে যায়। বর্তমানে কাছাড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে করিমগঞ্জ নোতুন জেলায় পরিণত হয়েছে।

০.৩

সিলেটের অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্মমত প্রচলিত। কয়েকটি উপজাতিও দীর্ঘদিন থেকে সেখানে বসবাস করছে। পার্বত্য জাতি বা গোষ্ঠী ব্যতীত অন্যান্য সকলেই বাঙালী এবং ধর্মীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের অখণ্ড বাঙালী সত্তা আজও অমলিন। প্রাচীন শ্রীহট্ট সনাতন ধর্মাবলম্বীদেরই বাসস্থান ছিলো। হজরত শাহ্জালালের আগমনের পূর্বে সিলেটে মুসলমানের বসতি ছিলো অতি নগণ্য। শাহ্ জালালের শ্রীহট্ট বিজয়কে কেন্দ্র করে বহুবিধ গল্পকাহিনী—কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছে। এই পুণ্যাত্মার পদার্পণের পর থেকে সিলেটে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানদের অধিকাংশই ধর্মান্তরিত ব্যক্তি, কিছু বহিরাগত। আবার অভিজাত পরিবারের অধিকাংশই বহিরাগতদের বংশোদ্ভূত বলে দাবী করেন।

প্রচলিত গ্রন্থাবলী এবং জনমতানুযায়ী শ্রীহট্টাধিপতি মহারাজ গৌরগোবিন্দের শাসনকালে জনৈক বুরহানউদ্দীন পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে গো-হত্যা করেন। ফলে ক্রোধান্ধ রাজা গো-হত্যার মূল কারণ সেই পুত্রকে হত্যা ও পিতার হস্ত কর্তনের নির্দেশ

দেন।[৫] প্রায় একই সময়ে একই প্রকৃতির দ্বিতীয় ঘটনাটিরও উৎসস্থল সিলেটের তরফ অঞ্চল। ত্রিপুরা বংশীয় এবং ত্রিপুরার মহারাজার অধীন সামন্ত আচক নারায়ণ তখন তরফের শাসনকর্তা। তিনি তাঁর রাজ্যের কাজী নূরউদ্দীন নামক এক ব্যক্তিকে পুত্রের বিবাহে[৬], মতান্তরে 'পুত্রোৎসব উপলক্ষ্যে',[৭] গো-হত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই নৃশংস ঘটনার প্রতিকারার্থে বুরহানউদ্দীন দিল্লীশ্বরের[৮] এবং নুরউদ্দীনের ভ্রাতা হেলিমউদ্দীন বঙ্গের সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের শরণাপণ্ন হন।[৯] তাঁদের অভিযোগক্রমে বঙ্গেশ্বর নিজ পুত্র সিকান্দর শাহ্‌কে,মতান্তরে দিল্লীর তুগলুক বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্ আপন ভাগিনেয় সিকান্দর শাহ্ গাজীকে সসৈন্যে শ্রীহট্ট অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু 'অলৌকিক শক্তিধারী' রাজা গৌরগোবিন্দের নিকট সিকান্দর পরাজিত হন। ফলে বিফল মনোরথ বুরহানউদ্দীন দেশত্যাগী হয়ে দিল্লী এসে উপস্থিত হন। এখানেই দরবেশ শাহ্ জালালের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। সমস্ত বিবরণ শুনে হযরত তাঁকে আশ্বস্ত করেন এবং বুরহানউদ্দীনের সঙ্গে তিনশত ষাটজন, মতান্তরে তিনশত তের জন দরবেশসহ শ্রীহট্টাভিমুখে যাত্রা করেন। এদিকে পরাজিত সিকান্দর গাজীর সাহায্যার্থে দিল্লীশ্বর সৈয়দ নাসিরুদ্দীনকে সিপাহ্‌সালার করে এক হাজার অশ্বারোহী ও তিন হাজার পদাতিকের এক বাহিনী সিলেটের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। এলাহাবাদে হযরত শাহ্ জালালের সঙ্গে এঁদের দেখা হয় এবং হযরতের মহিমা ও অত্যাশ্চর্য গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে স্বয়ং সিপাহ্‌সালার নাসিরদ্দীনও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর সাধু ও সৈনিকের সম্মিলিত শক্তি অসি ও ঐশী বলে বলীয়ান হয়ে শ্রীহট্টের পথে ধাবিত হলেন। ফলে "The supernatural powers of the last Hindu king, Gaur Gobind, proved ineffectual against the still more extraordinary powers of the fakir Shah jalal, who was the real leader of the invaders."[8] শ্রীহট্ট বিজয়ের পর শাহ্‌জালালের নির্দেশানুসারে সেনাপতি সৈয়দ নাসিরুদ্দীন বার জন দরবেশসহ তাঁর অধীন সেনাবাহিনী নিয়ে 'তরফে' অভিযান করেন। বিজিত তরফে ধর্ম প্রচার করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। এবং বিজয়ী দলে বার জন দরবেশ ছিলেন বলে তরফ অদ্যাবধি 'বার আউলিয়ার মুলুক' বলে অভিহিত হয়ে আসছে। শাহ্ জালালের অনুষঙ্গী দরবেশ ও সৈনিকদের অনেকেই সিলেটে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। পরবর্তীকালে "During the Mogul government a considerable military force was kept up at Sylhet for its defence,–the troops were maintained on the feudal system, and had lands alloted to them under the hills for their military services."[১০] সামন্তপোষিত এই সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের অধিকাংশ দেশীয় লোক হলেও এদের অধিকর্তা এবং নেতৃস্থানীয়দের অনেকেই ছিলেন বহিরাগত, অবঙ্গভাষী। এবং আজকের শ্রীহট্টের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবারের ধমনীতে এঁদের রক্তধারা প্রবহমান। স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বিদেশাগত ব্যক্তিবৃন্দ কয়েক পুরুষের ব্যবধানে পুরোপুরি এদেশীয় হয়ে পড়েন। ধর্মীয়, বৈবাহিক ও অন্যান্য সামাজিক সূত্রে দেশজ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। তাঁরা পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে একে অপরকে বুঝতে ও জানতে সচেষ্ট হলেন। ফলে সমাজ-সংস্কৃতি-ধর্মীয় জীবনে বিজয়ী নবশক্তি বিজিতকে যেমন

প্রভাবিত করলো তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশজ জনের ধর্ম-বিশ্বাস, লোকাচার তথা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড বিজয়ীর হৃদয়ের গভীরে শিকড় প্রোথিত করতে সমর্থ হলো।

মানুষের সাধারণ প্রবণতা প্রধানতঃ অর্থ, যশ ও প্রতিপত্তির দিকে এবং বিষয়ীলোক এই ত্রয়ীর প্রলোভনে কখনো সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ থাকতে পারে না। সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন বিত্তের। শুধু ধনবান হলেই চলবে না—সামাজিক স্বীকৃতিও আবশ্যিক। এজন্য দান-দক্ষিণা ও ধর্ম তথা মানবকল্যাণের জন্য কিছু ব্যয় না করলে সমাজে বিশিষ্ট আসন লাভ কষ্টকর। নিকট অতীতেও দেখা গেছে সাধরণস্তর-সমুদ্ভূত লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা দীঘি বা জলাশয় খনন, মন্দির-মসজিদ, বিদ্যালয়, আশ্রম স্থাপন প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কার্যের মাধ্যমে সাধারণ জনের শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। এরপরেও প্রয়োজন রাজানুগ্রহ। কেননা, রাজদরবারে সম্মানিত না হলে যেমন ভূস্বামী নিজ অঞ্চলে যথার্থ সম্মান থেকে বঞ্চিত হন, তেমনি প্রতাপশালী বা বিত্তবান প্রজা জমিদারগৃহে সমর্যাদায় গৃহীত না হলে স্বগ্রামেও তাঁর প্রাপ্য সম্মান হয় ভূলুণ্ঠিত। রাজানুগ্রহ ও রাজকর্মের প্রত্যাশা এবং বিত্ত-প্রতাপ-যশের কাঙ্গালপনাও অনেককে ধর্মান্তরণে প্রলুব্ধ করে। জাতবর্ণ নির্বিশেষে সর্ব শ্রেণীর প্রতি ইসলামের উদার আহ্বানের একটা অনিবার্য আকর্ষণ তো ছিলই, তদুপরি রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার আশায় এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে দেশীয় সাধারণ জনদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এবং বিত্তবান প্রভাবশালী ভূস্বামীদের অনেকে ইসলাম ধর্ম বরণ করেন। ধর্মান্তর ও বিবাহ — এ দুটো কারণে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের যে সুযোগ মেলে তারই ফলে হিন্দু-মুসলমানদের সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। শ্রীহট্টের সমাজ-জীবনধারা বিশ্লেষণ করলে বক্তব্যটি স্বচ্ছ হবে। সিলেটের বিশিষ্ট বংশধারা—বিশেষ করে ভূস্বামী হিসেবে যারা শাসন—শোষণের মালিক—বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বংশেই দুটো ধারা সমান্তরাল বহমান—একটি সনাতন ধর্ম, অপরটি ইসলাম। একই বংশের দুটো ধারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে হিংসা-জিঘাংসায় করাল মূর্তি ধারণ করেছে কিংবা পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছে এমন তথ্য অজ্ঞাত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে তীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং 'দ্বি-জাতিত্বের' ধ্যান-ধারণা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা চলে। মুসলমানদের একাংশ নিজেদের বহিরাগত 'শরীফ' প্রতিপন্ন করতে ছিলেন সমুৎসুক। এঁদের মুখপাত্রের ভাষ্য:

"বাঙলাদেশের হিন্দু ভ্রাতারা মুসলমানদিগের মনে যত প্রকার উপায়ে নীচ ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে "মোসলমানেরা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুবংশজ" এই কথাটি সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক ক্ষতিকর।

আমাদের নব্যযুবক এবং ছাত্রছাত্রীগণ প্রাণের সহিত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা সেই সমস্ত জগদ্বিজয়ী, জ্ঞান বিজ্ঞানবিশারদ, মহা-পরাক্রান্ত, বিশ্বধন্য আরব তুর্কী ও পাঠানদিগের বংশধর।"[১১]

এ মনোভাব মুসলমান সমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে অনেকে আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করেন। এ সময় 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত একটি পত্র বিশেষভাবে দৃষ্টি আকষর্ণ করে। লেখক শ্রীহট্ট-নিবাসী দেওয়ান একলিমুর রেজা চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য:

"যাহাদের শরীরে হিন্দুরক্ত প্রবাহিত তাহাদের হিন্দুদের বংশধর বলিয়াই গৌরব অনুভব করা উচিত। উহার কারণ এই যে, এদেশীয় হিন্দুগণ আর্য্যবংশোদ্ভূত এবং আর্য্যগণ অতি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, সুতরাং এহেন প্রাচীন সভ্য জাতির যাহারা প্রকৃত বংশধর তাহারা কেন যে নিজের প্রকৃত বংশ-পরিচয় গোপন করিয়া "সেমেটিক" বা অন্য কোনো অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবে, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম বরং আমি ব্যক্তিগতভাবে ভরদ্বাজগোত্রীয় আর্য্য সন্তান বলিয়া আপনাকে মহাগৌরবের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করি এবং এইজন্য আরোও অহঙ্কার করি যে, আমারি পূর্বপুরুষ কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন বিচার-শক্তির সাহায্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।" [১২]

শ্রীহট্টে বহু খ্যাতিমান পূত চরিত্রের অধিকারী মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে—যাঁদের চারিত্র্য-মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হয়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর লোকজন সমবেত হয়েছে, করেছে শান্তির অন্বেষণ। বিশেষ কোনো ধর্মীয় গণ্ডীর ব্যবধান তাঁদের মধ্যে পাষাণ প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়নি। তাঁদের পুণ্যস্মৃতি বহন করছে বহু দরগাহ্-মোকাম-আখড়া—সে সমস্ত স্থান আজও সর্বশ্রেণীর লোকজনের শুধুমাত্র পুণ্য তীর্থভূমি নয়, মহামিলন ক্ষেত্র।

ধর্মপথে বিচরণ করে এবং বিবিধ লোকহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থেকে হজরত শাহ্জালাল সকলের শ্রদ্ধেয় ও অতি মান্য হয়েছিলেন। এই মহাত্মার দরগাহ্ মুসলমানদের তীর্থস্থান হিসেবে চিহ্নিত হলেও "…হিন্দু যাত্রীরা শ্রীহট্টে যাইয়া … সাহজালালের মসজিদ পরিক্রমণ না করিয়া এবং সাহজালালের দরগাতে সিন্নি না দিয়া ফিরিতেন না।

ফলতঃ সে অঞ্চলের হিন্দুরা সাহজালালকে নিজেদের দেবতার আসনে না তুলিয়া ছাড়েন নাই। সাহজালালকে তাঁহারা মহাদেবের অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন…" [১৩]

প্রতাপগড়ের 'বাদশাহ্র মোকাম' সম্বন্ধে নানারকম কিংবদন্তী প্রচলিত। হয়তো এর পশ্চাতে ঐতিহাসিক সত্যও নিহিত থাকতে পারে। "In the Pratapgarh pargana,,,,, there are several Mukams (বাসস্থান) which are said to have been founded by one of the Badshas of Delhi, who turned fakir and settled in that lonely spot. Timber traders, whether Muhammadan or Hindu, still worship at this places,····" [১৪]

সাধক আকবর শাহ্-র দরগাহ্ ও মোকামের প্রতিও সিলেটের হিন্দু-মুসলমান একই রকম ভক্তি প্রদর্শন করেন। জফরগড়ের 'ঠাকুর ফকিরের' প্রকৃত নাম আজও অজ্ঞাত। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁর কৃপা লাভ করেছেন। হিন্দুদের কাছে তিনি 'ঠাকুর' এবং মুসলমানের নিকট 'ফকির'। তাই তিনি 'ঠাকুর ফকির' নামেই সমধিক পরিচিত। রজক জাতীয় রাখাল শাহ্ সাধারণের নিকট পীর বা সিদ্ধপুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধেয় ছিলেন। জাতি-ধর্ম নির্বিচারে সকলেই 'ইষ্টানিষ্ট' জানবার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হতো। আধুনিক যুগে সিলেটে বৈষ্ণব-ঘেঁষা আরেকটি ধর্মমত প্রচারলাভ করে। যে-কোনো লোকই এই মতাবলম্বীদের সঙ্গী হতে পারতো। এদের সাধনমার্গেও হিন্দু-মুসলমানের বা বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসীদের মিলনের পথে কোনো বাধা ছিলো না।[১৫]

মানুষে মানুষে মিলনের ক্ষেত্রে এসব ধর্মগুরু এবং তাঁদের পীঠস্থানগুলোর ভূমিকা বা অবদান অসামান্য। একই পীরের 'মুরিদ' বা গুরুর শিষ্য—হিন্দু ও মুসলমান—পরস্পর

'পীর ভাই/গুরু ভাই' হিসেবে এক রকম আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ। পীরের নির্দেশই তাদের পথ-প্রদর্শক। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার স্থান সেখানে এতো নগণ্য যে তা' ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না । মুসলমান ফকিরের আশীর্বাদ পেয়েছেন হিন্দু জমিদার, হিন্দু সামন্ত অকৃত্রিম ভক্তির সঙ্গে নির্মাণ করেছেন দরবেশের দরগাহ্ কিংবা মোকাম। মুসলমান নবাব-জমিদার দেবোত্তর জমি দান করেছেন বা প্রতিষ্ঠিত করেছেন হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীকে। এসব দৃষ্টান্ত বিরল নয়। 'শ্রীহট্টের সামাজিক জীবন' আলোচনায় আমরা এ প্রসঙ্গে কিছুটা আলোকপাতের চেষ্টা করবো। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—সিলেটে কি কখনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়নি ? হয়েছে। এবং সংখ্যায় নগণ্য। তার অধিকাংশই ছিলো স্বার্থ সংক্রান্ত এবং ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। সেখানে সংঘর্ষ বেধেছে রাজায় রাজায়, সামন্তে সামন্তে, জমিদারে জমিদারে। ঘটনাচক্রে হয়তো দু' পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দু' ব্যক্তি। আর মহল বিশেষ তাকেই 'সাম্প্রদায়িক' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ইতিহাসে কোনো নোতুন তথ্য নয়। পাঠান-মুঘল কিংবা নবাবী আমলে এ দেশে নিজেদের স্বার্থেই শাসকবর্গ বিদ্বান, বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ রাজকর্মচারী নিয়োগ করতেন। তাঁদের উদ্দেশ্য প্রজাকুলকে সুষ্ঠুভাবে শাসন-শোষণ এবং ক্ষমতা চিরস্থায়ী করে রাখা। এ-কর্মে তাঁদের প্রয়োজন ছিলো অনুগত যোগ্য ব্যক্তির — যিনি সুচারুরূপে তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে সমর্থ। তাই ধর্মবিশ্বাস সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করেনি। আপন গরজেই "মোসলমান আমলে গুণের আদর ছিল, উপযুক্ত হিন্দুগণও উচ্চপদে নিয়োজিত হইতেন। এমনকি, দেশের সর্বপ্রধান শাসনকর্তা ও সেনাপতির পদও হিন্দুগণ লাভ করিতে পারিতেন। সীমান্ত-দেশ শ্রীহট্টেও তাহার ব্যভিচার হয় নাই, নবাব হরকৃষ্ণ ও সেনাপতি হরদয়াল তাহার উদাহরণ।"[১৬] সিলেটের মহাফেজখানা থেকে যে-সমস্ত সনন্দ ও দানপত্র পাওয়া গেছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে সহজেই প্রত্যয় জন্মে যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে "মোসলমান আমলে দেশীয় সুধী ও সাধু সমাজ সতত রাজা হইতে প্রভূত সহায়তা প্রাপ্ত হইতেন, এই সকল সনন্দ তাহার উদাহরণ। শ্রীহট্টের আমিল (ফৌজদার) বর্গ প্রায় প্রার্থীবর্গকে বঞ্চিত করিতেন না।"[১৭] শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাসের জন্যই হিন্দু-মুসলিম চিত্তে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগেনি। এ অপকর্মটি হয়েছে পরবর্তী যুগে, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে—যার ফসল উপমহাদেশে তিনটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব।

গৌরবময় কীর্তিকাহিনীকেও কতো নির্লজ্জভাবে মসিলিপ্ত করা যায় তার দৃষ্টান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত রচনার যত্রতত্র লভ্য। এদেশে পুরোপুরি ভাবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব স্থাপনের মাত্র সতেরো বৎসরের মধ্যেই শ্রীহট্টে বণিক-রাজত্বের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান হয়েছিলো। দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাব, অপরিকল্পিত আক্রমণ, উদ্দেশ্যবিহীনতা—সর্বোপরি রাজনৈতিক চেতনার পঙ্গুত্বের জন্যে সে অভ্যুত্থান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। ঘটনাকাল ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দ। রবার্ট লিন্ডসে তখন সিলেটের রেসিডেন্ট। কোম্পানি রাজত্বের উচ্ছেদকল্পে যে বিদ্রোহ, তাকে তিনি 'হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলিম আক্রমণ' বলে অভিহিত করলেও তাঁর বক্তব্যের স্ববিরোধিতার মধ্যেই রয়েছে সত্যের উপাদান। লিন্ডসে অকপটে স্বীকার করেছেন : "I speak of the period when Mr. Hastings visited Benares in the year 1782 and the temporary revolt of Rajah Cheit Sing and Vizir Ali. By a well-constructed plan, they had rearly

succeeded in taking Mr. Hastings and his body-guard prisoners;···· as it was, there was considerable agitation in many of the provinces of Bengal, and it was partially felt even at Dacca and Sylhet;"[১৮]

বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে লিন্ডসে তাঁর সিপাইদের নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, এক ধর্মীয় নেতা তিন শতাধিক স্বাধীনতাকামীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বিদ্রোহী নেতাকে অস্ত্রত্যাগের নির্দেশ দিলে তিনি লিন্ডসের উদ্দেশে দৃপ্তকণ্ঠে বলেন, "আমরা ফিরিঙ্গির গোলাম নই।" এবং "He immediately drew his sword, and exclaiming with a loud voice, This is the day to kill or to die; the reign of the English is at an end !" aimed a heavy blow at my head this I was fortunate enough to parry ,... My black servant at the same moment thrust a pistol into my hand, which I instantly fired, and the priest felt,····

I had now time to look about me and survey the mischeif that had been done in so short a time. The high priest and his two brothers were lying dead on the ground, and many of his dependents were wounded; on my side one sepoy was killed, and six wounded. Most fortunately my people did not give way—if they had, every European in the place would have fallen..." [১৯]

রবার্ট লিন্ডসে ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে এতদসংক্রান্ত যে বিবরণ তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর পারিষদবর্গকে অবহিত করেন তা' থেকে জানা যাচ্ছে যে, বিদ্রোহীরা প্রথমে দেওয়ানের বাড়ি আক্রমণ করে শহরে অগ্নিসংযোগ ঘটায়। এই সংবাদ পেয়ে লিন্ডসে প্রথমে সিলেটের কানুনগো মাসুদ বখ্‌ত্‌ ও কোম্পানির সিপাইদের এক জমাদারকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন। দু' জনই মুসলমান এবং এই জমাদার যুদ্ধে নিহত হয়। বিবরণে দেওয়ান মাণিক চাঁদের মৃত্যুর উল্লেখ করা হলেও "অনেকে বলেন যে হাঙ্গামার কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু হাঙ্গামা উপলক্ষ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘোষিত হওয়ায়, যে কয়েকদিন জীবিত ছিলেন,—তাঁহাকে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হইয়াছিল!!"[২০] এই আত্মগোপনের তাৎপর্য কি ? কোম্পানি প্রশাসন কি প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, মুসলমান আক্রমণে হিন্দু দেওয়ান নিহত হয়েছে ? স্বাধীনতাকামীদের সাম্প্রদায়িক হিসেবে কলঙ্কিত করে হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তোলাই কি এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিলো না ? প্রথম থেকেই শ্বেতসন্ত্রাস এদেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধের বীজ বপন করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিলে সচেষ্ট ছিলো। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীহট্ট শ্লাঘনীয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

০.৪

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট ছিলো হিন্দু-শাসিত হিন্দু-প্রধান অঞ্চল। দু-চারটি মুসলমান পরিবার সবেমাত্র ছিট্‌কে এসে বসতি স্থাপন করেছে। আর ছিলো কিছু আদিবাসী—যাদের চিন্তাচেতনা, ধর্মাচার—লোকাচার আদিম ধ্যান-ধারণাও ধর্মবিশ্বাস

দ্বারা বরাবর নিয়ন্ত্রিত। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই অর্থাৎ বঙ্গে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পর দ্রুতগতিতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সিলেটে সর্বপ্রথম যে আদমসুমারী হয়, তাতে দেখা যাচ্ছে সেখানকার সর্বমোট জনসংখ্যা ১৭,১৯,৫৩৯ জন। তারমধ্যে "... the Hindus .... number 859,234, or 50 per cent; Muhammadans, 854,131, or 49.7 per cent.; Christians, 159; and 'others', 6015, or ·3 per cent,"[২১]

প্রায় তিরিশ বৎসর পর ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের লোক গণনায় দেখা যাচ্ছে সিলেটে মুসলমানের সংখ্যা ১১,৮০,৩২৪ জন, হিন্দু ও খ্রীষ্ট ধর্মালবম্বীর সংখ্যা যথাক্রমে ১০,৪৯,২৪৮ ও ৩৯৪ জন মাত্র।[২২] অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই সিলেট মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ঊনবিংশ কিংবা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে হিন্দু কিংবা মুসলমানের একে অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের কোনো হেতু ছিলো না।

সাধারণ লোকের মাতৃভাষা বাঙলা হলেও সিলেটে প্রাচীন কাল থেকে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য থাকায় সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক চর্চা হয়েছে। নবাবী আমলেও টোল-চতুষ্পাঠীর গৌরব অক্ষুণ্ন ছিলো। বহিরাগত মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আরবী-ফারসী-উর্দু প্রচলনের সূচনা। মুসলমানের শাস্ত্রীয় ভাষা আরবী, প্রশাসনিক ভাষা ফারসী আর বহিরাগত মুসলমানের ঘর-সংসারে নিত্যদিনের ব্যবহৃত ভাষা উর্দু। কাজেই ধর্মীয় প্রয়োজনে দেশজ মুসলমানদের আরবী শিখতে হয়েছে। আর প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রলোভনে, ব্যবসা-বাণিজ্যের গণ্ডী প্রসারিত করার মানসে এবং রাজন্যবর্গ তথা আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে পাঠান-মুঘল-নবাবী আমলে ও ইংরেজ আগমনের অব্যবহিত পর পর্যন্তও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উচ্চাভিলাষী শিক্ষিত জনমাত্রই উর্দু-ফারসীর চর্চা করতো। রাজভাষায় পারঙ্গমতা আভিজাত্যেরও একটা বহির্লক্ষণ বটে। সুতরাং অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরবী-ফারসী-উর্দু জানা মুন্‌শী পণ্ডিত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিলো। ইংরেজ আগমনের ফলে আরবী-ফারসীর সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাও অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। মক্তব-মাদ্রাসার মতো টোল-চতুষ্পাঠীও জীর্ণ দশাপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য ইংরেজ আবির্ভাবের শতাধিক বৎসর পরও এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিজস্ব মান-সম্ভ্রম বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলো। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশেই ফারসী-উর্দুকে পথ ছেড়ে দিতে হলো ইংরেজীর জন্য। ধাক্কাটা সমাজের সর্বস্তরকে আলোড়িত করলেও মুসলমানদের স্থিতধী হতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের অনেকটা পেছনে পড়ে যায়—অবশ্য এই পশ্চাৎপদের কারণ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের আর্থিক জীবন অনেকটাই পঙ্গু হয়ে পড়েছিলো, আর্থিক পঙ্গুত্ব তাদের ভাবজীবনকেও অসাড় করে ফেলে। পরিণামে একটি সম্প্রদায় অনিবার্য কারণেই শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা চিন্তা জগতে অন্য সম্প্রদায় থেকে অনেকটা এগিয়ে যায়। ক্ষুদ্র বৃহতের ব্যবধানটাও প্রসারিত হতে থাকে। আর অক্ষমের বঞ্চনাজাত হতাশা কোনো কোনো সময় তাকে করে তোলে অতিমাত্রায় সম্প্রদায়নির্ভর, যার থেকে কালে অঙ্কুরিত হয় সাম্প্রদায়িকতার অবাঞ্ছিত বিষবৃক্ষ।

শ্রীহট্টের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সমাজ-পরিবেশের মুল্যায়নে পুনর্বার অতীতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। বহু জ্ঞানী-গুণী-সাধক-বিদগ্ধ জনের পুণ্যস্মৃতি ধন্য এই জেলায় তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অপরিসীম। হজরত শাহ্ জালাল-প্রসঙ্গ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। '৩৬০ আউলিয়ার দেশ'কে অনায়াসেই 'বৈষ্ণব প্রসূতি' হিসেবেও আখ্যায়িত করা চলে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণে এবং মাতামহ বিশিষ্ট জ্যোতিষ শাস্ত্রী নীলাম্বর চক্রবর্তী ও তাঁর কন্যা তথা মহাপ্রভুর মাতা শচীদেবী তরফ পরগণার জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর পিতামহীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ১৪৩১ শকে চৈতন্যদেব ঢাকাদক্ষিণে আগমন করেছিলেন। অদ্বৈতাচার্যের জন্মস্থানও সিলেটের লাউড় পরগণার নবগ্রামে। চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীবাস আর্চায, চৈতন্যলীলার প্রাচীনতম লেখক মুরারি গুপ্ত, 'বঙ্গ-গৌরব রঘুনাথ শিরোমণি, পদ্মাপুরাণের স্বনামখ্যাত কবি ষষ্ঠীবর, অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য ও জীবনীকার ঈশান নাগর, ফারসী গ্রন্থকার রেয়াজউদ্দীন 'বুলবুলে বাঙ্গলা', ফারসী কবি মৌলবী মোহম্মদ আরসদ,'বিখ্যাত অষ্টবিংশতি প্রদীপ প্রণেতা.. মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার, ত্রৈপুর রাজবংশের ইতিহাস 'রাজমালা'কার শুক্রেশ্বর প্রভৃতি ... আবিভূর্ত হইয়া শ্রীহট্টের মুখোজ্জ্বল করেন।'[২৩] এ-সব সাধু-সন্তদের প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিলো অকৃত্রিম। তরফের 'বাবাজীর চর'-এর বিখ্যাত বাবা জয়রাম দাসের গুণে বিমুগ্ধ সুলতানশীর জমিদার 'তাঁকে উক্ত স্থান দেবোত্তর দান করেছিলেন। 'পঁচাউনের দত্তপুরকায়স্থ' বংশের শিবরাম দত্ত ঘটনাক্রমে সুলতানশীর এক জমিদারগৃহে অতিথি হয়েছিলেন। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে মহানুভব 'জমিদার সাহেব' তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে জায়গীর দিয়ে লক্ষ্মীপুর গ্রামে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন। লক্ষ্মীপুরের দত্তপুরকায়স্থরা শিবরামেরই উত্তরপুরুষ। বাণিয়াচঙ্গের দেওয়ান উমেদ রজা প্রকৃত ধর্মনিষ্ঠ জনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁরই নির্বন্ধাতিশয্যে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী কেশবলাল গোস্বামী তাঁরই প্রদত্ত জমিতে বসবাস করতে ও মাতৃদর্শনে সম্মত হয়েছিলেন। পরে গোস্বামী গৃহী হয়ে অনাসক্তভাবে জীবন যাপন করেন।[২৪] ইংরেজ আমলের সূচনাতে লস্করপুরের জনৈক শিকদার "তরফেশ্বরী নামে হিন্দুদের জন্য এক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং মোসলমানদের উপাসনার জন্যেও এক মসজিদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।"[২৫]

এই ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিতে শ্রীহট্টের হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলো এবং পর-ধর্মমতের প্রতি হয়েছিলো উদার ও সহিষ্ণু। সমকালীন মনীষীদের ঐতিহাসিক এবং জীবনচরিত গ্রন্থাদিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শ্রীহট্টে বিরাজমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার প্রামাণিক চিত্র পাওয়া যায়। এই চিত্রগুলো অত্যন্ত মধুর, চিত্তগ্রাহী। কখনো কখনো অপসৃত অতীত সুখময় স্মৃতি হয়ে হৃদয়ে একটা অব্যক্ত বেদনার ছায়া ফেলে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে লোক-লৌকিকতায় কোনো রকম বাধাবিঘ্ন ছিলো না। বিয়ে, শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রমে তারা ছিলো পরস্পরের সহযোগী, সমমর্মী। গ্রাম-সম্বন্ধে আত্মীয়তার এ বন্ধন ছিলো একান্তভাবেই আত্মিক। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে "পরস্পরের মধ্যে 'সিধা'র আদান প্রদান হইত। মুসলমান বলিয়া আমরা ইঁহাদিগকে ঘৃণা করিতাম না, ইঁহারাও আমাদিগকে 'কাফের' ভাবিয়া নরকে পাঠাইতেন না; উভয়ে নিষ্ঠা সহকারে নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করিতেন। উভয়েই এইভাবে মোক্ষ লাভ

করিবেন বিশ্বাস করিতেন, একে অন্যকে নিজের ধর্ম্মে লওয়াইতে চেষ্টা করিতেন না।... হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করিতেন। ওপথ তাঁহার নিজের পথ নহে কিন্তু ওপথে যে পরমার্থ মেলে না এ কল্পনা হিন্দু করিতেন না। মুসলমানও সেইরূপ হিন্দুর ধর্ম্মকে নিজে না মানিলেও সর্বদা সম্মান করিয়া চলিতেন। বিষয়-আশয় জমিজেরাত লইয়া ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হইত বটে। হিন্দু মুসলমানে যেমন হইত মুসলমানে মুসলমানে বা হিন্দুতে হিন্দুতে সেইরূপই হইত। কিন্তু ধর্ম্ম লইয়া মারামারি কাটাকাটি হইত না।... বাংলার অনেক মুসলমানের পূর্ব্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। সুতরাং ইঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কোনদিন হিন্দু দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তি হারান নাই। ... মুসলমান হইয়াও ইঁহাদের অন্তরে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি কোনো বিদ্বেষ জন্মে নাই।"[২৬] সিলেটের হিন্দু যেমন শুদ্ধচিত্তে মুসলমানের দরগায় শিন্নি দিতে দ্বিধা করেনি, তেমনি মুসলমানও হিন্দু দেবদেবীর নিকট মানত করেছে নিশ্ছিদ্র ভক্তি সহযোগে। দুর্গোৎসবের জৌলুস মুসলমানের মনে যেমন রং ধরাতো, মহর্‌রমের সময় হিন্দুও লাঠি–তরবারির ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হতো না। মহর্‌রম উপলক্ষে অনেক সময় দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়েছে—"কিন্তু সে মাথা ফাটাফাটি হইত মুসলমানে মুসলমানে, লাঠালাঠি হইত এক আখড়ার সঙ্গে আরেক আখড়ার, ... শান্তিতে নির্ভয়ে ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকে লইয়া এই তামাসা দেখিতাম। তখন মুসলমানের পর্ব উপলক্ষ্যে এ সকল আমোদ প্রমোদে হিন্দুরা নির্বিঘ্নে যোগদান করিতেন; আর মুসলমানেরাও হিন্দুদিগের পর্বাহে তাহাদের আমোদ প্রমোদে প্রাণ খুলিয়া যোগ দিতেন।"[২৭] বিষহরি বা মনসার পূজো সিলেটের অন্যতম উৎসব। ভাসানের দিন 'নৌকা বাচ' উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিলো। এতদুপলক্ষে কখনো কখনো রক্ত ঝরলেও গ্রামজীবনের স্বাভাবিক সৌহার্দ্য বিনষ্ট হতো না। মনসা হিন্দুর দেবী হলেও "মনসার প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিনে হিন্দু মুসলমান সকলে মিলিয়া এই নৌকা-দৌড়ের আনন্দ উৎসবে মাতিয়া যাইতেন। এই বাচ-খেলায় কোন সাম্প্রদায়িক ভাব বা ভেদ ছিল না। হিন্দুর নৌকাতে মুসলমান এবং মুসলমানের নৌকাতে হিন্দু উঠিয়া বৈঠা ধরিতেন।"[২৮] সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্যের ধারা বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও নির্লক্ষ্য ছিলো না। সামাজিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিমন্ত্রণ জানানোর রেওয়াজ তখনো প্রচলিত ছিলো। এই মহান ঐতিহ্যে আস্থাশীল বলেই তরফের সৈয়দ বংশজ সৈয়দ আবদুল হেলিম (তারা মিয়া) সপার্ষদ খোল-করতাল সহযোগে বৈষ্ণব সংকীর্তনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতে পেরেছিলেন এবং হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকিরের সম্মিলিত কণ্ঠে আজও ধ্বনিত হয়:

হো! বিশ্বেশ্বর লাল!
তিন লাখ পীর সাহ্ জালাল।

০.৫

গুরুগৃহে অবস্থান করে বিদ্যার্জনের আশ্রমিক যুগের অবসান হলেও তার রেশটুকু অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার কোথাও কোথাও ছিলো। সেই ঐতিহ্যের শেষ রশ্মির অনুজ্জ্বল ক্ষীণালোক বিচ্ছুরিত হয়েছে টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তবগুলোর মাধ্যমে।

পুথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে নীতিশিক্ষাও সেখানে সমগুরুত্ব লাভ করতো। নোতুন যুগ এলো নোতুন দিনের নবতর বাণী নিয়ে। বিদ্যা শুধু জ্ঞানার্জনের জন্যে নয়, বিত্তার্জনের বাহন হয়ে উঠলো। সেদিন থেকে টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তবকে ক্রমান্বয়ে পথ ছেড়ে দিতে হলো পাঠশালা-স্কুলের জন্যে। অবশ্য দীর্ঘদিন প্রাচীন ঐতিহ্য শ্রীহট্টে বর্তমান ছিলো। এবং সেই গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখবার জন্যে সৈয়দ মুজতবা আলী আশাবাদী মন নিয়ে বারংবার আবেদন জানিয়েছেন। সিলেট জেলা থেকে প্রকাশিত'কাফেলা'-র প্রথম বার্ষিক সংখ্যা পড়ে ১৩ই মে, ১৯৬৭-তে সম্পাদক সাহেবকে লেখেন:

"সিলেটে সাহিত্য তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ছান্দসিক শ্রীযুত প্রবোধ সেন একদা আমাকে বলেন, স্বরাজ লাভের পূর্বে, পাক-ভারতে জেলা অনুযায়ী সিলেটে ছিল সব-চেয়ে বেশি মক্তব-মাদ্রাসা এবং টোল-চতুষ্পাঠী। পরলোকগত রামানন্দ ও প্রমথ চৌধুরী নাকি বলিয়াছেন 'প্রবাসী' ও 'সবুজপত্রে'র গ্রাহক সংখ্যায় কলিকাতার পরেই ছিল শ্রীহট্ট জেলার স্থান।

আমি ভরসা রাখি, ভবিষ্যতে পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্ট তাহার ঐতিহ্য বজায় রাখিবে ও আপনারা সেই কর্মে নিশানদার হইবেন।" (প-২২৯.০১)।

সেকালে পড়ুয়াদের বড় দুর্দিন ছিলো। বহু 'সাধনার' পর কলম স্পর্শ করার অনুমতি পাওয়া যেতো। আর হস্তলিপির ওপর পণ্ডিত-মৌলবীদের ছিলো তীক্ষ্ন দৃষ্টি। শিক্ষাদানের 'মহত্তম' মাধ্যম 'বেত' তাঁদের হস্তে সগৌরবে ছিলো বিরাজমান।কলাপাতা-তালপাতার স্তর অতিক্রম করে তিতিক্ষু জ্ঞানান্বেষী কাগজ-কলমের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করতো। বিংশ শতাব্দীতেও প্রারম্ভিক শিক্ষার এই ঐতিহ্য শ্রীহট্টাঞ্চলে ছিলো সুপরিচিত। সিলেট জেলায় ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং এর প্রবর্তক মিশনারি রেভারেন্ড ডব্লিউ প্রাইজ। কিন্তু তখনো সমাজে ফার্সীর দাপট অপ্রতিহত ছিলো। কেননা, নবাবী আমলে ফার্সীই ছিলো রাজভাষা এবং তার জাবরকাটা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত ছিলো অব্যাহত। রাজ-সরকারে চাকুরি প্রত্যাশী মাত্রই ফার্সী শিখতেন সযত্নে। ব্রাহ্মণরা সংস্কৃত পড়তেন। প্রত্যেক বর্ধিষ্ণু গ্রামে টোল এবং আরবী ফার্সী পড়ার জন্য মক্তব ছিলো। সাধারণত মসজিদ কিংবা মসজিদ-সংলগ্ন ঘরে 'মক্তব' বসতো। মসজিদের ইমাম কিংবা অন্য কোনো মৌলবী সাহেব শিক্ষাদান করতেন। "উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান বালকেরা এ সকল মাদ্রাসায় এক সঙ্গে শিক্ষা লাভ করিত। এখানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার ছিল না। হিন্দু বালকেরাও মুসলমান মৌলবীকে শিক্ষাগুরুর প্রাপ্য মর্যাদা ও ভক্তি অসঙ্কোচে অর্পণ করিত। হিন্দুরা যেমন নিজেদের বিদ্যারম্ভে বা হাতে-খড়ির সময়ে সরস্বতীর বন্দনা করিয়া লিখিতে পড়িতে আরম্ভ করিত, সেইরূপ মাদ্রাসায় বা মোক্তবে যাইয়া ফার্সী পড়িতে আরম্ভ করিবার সময় এবং প্রতিদিনের পাঠের প্রারম্ভে কোরানের আদি কথার... আবৃত্তি করিত। ইহার ফলে তখনকার মধ্য শ্রেণীর হিন্দু ভদ্রলোকদিগের অন্তরে মুসলমানদিগের ধর্মের প্রতি একটা সহজ শ্রদ্ধা জন্মিত।"[২৯] শ্রীহট্টে শিক্ষিত পরিবারে এর ক্ষীয়মাণ প্রভাব এখনো বর্তমান। 'দেশে-বিদেশে'র রসে অভিভূত জনৈক সিলেটী পাঠকের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে 'আন্তরিক ধন্যবাদ' জানিয়ে সৈয়দ মুবজতবা আলী লিখেছেন:

"আমি যেটুকু লিখেছি তার পিছনে সিলেটের শিক্ষা-দীক্ষা অনেকখানি লুক্কায়িত আছে। আশা করি আপনারা সে ঐতিহ্য বজায় রাখবেন। আমার বাল্যবয়সে শ্রীহট্টের প্রধান গুণ এই ছিল যে সেখানে যেমন আরবী ফারসীর ব্যাপক চর্চা ছিল ঠিক তেমনি সংস্কৃত ও বাঙলার চর্চা ছিল। আমি যদি সাহিত্য-সৃষ্টিতে কিছুমাত্র কৃতকার্য হয়ে থাকি তবে তার প্রধান কারণ এই উভয় ঐতিহ্যের মুরুব্বীদের দোওয়া আমরা উপর ছিল। আপনারা উভয় ঐতিহ্য বজায় রাখুন, এই কামনা।" (প-১০৬)

ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সাহায্যে সাধারণত প্রাচীন টোল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতো। জমিদার বা সমাজপতিরাই সাধারণত এ' ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমাজের সামষ্টিক সাহায্য-সহযোগিতা থেকেও এ-সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র বঞ্চিত হতো না। হজরত শাহ্ জালালের জনৈক অনুষঙ্গীর বংশধর মৌলানা জিয়াউদ্দীন সিলেটের দরগা মহল্লায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। "ইংরেজ আমলে পারস্যের স্থলে বাঙ্গালা ভাষা আদালত-ব্যবহার্য ভাষার স্থান অধিকার না করা পর্য্যন্ত, সুদীর্ঘকাল এই মাদ্রাশা বিদ্যমান ছিল। এই মাদ্রাশা পারস্য ভাষা শিক্ষার এক প্রধান কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই স্থানে পারস্য শিক্ষা করিত।"[৩০] বিদ্যোৎসাহী এই বংশের মুফ্তি নুরউদ্দীন ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে 'মুফ্তি স্কুল' নামে একটি মাধ্যমিক ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীহট্টের নব্য-শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ অন্যান্য যুবকের উদ্যোগে এখানেই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন বা শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ-ধরনের বেসরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে সক্রিয় ছিলো পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতাকামী মানুষের পরাধীনতার গ্লানি মোচনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। সরকারের সঙ্গে এ-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পর্কই থাকতো না। স্কুল-কর্তৃপক্ষ নিজেরা বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন পদ্ধতি নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করতেন।

ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের প্রথমাবস্থায় উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় সিলেটেও মুসলমান সমাজে এর প্রসার ছিলো অত্যন্ত মন্থর। আর্থিক অসঙ্গতির সঙ্গে ইংরেজ ও ইংরেজী বিদ্বেষও তাঁদের মনে দানা বেঁধেছিলো। 'মাতৃভাষা' সম্পর্কেও বিভ্রান্তিমুক্ত হতে তাঁরা যথেষ্ট সময় অপচয় করেন। তদুপরি "তারা বাংলা ভাষাকে পৌত্তলিকতার ভাষা বলে মনে করে সে ভাষাকে দীর্ঘদিন ঘৃণার চোখেই দেখেছে।"[৩১] তাঁদের বিবেচনায় "বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় এরূপ কোন গ্রন্থ নাই যাহা পাঠ করিয়া মুসলমানদিগের হৃদয়ে ধর্মভাব উদ্দীপ্ত হইতে পারে। বরং উহা পাঠ করিলে তদ্বিপরীত ভাবেই হৃদয় কলুষিত হইবার সম্ভাবনা।" (প্রচার ও প্রচারক, ইসলাম প্রচারক, আশ্বিন ১২৯৮)। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও এই কূপমণ্ডুকতা মুসলমান সমাজের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে রেখেছিলো। তাঁদের প্রচারণায় অভিব্যক্ত, "যে সকল অভিভাবক স্ব স্ব সন্তানদিগকে প্রথমেই ইংরাজী বা বাঙ্গলা শিক্ষা করিতে দেন, তাঁহারা নিজের হাতে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করেন...।"[৩২]

অবশ্য এ সময় মানসিক প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তি প্রত্যাশায় মুসলমান সমাজেও আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে এবং কয়েকটি পত্র-পত্রিকা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ইমদাদুল হক তাঁর 'ধর্ম ও শিক্ষা'য় লিখেছেন, "শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে

এক্ষণে ইংরাজি শিক্ষার বহুল প্রচলন আবশ্যক। যাঁহারা কাফেরী ভাষা বলিয়া ইংরাজি শিক্ষার এবং এল্‌মে বেদীন বলিয়া বিজ্ঞানের বিরোধী, তাঁহারা অজ্ঞান, তাঁহারা মূর্খ, তাঁহারা দয়ার পাত্র।"৩৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক শিক্ষা-সমীক্ষায় সিলেট জেলার বিদ্যালয় ও ছাত্র-সংখ্যার নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান পাওয়া যাচ্ছে :৩৪

শিক্ষাবর্ষ	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	
		হিন্দু	মুসলমান
১৮৫৬-৫৭	৩	২৪৮	১৯
১৮৬০-৬১	৫	২৯৬	৭৬
১৮৭০-৭১	১৫	৮০৫	৭০

উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানানুযায়ী ১৮৫৬-৫৭ শিক্ষাবর্ষের তুলনায় ১৮৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষে হিন্দু ছাত্র-সংখ্যা বৃদ্ধির হার কিঞ্চিৎ অধিক হলেও উক্ত সময়ে মুসলমান ছাত্র-সংখ্যা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিলো। কিন্তু ১৮৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে হিন্দু ছাত্রসংখ্যা ১৮৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেলেও একই সময়ে মুসলমান ছাত্র-সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সম্ভবত সামর্থ্যের অভাবই এর কারণ। তখনো বিদ্যালয়ে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হয়নি। কাজেই বালিকা বিদ্যালয়ের জন্যে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

শাস্ত্রীয় ভাষা ও মাতৃভাষা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী হিন্দু ভদ্রজন রাজভাষা ইংরেজীতেও পারঙ্গমতা অর্জন করেছে দ্বিধাহীন চিত্তে। দেশজ মুসলমানের মাতৃভাষা চিরকালই বাংলা । কিন্তু বহিরাগত মুসলমান পরিবারে সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যে লালিত হয়েছে আরবী-ফারসী, অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে উর্দু। সিলেটেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে মাতৃভাষার প্রশ্নে দেশজ মুসলমানেরও চিত্তচাঞ্চল্য জেগেছে। অনেক পরিবারে প্রাত্যহিক কার্যক্রমের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো উর্দু, আর উচ্চতর ভাববৈদগ্ধ্য প্রকাশের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল ফারসী। 'গাজীর গীত' যখন নিম্নবিত্ত বা নির্বিত্তের চিত্তবিনোদন করছে, সেকালে অভিজাত মুসলমান সমাজের পারিবারিক অনুষ্ঠানে তখন উর্দুতে 'বাতচিত'এবং ফারসীতে 'বয়েৎ-বাজী' চলছে। তথাকথিত অভিজাত ভাষার মোহমুক্ত হয়ে স্বস্থ হতে বাঙালী মুসলমানের কিছুটা সময় লেগেছিলো। এবং এর ঢেউ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক পর্যন্ত ছিলো প্রবল। সৈয়দ মোস্তফা আলী তাঁর 'আত্মকথা'য় বলেছেন: "তখন আমাদের এ জেলায় (সিলেটে) বাংলা-উর্দুর দোটানায় পড়ে—বিশেষত আলিগড়ী ইংরেজী শিক্ষার আওতায় পড়ে মুসলমানরা তাঁদের লেখাপড়া ইংরেজীতেই করতেন। আর একদল যাঁরা আভিজাত্যের দাবী করতেন, তাঁরা বাংলা ভাষার চর্চা প্রায় গোনাহ্ মনে করতেন।'৩৫

এই অহমিকা ও অজ্ঞতার বশবর্তী হয়েই ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীহট্ট আগমন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সৈয়দ আবদুল মজিদ 'দেশীভাষায়' তাঁর ভাষণ দিলেন" উর্দুতে! "কারণ, তখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাত

ভাষা ছিলো উর্দু।"[৩৬] অবশ্য সভায়, বিশেষ করে কবি রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার উদ্দেশ্যে যে সভার আয়োজন—সেখানে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দানের ক্ষমতাও সম্ভবত মজিদ সাহেবের ছিলো না। কেননা, তখন সিলেটের 'শিক্ষিত মুসলমান বাংলা বলিতে পারিতেন না।'[৩৭] এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, বাঙালী মুসলমান মাতৃভাষার কথা প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছিলো। খিলাফত আন্দোলনের যুগে মাতৃভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করে মৌলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী সিলেটে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন, —"বিশেষতঃ শ্রীহট্টবাসী এই প্রথম শুনলেন যে , একজন মুসলমান বক্তাও এমন সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় এত সুন্দর ভাষণ দিতে পারেন।"[৩৮]

দীর্ঘদিন বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে বাঙলাদেশের সঙ্গে শ্রীহট্টবাসীর যোগাযোগ খুব দৃঢ় ছিলো না। তাঁদের অনেকে নিজেদের 'বাঙালী'র বদলে 'সিলেটী' হিসেবে পরিচয় দানে অধিক আগ্রহী ছিলেন। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে সিলেট ও আসামের দশ-বারো জন ছাত্র Assam Society নামে একটি সংস্থার পত্তন করেন। এ' প্রসঙ্গে সংস্থার সদস্য সৈয়দ মোস্তফা আলী তাঁর 'আত্মকথা'য় উল্লেখ করেছেন, "আমাদের উপর এমনিতেই পূর্ববঙ্গীয় বন্ধুরা খুব সুপ্রসন্ন ছিলেন না, এবার কাণ্ড দেখে তাদের ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক।"[৩৯] তদুপরি সিলেটের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে বাঙলা কথ্য লৈখিক রূপের ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এবং সেখানে সর্বত্র অফিস-আদালত, সভা-সমিতিতে সিলেটী কথ্য ভাষাই প্রচলিত ছিলো। সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন, "আমরা স্কুলে সিলেটী ভাষায়ই আলাপ-আলোচনা করতাম। কেউ সাধু ভাষায় কথা বললে চালিয়াৎ বলে নিন্দিত হতেন।"[৪০] শ্রীহট্টবাসীরা আদৌ বাঙালী কিনা এবং বাঙলা তাঁদের মাতৃভাষা কিনা—এ' জিজ্ঞাসা শুধু মুসলমান নয়, সেখানকার হিন্দুরও মনে হয়তো জেগেছিলো। সম্ভবত তাঁদের সংশয়মুক্ত করবার উদ্দেশ্যেই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মৌলবীবাজার শহরে অনুষ্ঠিত 'সুরমা উপত্যকা সাহিত্য সম্মেলনের' তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব বলেছেন, ".....'আমরা বাঙালী। বঙ্গভাষা আমাদের ভাষা। বঙ্গীয় সমাজ আমাদের সমাজ। আমাদের দেহে বাঙ্গালীর রক্ত প্রবাহিত। আমাদের মস্তিষ্কে বাঙ্গালীর চিন্তাস্রোত।' এই পণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে তিনি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে বিস্তর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন সিলেটী কথ্য ভাষা বাংলাভাষার প্রাচীন রূপ ও সিলেটের কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত অনেক শব্দ মধ্যযুগের বাংলা গ্রন্থে পাওয়া যায়।" [৪১]

একথা অনস্বীকার্য সিলেট ও শ্রীহট্টবাসী সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় বাঙলার কোনো মফঃস্বল শহর থেকে পশ্চাদপদ ছিলো না। এই জেলার গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কোলকাতা থেকে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে 'সম্বাদভাস্কর' প্রকাশ করেন এবং তিনি ছিলেন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকারও অন্যতম সম্পাদক। ১৮৭৬ খ্রীঃ কবি প্যারীচরণ দাসের সম্পাদনায় সর্বপ্রথম সিলেট থেকে 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অবশ্য প্রথমাবস্থায় এটি কোলকাতা থেকে মুদ্রিত হতো। ১৮৮০ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পরিদর্শক'। ১৮৯৯ খ্রীঃ থেকে প্রকাশিত মাসিক 'শ্রীহট্টদর্পণ' সাহিত্য ক্ষেত্রেও খ্যাতি লাভ করে। ১৯০০ খ্রীঃ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকা 'The Weekly Chronicle' এবং খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মাসিক পত্রিকা 'Friend of Sylhet' শিক্ষিত মহলে আদৃত হয়েছিলো।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের হৃদয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের ধ্যান-ধারণার অঙ্কুরোদগম হয়। অবশ্য এই স্বাতন্ত্র্যবোধ তাদের সাম্প্রদায়িক করে তোলেনি। তবে ধর্ম ও আচার-আচরণ যে অভিন্ন নয় সে সম্পর্কে জনসাধারণ সচেতন এবং নবীনের অতিমাত্রায় সংস্কার-মুক্তির আহ্বানে ধর্মের ভিত্তি বিনষ্টির আশঙ্কায় সমাজপতিরা রীতিমতো আতঙ্কিত। তাই দেখা যায় মুসলমানের তৈরী সোডা-লেমনেড পানের গর্হিত অপরাধে পিতৃ নির্দেশে কিশোর বিপিনচন্দ্র পালের (১৮৫৮-১৯৩২) স্কুল গমন সাময়িকভাবে বন্ধ হতে। যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করায় তিনি গোঁড়া হিন্দুর কাছে অবাঞ্ছিত এবং পিতৃবর্জিত। করিমগঞ্জের উকিল বিপিনবিহারী দাসের সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহিলা –'The High Caste Hindu Woman'-এর লেখিকা রমাবাই সরস্বতীর বিয়ে 'হিন্দুর পক্ষে একটা বিসদৃশ ব্যাপার' এবং এই রেজিস্ট্রি বিয়ের ফলে 'বিপিনবাবু সমাজ বর্জ্জিত হন।'[৪২]

এই প্রতিবেশেই খানবাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলীর বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অতিক্রান্ত হয়।

তথ্য-নির্দেশ

১. বিপিনচন্দ্র পাল : সত্তর বৎসর ঃ আত্মজীবনী পৃ. ১৪৫।
২. সৈয়দ আবদুল আগফর : তরফের ইতিহাস, (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৩।
৩. প্রবাসী : শ্রাবণ, ১৩৩৩, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৬৮৩।
৪. Histoy and statistics of Dacca Division (Sylhet Section) থেকে W.W Hunter-এর A statistical Account of Assam, Vol. 2-তে উদ্ধৃত, পৃ. ২৬০।
৫. সৈয়দ আবদুল আগফর : তরফের ইতিহাস , পৃ ৩৩।
৬. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস,পৃ. ১৪৪।
৭. তরফের ইতিহাস, পৃ. ৩৩।
৮. ঐ ।
৯. হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ. ১১৪।
১০ Robert Lindsay: Oriental Miscellanies: Anecdotes of an Indian Life (Published in 1840) পৃ. ২১।
১১. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ১৯৭৭,পৃ. ১৫৩।
১২. ভারতীয় মুসলমানের ভ্রম, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৩, পৃ. ৭৯০।
১৩. বিপিনচন্দ্র পাল : সত্তর বৎসর ঃ আত্মজীবনী, পৃ. ১০৭-০৮।
১৪. Assam District Gazeiteers, Vol. II (Sylhet),পৃ. ৮৩।
১৫. "A new religious sect has sprung up among the Kaibarttas, founded about eighty years ago by a certain Rám Krishna Gosáin, a member of that caste, who is traditionally said to have received his inspiration from a Musalman saint. He established an akhrá, or a religious com-

munity, in Pargana Bimangal, where he now lies buried; and at the present day his disciples refuse to touch either cow-dung or the leaves of tulsi plant, both of which things are held in veneration by orthodox Hindus, but abhorred by Muhammadans." (W.W. Hunter: A Statistical Account of Assam, Vol. 2,পৃ. ২৮২)।

১৬. অচ্যুতচরণ চৌধুরী : শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্ব্বাংশ, ২য় ভাগ, ২য় খ ঃ, পৃ. ১৮৩।
১৭. ঐ, উত্তরাংশ, পরিশিষ্ট (জীবনবৃত্তান্ত), পৃ. ১৩।
১৮. Robert Lindsay: Oriental Miscellanies: Anecdotes of an Indian Life , পৃ. ৮৯।
১৯. ঐ, পৃ. ৯০-৯২।
২০. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্ব্বাংশ ২য় ভাঃ, ৫ম খঃ, পৃ. ১৯-২১।
২১. W. W Hunter : A Statistical Account of Assam, Vol. 2, পৃ. ২৮১।
২২. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্ব্বাংশ , ১ম ভা ঃ, পৃ. ৮৭-৮৮।
২৩, ঐ, পূর্ব্বাংশ , ২য় ভাঃ, ২য়ঃ খঃ, পৃ ৯৩-৯৪।
২৪. ঐ, উত্তরাংশ, জীবন-বৃত্তান্ত, পৃ. ৩৫-৩৭।
২৫ ঐ, ৩য় ভাঃ, ৪র্থ খঃ, পৃ. ৩৫৭।
২৬. সত্তর বৎসর ঃ আত্মজীবনী, পৃ. ২০-২১।
২৭. ঐ, পৃ. ১০৬।
২৮. ঐ, পৃ. ৭৪।
২৯. ঐ, পৃ. ২৭-২৮।
৩০. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উত্তরাংশ, ৩য় ভাঃ,১ম খঃ, পৃ. ১১৬-১৭।
৩১. খোন্দকার সিরাজুল হক : মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ঃ সমাজচিন্তা ও সাহিত্য-কর্ম, পৃ. ২১।
৩২. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, পৃ. ৪।
৩৩. ঐ, পৃ. ৫।
৩৪. W. W. Hunter : A Statistical Account of Assam, Vol 2, পৃ. ৩২৭।
৩৫. সৈয়দ মোস্তফা আলী ঃ আত্মকথা, পৃ. ৩২।
৩৬. ঐ, ৭৩।
৩৭. সৈয়দ মোস্তফা আলী : জাতি গঠনে সাহিত্যের প্রভাব, আল্-ইসলাহ্, আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৪৭ পৃ.১১০।
৩৮. আত্মকথা, পৃ. ৭৩।
৩৯. ঐ, পৃ. ১৩৪।
৪০. আমাদের কালের কথা, পৃ. ৫১।
৪১. ঐ, পৃ. ৭৪।
৪২. অচ্যুতচরণ চৌধুরী : শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উত্তরাংশ, জীবন বৃত্তান্ত, পৃ. ১২৫।

অধ্যায় : দুই

০১.

খানবাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলী প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, নানাবিধ বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র নিষ্ঠা, সততা, চরিত্রবল ও অদম্য স্পৃহার ফলেই অতি সাধারণ স্তর থেকে উচ্চতম পর্যায়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাধনা ও অধ্যবসায় উদ্যোগী পুরুষের জীবনকে কতোটা সাফল্য মণ্ডিত করতে পারে সিকন্দর আলী তার সার্থক দৃষ্টান্ত। তাঁর মৃত্যুর বছর তিনেক পূর্বে সৈয়দ মুর্তাজা আলী কৃতী পিতার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করেন।

সৈয়দ সিকন্দর আলীর পৈতৃক নিবাস হবিগঞ্জ মহকুমার বাহুবল থানার নিকটবর্তী করঙ্গী নদীর তীরে উত্তরসুর গ্রামে। এই বংশের আদি পুরুষ শাহ্ আহমদ 'মতাওক্কীল' সাহেবের সমাধিভূমি এখনো সেখানে বিদ্যমান। হজ্রত শাহ্ জালালের অনুষঙ্গী হয়ে এবং পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বহু 'সৈয়দ' সিলেটে আগমন করেন। এঁদের শাখা প্রশাখা তরফ অঞ্চলেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সিকন্দর আলীর পূর্বপুরুষও তরফের সৈয়দ বলে উল্লিখিত। প্রামাণিক গ্রন্থমতে তরফবিজেতা সৈয়দ শাহ্ নাসিরউদ্দীন সিপাহ্সালার-ই সেখানকার প্রথম সৈয়দ। এঁর বশধরগণ দীর্ঘকাল তরফ শাসন করেন। পরবর্তীকালে এই পরিবার নয় আনি-সাত আনিতে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। তরফের আদি সৈয়দের দুটো ধারার যে বংশ-লতিকা আমাদের হাতে রয়েছে তাতে সিকন্দর আলীর পূর্বপুরুষের নাম নেই। এঁরা হয়তো অন্য কোনো 'সৈয়দের' উত্তর পুরুষ। শাহ্ আহমদ মতাওক্কীলের পরিবার উত্তরসুরের খোন্দকার বংশরূপে পরিচিত। এঁদের ব্যবসা ছিলো 'পীরি-মুরিদী'। সিকন্দর আলীও শৈশবে শিষ্যদের বাড়ি গিয়েছেন। কিন্তু 'পীর হওয়ার যোগ্যতা' নেই বলে তিনি কাউকে শিষ্যত্বে বরণ করেননি।[১] সৈয়দ মুজতবা আলীর বর্ণনায় :

". . . আমার ঠাকুরদা থেকে উর্ধ্বতন ক'-পুরুষ যে পীর ছিলেন সে তত্ত্ব অদ্যাপি বিলক্ষণ অবগত আছে তরফ পরগণার কিছু কিছু চাষা-ভুষো, মোল্লামুনশী। এরা বংশানুক্রমে আমাদের পরিবারের শিষ্য। কিন্তু আমার পিতা এবং আমার অগ্রজেরা পীর হতে রাজী হলেন না বলে এদের অধিকাংশই অন্য পীরের আশ্রয় নিয়েছে।"[২]

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে মাতুলালয় চৌয়াল্লিশ পরগণার দুল্লভপুর গ্রামে সৈয়দ সিকন্দর আলীর জন্ম। পিতা সৈয়দ মুশররফ আলী কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মৌলবী, বংশের প্রথম সরকারী চাকুরে এবং কর্মসূত্রে ছিলেন জৈন্তায়—'মোহামেডান ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ও কাজীরূপে।'[৩] তিনি দুল্লভপুরের জমিদার সৈয়দ তফজ্জল হোসেন

(লালা মিয়া সাহেব)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা হাবিবা বানুকে বিয়ে করেন। হাবিবা বানুর মাতা ছিলেন বেকামুরা গ্রামের সৈয়দ জুলফিকার আলীর কন্যা এবং সৈয়দ মোহাম্মদ আসিরের পৌত্রী। পিতা-পুত্র উভয়েই ছিলেন মুন্সেফ। বেকামুরার সৈয়দ পরিবার হজরত শাহ্ জালালের অন্যতম অনুষঙ্গী শাহ্ দরঙ্গের ভ্রাতৃবংশ।[৪]

মাত্র একমাস বয়সে সিকন্দর আলী মাতৃহারা হন। তিন মাসের শিশুকে এক ফুপু (পিসী) নিয়ে এলেন দিনারপুরে। সেখানে তিনি আরেক দুগ্ধপোষ্য শিশু জনৈকা আজিজা বানুর মাতার স্তন্য পান করতেন। অল্পদিনের মধ্যে আজিজা বানুর মাতা লোকান্তরিত হলে তাঁকে পুনরায় দুল্লভপুরে ফিরিয়ে আনা হলো। এক বৎসরের সময় দিনারপুরে সিকন্দর আলীর পিতৃবিয়োগ ঘটে। অতঃপর তাঁর খালা (মাসী) তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন এবং মাতামহী হলেন পিতৃ-মাতৃহীন শিশুর অভিভাবিকা। মাতামহের জীবদ্দশায় মাতার মৃত্যুর ফলে মুসলিম আইন অনুসারে সিকন্দর আলী মাতামহের সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হন। ধর্মান্তপ্রাণ মাতামহী তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি সিকন্দর আলীকে দান করেন।

দুল্লভপুরের মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে সিকন্দর আলীর অতি স্বল্পায়ু শিক্ষাজীবনের সূচনা এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে এম. ই. স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠরত পিতৃমাতৃহীন এই কিশোরকে ডাকবিভাগে মাত্র সাত টাকা মাসিক বেতনে 'পেইড এপ্রেন্টিস'-এর চাকুরী নিয়ে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। কিছুদিন দত্তগ্রাম ও মুতীগঞ্জ পোস্ট অফিসে কাজ করার পর তাঁর অস্থায়ী কর্মের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং তিনি কর্মহীন হয়ে পড়েন। সম্ভবতঃ বেকার অবস্থায়ই সিকন্দর আলী পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।[৫] অতঃপর ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের পয়লা এপ্রিল, সিলেট সদর সাবরেজিস্ট্রি অফিসে মাসিক পনেরো টাকা বেতনে মুহুরির পদে যোগদান করেন। ১৮৯০ খ্রিঃ ওলাউঠায় তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে। ১৮৯২-তে সিকন্দর আলী তাঁর শ্যালিকা আমতুল মন্নান খাতুনকে বিয়ে করেন।[৬]

সৈয়দ সিকন্দর আলীর শ্বশুর ছিলেন বাগপ্রচণ্ডখাঁর সম্মানিত জমিদার পরিবারের সন্তান মৌলবী মোহসেন চৌধুরী। ইনি রাজা রামজীবন পালের অধস্তন পুরুষ।[৬] কিছুটা গোঁড়ামি এবং কিছুটা ধর্মান্ধতার জন্য তিনি সিলেট সরকারী হাই স্কুলের 'মৌলবী' পদ ত্যাগ করে স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর শ্বশুর ছিলেন বাণিয়াচঙের একজন বিশিষ্ট আলিম। সিকন্দর আলীর শাশুড়ীও আরবী-ফারসী জানতেন এবং তাঁর স্ত্রী আমতুল মন্নান খাতুন পিতামাতার নিকট থেকে ভালোভাবে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তখন মিশনারী মহিলারা বাড়ী বাড়ী ঘুরে মুসলমান মেয়েদের বাংলা, ইংরেজী এবং সূচীকর্ম ও উলের কাজ শেখাতেন—এরই নাম 'জেনানা ক্লাস'। আমতুল মন্নান জেনানা ক্লাসে নাম লিখিয়ে হাতের কাজ ও সামান্য বাংলা শিখেছিলেন। যে-বইটি তিনি সযত্নে সুর করে পাঠ করতেন তার নাম 'কাসাসোল আম্বিয়া'। তিনি উলের ওপরে কাজ করে নানারকম প্রাণীর ছবি ফুটিয়ে তুলতেন। তবে জীব-জন্তুর নিখুঁত ছবি না তুলে যে কোন একটি অঙ্গ বর্জন করতেন। তাঁর বিশ্বাস 'জানদার প্রাণীর অবিকল পূর্ণাঙ্গ ছবি তোলা গোনাহ্।'[৭] এ' ধরনের ঘটনা থেকে তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলিম মানসিকতার সংস্কারান্ধতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। পারিবারিক ও সামাজিক সূত্রে সিলেটের দুই প্রাচীন বংশ—মজুমদার ও কাজী পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে তিনি রন্ধন বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতা

লাভ করেন। কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনায় তার সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, ". . . আমার মা খুব ভালো রাঁধতে পারেন আর নূতন নূতন দিশী-বিদেশী পদ শেখাতে তাঁর ভারী আগ্রহ।. . . রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট বিশেষ আর আমার মা খাঁটি আর্টিষ্ট।"[৮]

১৯০০ খ্রিস্টাব্দে সিকন্দর আলী কেরানীর পদে উন্নীত হন। ১৯০৩-০৪-এ তাঁর পুত্র ইসহাক ও কন্যা ময়না যথাক্রমে দশ ও আট বৎসর বয়সে কালাজ্বরে মৃত্যুবরণ করে। পরবর্তীকালে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্রেরও মাত্র দু' বছর বয়সে একই রোগে মৃত্যু ঘটে। ১৯০৫-এর ফেব্রুয়ারিতে তিনি সাবরেজিস্ট্রার পদ লাভ করেন। স্মৃতিকথায় সৈয়দ সিকন্দর আলী উল্লেখ করেছেন যে, এই পদ-প্রাপ্তির 'অল্পদিন আগে' তাঁর 'তৃতীয় পুত্র সিতুর জন্ম হয়েছে।' স্কুলের শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হলেও তাঁর মন জ্ঞানান্বেষণে ছিলো উন্মুখ। সেকালে সাবরেজিস্ট্রারদের অনেক সময় অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবেও কার্য সম্পাদন করতে হতো। এ জন্যে প্রয়োজনীয় ইংরেজী জ্ঞানের অভাব-হেতু তিনি প্রাক-উত্তরযৌবনে গৃহশিক্ষক রেখে দু' বছরে উত্তম ইংরেজী আয়ত্ত করতে সমর্থ হন। অবশ্য বাংলার চেয়ে উর্দুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অধিক ঘনিষ্ঠ ছিলো। ১৯১৮ খ্রীস্ট্রাব্দে জানুয়ারিতে তিনি সিলেটের স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। এবং ১৯২৩ সালে ১লা জানুয়ারি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে মৌলবীবাজার শহরে চলে আসেন। জীবনের শেষ ষোল বৎসর তিনি এখানে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজসেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯১৯-এ এই কৃতীপুরুষ 'খান সাহেব' এবং ১৯৩৩-এ 'খান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।

খানাবাহাদুর সাহেবের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল না হলেও তাঁর ছিলো অদম্য জ্ঞানপিপাসা এবং ধর্মানুরাগ ও স্বাজাত্যবোধ। এ' সম্পর্কে সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন: "তিনি (খানবাহাদুর সাহেব) মিহির ও সুধাকর, সাপ্তাহিক মোসলেম হিতৈষী, The Mussalman, মৌলানা মোহাম্মদ আলীর Comrade ও বিলাতের Islamic Review পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। ... তুরস্কের সুলতানদের প্রতি তাঁর গভীর দরদ ও আন্তরিক ভক্তি ছিল।

তখনকার দিনে মুসলমান পরিচালিত দৈনিক সংবাদপত্র ছিল না। কাজেই আব্বা ও অন্যান্য মুসলমান অফিসাররা সুরেন্দ্র ব্যানার্জী সম্পাদিত The Bengalee অথবা ইংরাজ পরিচালিত The Englishman অথবা The Statesman কাগজ কিনতেন।"[৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিম মানসে নবযুগের প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজে ইংরেজী ভাষার প্রচলন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগে। সরকারী চাকুরী লাভ ও যুগোপযোগী জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে বিদেশী-ভাব-ভাষা গ্রহণে কিছুটা নমনীয় হলেও তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ 'মক্তব-মাদ্রাসায় আরবী-ফারসী শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন।' কেননা তাঁদের অনেকের বিবেচনায় 'আরবী-ফারসী না জানলে শরীফ সমাজের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করা যায় না।'[১০] ভারতীয় মুসলমান সমাজে প্রাগ্রসর চিন্তাধারার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত সৈয়দ আমীর আলী ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য আন্দোলন করলেও সর্বভারতীয় মুসলিম স্বার্থের দোহাই দিয়ে উর্দুকে বাঙালীর মাতৃভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেননি। এর প্রতিক্রিয়া সমকালীন মুসলিম সমাজ-মানসে দারুণভাবে প্রতিফলিত

হয়েছিলো এবং বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্যন্ত এর জের চলে। এ' সময়টাকে বাঙালি মুসলমানের 'যুগ-সন্ধিক্ষণ' হিসেবেও নির্দেশ করা চলে—যে সময়ে অন্ধ ঐতিহ্যপ্রীতির পিছুটান এবং সোনালী ভবিষ্যতের হাতছানিতে মুসলিম চিত্ত দ্বিধাসঙ্কুল, দোদুল্যমান। রাজভাষা ইংরেজী তখন আর অপাঙ্‌ক্তেয় না হলেও মাতৃভাষা বাঙলা তথাকথিত 'শরীফ খান্দানের লোকদের কাছে অকথ্য। তাঁদের অনেকে তখনও দিল্লী-আগ্রার নবাবীর স্বপ্ন দেখছেন ও তাঁদের মাতৃভাষা উর্দু বলে সরবে সগৌরবে ঘোষণা করছেন।'[১১] এবং মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থপাঠে ছিলো তাঁদের প্রবল অনীহা।

সৈয়দ সিকন্দর আলীর মধ্যেও রক্ষণশীল এবং উদার মনোভাবের টানাপোড়েন লক্ষণীয়। বৈরী পরিবেশে উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হলেও তাঁর অদম্য জ্ঞানপিপাসা ও বিদ্যার্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চরিতার্থ করতে ছিলেন সদাসচেষ্ট। এবং এতে সার্থকতাও লাভ করেন। অর্জিত শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত তিনি তাদের শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। আর বিদ্বজ্জনের সান্নিধ্য কামনায় তাঁর ছিলো অপার আগ্রহ। স্কুল-কলেজের সনদ-বঞ্চিত স্বপ্রতিষ্ঠিত এই কীর্তিমান শুধুমাত্র পুত্র সন্তানদেরই সুশিক্ষিত করে তোলেননি, স্ত্রীকে 'জেনানা ক্লাসে' এবং মিশনারীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যাদের ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংস্কারের নাগপাশে আবদ্ধ রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে এটা ছিলো প্রায় বিদ্রোহের সামিল। ফলে সিকন্দর আলীকে স্বসমাজের কঠোর সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিলো। এমন কি স্থানীয় 'যুগভেরী' পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় নিবন্ধও লেখা হয়। (সা-৪)। সিকন্দর আলীর দুঃসাহসিক দূরদর্শিতার সঠিক মূল্যায়নে সমকালীন মুসলিম মানসিকতা ও সামাজিক পরিবেশ পর্যালোচনা আবশ্যিক। পর্দা-প্রথার আবরণে মুসলিম নারী তখন গৃহে অন্তরীণ, ধর্মের নামে শিক্ষার আলোক বঞ্চিতা। এই বর্বরতার নির্লজ্জ গুণকীর্তনের প্রবল উচ্ছ্বাসে সামাজিক পাণ্ডারা তখন উচ্চকণ্ঠ।

"অবরোধে থাকিয়া যেরূপ আদর ও যত্ন প্রাপ্ত হয়, যেরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কাল যাপন করে, যেরূপ স্বাধীনভাবে জীবন নির্ব্বাহ করে, তাহা অবরোধমুক্ত স্বাধীনা রমণীদিগের ভাগ্যে কখনই ঘটিয়া উঠে না। এমন সুন্দর ও প্রশংসনীয় অবরোধ প্রথাকে কারাবাসের সহিত তুলনা করা সত্য ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করা এবং নিজেকে মূর্খ ও বাতুল সাব্যস্ত করা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী শিক্ষা বলিয়া যে চীৎকার করা হইতেছে, এবং অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে যে নানা কথা প্রকাশ করা হইতেছে, তাহাকে পাগলের প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?"[১২]

তাঁদের বিবেচনায় 'আধুনিক শিক্ষা' মুসলমান মহিলাদের জন্য বাঞ্ছিত নয়।

"পাশ্চাত্য সমাজের আদর্শে তাঁহাদিগকে শিক্ষিতা করিতে চেষ্টা করিলে তাহা সুফল প্রসব করিবে না। স্যামিজ, কমিজ আঁটিয়া গাড়ী চড়িয়া বুড়া বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয় গমন করা মোছলেম মহিলাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

...সে শিক্ষায় রুচি বিকৃত হয়, অনাচার এবং ধর্ম্মকর্ম্মে অনাস্থার ভাব পরিস্ফুট হয়, তাহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে।"[১৩]

এমন কি প্রগতিকামী হিতবাদীদের উদ্দেশে অশোভন অরুচিকর মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁদের রসনা অধিকতর শাণিত হয়ে উঠেছে।

"নব্য তন্ত্রীর একটা দল আছে, . . .

তাঁহারা শহরে দেখেন, কোন কোন জাতীয় মেয়ে পুরুষ অবাধ-মিলনের সুখে মগ্ন আছে। কিন্তু মুসলমান সমাজে তাহা কোথায় ?...

সেই অসভ্য মেয়েরা না জানে গাহিতে, না জানে পিয়ানো বাজাইতে, না জানে বক্তৃতা করিতে।... এই জন্যই বুঝি মনে হয়, এই নব্য-তন্ত্রীর দল মুসলমান সমাজে অবাধ নারী-পুরুষের মিলন-মেলা বসাইয়া, যুবক যুবতীর হাসির হো হো, মুক্ত বেণীর শোভা, যুক্ত বাহুর মিলনানন্দ, যৌবনে প্রেমবন্যায় অভিষিক্তা কুল বধূদিগের পুঁথির ভাষায় সাদর সম্ভাষণ, হাতে হাত মিশাইয়া, খোশগল্পে মাতিয়া যেখানে সেখানে বিচরণের সুখ দুই হাতে লুঠিবার জন্যই 'নারী স্বাধীনতা মিশন' বা 'নারী-তীর্থ' গঠন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।'[১৪]

অবশ্য এ' সময় মুসলমান সমাজের সচেতন অংশেও অবরোধ রূপ 'জাল্লাদী পর্দ্দা' প্রথার উচ্ছেদকল্পে এবং ব্যাপক নারীশিক্ষার সপক্ষে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। সিকন্দর আলী সর্বক্ষেত্রেই যে সংস্কারমুক্ত ছিলেন, তা নয়। পারিবারিক ঐতিহ্য ও রক্ষণশীল ধর্মচেতনা বরাবর তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন, "আমার আব্বা রক্ষণশীল ছিলেন। পূজাপার্বণ উপলক্ষে গানবাজনা, যাত্রা-থিয়েটার ইত্যাদিতে যোগদান ব্যাপারে আমাদের উপর কড়া নিষেধ ছিল। তবে ব্রাহ্ম মন্দিরে সভা ইত্যাদিতে যোগদানে তিনি কোন দিন আপত্তি করেন নাই।"[১৫] সৈয়দ মুজতবা আলীও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি 'পাঠশালায় যাবার সময় থেকেই তাঁর (রেভারেন্ড পিন্ গোয়ান জোন্স-এর) গির্জা ও সানডে স্কুলের রীতিমত অনুরাগী অংশগ্রহণকারী' ছিলেন।[১৬] এ থেকেও প্রতীয়মান হয় তিনি স্বাতন্ত্র্যপন্থী রক্ষণশীল হলেও ধর্মান্ধ ছিলেন না। স্বধর্মের প্রতি তাঁর আস্থা ও নিষ্ঠা ছিলো অপরিসীম। মুসলমান হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে তাঁর মনে কণামাত্র সংশয় ছিলো না। এই স্বাতন্ত্র্য বোধ থেকেই স্বধর্মীর প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধও সুস্পষ্ট অবয়ব লাভ করে। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ না হয়ে ও তাঁদের দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়েও যে সমাজে নির্বিঘ্নে বসবাস করা যায় সে প্রত্যয় তাঁর ছিলো। স্বাতন্ত্র্যের কারণেই তিনি ". . . মুসলমান ছেলেদের পরিধানে ধুতি দেখলে . . . ও মাথায় টুপি না দেখলে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে বলতেন "হিন্দুরা" তাদের মত চলবে, তোমরা নিজের ধর্ম অনুসরণ করে চলবে। পাড়া প্রতিবেশী সব যাতে নামাজ পড়ে রোজা রাখে তজ্জন্য ঘরে ঘরে গিয়ে বুঝাতেন।...

পাড়ার সকলের নামাজের সুবিধার জন্য তার বাসার কাছে—নিজের জায়গার উপর একটি পাঞ্জেগানা মসজিদ করেছিলেন। এবং নিজের পয়সায় একজন ইমাম নিয়োগ করেছিলেন। বাসার সামনে বসে থাকতেন এবং নামাজের সময় হলে সকলকে ডেকে নিয়ে নামাজ পড়তেন।"[১৭] আপন সন্তানদেরও ইসলামী শিক্ষাদানে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

কর্তব্যবোধ থেকেই সাহিত্যচর্চায় সৈয়দ সিকন্দর আলীর আগ্রহ জন্মে। বাঙলা ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা ছিলো এবং ফার্সী ও উর্দু ভাষাতেও তিনি পারঙ্গম ছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি অনুবাদ ও মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সাহিত্যানুরাগ এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে কোলকাতার 'নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ' তাঁকে সম্মানজনক 'বিদ্যাভূষণ' ও 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ সিকন্দর আলী তাঁর প্রথমা কন্যা হবিবুন্নেসার লেখা কাব্যগ্রন্থ 'জীবনের সাথী' প্রকাশ করেন।

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে পত্নী বিয়োগ এবং ১৯৩৯-এর ২৬শে নভেম্বর, সিলেট জেলার মৌলভীবাজার শহরে বিদ্যোৎসাহী নিরহংকার এই কর্মী পুরুষের ঘটনাবহুল ও সংঘাতময় জীবনাবসান ঘটে। সিকন্দর আলী সাহেবের মৃত্যুতে সিলেট থেকে প্রকাশিত 'আল্-ইসলাহ্' পত্রিকা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লেখেন, "কিসে জাতির ও সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল হয়, সর্বদাই তিনি তাহার চিন্তা করিতেন। মুসলমান ছাত্রদের চরিত্রে ও জীবনে যাহাতে জাতীয় আদর্শ ও অনুভূতি জাগিয়া উঠে, তদ্বিষয়ে তিনি সর্বদাই যত্নবান ছিলেন।"[১৮]

পিতার জ্ঞানানুরাগ, সাহিত্যপ্রীতি, গুণিজনসান্নিধ্য বাসনা এবং স্বাজাত্যবোধ খানবাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলীর আত্মজদের মধ্যেও বিকশিত হয়েছিলো।

০২.

সম্ভ্রান্ত পরিবারে জাত খানবাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলীর চাকুরীই ছিল জীবিকানির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। অবশ্য স্ত্রীসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি থেকে কিঞ্চিৎ অর্থ সমাগম হতো। তার ওপর নির্ভর করে তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যার বৃহৎ সংসার চালানো ছিলো কষ্টকর। তদুপরি সন্তানদের শিক্ষা ও পত্র-পত্রিকা ক্রয় বাবদ বেশ একটা বড় অংক ব্যয় হয়ে যেতো। ফলে সিকন্দর আলী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রায়ই বন্ধুবান্ধবের কাছে পাঠাতেন টাকা ধার করবার জন্যে। পিতার আর্থিক অনটন এবং সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সন্তানরাও ছিলেন যথেষ্ট সচেতন। তাঁর সন্তানদের সকলেই মেধার গুণে বৃত্তি লাভ করার ফলে পিতার আর্থিক চাপ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিলো। তবু যেন একটা বেদনার অনুরণন সন্তানদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁদের জীবনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এবং জীবনযুদ্ধে জয়ী ও কর্মক্ষেত্রে সফল পুত্ররা পরবর্তীকালে নিঃসঙ্কোচে তা' স্বীকার করেছেন। পিতাকে সংসার-চিন্তা থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যেই প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রকে স্নাতকোত্তর সনদের মোহ পরিত্যাগ করে চাকুরী গ্রহণ করতে হয়েছে। তীব্র বাসনা সত্ত্বেও সৈয়দ মোস্তফা আলী প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করতে পারেননি। এ বেদনা শেষদিন পর্যন্ত তিনি লালন করেছেন এবং চাকুরী পেয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে যথাক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও শান্তিনিকেতনে পড়ার খরচ যোগাতে কার্পণ্য করেন নি। একইভাবে পিতার অভিপ্রায়ে এবং ভ্রাতৃস্নেহে আপ্লুত সৈয়দ মুর্তাজা আলীও বন্-প্রবাসী কনিষ্ঠ ভ্রাতার উচ্চশিক্ষার জন্য নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করে গেছেন। সৈয়দ মুর্তাজা আলী প্রসঙ্গে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লিখেছেন, "(মুর্তাজা) গ্রাজুয়েট হওয়ার পর কলেজ হতেই···· এলাহাবাদে গৃহীত I. C. S. পরীক্ষা দেন—Qualify করেন—তবে Compete করতে পারেন নি—বিলেত গিয়ে আবার পরীক্ষা দিলে হয়তো I. C. S. হয়ে ফিরতে পারতেন, কিন্তু আমাদের সে সঙ্গতি ছিলো না।'[১৯] এ অক্ষমতা মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিভাদীপ্ত সন্তানের পক্ষে যে কি নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গ তা' সহজেই অনুমেয়। পারিবারিক বন্ধনের মাধুর্য এবং অকৃত্রিম স্নেহ-বাৎসল্য ও সমমর্মিতা ছিলো বলেই সগর্বে স্বীকারোক্তি করা চলে, "আমরা সকলেই (মুসলিম হলের বন্ধুরা) ছিলাম গরীব মা-বাপের সন্তান।

যদিও আমার বাবা অফিসার ছিলেন. . . তথাপি তাঁর পরিবার ছিল বড়—দরাজ হাতে টাকা দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিলো না।"[২০] শুধুমাত্র চিত্তবিনোদন নয়, অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুপ্রাণিত করেছিলো বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে 'কিছু কাপড়-চোপড় ও টাকা ধার' করে অনুজের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে। পরিবার-পরিজন বিশেষ করে ভাই-বোনের প্রতি একটা অসাধারণ স্নেহ-মমতা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সিকন্দর আলীর সন্তানদের মধ্যে বিশেষভাবে স্ফূর্তি লাভ করে এবং তার চরমোৎকর্ষ ঘটেছে ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর মধ্যে।

খানবাহাদুর সাহেবের চরিত্রে উনিশ শতকের স্বাতন্ত্র্যকামী ও সমন্বয়পন্থী উদার মন-মানসিকতার পরিচয় পেয়েছি। এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ছিলো তাঁর পারিবারিক জীবন। আর প্রতিবেশ তো ছিলো এ' জীবনেরই অনুকূল। সন্তানদের মানস-গঠনে এর প্রভাব অনস্বীকার্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্ত-চাঞ্চল্যের মধ্যেই স্থিতধী দেশজ মুসলমানের নবজাগ্রত আত্মচেতনার উন্মেষ তার বাঙ্গালীত্ববোধে তথা দেশপ্রেমে।

"আমরা . . . বাঙ্গালী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া সন্তুষ্ট হই। সহস্র বৎসর যে দেশে বাস করিয়া আসিতেছি, যাহার শীত, গ্রীষ্ম, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য দুর্ভিক্ষ, সুখ সম্পদ, হর্ষবিষাদ সমভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছি, সে আমার স্বদেশ নহে, তাহার বাহিরে আবার আমার এক নিজের দেশ আছে, একথা কখনও কেহ মনে করিতে পারে না। এই জন্য আমি মোসলমান হইলেও বাঙ্গালাদেশ, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালীজাতি সম্বন্ধে কোন কথা উপস্থিত হইলে তাহাতে আমার মতামত ব্যক্ত করিবার সম্পূর্ণ ষোল আনা অধিকার আছে।"[২১]

প্রজ্বলিত এই দেশপ্রেমই ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর নৈকট্য লাভে সহায়তা করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দী এ' মানসিকতার জন্মদাতৃ, বিংশ শতাব্দীতেও এর প্রস্তুতি পর্বের রেশ অনুরণিত। এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিই ছিলো এই মহামিলনের সঙ্গমক্ষেত্র। ১৯২৩-এ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন :

"আমি বিশ্বাস করি কল্‌চরের মধ্য দিয়াই আমাদের মিলন হইবে। যে পর্যন্ত মুসলমান হিন্দু-কল্‌চর সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবে এবং হিন্দু মুসলমান-কল্‌চর সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবে, সে পর্যন্ত কখনই আন্তরিক মিল হইবে না। এই মিলনপন্থী হইয়াও আমি স্বীকার করি প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্ম প্রচারের অধিকার আছে।"[২২]

কালান্তরের ঘূর্ণিঝড়ে টলমলায়মান হয়েও শেষ পর্যন্ত সিকন্দর আলীর পরিবার কালের যাত্রাধ্বনি অনুসরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের রেওয়াজ অনুযায়ী মৌলবী সাহেবদের মাধ্যমেই শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর সন্তানদের হাতে খড়ি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার জোয়ারও তাঁদের প্রাচীন মূল্যবোধে ফাটল সৃষ্টি করতে পারেনি। ১৯২১ খ্রীঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে সেখানকার ছাত্রসমাজে নব উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ১৯২২-এ শারদীয় অবকাশ উপলক্ষে মুসলিম হলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গনারী' নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন সাড়ম্বরে চলতে লাগল। কিন্তু গোঁড়া একদল ছাত্রের বিরোধিতার ফলে এ' আয়োজন ভণ্ডুল হয়ে যায়। উত্তর-যৌবনে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁদেরই একজন সৈয়দ মোস্তফা আলী অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে ঘটনাটি স্মরণ করেছেন।

"যে ইউনিভার্সিটি মুসলিম কালচারের ধারক ও বাহক, সেখানে থিয়েটার, তা'—

আবার মুসলিম হলের নামে মুসলিম ছাত্র দ্বারা—নাউজুবিল্লাহ্!... যদিও আমি ইংলিশের ছাত্র ছিলাম, কিন্তু আমি তখনও পারিবারিক সংস্কারের উপরে উঠতে পারিনি। সুতরাং বিরোধী দলেই থাকলাম! আর সমস্ত লেখাপড়া ও ফতুয়া সংগ্রহের ভার পড়লো আমার উপর।...অভিনয় বন্ধ হয়ে গেলো। Islam in danger—সঙ্কটের ভিতর দিয়ে ইসলাম আবার জয়লাভ করলো। আমার ভূমিকা অনেকটা সেক্রেটারীর মত ছিলো।"[২৩] ধর্মান্ধতা বা গোঁড়ামি মুক্ত হলেও স্বধর্মীর মঙ্গল-বাঞ্ছায় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই শতাব্দীর তৃতীয়/চতুর্থ দশকেও মোস্তফা আলী ছিলেন সংশয়হীন। মাতৃভাষার চর্চা ব্যতীত যে জাতির মেরুদণ্ড ঋজু হতে পারে না, অবহেলিত লোকভাষার চর্চা ব্যতীত যে জীবনে পঙ্গুত্ব ডেকে আনে—সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সচেতন। বাঙালি মুসলমান মাতৃভাষার অহেতুক দ্বন্দ্বে অযথা সময় ক্ষেপণ করে প্রতিবেশী হিন্দুর তুলনায় বহু পশ্চাদ্বর্তী হয়ে পড়ছে। কোনো কোনো মানবহিতৈষী সহৃদয় হিন্দুও যে মাতৃভাষার মাধ্যমে মুসলমানদের গৌরবদীপ্ত কালের ওপর আলোকসম্পাত করেছেন তা-ও তিনি সশ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন।

"এক্ষেত্রে ধর্ম্মাচার্য্য গিরীশ সেনের নাম উল্লেখ না করিলে তাঁহার প্রতি ঘোর অবিচার করা হইবে। মুসলমানের পক্ষে গৌরবের বিষয় না হইলেও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ধর্ম্মাচার্য্য গিরীশ সেনের কোরানের বঙ্গানুবাদই বাঙ্গালা ভাষায় কোরানের প্রথম বঙ্গানুবাদ।...

যদিও মুসলমানের হাত হইতে আসে নাই তথাপি অক্ষয় মৈত্রয়ের 'সিরাজউদ্দৌলা', 'মিরকাশিম' ও রামপ্রাণ গুপ্তের 'ইসলাম কাহিনী,' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলার বেগম' ও অন্যান্য রচনাবলী মুসলমানের বিগত ইতিহাসকে কলঙ্কের হাত হইতে মোচন করিয়াছে।"[২৪] আলোচ্য নিবন্ধটির পরবর্তী অংশে লেখকের রক্ষণশীল মনোভাব সুদৃঢ়। এবং বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকেও তিনি পারিবারিক সংস্কারের গণ্ডী ছিন্ন করতে পারেননি। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেও 'শিখা' গোষ্ঠীর প্রাগ্রসর মননশীলতা তাঁর দৃষ্টিতে 'বিকৃত' হয়ে ধরা দিয়েছে; মানবপ্রেমী যুক্তিবাদীর বক্তব্য ইসলামবিরোধী মনে হয়েছে। এঁদের আবেদনে মুসলিম মানস আন্দোলিত না হওয়ায় তিনি স্বস্তিবোধ করেছেন।

"স্বাধীন চিন্তার নামে 'সওগাত' ও 'শিখা'র ইসলাম বিরোধী প্রচার তাহাও অনুমোদনের অভাবে আস্তে আস্তে কমিয়া আসে। বলা বাহুল্য ইত্যাকার সাহিত্য জাতির জীবন গঠনের পক্ষে অন্তরায়ই হইয়া দাঁড়ায়।"[২৫]

বাঙলাদেশের মুসলমান পুনরায় তাদের হৃত গৌরব উদ্ধারে সমর্থ হবে এবং ইসলামী ঐতিহ্য ও আদর্শে স্নাত হয়ে পুনরায় তারা উন্নত শিরে সসম্মানে দেশে ও সমাজে পাঙ্‌ক্তেয় হবে এবং মাতৃভাষায় সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টি করে প্রতিবেশী হিন্দু বাঙালীর সমকক্ষ হয়ে উঠবে—প্রবন্ধের শেষাংশে লেখকের এই দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত।

"বাঙালী মুসলমানও একদিন বিজাতীয় সাহিত্যের প্রভাবে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল—তরুণ বাঙ্গালী মুসলমান কবি দেবী সরস্বতীকে বন্দনা করিয়া কবিতা লিখিতেন। সে দিন গিয়াছে—বাঙ্গালী মুসলমান জাগিয়াছে—আজ সাহিত্যের প্রভাবে জাতির জীবন সুন্দর ও বীর্য্যবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আরও উন্নত হইবে যখন আমাদের রবীন্দ্রনাথ আমাদের শরৎচন্দ্র আসিবেন—আমরা সেই অনাগত কালের আগমনের আশায় উন্মুখ হইয়া রহিলাম।"[২৬]

সাম্প্রদায়িক নয়, গভীর স্বাজাত্যবোধে আপ্লুত একজন নিষ্ঠাবান স্বাতন্ত্র্যপন্থী ব্যক্তিকেই এখানে পাচ্ছি। এমনি একটি রক্ষণশীল নিষ্ঠাবান মুসলমান পরিবারে ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম এবং তাঁর বাল্য, শৈশব ও কৈশোরও উত্তীর্ণ হয়েছে এই পারিবারিক ও সামাজিক বাতাবরণে। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানপীঠ আল্-আজহারে তাঁর অধ্যয়নকে কী প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখেই না দেখেছেন তাঁর স্বদেশবাসী :

"সর্ব্বশেষে তিনি (সৈয়দ মুজতবা আলী) মিশরের বিখ্যাত জামে আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ শ্রেণীর আলেম (মওলানা) হইয়া ফিরিয়াছেন।"[২৭]

তথ্য-নির্দেশ

১. খান বাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলীর স্মৃতিকথা, সৈয়দ মুর্তাজা আলীর 'আমাদের কালের কথা' থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৫।
২. সৈয়দ মুজতবা আলী : শহ্র্-ইয়ার, ১ম প্রকাশ, পৃ. ১৫০।
৩. সৈয়দ মোস্তফা আলী : আত্মকথা, পৃ. ৯৮
৪. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : হযরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস, পৃ. ৩৫
৫. আত্মকথা, পৃ. ৯৬।
৬-৬. খান বাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলীর স্মৃতিকথা, সৈয়দ মুর্তাজা আলীর 'আমাদের কালের কথা' থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২০।
৭. আত্মকথা, পৃ. ১০১-০২।
৮. নয়রাট, ময়ূরকণ্ঠী, পৃ. ১৮২।
৯. আমাদের কালের কথা, পৃ. ২৩।
১০. ডঃ ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা (১ম খণ্ড), পৃ. ৭৭।
১১. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : আমাদের কালের কথা, পৃ. ৫৯।
১২. ইসলাম দর্শন : আলাউদ্দীন আহমদ, ইসলাম-প্রচারক, চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৯-১০; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, ১৯৭৭, পৃ. ৮৭।
১৩. ঐ, পৃ. ২২।
১৪. ঐ, পৃ. ৯০।
১৫. আমাদের কালের কথা, পৃ. ৭৮।
১৬. মিজোর হেপাজতী, পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব), পৃ. ১৫৬।
১৭. সৈয়দ শামসুল ইসলাম : যোগ্য পিতা ও আদর্শ অভিভাবক, শাশ্বত, মৌলবীবাজার মহকুমা সমিতি স্মরণিকা, ১৯৮৩, পৃ. ২১।
১৮. আল্-ইসলাহ্, ভাদ্র ১৩৪৭।
১৯. আত্মকথা, পৃ. ১০৫-০৬
২০. ঐ, পৃ. ৯৩।
২১. বিবাদ, প্রচারক, আষাঢ় ১৩০৭; সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, পৃ. ১৪৫।
২২. সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, পৃ. ২৬১-৬২।
২৩. আত্মকথা, পৃ. ১২৫।
২৪-২৬. সৈয়দ মোস্তফা আলী : জাতি গঠনে সাহিত্যের প্রভাব, মাসিক 'আল্-ইসলাহ্', আশ্বিন ১৩৪৭, পৃ. ১০৯-১১।
২৭. মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন, সাহিত্যরত্ন : খান বাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলী, আল্-ইসলাহ্, ভাদ্র ১৩৪৭, পৃ. ৩৭।

অধ্যায় : তিন

০১.

'বিচিত্র সংলাপের সপ্রতিভ নায়ক' ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী সুনিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর 'এমন কোনো বাণী নেই, এমন কোনো message নেই—যা' না বললে এই সোনার বঙ্গভূমি কোনো প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' সর্বোপরি "আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সর্বসমক্ষে কোনো কিছু বলতে বড়ই লজ্জা বোধ করি। হয় সত্য গোপন করতে হয়, নয় ডাহা মিত্যে কতা কইতে হয়।"[১] প্রচার-বিমুখ মুজতবা আলীর এই স্বীকৃতির অকৃত্রিমতার পরিচয় মেলে ইন্দ্র মিত্রের সঙ্গে আলাপচারীতে। দেশবিদেশের কাহিনী, মনীষী প্রসঙ্গ থেকে ধর্ম, দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় মুখর চিরতরুণ এই জ্ঞান-সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্ব "একটি বিষয়ে...নিঃশব্দ—তাঁর নিজের বিষয়ে। প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যান। চুপ করে থাকেন। প্রশ্নাবলীর উত্তর আদায় করার চেষ্টা করেছি; এবং সমূলে ব্যর্থ হয়েছি।"[২] মুজতবার ব্যক্তিজীবন অন্বেষু বিফল মনোরথীদের মধ্যে খ্যাতিমানদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র প্রথিতযশা সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে মুজতবা আলী ১৯২১-এ শান্তিনিকেতনে কোথায় থাকতেন, কি পড়তেন ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। আলী সাহেব যথারীতি "সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তখন ওখানে (শান্তিনিকেতনে) যাঁরা ছিলেন তাঁদের নামের তালিকা পাঠিয়েছেন।"[৩] সুতরাং সহজেই অনুমেয়, সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও দুই কৃতী অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণে কেন তিনি আত্মজীবনী রচনায় আগ্রহী হলেন না। তবে গুণগ্রাহীদের আগ্রহাতিশয্যে এবং মধ্যমাগ্রজের অনুরোধে 'আত্মজীবনী লেখার প্রচেষ্টায়' একবার মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু জগতের আর পাঁচটা অতি তুচ্ছ অপকর্মের ন্যায় এটিকেও তিনি অবহেলায় সূচনাতেই চিরতরে শ্মশান-শয্যায় নিক্ষেপ করেন। 'ডাইরী বুক' তাঁর ছিল, কিন্তু প্রচলিতার্থে 'রোজনামচা' রচনা করেননি। তাতে পাওয়া যাচ্ছে নানা দেশের নানা ভাষার বচনামৃত, বিবিধ উদ্ধৃতি, টুকরো খবর, স্বগতোক্তি এবং আরো বহু কিছু—যাকে ঠিক রোজনামচায় সংজ্ঞাবদ্ধ করা যায় না। তবু এ' সমস্ত লেখায় মুজতবা-মানসের অন্তহীন জিজ্ঞাসার তথা তাঁর মানস-প্রবণতার দিকটি সমুদ্ভাসিত।

সৃজনশীল সাহিত্যিকের রচনাবলী-ই তাঁর জীবন-ভাষ্য, তাঁর অলিখিত রোজনামচা। সৃষ্টির মধ্যেই শিল্পীকে আবিষ্কার করতে হয়—সেখানেই তাঁর চিৎপ্রকর্ষের স্বরূপ ও হৃদস্পন্দনের সন্ধান মেলে। লেখকদের অনেকে ছদ্মবেশ ধারণ করে চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেই এক সময় মিলিয়ে যেতে চান। এঁদের সম্বন্ধে পাঠক সাধারণের

আগ্রহকেও এঁরা অতি সামান্যই মূল্য দিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে আলী সাহেবও সচেতন। “ছদ্ম নামে বা বেনামীতে যে বই লেখে ধরে নিচ্ছি কাপুরুষের মতো অন্যকে আক্রমণ করার জন্য সে বেনামীতে গা ঢাকা দেয়নি—তার সম্বন্ধে, তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে পাঠক সাধারণের কৌতূহল থাকা উচিত নয়। কারণ সে খ্যাতি চায় না, তার পদ মর্যাদা বা অন্য কোনো ভাবের জোরে সে তার বক্তব্য পাঠকের উপর চাপাতে চায় না।”[৪] মুজতবা আলীর রচনাবলীর অংশবিশেষ বেনামীতে তথা ছদ্মনামে প্রকাশিত হলেও সিংহভাগ স্বনামেই রচিত ও পাঠক সমাজে নন্দিত। তিনি যখন নিজেও বিশ্বাস করেন, “তুমি যখন সাড়ম্বরে তোমার বইয়ের মলাটে তোমার নাম প্রকাশ করে ফেলেছ, প্রকাশককে তোমার ফোটো ছাপতে দিয়েছ ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বেশ কিছুটা blurb লেখার অনুমতি দিয়েছ তখন পাঠকেরও হক্ক আছে, বাকিটা জানবার। এটা তো আর এক তরফা মোকদ্দমা নয়।”[৫] সেজন্যেই মুজতবা দরাজদিলে ভক্তজনকে তাঁর ‘ডাইরি’ পড়ার অনুমতি দান করেন। তিনি জানেন এবং মানেনও "My life is an open book." (প-১৪৭)। সুতরাং ইচ্ছুকজন মাত্রই নির্দ্বিধায় এর পাতায় চোখ বুলোতে পারেন। আমরাও সেই ‘হক্কের’ জোরে সৈয়দ মুজতবা আলীকে তাঁর রচনাবলীর আলোকে, গুণগ্রাহী, ভক্ত ও আত্মজনদের নিকট লেখা পত্রাবলীর মাধ্যমে এবং ঘনিষ্ঠজনদের সাক্ষাৎকারের নিরিখে বিচার বিশ্লেষণে প্রয়াসী হবো। তাঁর রচনায় কোনো কোনো তথ্য সম্পর্কে কিছু বৈপরীত্য রয়েছে এবং সে-সমস্ত বিষয়ে সংশয়াতীতরূপে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শ্রমসাধ্য।

পিতার কর্মস্থল তদানীন্তন আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম। বিভাগোত্তর কালে করিমগঞ্জ ভারতভুক্ত হয়। জন্মসন নিয়ে দ্বিধামুক্ত হলেও মুজতবার সঠিক জন্ম তারিখ নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। এবং এ’ সমস্ত সংশয়ের মূলে রয়েছে চিঠিপত্রে আপন জন্ম তারিখ নিয়ে আলী সাহেবের কিছু মন্তব্য। সম্ভবতঃ তখনো এ’ পরিবারে নবজাতকের জন্ম তারিখ, দিনক্ষণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে রাখার রেওয়াজ প্রচলিত হয়নি। উত্তম-পুরুষে লেখা ‘শব্‌নম্’-এ উল্লিখিত: ‘কাল জন্মাষ্টমী গেছে। আমার জন্মদিন। মা’র মুখে শোনা।’ জন্মদিন নিরূপণে মুজতবা আলী মাতার মুখনিঃসৃত বাক্যটিতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছিলেন। ১৯০৩-০৪-এ দু’ দিনের মধ্যে সিকন্দর আলীর একপুত্র ও কন্যার অকাল মৃত্যু ঘটে। এর ‘প্রায় মাস খানেক পরেই’ তিনি আরেকটি পুত্র সন্তান লাভ করেন।[৬] এ’ সময় তিনি ছিলেন করিমগঞ্জ সাবরেজিস্ট্রি অফিসের কেরানী। এরপর তাঁর পদোন্নতি ঘটে। খানবাহাদুর সাহেব স্মৃতিকথায় স্মরণ করেছেন, “১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি হাইলাকান্দিতে সাব-রেজিস্ট্রাররূপে যোগদান করি। এর অল্পদিন আগে আমার তৃতীয় পুত্র সিতুর (মুজতবা আলীর) জন্ম হয়েছে।”[৭] তাঁর ম্যাট্রিক পরীক্ষার সনদেও তৎকালীন প্রথানুযায়ী শুধু বয়স উল্লিখিত হয়েছে ২১ বৎসর ৬ মাস।[৮] তাঁর মধ্যমাগ্রজ লিখেছেন, “সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম ১৯০৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর।”[৯] অমলেন্দু সেনকে একটি চিঠিতে স্বয়ং মুজতবা জানাচ্ছেন, “আমি জন্মেছি, ১৯০৪—জন্মাষ্টমীর দিনে।” (প-২৪৭)। অভিন্ন তথ্য ‘জরাসন্ধ’কেও দিয়েছেন। সেপ্টেম্বর ১৮ -১৯, ১৯৭২-এ অপর একটি পত্রে তাঁর সম্পর্কিত এক পৌত্রকে লিখেছেন, "I am in fact actually 68 years and 14 days "young" today; I should have celebrated my birth day on the 31st august last which happens to be the

Janmastami day of the Hindus." (প-১৭২)। এই পত্রে '৩১শে আগস্ট' তাঁর জন্ম তারিখ হিসেবে চিহ্নিত করলেও পত্রে উল্লিখিত তারিখের সঙ্গে '৬৮ বৎসর ১৪ দিন' যোগবিয়োগ করে জন্ম তারিখ পাওয়া যাচ্ছে সেপ্টেম্বর ৪/৫, ১৯০৪ খ্রীঃ। সেদিন যে জন্মাষ্টমী ছিলো সে-কথাও বলেছেন। কিন্তু পঞ্জিকা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ১৯০৪ খ্রী: 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত' ছিলো ২রা সেপ্টেম্বর। পশ্চিম জার্মানির বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত তাঁর অভিসন্দর্ভ "The origin of the Khojahs and their religious life today"-তে আলী সাহেবের জীবনীতে উল্লিখিত, "I was born on the 13th September in 1904 at Karimganj, Sylhet in India." তাঁর সরকারি চাকুরীর নথি-পত্রেও '১৩ই সেপ্টেম্বর' জন্ম তারিখ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। এ' তারিখের ভিত্তিতেই ষাট বৎসর পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে বিশ্বভারতীর চাকুরী থেকে অব্যাহতি দানের কথা জানানো হয়। এবং 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান'-এ এটিই-ই তাঁর জন্ম তারিখ হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে। সুতরাং, প্রামাণিক নোতুন কোনো তথ্য-প্রমাণ না পাওয়া অবধি আমরা ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম-তারিখ হিসেবে মেনে নেবো।

প্রিয়দর্শন শিশু মুজতবার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও শাণিত মুখাবয়ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। ডাক নামটিও বাছাই করা হয়েছিলো চেহারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে—'সিতারা' অর্থাৎ নক্ষত্র, সংক্ষিপ্তাকারে যা 'সিতু' রূপ ধারণ করে। মুজতবার 'মার্জারনিধন কাব্য'-এর ভণিতায় রয়েছে—

'বাণীরে বন্দিয়া বান্দা বান্ধিলো বয়ান
দীন সিতু মিঞা ভনে শুনে পুণ্যবান ॥'

সিতু মিয়া ছেলেবেলায় আঞ্চলিক ভাষায় একটি কবিতা লিখেছিলেন। সেটি প্রকাশিত হয়েছিলো কি-না আমাদের জানা নেই। সম্পূর্ণ কবিতাটির সন্ধানও পাইনি। শুধুমাত্র শেষের ক'টি ছত্র তাঁর এক ভক্তের পত্রে উদ্ধৃত হয়েছে।

'ই কুল খাইলাম হি কুল খাইলাম,
খাইলাম দশর গাইল
হাওয়ার গুড়িৎ রস্সি বান্ধিয়া
সিতু মিয়া ডাইল।' (প-২০)।

০২.

শৈশব-কৈশোরেই সাহস, জেদ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো মুজতবা চরিত্রে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তখন তাঁর বয়স বছর পাঁচেক হবে। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন মিঃ হেজলেট, আই. সি. এস. চাড়াভাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস পরিদর্শনে এলে অজ পাড়াগাঁয়ে রীতিমতো একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো। সাহেব অফিসের নথিপত্র পরীক্ষা করছেন। চতুর্দিকে উৎসাহী জনতার কৌতূহলী দৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করছে। সকলের চক্ষু এড়িয়ে গুটিগুটি পায়ে মুজতবা এগিয়ে গেলেন এবং সাহেবের কব্জীতে বাঁধা ঘড়িতে হাত রাখলেন। সাহেব সকৌতুকে ছেলেটির পরিচয় জানতে চাইলেন। পুত্রের

অপ্রত্যাশিত আচরণে অপ্রস্তুত সৈয়দ সিকন্দর আলীকে আশ্বস্ত করে সাহেব বললেন, "Never mind. He will be a genius."[১০] ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল ছিলো না।

সুনামগঞ্জ শহরের পাঠশালায় মুজতবার স্কুল জীবনের সূচনা। "প্রথম বছর বার্ষিক পরীক্ষায় তাঁকে একটি কঠিন শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, "আমি বানান করতে পারব না কিন্তু শব্দটি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিতে পারব। তাঁর এই চটপটে জবাবে পরীক্ষকের চমক লাগে।"[১১] পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুজতবার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্তন চলতে থাকে। ১৯১৫ খ্রীঃ মৌলবীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানে তিন বৎসর কাটিয়ে ১৯১৮ সালে সিলেট গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৬৯ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)-সহ বহু দেশপ্রেমিক শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক নেতার স্কুল জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এই স্কুলে মুজতবা আলীর তিনটি বছর ভালোভাবেই কেটে যায়। সুদর্শন, মেধায় শ্রেণীতে শীর্ষস্থানীয়, পদস্থ সরকারি অফিসারের পুত্র। বাক্‌পটুতায় অদ্বিতীয়। এতোগুলো গুণের সম্মিলনের ফলে শুধু পরিবারের মধ্যে নয়, পাড়া-প্রতিবেশী এবং বন্ধু মহলেও তাঁর বিশেষ কদর ছিলো। অল্প বয়সেই ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল চালনা ও সন্তরণে রীতিমতো কৌশলী হয়ে উঠেছিলেন। অবলীলায় মনু নদীর এপার-ওপার করেন। আকর্ষণীয় এই কিশোরের 'কৈশোরলীলা' সকলে স্নেহের দৃষ্টিতেই উপভোগ করতেন। (সা-২ ও ৩)। তিনি শুধু সর্দার 'পড়ুয়া'ই নন, দুষ্টুমিরও সর্দার। সুতরাং সমবয়সী 'ইয়ার-দোস্ত' জুটতেও বিলম্ব হলো না। ডানপিটে মুজতবার নবীন কৈশোরের দুটো ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক. এক সময় সিলেটে ঘন ঘন ভূমিকম্প হতো। ভূমিকম্পের সময় পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কুলের ছেলেরা 'আল্লা আল্লা' বলে বেরিয়ে পড়তো। মুজতবার পরামর্শ ও নেতৃত্বে তাঁর সহপাঠীরা দু'-দুবার 'আল্লা আল্লা' ধ্বনি দিয়ে শ্রেণীকক্ষ পরিত্যাগ করে মহা উল্লাসে গৃহমুখী হয়। অবশ্য দ্বিতীয় দফায় তাঁর অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যায়।

খ. তখন টানা পাখার যুগ। প্রায়ই মুজতবা তাঁর কোনো সহপাঠীকে নিয়ে দু' জনে টানা পাখার দু' দিকে চড়ে বসতেন। অন্য ছেলেরা হৈ হৈ করে মহা উৎসাহে টানতো। তারপর একদিন দুই বন্ধু সমেত পাখা মেঝেতে। (সা-৮)।

পরবর্তী সময়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্র হিসেবে এ 'সমস্ত মহৎ কর্মকাণ্ডের' তিনি ছিলেন সক্রিয় সদস্য। মুজতবার হস্তাক্ষর ছিলো রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ এবং গুরুদেবের নামটি হুবহু তাঁরই মতো স্বাক্ষর করতে পারতেন। এরই বদৌলতে কবিগুরুর নাম সই করে 'ভুয়ো নোটিশ মারফত আশ্রমকে একদিনের ছুটি' দিয়ে এই সিলেটী বাঙাল শান্তিনিকেতনীদের মোক্ষম হাইকোর্ট দেখানোর এক অক্ষয় 'কীর্তি' স্থাপন করেন।[১২] পরিপূর্ণ যৌবনে জার্মানিতে অধ্যয়নকালেও এহেন 'সদাচারের' সদৃষ্টান্ত বর্ণনা অনুপম শৈলীতে 'ছাত্র বনাম পুলিশ'-এ সুচিত্রিত হয়েছে। স্কুলে সংস্কৃত ও বাঙলা পড়াতেন পণ্ডিত মশাইরা। এবং পণ্ডিত ও মৌলবীদের বেতন ছিল অপেক্ষাকৃত কম। এই স্কুলেরই এক পণ্ডিতকে মুজতবা আলী অমর করে রেখেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় 'পাদটীকা' গল্পে।[১৩]— যিনি মুজতবার সাহিত্যজীবন সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আশাবাদী ছিলেন না। কারণ

জনৈক হিন্দু পণ্ডিত অযাচিত ভাবে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনার মস্তকের পাগড়ী প্রদান করিতেছেন, কলিকাতা গড়ের মাঠে হিন্দু মোছলমান পরস্পর বরফ মিশ্রিত সরবত বিনিময় করিতেছেন।· · · এই মিলন যাহাতে অকৃত্রিম হয়, দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তৎপ্রতি আমাদের প্রত্যেকের সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।"[১৬]

সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন, "তখন কংগ্রেসী ও খেলাফতি নেতারা সরকার অনুমোদিত স্কুল-কলেজকে বলতেন গোলামখানা। ছেলেদের গোলামখানা থেকে বেরিয়ে এসে ন্যাশনাল স্কুলে যোগ দিতে আহ্বান করা হত। সিলেটেও একটি ন্যাশনাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল।"[১৭] এই জনজাগরণের কালে ১৯২১ সালে সিলেটের একটি অবাঞ্ছিত ঘটনার সঙ্গে মুজতবা আলী জড়িয়ে পড়েন। সরস্বতী পূজোর সময় কয়েকজন ছাত্রকে তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার জে. এ. ডসন, আই. সি. এস.-এর বাঙলো থেকে বিনানুমতিতে ফুল সংগ্রহ করার অপরাধে সাহেবের হুকুমে তাঁর চাপরাশী প্রহার করে। পরিণামে ছাত্র ধর্মঘট শুরু হয়। স্কুল সরকারী এবং ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে সরকারী কর্মচারীর সন্তান। মুজতবা তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র এবং ক্লাসের ফার্স্টবয়। আন্দোলনকারীদের মধ্যে—সৈয়দ মোস্তফা আলীর ভাষায়—'অগ্রণী ছিলেন সাধুহাটীর মহেন্দ্র দাম, . . . আশুদাম আর . . . ক্ষীরোদ চক্রবর্তী। আশুদামকেই দু-এক ঘা বেত দেওয়া হয়। তখন জোর নন-কো-অপারেশন চলছে . . . সমস্ত স্কুল কলেজ Strike করলো—আর সে Strike চললো বহুদিন। . . . মুজতবা আলী প্রথম হতেই . . . Strike এ যোগ দিয়েছিলেন—বাবার শত ধমকানিতেও আর স্কুলে ফিরে গেলেন না—এমন কি শুনেছি আশুদাম স্কুলে ফিরে গিয়েছিলেন।"[১৮]

নিরুপায় পিতা মুজতবাকে রাজনৈতিক তপ্ত হাওয়া থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখবার উদ্দেশ্যে শহরের বাইরে মোজা বোনার কাজে লাগিয়ে দেন। মাস দুয়েক পর মহান শ্রমের মর্যাদাকে দাফন করে তিনি শান্তিনিকেতনে অধ্যয়নের প্রবল বাসনা প্রকাশ করলেন। বাধ্য হয়ে পিতা তাঁকে শান্তিনিকেতনে প্রেরণ করলেন। এ' সময়কার কথা শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

"দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছে; আশ্রমের কয়েকটি ছাত্র 'বিশ্বভারতী'তে অধ্যয়ন শুরু করিয়াছে; বাহির হইতেও যেসব ছাত্র স্কুল কলেজ ত্যাগ করিয়াছে তাহারা বেসরকারী বিশ্ব-ভারতী প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানালোচনার জন্য আসিতেছে।. . .

... বহিরাগত ছাত্র আসিলেন হীরাচাঁদ ডুগার, অর্দ্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ও হরিপদ রায়। সিলেট হইতে আসিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী, পাঞ্জাব-লাহোর হইতে জিয়াউদ্দীন প্রভৃতি।"[১৯]

সৈয়দ মুজতবা আলীও তাঁর অনবদ্য বাক্‌নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছেন: "অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম যুগ। যারা 'গোলামী-তালিম' চায় না, তারা যাবে কোথায় ? বিশ্বকবি ... যেন বিধির আদেশে ঠিক ঐ শুভলগ্নেই শান্তিনিকেতনে তাদের জন্য নীড় নির্মাণ করেছিলেন ... দূর সিন্ধু, মালাবার, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, আসাম থেকে ছেলেমেয়ে আসতে লাগলো—...।

যারা এল তাদের মধ্যে দু চারটি ছিল লেখাপড়ায় বিদ্যেসাগর, বাপমা-খ্যাদানো বিশ্ব-বকাটে।. . . আসলে এরা ছিল কোনো কৌশলে ইস্কুল থেকে নাম কাটাবার তালে। অসহযোগের সহযোগিতায় তারা সে কর্মটি করলো নিশান উড়িয়ে দামামা বাজিয়ে।

"...পর্যবেক্ষণ-শক্তি আমার বিলক্ষণ অক্ষম বলে ছেলেবেলায়ই আমার গুরুমশাই আমাকে 'রাত্র্যন্ধ, দিবান্ধ' ইত্যাদি উত্তম উত্তম খেতাবে বিভূষিত করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমাদ্বারা আর যা হোক সাহিত্যিক হওয়া হবে না। আমার দোষের মধ্যে, লাটসায়েবের কুকুরের যে একটা ঠ্যাঙ নেই, সেটা আমি লক্ষ্য করিনি।"[১৪]

১৯১৯ সাল মুজতবা আলীর জীবনে স্মরণীয় বৎসর। এ' বৎসরের মার্চ মাসে গোবিন্দ নারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সিলেটে আসেন। এই প্রথম গুরুদেব তথা তাঁর 'মুর্শিদ'কে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলেন মুজতবা। তখনো তিনি জানতেন না এই গুরুদর্শনই তাঁর জীবনদর্শনের সন্ধান দেবে—ঘুরিয়ে দেবে জীবনের গতি। প্রথমদিন রবীন্দ্রনাথ 'বাঙালীর সাধনা' সম্বন্ধে এবং পরদিন মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশে 'আকাঙ্ক্ষা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সিলেটে দু' দিনের সফর শেষে তিনি ত্রিপুরার মহারাজার আহ্বানে আগরতলা চলে যান। মুজতবা কাউকে কিছু না জানিয়ে 'গুরুদেব'কে আগরতলার ঠিকানায় একটি পত্র লেখেন। তাতে একটি মাত্র জিজ্ঞাসা, 'আকাঙ্ক্ষা উচ্চ করতে হলে কি করতে হবে।' এবং অবিশ্বাস্য ও অপ্রত্যাশিত ভাবে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সুদৃশ্য খামে রবীন্দ্রনাথের নিকট থেকে প্রত্যুত্তর পেলেন। সম্ভবতঃ তখন থেকেই তাঁর মন গুরুদেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে। যদিও সে মুহূর্তে মনোবাসনা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আরো দুটো বছর কেটে গেলো। রাজনৈতিক অস্থিরতা তথা স্বাধীনতা-স্পৃহা জনচিত্ত উদ্বেলিত করে তুলেছে। সে-আন্দোলনে যুব-কিশোর-ছাত্রসমাজ প্রবলভাবে আলোড়িত। অসহযোগ-খিলাফৎ আন্দোলন প্রায় বিস্ফোরণমুখী। জননেতারা স্বরাজের স্বপক্ষে সর্বশিক্ত দিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছেন। তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় বিধৃত এতদ্‌সংক্রান্ত সংবাদ, সম্পাদকীয় ও নিবন্ধে সমকালীন বিক্ষুব্ধ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। কাজী নজরুল ইসলাম 'ধূমকেতুর পথ'-এ সম্পূর্ণ আবরণ ছিন্নভিন্ন করে সুস্পষ্ট ভাষায় স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন :

"স্বরাজ টরাজ বুঝি না,...ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে।...যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ দেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদেরে পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে।"[১৫]

স্বরাজের সাধনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যের বাণ ডেকেছিলো। এ' প্রসঙ্গে অনেকের ভূমিকাই ছিলো আন্তরিক ও অকৃত্রিম। জাতীয় ঐক্যই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে চূরমার করে দেয়ার একমাত্র হাতিয়ার। অবিচল এই প্রত্যয় নিয়েই আবদুল মালিক চৌধুরী তাঁর 'আলোচনার আলোচনা'য় সুগভীর আবেগ নিয়ে লিখেছেন :

"...অচলায়তনের সংকীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া আমরা বিশ্বমানবতার সত্তা অনুভব করিতেছি। তাহারই ফলে আজ আমরা দিল্লীর জুমা মছজেদের বেদীর উপর হইতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের ও কলিকাতা নাখোদা মছজেদের বেদীর উপর হইতে ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর অভিভাষণ শুনিতেছি, বোম্বের মাধববাগের হিন্দু মন্দিরাভ্যন্তরে মোছলমান, পার্শী ও হিন্দুর প্রীতিসম্মিলন ঘটিতেছে, পাটনার সভায় সম্মিলিত মোছলমানের নমাজের জন্য

বলা বাহুল্য আমি ছিলুম এই দলের।"[২০]

কিশোর পুত্রের শান্তিনিকেতন গমন মুজতবা-জননী কিছুতেই অনুমোদন করতে চাননি। চোখের জলে তাঁকে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি, শ্বেত শাসনের বীভৎসতা সেই যে মুজতবাকে করেছে গৃহছাড়া, যথার্থ অর্থে অতঃপর তিনি আর কখনো গৃহী হতে পারেননি। সারাজীবন একটা অব্যক্ত বেদনা বহন করে বেড়িয়েছেন। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, সর্বসময় তাঁর সর্বসত্তা জুড়ে ছিলো তাঁর মা—স্নেহময়ী জননী। আর মাতৃরূপের মধ্যে চকিতে দেখা দিয়েছে তাঁর মাতৃভূমি—স্বদেশ—বাঙলাদেশ। জার্মানির ছোট্ট মেয়ে মারিয়ানার কাছে তিনি কবুল করেন :

"মাকে ফেলে দূরে চলে আসাটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাপ। কিন্তু কি করবো বলো। ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, তার ইস্কুল-কলেজে পড়বো না—অবশ্য গাঁধীর আদেশে। বিদেশে না গিয়ে উপায় কি ? কিন্তু মা কী সেটা বোঝে ?"[২১] জীবনের শেষ প্রহরেও অনুশোচনায় পলে পলে দগ্ধ হয়েছেন। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে আবেগতাড়িত মুজতবা কখনো অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলতেন, "আমি পাষণ্ড। আমি মায়ের মনে ব্যথা দিয়েছি।" (সা-২৮)। সুদীর্ঘকাল মাতৃবিরহের অসহনীয় কাতরতাই শুধু নয় "তার চেয়েও নিষ্ঠুর উপলব্ধি যে পুত্রবিরহিনী আমার মা-জননী আমার চেয়ে কত লক্ষ গুণে কাতর নিরানন্দ নিরালোকে দিনযামিনী যাপন করছেন আমার প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করে—...।"[২২] মুজতবা-মানসে তাঁর মাতৃমূর্তি ছিলো চিরভাস্বর। মধ্যরাত্রে মিশরের 'কাবারে' নৃত্যানুষ্ঠান উপভোগ করতে গিয়েও তাঁর মন নিশ্ছিদ্র শূন্যতায় হাহাকার করে ওঠে। নর্তকীদের 'পায়ে ঘুঙুর নেই, হাতে কাঁকন নেই। শুধু থেকে থেকে সমের একটু আগে তেহাইয়ের সময় থেকে বাঁশি, খঞ্জনী আর ঢোলের সামান্য একটুখানি সঙ্গীত। বড় করুণ, অতি বিষাদে ভরা। নীলনদের এপার থেকে মা যেন ওপারের ছেলেকে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফেরার জন্য ডাকছে। এ ডাক আমি জীবনে বহুবার শুনেছি। যে মা-ই ডাকুন না কেন, আমি যেন সে ডাকে আমার মায়ের গলা শুনতে পাই।"[২৩]

০৩.

শান্তিনিকেতনের প্রথম মুসলমান ছাত্র সৈয়দ মুজতবা আলী প্রথমে স্কুল বিভাগেই ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাই। বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগ তখনও খোলা হয়নি। ছ' মাস পরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পৌরোহিত্যে তার ভিত্তিপত্তন হয়। বিশ্বভারতীতে তখন জনদশেক ছাত্রছাত্রী ছিলেন; তাঁরা সবাই শান্তিনিকেতন স্কুল থেকেই কলেজে ঢুকেছেন—শ্রীহট্টবাসীরূপে আমার গর্ব এই যে বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে আমিই প্রথম বাইরের ছাত্র।"[২৪]

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে জুলাই শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কিন্তু "দ্বন্দ্বপুরাণ'-এর পাদটীকায় তিনি উল্লেখ করেছেন, "১৬ই জুলাই (অর্থাৎ গাঁধী ভেটের প্রায় মাস দেড়েক পূর্বে ১৯২১-এ)

রবীন্দ্রনাথ ইয়োরোমেরিকা ভ্রমণের পর আশ্রমে ঢুকেই দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে যান। কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর তিনি একাধিকবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করবার চেষ্টা দেন;—কারণ তিনি জানতেন, রবীন্দ্রনাথ এ-আন্দোলনের বিরোধী...অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলুম।"[২৫] ফলে মুজতবা আলীর সর্বপ্রথম শান্তিনিকেতন-যাত্রার তারিখটি সংশয়াচ্ছন্ন।

স্মরণীয় ব্যক্তির সবকিছুই স্মরণীয়। কুলাউড়া থেকে কোলকাতা যাত্রাপথের কাহিনীটুকু কম চিত্তাকর্ষক নয়। বন্ধু সয়ফুল আলম খানকে ১৯শে আগস্ট, ১৯২১ তারিখের পত্রে মুজতবা লিখছেন :

"কুষ্টিয়া ষ্টেশনের (নদীয়া জেলার) ধারে আসিয়া ষ্টেশনের প্রায় তিন মাইল আগে থাকিতে আমি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়াছিলাম। কি বাড়াইব, অমনি ৮/—টিকিট বাস্কেটের চাবিশুদ্ধ মানিব্যাগ, ও ছোট রুবাইয়াৎখানা পড়িয়া গেলে আমি ত হতভম্ব খাইয়া গেলাম। ...মাল ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মায় রাখিয়া আমি টাকা কুড়াইবার জন্য গেলাম। কিন্তু পাইলাম না। অবশেষে কুষ্টিয়া শহরের একজন ধনী মুসলমান ভদ্রলোকের কাছ হইতে ৩/-কর্জ্জ করিয়া (তিনি যে বিনা পরিচয়ে কেন টাকা দিলেন বুঝিতে পারিলাম না) কলিকতায় আসিলাম।" অতঃপর শান্তিনিকেতনে তাঁর 'রুমমেইট'দের মনোজ্ঞ বর্ণনা, "আমার রুমমেইট অনেক। দুইজন মহীশূরের, তাঁহাদের সহিত ইংরাজীতে কথা বলিতে হয়—বাঙলা জানেন না। ইহার মধ্যে একজন আমার ইংরাজীর প্রফেসার। একজন ত্রিবাঙ্কুরী—তাহার সহিতও ইংরাজী কথা বলিতে হয়। দুইজন সিংহলী ভিক্ষু। তাঁহাদের একজনের সঙ্গে বাঙলা বলা যায়—অন্যজনের সহিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙলা বলা যায়। একজন ঢাকার সে লোকটা গর্বিত, তাহার সহিত খাপ খায় না। একজন সিংহলী—তাহাকে একটু সম্মানের চোখে দেখি। তিনিও মিশুক নন, একজন আর্টিষ্ট ও ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠ। তিনি খুব কম কথা বলেন। আর একজন ইতালীয়—তিনি M.A. ও ইতিহাসের অধ্যাপক। গল্প-টল্প যা তাঁর সঙ্গেই হয়। তবে প্রফেসর কি না—খুব বেশী মিশা যায় না।... গল্প গুজব করিবার মত লোক এখানে খুব কম।

চাপায় পড়িয়া আমিও কম কথা বলি। কেবল ওমর খাইয়াম না থাকায় কষ্ট হইতেছে।" (প-১৩৩)।

এ বর্ণনা থেকে শান্তিনিকেতনের ঘরোয়া পরিবেশ সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা আমরা করতে পারি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ছাত্র-শিক্ষকের পূর্ব নির্দেশিত গণ্ডীকে অস্বীকার করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে সৃষ্ট হতে যাচ্ছে এক বৃহত্তর পৃথিবী, রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদিনের ধ্যান ও সাধনার বাস্তব রূপ—মহামানবের মহামিলনের পুণ্য তীর্থস্থান। মফঃস্বলের স্বভাবভীরু বঙ্গসন্তান আরেক মফঃস্বলের পর্ণকুটীরে সন্ধান পেলো বৃহত্তর ভুবনের। এ' ভুবনের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সমগ্র পৃথিবীকে তাঁর নেত্রসীমায় আবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে।

কিশোর মুজতবা ভদ্র মুসলিম পরিবারের পোষাক পরিহিত অবস্থায় শান্তিনিকেতনে আসেন। কালক্রমে স্থান বা কালমাহাত্ম্যে তিনি পোষাকের পরিবর্তন করেন এবং ধুতিও পরিধান করতে শুরু করেন। (সা-২৮)।

সমকালীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনিলকুমার চন্দ, বাচুভাই শুক্ল, চিত্রা বীরভদ্র রাও, পরিমল গোস্বামী, অনাদি দস্তিদার, প্রমথনাথ বিশী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ

চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে মুজতবা আলীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। শান্তিনিকেতনের স্নেহচ্ছায়ায় তাঁর দিনগুলো আনন্দেই অতিবাহিত হতে থাকে। বন্ধুভাগ্য তাঁর সর্বদাই সুপ্রসন্ন। এছাড়া পরকে আপন করবার অলৌকিক শক্তি তো তাঁর ছিলোই। সেখানকার প্রথম দিনগুলোর স্মৃতিচারণে মুজতবা বলছেন, "একে বাঙাল,—খাজা বাঙাল—তদুপরি বাচাল, সর্বোপরি সহজ মেলামেশায় অভ্যস্ত মহিলা মিশ্রিত ব্রাহ্ম সমাজ ঘেঁষা তৎকালীন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আবহাওয়া বাবদে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, বয়স ষোল বছর . . . হয়-কি-না-হয়, চঞ্চল প্রকৃতির মুসলমানের পক্ষে সে বাতাবরণে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উৎকট সংকট, বিভীষিকাময় খণ্ড প্রলয় থেকে তাকে উদ্ধার করেন, আশ্রয় দেন, প্রথম দিন থেকেই . . . অনাদিদা। শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার গার্জেন।"[২৬] এই 'বাঙাল' অনতিকালের মধ্যেই স্বমহিমায় আশ্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৯২৪-এ পাটনা কলেজের তৎকালীন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং আজকের খ্যাতিমান সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় তখনই শান্তিনিকেতনের ছাত্রমহলে মুজতবার জনপ্রিয়তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। (সা-২৩)।

শান্তিনিকতনে প্রথম সাক্ষাতে গুরুদেবের প্রশ্নোত্তরে মুজতবা কোনও একটা জিনিস খুব ভালো করে আয়ত্ত করার আগ্রহ প্রকাশ করলে কবি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। গুরুর অভিপ্রায়েই তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন, "অনেক কিছু শিখতে হবে। সম্ভব অসম্ভব বহু ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম।" খোদ্ গুরুদেবের নিকট ইংরেজী ও বাঙলা ক্লাসে শেলি, কীট্স এবং বলাকা কাব্য পাঠের বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তিনি। বিশ্বভারতীতে মুজতবা আলী ছিলেন ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনের ছাত্র। তৎকালীন শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের নিজস্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু না কিছু দায়িত্ব পালন করতে হতো। এরই অঙ্গ হিসেবে—মুজতবা আলী লিখেছেন, "শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে অবসর সময়ে ক্যাটালগ তৈরী করতুম। তখন প্রতিদিন দেখতুম পাঠান্তে নতুন পুরাতন বই তিনি (রবীন্দ্রনাথ) লাইব্রেরীতে ফেরৎ পাঠাতেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, কাব্য, কত বলব। এমন বিষয় নেই যাতে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল না।"[২৭] অনুসন্ধিৎসার প্রাবল্য প্রথম কৈশোরেই মুজতবা চরিত্রে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা গেলেও রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে এসে তা যথাযথ বাস্তবরূপ পরিগ্রহের সুযোগ পেলো। এবং মুজতবা প্রাপ্ত সুযোগের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা ও প্রজ্ঞার অতলস্পর্শী গভীরতা এবং দিগন্তপ্রসারী বিস্তৃতির সম্মুখে বিস্ময়াভিভূত মানুষ এ' কথাটি স্মরণে রাখলে সহজেই উপলব্ধি করবেন উদ্ধৃতাংশটুকু শূন্য কুম্ভের অকারণ আস্ফালন নয়।

"দম্ভ করে বলছি, আমি (মুজতবা) শঙ্কর কপিল পড়েছি, কান্ট, হেগেল আমার কাছে অজানা নন। অলঙ্কার নব্যন্যায় খুঁচিয়ে দেখেছি, ভয় পাইনি। উপনিষদ, সূফীতত্ত্বও আমার কাছে বিভীষিকা নয়।. . . পুনরপি দম্ভ ভরে বলছি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের হেন বস্তু নেই যার সামনে দাঁড়িয়ে হকচকিয়ে বলেছি, এ জিনিস ? না, এ জিনিস আমাদ্বারা কক্খনো হবে না। আপ্রাণ চেষ্টা করলেও হবে না।"[২৮] ব্যাজোক্তির মধ্য দিয়ে মুজতবা আলী বক্তব্যটি সরস ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন, "আমি যে শিক্ষা-দীক্ষায় নিরঙ্কুশ 'ডডনং' হয়ে রইলুম তার জন্য কবিগুরু গুরুদেবও খানিকটা দায়ী। অবশ্য তাঁর প্রতি আমার ভক্তি

আমৃত্যু অচলা থাকবে। কারণ—

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।।"[২৯]

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর শুধু প্রতিষ্ঠাতা প্রাণ পুরুষই নন, তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, অভিভাবক এবং পরিচালক। কি নিষ্ঠা নিয়ে তিনি পাঠদান করতেন। মুজতবা আলী লিখেছেন,—"তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) সব সময় ছিল সজাগ এবং কৌতূহলী দৃষ্টি। তিনি যা বললেন বা পড়ে শোনালেন তারই প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য তিনি আমাদের (ছাত্রদের) দিকে তীক্ষ্ণ নয়নে তাকাতেন, কিংবা দেখতুম সজাগ দৃষ্টি, আমাদের কেউ কিছু বলতে চায় কি না তার প্রত্যাশায়। খাতা তাঁর হাতে দেখেছি, যখন তিনি আমাদের ডেকে, কিংবা আমাদের সাহিত্য-সভায় কবিতা পড়ে শোনাতেন। আর দেখেছি, যখন তিনি অধ্যাপক সিলভাঁ লেভির ক্লাশে আসতেন। তখন তিনি মাথা নিচু আর পাঁচজন ছাত্রের মত নোট নিতেন এবং বক্তৃতা শেষ হলে তিনি তার সারাংশ আমাদের শোনাতেন—কারণ গোড়ার দিকে আমরা লেভি সাহেবের ফরাসি উচ্চারণে বলা ইংরেজি বুঝতে পারতুম না। কোনো জিনিস স্মরণ রাখার জন্য বা অন্য কোনো কারণে তাঁকে খাতা বইতে, বা কোনো-কিছু টুকতে কখনো দেখিনি ....।" [৩০] শুধু ছাত্র নয়, বিশ্ববিশ্রুত 'বিদ্যার্ণবদের' ক্লাসে বিশ্বভারতীর আগ্রহী অধ্যাপকগণও খাতা কলম নিয়ে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ কতোরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন সেখানে—কখনো তিনি 'গুরুদেব', কখনো সাহিত্যসভার সভাপতি, নাটকের মহড়ার 'অধিকারী', আবার তিনিই 'মন্দিরের আচার্য'। তিনি যে নিষ্ঠা, ধৈর্য ও সুকঠিন শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা' অতুলনীয়। সেই সঙ্গে মিশ্রিত ছিলো তাঁর অন্তহীন মমত্ব ও ভালোবাসা। অতীতের স্মরণে আলী সাহেব বলছেন:

"আমি রবীন্দ্রনাথকে ক্লাশে আসতে একদিনের তরেও দেরী করতে দেখিনি। সাহিত্যসভার ঘণ্টা বাজা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সভায় আসন গ্রহণ করতেন। নাট্য, কিংবা বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব ইত্যাদি সঙ্গীতানুষ্ঠানের মহড়া সাধারণত তাঁর বাসভবনে, কলাভবনে, বেণুকুঞ্জ কিংবা অন্য কোনো ফাঁকা জায়গায় হতো। তিনি যে সময় ঠিক করে দিতেন কাঁটায় কাঁটায় সেই সময়েই উপস্থিত হতেন।.... পূর্ববর্তীকালে তিনি উপাসনা আরম্ভ হওয়ার আধঘণ্টা পূর্বে মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে স্বয়ং দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজাতেন—যতক্ষণ না আশ্রমের শেষ ছাত্রটি মন্দিরে প্রবেশ করেছে।"[৩১]

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সর্বাগ্রজ দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ যে কঠোরতম নিয়মনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আশ্রমিক জীবনযাপন করেছেন তার স্মরণে সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন:

"..... ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথের বাসভবনের অতি কাছে. 'নূতন বাড়িতে' কয়েক মাসের জন্য আমার আশ্রয় জুটেছিল। তখন অনিদ্রা-কাতরতাবশত অনিচ্ছায় শয্যাত্যাগ করে আমলকী গাছের তলায় পাইচারি করতে করতে দেখেছি, শুভ্রতম বস্ত্রে আচ্ছাদিত গুরুদেব পূর্বাস্য হয়ে উপাসনা করছেন। পরে তাঁর তৎকালীন ভৃত্য সাধুর কাছে শুনেছি, তিনি আগের সন্ধ্যায় তোলা বাসি জলে কী শীত কী গ্রীষ্মে স্নানাদি সমাপন করে

উপাসনায় বসতেন। তাঁর সর্বাগ্রজ, তাঁর চেয়ে একুশ বছরের বড় দ্বিজেন্দ্রনাথকেও আমি শান্তিনিকেতনের অন্য প্রান্তে ঐ একই আচারনিষ্ঠা করতে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষাট; বড়বাবুর একাশি।"৩২

দৃষ্টান্তকেই রবীন্দ্রনাথ 'সর্বোত্তম উপদেশ' মনে করতেন। জনৈক ডরমিটরি শিক্ষক তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ছাত্রদের মধ্যে পড়ার অভ্যাস (রিডিং হ্যাবিট) কি করে বাড়ানো যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন, 'আপনার নিজের পড়ার অভ্যাস বাড়ান।'"৩৩

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দৈহিক শাস্তিদান নিষিদ্ধ হলেও শিক্ষার্থীদের 'মানুষ করার' সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি দু-একজন শিক্ষকের দুর্বলতা মাঝে-মধ্যে প্রকাশ পেতো। এ-সম্পর্কে একটি ঘটনা মুজতবা তাঁর 'বড়বাবু' নিবন্ধে বর্ণনা করেছেন। "একদিন দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাতর্ভ্রমণের সময় দূর হতে দেখতে পান, হেডমাষ্টার জগদানন্দ রায় একটি ছেলের কান আচ্ছা করে কষে দিচ্ছেন। কুটিরে ফিরে এসেই তাঁকে লিখে পাঠালেন :

'শোনো হে জগদানন্দ দাদা,
গাধারে পিটিলে হয় না অশ্ব
অশ্বে পিটিলে হয় যে গাধা—' "৩৪

সম্ভবতঃ সেদিনই শান্তিনিকেতনে গুরুকর্তৃক শিষ্যের 'কর্ণমর্দন পালার' পরিসমাপ্তি।

বাহ্যিক আড়ম্বরের কোনো প্রশ্নই আসে না। তখন শান্তিনিকেতনে যে কৃচ্ছ্রসাধন চলছিলো, তা' ঋষিযুগের আশ্রমিক জীবনের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারতো। আন্তরিকতা, সত্যের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা শান্তিনিকেতনের হৃদ্স্পন্দনকে সচল রেখেছিলো। এ্যন্‌ড্রুজ সাহেব ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ক্লাস নিতেন অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রীর বারান্দায়। "হায়, আজকের লোক বুঝতে পারবে না, আমাদের কী স্থানাভাব ছিল! ব্ল্যাকবর্ড ছিল না বলে সায়েব বারান্দার মেঝের সঙ্গে আনা চক দিয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তুর শিরোনামা লিখতেন। বিরাট দেহ। সমস্ত রক্ত চলে আসতো দাড়ি আর চোখের মাঝখানে।"৩৫

মুজতবা আলী যখন বিদ্যার্থী হিসেবে গুরুদেবের সান্নিধ্যে ছিলেন তখন যথার্থ অর্থেই রবীন্দ্রনাথ রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় নবরত্নের মধ্যমণি হিসেবে দেদীপ্যমান। তাঁর বাসনা ছিলো বিশ্বের জ্ঞানাচার্যরা শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত হয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় 'বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সাধনায় নিযুক্ত হবেন।' এবং এই মহতী উদ্দেশ্য নিয়েই 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই আমন্ত্রণ জানালেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিলভাঁ লেভিকে—ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে যাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছেছিলো। অতঃপর বিশ্বের দিকপাল পণ্ডিতেরা একের পর এক বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনায় যোগদান করতে থাকেন। বিশ্বভারতীর সেই সমৃদ্ধতম যুগে সিলভাঁ লেভি, উইনটারনিৎস, লেজন, এ্যান্‌ড্রুজ, পিয়ার্সন, মরিস, ডঃ মার্ক কলিন্‌স্‌, তুচ্চি, ফরমিকি, স্টেলা ক্রামরিশ, বগদানফ, বেনোয়া, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পী নন্দলাল বসু— দেশবিদেশের তাবৎ বিদ্বজ্জন শান্তিনিকেতন আলোকিত করে রেখেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

"১৯২৩ সনে পঠন-পাঠনের মধ্যে বিদ্যাভবনে নূতন ধারা শুরু হইল—বগ্দানোফ্ (Bogdanof) নামে এক রুশীয় পণ্ডিতের আগমন হইতে। বগ্দানোফ্ পারসি ভাষায় সুপণ্ডিত, ফরাসী ভাষা ও ইংরেজী ভাষা খুবই ভালো জানিতেন—তা ছাড়া আরবীও।... তিনি বিশ্বভারতীতে যোগদান করিলে ইস্লামিক সংস্কৃতি আলোচনার ব্যবস্থা হইল। জিয়াউদ্দীন, মুজতবা আলী হইলেন তাঁহার ছাত্র। এতদিনে বিশ্বভারতী সত্যই জাতীয় তথা বিশ্বমানবীয় প্রতিষ্ঠান হইল; রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ লইতেছে।"[৩৬]

১৯২৫ সালে কবিগুরুর আমন্ত্রণে ইতালীয় অধ্যাপক ফরমিকি এবং তুচ্চি বিশ্বভারতীতে যোগদান করেন। মুজতবা আলী ফরমিকির অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন এবং তাঁর কাছে সংস্কৃত সাহিত্য, সাংখ্য ও বেদান্তের পাঠ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক তুচ্চির কাছে পড়েন ইতালিয়ান। তুচ্চি 'মাদ্জিনি' পড়ানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের বলেন, "তোমরা এখন স্বাধীনতার জন্য লড়ছো। তোমাদের চিন্তাজগতে এখন স্বাধীনতা কি, স্বাধীনতা-সংগ্রাম কাকে বলে তাই নিয়ে তোলপাড় চলছে। আর এসব বিশ্লেষণ মাদ্জিনি যে রকম করে গিয়েছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে তিনি যে রকম উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন এ রকম আর কেউ কখনো পারেননি। তোমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে এগুলো মিলে যাবে, ভাষা শেখাটাও তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে।" এবং তিনি যখন ভাবাবেগে মাদ্জিনির ভাষায় উচ্চারণ করতেন,

" 'আভান্তি, আভান্তি ও ফ্রাতেল্লি।'
'অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, হে ভ্রাতৃবৃন্দ—'

'আসবে সেদিন আসবে, যে দিন নবজীবনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে তোমরা পিছন পানে তাকাবে—পিছনের সব কিছু তখন এক দৃষ্টিতেই ধরা পড়বে, তার কোনো রহস্যই তোমাদের কাছে তখন আর গোপন রইবে না; যে সব দুঃখবেদনা তোমরা একসঙ্গে সয়েছ সেগুলোর দিকে তাকিয়ে তোমরা তখন আনন্দের হাসি হাসবে।' "[৩৭]

স্বাধীনতার এই বাণী শৃঙ্খলিত নিষ্পিষ্ট যুবচৈতন্যকে উচ্চকিত করেছে, বন্ধনমুক্তির সাধনায় করেছে উৎসাহিত। এ' প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন মনে জাগে, রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্স, জার্মান, রাশিয়া, ইতালীর বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিশ্বভারতীতে, কিন্তু কোনো ইংরেজকে নয়। এবং পুলিশের অতন্দ্র পর্যবেক্ষণ থেকে শান্তিনিকেতন যে কখনো মুক্ত ছিলো না সে তথ্যও আমাদের অজ্ঞাত নয়। ভগ্ন-স্বাস্থ্য, ক্লান্ত, পুলিশ-তাড়িত বহু 'স্বদেশী'র আশ্রয়ও যে ছিলো গুরুদেবের আশ্রম—এ' সংবাদও সরকারের অনবহিত ছিলো না।

একই সময়ে একই সঙ্গে একই বিদ্যায়তনে বিশ্বের এতো জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। "এবং আশ্রমের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত না হয়েও এক ঋষি আশ্রমটিকে আপন আশীর্বাদ দিয়ে পুণ্যভূমি করে রেখেছিলেন। .. ইনি রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"[৩৮]— এরই নাম 'বিশ্বভারতী'। জ্ঞানের সাধনা ও মনুষ্যত্বের উজ্জীবনই মূলমন্ত্র ছিলো বলে 'বিশ্বভারতী তখন পরীক্ষা নিত না, উপাধিও দিত না। ···· বিশ্বভারতীর অন্যতম প্রধান নীতি ছিল ঃ "দি সিস্টেম অব্ এগজামিনেশন উইল হ্যাভ নো প্লেস ইন বিশ্বভারতী, নর উইল দ্যার বী এনি কন্ফারিং অব্ ডিগ্রীজ।"[৩৯]

গুরুদেব স্বয়ং সত্য, সুন্দর, শিবের পূজারী। মানবের সার্বিক কল্যাণ-ই তাঁর

অভীষ্ট। গ্রামীণ গণ্ডীমুক্ত হয়ে এমনি উদার পরিবেশে,বৃহত্তর জগতের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন সৈয়দ মুজতবা আলী । চোখে তাঁর বিশ্বের বিস্ময়। তিনি যা দেখেন তারই চিত্র বক্ষে ধারণ করেন। গুণীজনদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। এমনি করে এক সময় তিনিও লাভ করেন বৃহত্তর বিশ্বের সন্ধান। তাঁর রচনায় যে পরিহাসপ্রিয়তা, রঙ্গব্যঙ্গ, সরস কথকতা—তা' তিনি শান্তিনিকেতনের পরিবেশ থেকেই লাভ করে নিজেকে ঋদ্ধ করেছেন, আপন রসবোধকে করেছেন পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে মুজতবা আলীও দ্বিধাহীন—"এ আমি নিশ্চয় করে জানি যে আমার মনোজগৎ রবীন্দ্রনাথের গড়া। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলুন, দর্শন, কাব্য, ধর্মের ভিতর দিয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের রসাস্বাদই বলুন—আমার মনোময় জগৎ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। আমার চিন্তা, অনুভূতির জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।"[৪০]

আমরাও অভিন্ন মত পোষণ করি যে,— "বিক্রমাদিত্যের সভায় কেবল ভারতীয় জ্ঞানী গুণীরাই ছিলেন। শান্তিনিকেতনে সারা পৃথিবীর গুণী সম্মিলন। ছাত্র সংখ্যা অল্প কিন্তু এসব মহারথীরা যখন নিজ নিজ বিষয়ে ক্লাশ নিতেন তখন ছাত্রদের সঙ্গে কর্মী অধ্যাপকরাও অনেকে এসে বসে যেতেন, কখনো কখনো স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ খাতা পেন্সিল হাতে। কাশীর গঙ্গার ঘাটে যেমন কোথাও শাস্ত্রালোচনা, কোথাও ভাগবত পাঠ, কোথাও কথকতার আসর—শ্রোতারা যার যেখানে ইচ্ছা বসে যাচ্ছে—এও তেমনি যেন বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন সত্র। সবটা মিলিয়ে একটি অত্যুজ্জ্বল বিদগ্ধ পরিবেশ। এ পরিবেশ থেকে যে বস্তু আহরণ করা যায় সেটাই যেন মজ্জায় লেগে যায়। সে জিনিসই মনে ফুল ফোটায়, প্রকাশের শক্তি যোগায়। জ্ঞানের একটা ভাণ্ডার খুলে রাখা হয়েছে। যে যেমন পারছে তার থেকে আহরণ করে নিচ্ছে। সৈয়দ-এর (মুজতবা আলীর) লেখায় যে বহুমুখী জিজ্ঞাসা, যে জ্ঞানস্পৃহার আভাস আছে সেটি এই আবহাওয়ার কল্যাণেই হয়েছে। তিনি যে বহু ভাষাবিদ হতে পেরেছিলেন তারও প্রেরণা এখানেই। ... তাঁর যে অফুরন্ত হাস্যরস তার অনেকখানি নিঃসন্দেহে নিজস্ব, তাহলেও বলতে হবে ক্ষিতিমোহন বাবুর রসালাপ হাস্যরসের একটি প্রধান উৎস ছিল এবং শান্তিনিকেতনের চিত্তভূমিকে দীর্ঘদিন সরস করে রেখেছিল।"[৪১]

বিশ্বভারতীতে মুজতবা আলীর ভাষাজ্ঞানের সমৃদ্ধি। তিনি বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ফরমিকির নিকট সংস্কৃত ভাষা, সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করেন। ডঃ মার্ক কলিন্‌সের নিকট ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান, মরিস সাহেবের কাছে ফরাসী, বেনোয়ার কাছে ফরাসী ও জার্মান, বগ্‌দানফের কাছে ফারসী ও আরবী এবং তুচ্চির নিকট অধ্যয়ন করেন ইতালিয়ান। এ' সময় তিনি হিন্দি, গুজরাটি ইত্যাদি ভাষাও শেখেন। অবশ্য ভাষা আয়ত্তের প্রতি তাঁর আগ্রহ বাল্যাবধিই ছিলো। শ্রীহট্টে "সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই ভাষা শেখার অদম্য আগ্রহ নিয়ে এক দোকানদারের নিকট তিনি (মুজতবা আলী) হিন্দি শিখতে থাকেন। বলাবাহুল্য দোকানদার ভদ্রলোক ছিলেন মাড়োয়ারী। তাঁকে তিনি ওস্তাদজী বলে সম্বোধন করতেন।" (সা-৪)। উর্দুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় সম্ভবত বাল্য-কৈশোরে পারিবারিক পরিবেশেই ঘটেছিলো। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন "আলী (মুজতবা) হিন্দি এবং উর্দু দ্রুত লিখতে পারতেন। সোজা দিক থেকে এবং বিপরীত দিক থেকে। আমার একখানা খাতায় তাঁর হাতে আমার নাম ইংরেজী, বাংলা, নাগরী, এবং উর্দূতে সোজা এবং উল্টো ক'রে লেখা, এখনও রয়ে গেছে।"[৪২]

তৎকালীন বিশ্বভারতীতে বিদ্যা 'দান' করা হতো, শিষ্যবৃন্দ সে- দান অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করতেন। গুরুদের পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞায় ছিলো তাঁদের পরিপূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা। তাই পরিণত বয়সে খ্যাতির শীর্ষে সমাসীন থেকেও গুরুর মৃত্যুতে শিশুর মতোই অসহায় বোধ করেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী।

'কঠিন কঠিন প্রশ্ন নিয়ে ওঁর (ক্ষিতিমোহন সেন) কাছে তাঁর অপারেশনের দিন তিনেক পূর্বেও গিয়েছি। ওসব প্রশ্ন নিয়ে এখন কার কাছে যাই ?····

বিধুশেখর (শাস্ত্রী) নেই—বেদ এবং আবেস্তা তথা বীজধর্ম সম্বন্ধে কাকে প্রশ্ন শুধাই?"[৪৩] ডঃ মার্ক কলিন্‌স্‌কেও তিনি আজীবন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করেছেন। ডঃ কলিন্‌স্ প্রসঙ্গে মুজতবার উক্তি থেকে তৎকালীন ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সৌহার্দ্য এবং জ্ঞান সঞ্চয় সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ধারণা হতে পারে। "আমার যে গুরুর কাছে আমি সবচেয়ে বেশী অনুপ্রেরণা পেয়েছি তিনি ছিলেন আইরিশম্যান, নাম (ঈশ্বর) মার্ক কলিন্‌স্।... আমি জীবনে কোনোদিন দেখিনি যে, কোনো একটা text- এর সামনে এসে বললেন, 'এ ভাষা আমি জানিনে। তা সে Chinese-ই হোক, আর ওঁরাঁও-ই হোক। আমাকে ইংরিজি, ফরাসী, জর্মন পড়াতেন। আর ইংরেজি শব্দতত্ত্ব শেখাবার সময় দুনিয়ার কুল্লে ভাষার সঙ্গে···· পরিচয় করিয়ে দিতেন। একদিন রাত্রের অন্ধকারে মাঠে দাঁড়িয়ে কন্‌স্‌টেলেশন চিনছি এমন সময় তিনি পিছন থেকে আমার পরীক্ষা নিতে নিতে কৃত্তিকার খাঁটি বাংলা নাম ('সাত ভাই চম্পা') শেখালেন। সে প্রায় ৪০ বছর হল। তখন ওর ফার্সী নাম পরওয়ীজও শিখিয়েছিলেন।"[৪৪]

শান্তিনিকেতনে পাঁচ বৎসর অধ্যয়নের পর ১৯২৬-এ সৈয়দ মুজতবা আলী ও বাচুভাই শুক্ল বিশ্বভারতীর সর্বপ্রথম স্নাতক হওয়ার সম্মান অর্জন করেন। ১৯২৭-এ বিশ্বভারতীর সর্বপ্রথম সমাবর্তন উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বয়ং গুরুদেব এঁদের হাতে সনদ-পত্র তুলে দেন। '··· নন্দলাল সে উপাধি-পত্রের পরিকল্পনা ও চিত্রণকর্ম করেছিলেন।' বিশ্বভারতীর ডিগ্রি তখন জার্মানী ছাড়া অন্য কোথাও স্বীকৃতি লাভ করেনি। পরাধীন ভারতেও এই 'ব্রাত্য' ডিগ্রির বদৌলতে ভালো কর্ম সংস্থানের কোনোরকম আশা-ভরসা ছিল না। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শান্তিনিকেতন থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হলে সৈয়দ মুজতবা আলীও উক্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এ' প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকার জানিয়েছেন :

"আমরা ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকি। বিশেষ অনুরোধে সৈয়দদা আমাকে ও আমার কয়েকজন বন্ধুকে ইংরেজী পড়াতেন এবং তারই পরামর্শে আমরা পুলিনবিহারী সেনের নিকট সংস্কৃত পড়তুম। পরীক্ষা যখন একেবারে নিকটবর্তী, তখন সৈয়দদা পুলিন বাবুকে বললেন, 'পড়াতে পড়াতে আমাদের যখন প্রস্তুতি হয়ে গেছে, তখন চলো, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েই দিই।' এবং শেষ পর্যন্ত আমরা একই সঙ্গে প্রাইভেট প্রার্থী হিসেবে সিউড়ি কেন্দ্র থেকে ১৯২৬ সনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই।" (সা-২৭)। ম্যাট্রিকে মুজতবা আলী দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত নিয়েছিলেন এবং বাঙলায় লেটার নম্বরসহ প্রথম বিভাগ উত্তীর্ণ হন।[৪৫] অতঃপর তিনি আলগড়ে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনের অব্যবহিত পরেই 'আলীগড়ি' পরিবেশ মুজতবার মনঃপূত হয়নি। তদুপরি তাঁর মন তখন বিশ্বপরিক্রমায় উন্মুখ। কিন্তু অর্থসংস্থান নেই। সেই মুহূর্তে একটি

সুবর্ণ সুযোগ জুটে গেলো। আমীর আমানুল্লাহ্ সাড়ম্বরে আফগানিস্তানের শিক্ষা-সংস্কারের উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তাঁর অনুরোধে শান্তিনিকেতন থেকে অধ্যাপক বেনোয়া ও বগদানফ কাবুলের শিক্ষা বিভাগে যোগ দিলেন। তাঁদের সক্রিয় সুপারিশ ও সাহায্যে তাঁদেরই প্রিয় ছাত্র মুজতবা আলীও সেখানে চাকুরি লাভ করেন। এবং এ' চাকুরীর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য অর্থ সঞ্চয়।

০৪.

তিনি যে বিদ্যার্জনের জন্যে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের দেশে যাবেন না সে বিষয়ে ছিলেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ। লন্ডনে গিয়েছেন—কিন্তু শহরটাকে কখনো আপন মনে হয়নি। " বহু চেষ্টা করেও লন্ডনের সঙ্গে দোস্তী জমাতে পারলুম না। পূর্বেও পারিনি। কারণ অনুসন্ধান করে আশ্চর্য বোধ হয়েছে, যে শহরকে দশ-এগারো বছর বয়স থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মারফতে চিনতে শিখেছি তার সঙ্গে হৃদ্যতা হয় না কেন ? বোধ হয় ইংরেজ এ দেশে রাজত্ব করেছে বলে। বোধ হয় বহুকাল ইংরেজের গোলামী করেছি বলে তার প্রতি রাগটা যেন যেতে চায় না।"[৪৬] সে-সঙ্গে স্মরণযোগ্য যে, তৎকালে ব্রিটিশের হাতে পর্যুদস্ত জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই বিশ্বভারতীর ডিগ্রি স্বীকৃত ছিলো। কোন্ দেশে যাবেন তার হদিস্ পেতেও বিলম্ব হয়নি। কেননা 'মাত্র একটি দেশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কখনও তার ভক্তি, শ্রদ্ধা হারায়নি।' এবং 'সে-দেশ জর্মনি।'[৪৭] শ্রীহট্ট শহরে বাগ্দেবীর বন্দনার উদ্দেশ্যে পুষ্প চয়নকে কেন্দ্র করে কিশোর-মনে সৃষ্ট ক্ষত যুবক-হৃদয়ে দগ্দগে ঘায়ে রূপান্তরিত হয়েছে "ইংরেজ রাজদূতের বিদগ্ধ বর্বরতা" দেখে—কাবুল শহরে। বাচ্চা-ই সাকাওর আকস্মিক তাণ্ডবে কাবুলের জনজীবন স্তব্ধ। নিরাপত্তাহীনতা বিভীষিকার রূপ ধারণ করেছে। বাচ্চা ক্ষমতা দখল করে অধ্যাপক-শিক্ষকদের বরখাস্ত করলেন। এমনকি প্রাপ্য বেতন থেকেও তাঁদের বঞ্চিত করা হলো। "পরিস্থিতি আলোচনা করিবার জন্য ফরাসী, জর্মন ও ভারতীয় শিক্ষকেরা একত্র হইয়া জিরগা করিলেন। তখন প্রথম অসুবিধা হইল ভাষা লইয়া। সকলে জানেন এমন কোন ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সে সভায় মাত্র একজন বাঙালী ছিলেন। তিনি ফারসী, ফরাসী, জর্মন তিনটি ভাষাই জানিতেন বলিয়া তাঁহাকেই সভাপতি করা হইল।'[৪৮] যেহেতু বৃটিশ দূতাবাসই তখন আইনত ও ধর্মত ভারতের প্রতিনিধি, সেই বিবেচনায় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা কাবুলস্থ বৃটিশ-লিগেশনের প্রধান স্যার ফ্রান্সিস হমফ্রিস-এর সঙ্গে দেখা করে আশু বিপন্মুক্তির জন্যে তাঁর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। প্রত্যুত্তরে সাহেব জানালেন, "...ব্রিটিশ লিগেশন লণ্ডনস্থ বৃটিশ সরকারের ····· মুখপাত্র । ভারতীয়েরা হক্কের জোরে (as a matter of right) ····· আমাদিগের নিকট হইতে কোন সাহায্য দাবী করিতে পারেন না। মেহেরবানিরূপে (as a matter of favour) চাহিতে পারেন।" [৪৯] অতিশয় দুঃসময়েও তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত দলের বাঙালী মুখপাত্রটি "ধবলদন্তের" বিকশিত বিষাক্ত দন্তে লোষ্ট্রাঘাত করলেন। ঋজু ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন— "এই যে হাওয়াই জাহাজ আসিতেছে সেগুলি তো ইন্ডিয়ান আর্মির পয়সায় কেনা, পাইলট মেকানিক ভারতীয় তনখা

খায়, যে জায়গায় গিয়া জাহাজখানা লইবে সেওতো ভারতের জমি। ···· সায়েব, আমি ভারতে স্বদেশে মেহেরবানিরূপে যাইব না, যদি যাই, যাইব হক্কের জোরে।"[৫০]

অভাবিত এই বেয়াদবির ফলে "ভারত প্রত্যাগমনকামীদের নির্ঘণ্ট" থেকে ভদ্রলোকের নাম খারিজ হয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত তাঁর আত্মীয় তৎকালীন কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য (মরহুম) মৌলবী আবদুল মতিন চৌধুরীর অনুরোধে "সর ডেনিস ব্রের... কাবুলে বেতার পাঠাইলেন সর ফ্রান্সিসকে, "অমুককে তার-পাঠ পাঠাও।".. সর ডেনিস সেন্ট্রাল এসেমব্লির সদস্যকে সস্তায় খুশ্‌ করিতে কেন নারাজ হইবেন। কোনো ভারতীয়কে বাঁচাইবার জন্য ঐ একটি মাত্র বেতার সেই সময় ভারতবর্ষ হইতে কাবুল যায়।"[৫১] এই বিড়ম্বনা ভদ্রসন্তানটির পক্ষে ভবিষ্যৎ কর্ম পদ্ধতি নিরূপণে কিছুটা সহায়ক হয়েছিলো বটে। তিনি লিখেছেন, "আমার চরম শিক্ষা হইয়া গেল। কাবুল গিয়াছিলাম টাকা রোজগার করিয়া ইউরোপে পড়িতে যাইবার জন্য। কোন্‌ দেশে যাইব বহুদিন মনস্থির করিতে পারি নাই। এই ঘটনার পর নির্দ্বন্দ্ব মনে ইংলন্ড বর্জন করিলাম। পড়িতে গেলাম অন্য দেশে—ও ফরাসী জাহাজে।"[৫২]—এই ভদ্রলোকটিই স্বয়ং সৈয়দ মুজতবা আলী। কাবুলের পর্বতশীর্ষে মুঘল সম্রাট বাবুরের সমাধি দেখে তাঁর মনে হয়েছে, বাবুর 'যেন অন্তরের শেষ কামনা জানাচ্ছেন।' সেই কামনাই তো মুজতবার হৃদয়-মথিত আর্তনাদে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, 'ইংরেজ-ধর্ষিত ভারতের জন্য মুক্তি-মোক্ষ-নজাত কামনা'...।"[৫৩] সুতরাং আর যেখানেই হোক, ইংরেজের দেশে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে গমন কদাচ নয়—বৃটিশ মালিকানাধীন যানবাহনও যথাসম্ভব পরিত্যাজ্য।

পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে প্রতি বৎসর ছাত্র-ছাত্রী ইংলন্ডে বিদ্যার্জনের জন্য যেতো। জ্ঞানতৃষ্ণা তাদের অবশ্যই ছিলো। ইংরেজ-শাসিত দেশে প্রত্যাবর্তন করে ইংলন্ডের ডিগ্রিধারীরা অতি সহজেই লোভনীয় চাকুরী লাভ করতেন। ফলে ভিয়েনা, বন্‌, বার্লিন ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে ফ্রয়েড, শুম্‌পেটার, আইনস্টাইন এবং সিলভাঁ লেভির মতো বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিতবর্গ অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় ভারতবাসী সে-সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হয়েছে। "তবে এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইত কাহারা ?" উত্তরে ছদ্মনামে আলী সাহেব পরবর্তীকালে লিখেছেন–"গরীব ছেলে ...ও অতি অল্প সংখ্যক গুণী বিদ্যার্থী যাহারা সত্যই জ্ঞানান্বেষণে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইত। এবং প্রধানত 'সন্ত্রাসবাদী' কিশোর-যুবকগণ। যে সাম্রাজ্যবাদ তাহাদের দেশের সর্বনাশ করিয়াছে তাহারই অর্থে ও হয়ত তাহারই বীজমন্ত্রে প্রণোদিত বিদ্যায়তনে যাইবার রুচি তাহাদিগের না থাকিবারই কথা।"[৫৪]

মুজতবার কাবুল যাওয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বেনোয়া সাহেব জানতেন। কাবুলে অরাজকতার দিনে যে ভারতীয় মহাজনের কাছে তাঁর টাকা গচ্ছিত ছিলো তাঁর পরলোক গমনে মুজতবার জার্মানী যাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষাও প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছিলো। কাবুলে নিযুক্ত জার্মান রাজদূত অধ্যাপক বেনোয়ার মুখে সব শুনে মুজতবা আলীকে ডেকে আশ্বস্ত করেন, "জর্মন সরকার যদি একটিমাত্র বৃত্তি একজন বিদেশীকেও দেন তবে আপনি সেটি পাবেন, . . . আপনি নিশ্চয়ই বৃত্তিটা পাবেন। নিশ্চিন্ত থাকুন।"[৫৫]

মেধা এবং সুপারিশের জোরে মুজতবা আলী 'হুম্‌বল্‌টএ' বৃত্তি পেয়ে ১৯২৯-এ জার্মানিতে যান। এ' প্রসঙ্গে মুজতবা লিখেছেন–"সে আমলে ইন্ডিয়া পেত মাত্র একটি স্কলারশিপ ····· সেটি পেলেন আমার বন্ধু সতীর্থ বাসুদেব বিশ্বনাথ গোখলে।... তার চার

বৎসর পর পেলুম আমি। ··· মাঝে মাঝে গাধাও রাজমুকুট পেয়ে যায়।"[৫৬] নিজেকে নিয়ে এমনি মুখরোচক রসিকতায় তাঁর ছিলো পরমানন্দ। পাঠশালায় প্রথম গুরুদর্শনের বর্ণনায়ও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। "আমার কণ্ঠস্বর শুনেই গুরু বুঝে গেলেন এটা একেবারে জাত দাঁড়কাকের। সবিস্ময়ে দাদাকে শুধোলেন, 'এটা তোর ভাই।'

তারপর তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন 'কস্মিনকালেও শুনিনি, কাক কোকিলের বাসায় ডিম পাড়লো। এইবারে একটা ব্যত্যয় দেখলুম। হরি হে, তুমিই সত্য।' "[৫৭]

আলী সাহেব তাঁর অভিসন্দর্ভে উদ্ধৃত Biography-তে লিখেছেন : In Kabul I came in touch with the Minister of the German Legation and through his recommendation obtained the Alexander Von Humboldt scholarship. I came over to Berlin in September 1929 and after having obtained the necessary certificate ······ testifying that I know enough German to follow the university lectures, had myself admitted into the University of Berlin. I studied for one term (winter 1929-30) there, and from April 1930 to the end of the Summer term 1931 I studied in the University of Bonn."

মুজতবা আলী শান্তিনিকেতনেই মোটামুটিভাবে র্জামান ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ফলে বিদেশীদের জন্য নির্দিষ্ট জার্মান ভাষার ছ' মাসের কোর্সটি মাত্র তিন সপ্তাহ্ প্রস্তুতি নিয়ে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হন। মুজতবা যখন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তখন বিশ্বনন্দিত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, এবং দার্শদিক শ্লিট ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিয়োজিত। বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন ভাগনার সাহেব। সেখানে 'রোল-কল'-এর প্রথা নেই দেখে তিনি কিছুটা অবাক হয়েছিলেন। শুধু "টার্মের গোড়াতে ও শেষে আপন আপন 'স্টুডেন্টস বুকে' অধ্যাপকদের নাম দু'বার সই করিয়ে নিতে হয়।" [৫৮]

জার্মানীতে বিভিন্ন টার্মে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনের প্রচলিত প্রথা বেশ জনপ্রিয় ছিলো। এতে বৃহত্তর ছাত্রসমাজের সঙ্গে পরিচিতি ছাড়াও তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানাচার্যদের সংস্পর্শে এসে বিশেষভাবে উপকৃত এবং নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হতেন। মুজতবা আলীও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শীতকালীন টার্ম (১৯২৯-৩০) সমাপ্ত করে ১৯৩০-এর এপ্রিলে রাইল্যান্ডের বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন এবং সেখানে ১৯৩১-এর গ্রীষ্মটার্ম পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। 'বিশাল বিরাট বিপুল কলেবর আধখানা শহর জুড়ে ভুবন-বিখ্যাত' এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ আর্কষণ অকারণ নয়। "এই বিশ্ববিদ্যালয়েই জর্মনিতে প্রথম সংস্কৃতচর্চা আরম্ভ হয়। হেরমান য়াকোবি এখানেই অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর শিষ্য কির্ফেল এখনো সেখানে সংস্কৃত পড়ান। .... কির্ফেলের সতীর্থ অধ্যাপক লশ উপনিষদ নিয়ে বছর বিশেক ধরে পড়ে আছেন।"[৫৯] প্রকৃতপক্ষে 'বন্' তখন প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রাণকেন্দ্র। এর আকর্ষণ অগ্রাহ্য করা আলী সাহেবের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। সেখানে তাঁর অধ্যাপকের সঙ্গে লেখাপড়া সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার প্রথম দিনটি মুজতবার জীবনে চির-ভাস্বর। 'ভুরি ভুরি খাঁটি তত্ত্বকথা বলার পর' তিনি বললেন : "এখানে ফুল প্রচুর পরিমাণে ফোটে, তরুণীরা সহৃদয়া এবং ওয়াইন সস্তা। ... আজ পর্যন্ত আমার কোনো শিষ্যেরই বদনাম হয়নি যে নিছক পড়াশুনো করে সে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করেছে।"[৬০]—সেই যে গুরুবাক্য সিন্দাবাদের দৈত্য হয়ে মুজতবার স্কন্ধারোহণ করেছিলো তার থেকে তিনি কখনো নিষ্কৃতি পাননি।

সৈয়দ মুজতবা আলী দর্শন বিভাগে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর 'অপশনাল ছিল আরবী'।[৬১] তাঁর গবেষণার বিষয়টি নির্ধারণ করে দেন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক (ডঃ) সি. ক্লেমেন এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে মুজতবা 'The Origin of the Khojahs and their religious life today' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনা করে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি. ফিল.' ডিগ্রি লাভ করেন। তত্ত্বাবধায়ক ব্যতীত ডঃ পি. কাহ্‌লে, ডঃ ডব্লিউ. কির্ফেল এবং ডঃ ও. স্পাইস্ তাঁকে নানাভাবে গবেষণার বিষয়ে মূল্যবান সাহায্য প্রদান করেন। সর্বোপরি "His Highness the Aga Khan, the present Imam of the Nizari Ismailies, was generous enough to finance me a visit to the British Museum and the National Library in Paris."[৬২]

বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সৈয়দ মুজতবা আলী যে কী নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানার্জন করেছেন তার কিছুটা আভাস তিনি দিয়েছেন।

"সেমিনার খোলা থাকতো সকাল আটটা থেকে রাত দশটা অবধি। জবরদস্ত গবেষকরাও রাত আটটার সময় বাড়ি গিয়ে বড় একটা ফিরতেন না। .....

কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটায় মাইস্টার উইলি এসে আমাকে হুলো লাগিয়ে একখানা লেকচার ঝাড়তো। .....

আমি পকেট থেকে একটা সস্তার চেয়ে সস্তা সিগার বের করলুম।

উইলির দিকে এগিয়ে দিয়ে সিরিয়াস গলায় বলতুম "পাক্কা বাকিংহাম পেলেসের সিগার। .... নাও,হলো তো.....

উইলি আর ঘণ্টা দেড়টাক তাড়া দিতে আসতো না।

উইলি সিগারটার সওগাৎ প্রতিবারে নিত না। না নিলেও আমার ম্যাদ বাড়াতো নিত্যি নিত্যি।"[৬৩]

মাস্টার উইলি ছিলেন সেমিনার লাইব্রেরির তত্ত্বাবধানে এবং মুজতবা আলী নিয়মিত গভীর রাত অবধি সেখানে পড়াশুনোয় নিমগ্ন থাকতেন। বন্-এর শিক্ষাপদ্ধতির সামান্য আভাস তিনি দিয়েছেন। পরোক্ষে ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে তুলনারও ইঙ্গিত রয়েছে। সেখানে 'রোল-কল্' নেই, 'গাইড বুক'-ও নেই। "অধ্যাপকরা বই লেখেন, সেগুলো পড়তে হয়।... বিস্তর বই প্রকাশিত হওয়ার পরও অধ্যাপক যে-সব গবেষণা করেছেন সেগুলো বলেন ক্লাস-লেকচারে। পরীক্ষার সময় প্রশ্ন করেন তার থেকে। তার উত্তর না দিতে পারলে ভাল নম্বর পাওয়া যায় না—শুধুমাত্র বইয়ের জোরে মেরেকেটে পাস-নম্বর পাওয়া যায় মাত্র।।"[৬৪]

বন্ শহর, রাইন নদী এবং সংলগ্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী মুজতবা আলীকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তাঁর একাধিক রচনায় 'বন'-এর প্রবাসী জীবনের প্রাণবন্ত ছবি এঁকেছেন। বিভিন্ন অবকাশে ডুসেলডর্ফ, কলোন এবং জার্মানীর বহু জনপদে তাঁর আনন্দঘন দিনগুলো কেটেছে। জীবনসায়াহ্নে প্রথম যৌবনের স্মৃতি স্নিগ্ধ রসিকতায় বর্ণনা করেছেন 'মুসাফির' গ্রন্থে এবং 'দেশ' পত্রিকার 'পঞ্চতন্ত্র' কলামে 'বিদেশে' শীর্ষক রচনামালায়।

স্বভাবসুলভ আকর্ষণীয় গুণে বন্-এর ছাত্র-শিক্ষক উভয় মহলেই মুজতবা আলী ছিলেন অতি পরিচিত প্রিয় নাম। এরই একটি প্রাণবন্ত চিত্র এঁকেছেন আমীনুর রশীদ

চৌধুরী। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের বাসায় দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী ডঃ হাসান ইমাম তাঁকে বলেন, "আমি বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভরতি হই তখন অধ্যাপকমণ্ডলীর মুখে প্রাচ্যের একজন ছাত্রেরই নাম শুনিতাম। তিনি হইলেন ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী এবং এত বেশি শুনিতাম যে, ভদ্রলোকের প্রতি আমার ঈর্ষাই হইত। লাইব্রেরীতে পড়িতে যাইতাম, শুনিতাম তিনি একটি বিশেষ চেয়ার টেবিল দখল করিয়া সেখানেই বেশীর ভাগ পড়াশোনা করিতেন এবং একটা বিশেষ ভঙ্গিতে বসিয়া ডান হাতের তর্জনী দিয়া কপালের একটা জায়গায় চুল ধরিয়া মোচড়াইতে থাকিতেন। মাঝে মাঝে মনে হইত ভদ্রলোকের এত কথা শুনিয়াছি, যদি দেখিতে পারিতাম, পরিচয়ও হইত!..... বন্-এর রাষ্ট্রদূতাবাসে চাকরি লইয়াছি। ..... মনে করিলাম আমার ইউনিভার্সিটি হইতে ঘুরিয়া আসি।..... লাইব্রেরীতে গিয়া দেখি একটি অত্যন্ত সুদর্শন লোক, মাথা ভরা টাক। ডঃ মুজতবা আলী যে চেয়ারে বসিতেন বলিয়া আমাকে বলা হইয়াছিল, সেই চেয়ারে বসিয়া একটা বই পড়িতেছেন, আর তাঁহার তর্জনী দিয়া কপালের একটি জায়গায় যেখানে একটি চুলও নাই সেই জায়গায় কাল্পনিক চুলের গুচ্ছ মোচড়াইতেছেন।' বলাবাহুল্য, ইনিই স্বয়ং ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী এবং অপ্রত্যাশিতভাবে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির দর্শন কূটনীতিক ভদ্রলোকের জীবনের অন্যতম স্মরণীয় দিবস। 'সেই দিনটি আমার কাছে অবিস্মরণীয়। সারাদিন এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা এমন সরসভাবে শুনিতে হইয়াছে যাহা জীবনে কোথাও শুনি নাই।' [৬৫]

১৯৩০-এ রবীন্দ্রনাথ জার্মানীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মুজতবা সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাটির স্মরণে আলী সাহেব লিখেছেন, "... হঠাৎ একদিন শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে তার পেলুম, জর্মনির মারবুর্গ শহরে গুরুদেব আমাকে ডেকেছেন—জানতেন আমি কাছাকাছি আছি।"[৬৬] অতঃপর কবিগুরুর অলৌকিক বক্তৃতার বর্ণনা: "... দীর্ঘ এক ঘণ্টাকাল গুরুদেব বক্তৃতা দিলেন,–একটি বারের মতো সামান্যতম একটি শব্দও সেই সম্মিলিত যোগসমাধির ধ্যান-ভঙ্গ করল না। আমার মনে হল গুরুদেব যেন কোন এক অজানা মন্ত্রবলে সভাস্থ নরনারীর শ্বাস-প্রশ্বাস পর্যন্ত স্তম্ভন করে দিয়েছেন...আমার মনে হয়েছিল, সভাগৃহ থেকে বেরুতে গিয়ে দেখব সেই বিপুল কলেবর অট্টালিকা বল্মীকস্তূপে নিরুদ্ধ নিরন্ধ্র হয়ে গিয়েছে।"[৬৭] অতঃপর একটিমাত্র জিজ্ঞাসায় শিষ্যের প্রতি গুরুদেবের স্নেহ-প্রীতি-মমতা অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে। "গুরুদেব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবু হাসি মুখে বসতে বললেন।... বললেন, 'এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন'?"[৬৮]

সৈয়দ মুজতবা আলী জার্মানীতে শিক্ষাসমাপনান্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁর অভিসন্দর্ভ এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি জমা দেয়ার একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন।

"এদেশে (জার্মানীতে) পরীক্ষার পূর্বে এত সাতান্ন রকমের কাগজপত্র মায় থীসিস ডীনের দফতরে জমা দিতে হয় যে, সবাই শরণ নেই আন্‌কোর হালের যে দু' দিন আগে পাস বা ফেল করেছে।... সে রকম দুজনা... দফে দফে ... এক বাণ্ডিল কাগজ, ফর্ম সার্টিফিকেট আমাকে দিয়ে বললে, '... সব কাগজের নিচে রাখবে একখানা পাঁচ মার্কের নোট। এটা কেরানীর অন্যায্য প্রাপ্য—কিন্তু পূর্ণ শত বৎসরের ঐতিহ্য।' "[৬৯]

১৯৩২-এ সৈয়দ মুজতবা আলী ডুসল্‌ডর্ফ-এ তাঁর এক বন্ধু পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 'বন্' হয়ে ইতালি থেকে জাহাজ যোগে ফেব্রুয়ারিতে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কি অনাসক্তভাবেই না আলী সাহেব বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ডিগ্রিপ্রাপ্তির সংবাদ দিয়েছেন।

"... এ-গর্দভও দর্শন বিভাগ থেকে ডক্টরেট পায়—জর্মনির অন্যতম বিখ্যাত বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এবং বললে পেত্যয় যাবেন নিশ্চিত মতুল্য এবং "মদাপেক্ষা" সহস্র গুণে খঞ্জতর ভূরি ভূরি গর্দভ গর্দভী জর্মনি থেকে—জর্মন কেন , সর্বদেশেই—নিত্যি নিত্যি ডক্টরেট পেয়েছে ও পাবে।"[৭০]

লব্ধ ডিগ্রি এবং দীর্ঘ সাধনায় অর্জিত প্রজ্ঞায় যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান এবং অন্তঃসারশূন্য ডিগ্রিধারীদের আস্ফালন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করে মুজতবা আলীর তীক্ষ্ণ, ব্যঙ্গবাণ শাণিত হয়ে উঠেছে। যদি কোনোক্রমে প্যারিস পৌঁছে যেতে পারেন, তাহলে—মুজতবার বিজ্ঞোচিত পরামর্শ—'(ভুলবেন না, ফেরার সময় মঁ পলিয়ে থেকে একটা ডি-লিট নিয়ে আসবেন; এদেশে কাজে লাগবে। প্ল্যাটফর্মেই বোধ হয় সনদ বিক্রি হয়, নইলে হয়তো দু-একদিন বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ায় বাস করে, রেডিমেড্ থীসিস কিনে সেটা পেশ করা মাত্রই সনদটা পেয়ে যাবেন সঙ্গে সঙ্গে...ডট্ করা লাইনের সঠিক জায়গায় নাম সই করতে কিংবা টিপ সই দিতে যেন ত্রুটি না হয়...)।'[৭১]

০৫.

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর মুজতবা আলী কিছুদিন কোলকাতায় এবং '৩৩-এর সম্পূর্ণ বছরটি' পিতামাতার সঙ্গে মৌলবীবাজার শহরে অতিবাহিত করেন। ১৯৩৪ সালের গোড়ার দিকে তিনি রেডিওলজিস্ট ডাঃ অজিত বসুর সঙ্গে ইউরোপ যাত্রা করেন দোভাষী হিসেবে। ডাঃ বসুর সঙ্গে প্রথম চার মাস ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী অস্ট্রিয়া, এবং চেকোস্লোভাকিয়ার যক্ষ্মা হাসপাতালগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলেন। অতঃপর ডাঃ বসু দেশে ফিরে এলেও মুজতবা আলী ইউরোপে আরো ছ'টি মাস কাটিয়ে দিলেন 'এটা সেটা দেখতে দেখতে।' অতঃপর 'একদিন শুভ-প্রাতে ভেনিস' বন্দর থেকে জাহাজে আলেকজান্দ্রিয়া এবং সেখান থেকে ট্রেনে কাইরো। মুজতবা আলী লিখেছেন, "তারপর যে এগারো মাস আমি কাইরোতে কাটালুম তার স্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।"[৭২] অর্থাৎ এ' যাত্রায় তিনি মোট এগারো মাস মিশরে অবস্থান করেন এবং বিশ্বে বর্তমান প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় আল্-আজহারে কয়েক মাস 'মুসলিম শাস্ত্র' অধ্যয়ন করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি '১৯৩৫ খৃঃ বসন্তকালে' কিছুদিনের জন্য জেরুজালেমে থেকে প্যালেস্টাইনের পরিস্থিতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন।

বরোদার বিদ্যোৎসাহী মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াড় ইউরোপ পরিভ্রমণ শেষে মিশরের আল্-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। এবং সেখানে মুজতবা আলীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি লিখেছেন :

"১৯৩৪-এ আমি যখন কাইরোতে মুসলিম শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি তখন...সয়াজীরাও আমাকে 'পাকড়কে' বরোদায় নিয়ে এসে একটি অত্যুত্তম কর্ম দেন।"[৭৩]

মুজতবা আলীর রচনাবলী থেকে প্রাপ্ত সূত্রে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি ১৯৩৪-এর শেষপাদে কাইরো গমন করেন। সেখানে মাস কয়েক বিদ্যাচর্চা করে ১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে বরোদায় পৌঁছেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী সঙ্গীতেরও সমঝদার ছিলেন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরাট সম্ভার তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিলো। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ ফৈয়াজ খান বহুদিন বরোদায় আলী সাহেবের বাড়িতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। শান্তিনিকেতনে পাঠ্যাবস্থায় মুজতবা কিছুদিন সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন। তারিখবিহীন একটি পত্রে কিশোর মুজতবা তাঁর এক বন্ধুকে জানাচ্ছেন—"কাল বড় ভাই সাহেবের চিঠি পেলুম। তিনি লিখেছেন গান শিখবার জন্য। আমিও ভর্ত্তি হয়ে গিয়েচি। একটি ঘন্টা বসে কেবল সারেগামাপাধানিসা, সানিধাপামাগারিসা সাধতে হয়। গান যে কোনদিন আরম্ভ হবে তার কোনো দিশে পাচ্ছি নে।" (প-১৩৫)। পরবর্তীকালে লিখেছেন, "...আমি পূর্ণ একটি বছর রেওয়াজ করেও তবলার গভীরে কেন—কানি পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে নিরাশ হয়ে সাধনাটি ছেড়ে দি,"[৭৪] এবং শ্রীযুক্ত অবিনাশ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'তবলায় আলী সাহেবের মোটামুটি হাত ছিলো।'

বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বা প্রথানুযায়ী অধ্যয়ন সমাপ্ত হলেও সৈয়দ মুজতবা আলী আজীবন ছাত্রই ছিলেন। অধ্যয়নই ছিলো তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র, চিত্তবিনোদনের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। তাঁর গুরু 'গুরুদেবের' অন্তত একটি বিশিষ্ট গুণ মুজতবা ব্যক্তিজীবনে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং সে-গুণটি হলো নিরলস অধ্যয়ন ও বহুমুখী জ্ঞানতৃষা—যার অন্বেষণে মুজতবা ছিলেন নিষ্ঠাবান প্রত্যয়ী পুরুষ। ১৯৬০-এ একটি পত্রে লিখছেন, "আমি অন্তত ১২/১৪ ঘণ্টা পড়ি। ওর মত আফিং নেই।" (প-১১৯)। এই আফিঙে তিনি সারাজীবন বুঁদ হয়েছিলেন। "আপন পড়া, তাও হতচ্ছাড়া, ছন্নছাড়া, নিয়ে এত বেশি সময় কাটিয়ে দিই যে অন্য কোনো কাজ করে উঠতে পারিনে। বিশ্ব-সংসার চটে যায়, ভাবে হৃদয়হীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন।"[৭৫] অন্যত্রও এ 'নেশা'র নিরহঙ্কার উল্লেখ রয়েছে : "আমি জাগ্রত অবস্থায় কিছু একটা না পড়ে থাকতে পারিনে। ..জানেন মাথা থাবড়াতে ইচ্ছে করে যখন কেউ বলে, কিংবা তার মুখের ভাব থেকে বুঝতে পারি যে, সে ভাবছে, আমি পড়ে জ্ঞানসমুদের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে ডুব দিচ্ছি। বিশ্বাস করুন, কসম খেয়ে বলছি, জ্ঞান যৎসামান্য একটু আধটু হয়তো মাঝে-সাঝে বাড়ে, আসলে কিন্তু আমি পড়ি ওটা আমার নেশা, নেশা নেশা।"[৭৬]

শিক্ষা এবং কর্মজীবনে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রায় পনেরো-ষোলটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। মাতৃভাষা ব্যতীত সংস্কৃত ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান, আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দি, উড়িয়া, অসমিয়া, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি ভাষায় গভীর জ্ঞানের পরিচয় তাঁর রচনায় বিধৃত।

অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সৈয়দ মুজতবা আলী যে দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তার এক দশমাংশের সদ্ব্যবহারও তিনি করেননি। আত্মগোপনের কিংবা অসত্যের বেসাতিতে তাঁর সামান্যতম রুচি ছিলো না। তাঁর মতো গুণীর পক্ষেই এমন সরলোক্তি সম্ভব : "....আমার যা আরবী-ফার্সী জ্ঞান তা আপনি কেন যে কোনো লোক ছয় মাসে আয়ত্ত করতে পারবে। আমি সব সময়ই বলি any donkey would have known

100 times more than what I know had he had all the opportunities I had.

এ অতি সত্যি কথা! ঈশ্বর সাক্ষী। আমি আমার সময় আর সুযোগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি।" (প-২৩২)।

'Biography'-তে প্রদত্ত সৈয়দ মুজতবা আলীর শিক্ষা ও শিক্ষায়তন সম্পর্কিত তথ্য :

"After attending the Primary School till 1914 I attended the High School in Maulvi Bazar, Sylhet and Shantiniketan till 1922, when I passed the final High School Examination. In 1922 I joined the Vishvabharati... and in 1926 I obtained my B. A. degree after having passed the Final Examination. I then studied for a year in the Aligarh Muslim university."

তিনি যে ১৯২৬-এ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তা' 'Biography-তে অনুল্লিখিত। সম্ভবত 'স্নাতক' হয়ে পুনরায় ম্যাট্রিক পরীক্ষা দানের দীর্ঘ পটভূমি বিশ্লেষণের আশঙ্কাতেই তা' উল্লিখিত হয়নি। এবং এই সনদের বদৌলতেই মুজতবা আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন বিশ্বভারতী থেকে বি. এ. ডিগ্রি প্রাপ্তির পর।

সৈয়দ মুজতবা আলী লিখেছেন, "আমার ব্যক্তিগত শাবাসী সেই হাস্যরসের, সেই ব্যঙ্গরসের উদ্দেশে যেখানে রসস্রষ্টা নিজেকে নিয়ে নিজে হাসেন, নিজেকে ব্যঙ্গ করেন, লাফস অ্যাট হিজ ওন্ কস্ট্।'[৭৭] এবং কতো ভাবেই না আলী সাহেব তাঁর রচনায় এ' সত্য প্রতিপন্ন করেছেন। সাধারণের চেয়ে বড় মাপের মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব। চারুদর্শন 'সিতু মিয়া' প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা করেছি। আর আত্মবর্ণনায় তিনি কি শোনালেন ? তাঁরই এক বন্ধু তার রং দেখিয়ে দোকানদারের কাছে ঐ রঙের "বুটপালিশ" চেয়েছিলেন।[৭৮] অথবা, "অধুনা মৃত ভাস্কর এপষ্টাইন আমাকে 'বৃদ্ধ নিগ্রোর' মডেল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু (অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত) সুন্দরীরা আমাকে অবহেলা করেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন আমিও বুঝি ফিলিম স্টার —'স্যুটিঙে'র ড্রেস না ছেড়েই দাওয়াতে এসেছি।"[৭৯] অত্যন্ত সম্মানজনক 'হুমবল্ট্' বৃত্তি পেয়ে যাঁর মনে হয় 'মাঝে মাঝে গাধাও রাজমুকুট পেয়ে যায়' এবং ছেলেবেলায় গরু সম্বন্ধে রচনা লিখতে গিয়ে তথ্যের সন্ধান চাইলে বিজ্ঞ বন্ধুটি যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে "বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, আত্মজীবনী লেখা তো কঠিন নয়।"[৮০] —আমরা দেখবো সেই ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী কী অপূর্ব ভঙ্গীতে, মনোরম ভাষায় যথার্থরূপে 'রম্য' করে আত্মজীবনী বর্ণনা করেছেন—

I cannot write English. That does not mean that I can write Bengali, which happens to be the language my mother tried to teach me... Indeed she realised pretty early that I was not particularly gifted in any of the subjects you learn at school. At that time, however, she came across a Chinese poem, composed by a father and addressed to his three-year old son, which ran more or less as follows :

When a son is born
Parents and relations pray
That he should be intelligent, he should be gifted,
These have ruined me!
I, therefore, pray,my son,
That you may have the brain of a donkey,

So that you may, one day,
Become a cabinet Minister.

That consoled her...It has saved me any way...

I was kicked out of school when I was fourteen. I do not resent it. After all you cannot set fire to the Head Master's personal "highly confidential" papers (which incidentally also recorded the fact that I had been caned twice and would be rusticated if I should repeat my previous performances) and get away with it. Of course, I tried to suppress my rustication by bribing my friends and enemies with stoln mangoes from the Head Master's garden but my father got scent of it and kicked me out of hearth and home.

...The non-co-operation movement had there just started and I joined it. The news went round that one of the most "brilliant" young students of the Government School has left the "Satanic" organisation which breeds "Slave mentality." I became a hero overnight, a sort of a Chota Barin Ghosh or a potential Kanailal.....

There was, however a tiny catch which I had overlooked. In a couple of weeks I found out much to my chagrin that I was expected to go into villages and do what the leaders called constructive work. On the top of it I also came to know that it meant bad food, poor accomodation, plenty of mosquitoes and a lot of walking in the hot sun. Well, that was not quite the idea of a hero I had...

Luck was again in my favour. Tagore had at about that time founded his VISVABHARATI at Santiniketan and I "responded to his call for higher education" with great eclat. The news got round again that I was not one of the those chaps who live and die for a petty degree but a "real searcher of truth", a "genuine lover of wisdom", for, had not Tagore declared in the prospectus of his newly founded University that, "The system of examination will have no place in Visvabharati, nor will there be any conferring of degrees"?

Having failed at all exminations, so far, I was naturally delighted to join an institution where was no nightmare of examinations.

It took Tagore full five years to realise his blunder. Full five years passed and I showed no signs of leaving the Visvabharati. My attitude was clear: if there is no examinations and, a fortiori, no final exmination, I could as well spend the rest of my life in Santiniketan. The poet got alarmed, for, by that time he had found out what a priceless jewel I was as a student. Purely with a view to get rid of me he held an examination and I passed malgrémoi. I had, of course, done everything in my power to fail but, alas, by that time Tagore was far too clever for me.

With this degree in my pocket I went to Germany. I had no difficulty in getting admission in one of her Universities, thanks to Tagore's fame as a poet and educationalist. At the end of three years the University authorities were in a dilemma : if they did not give me a doctorate it would amount to dishonouring Tagore; if they did the contrary it would lower the prestige of their University. In utter despair and for the deep respect they bore for Tagore, they were at last pleased(!) to confer the doctorate on me. Amen!

Going back to the Chinese poem with which I began this epistle, I now expect to become a cabinet Minister ." * ৮১

অগ্রন্থিত 'শিক্ষাব্রতীর আত্মকথা'য় হালকা আমেজে রসের বন্যা বইয়ে দিলেও সৈয়দ মুজতবা আলীর বক্তব্য বাস্তব ও সত্যের কূল ঘেঁষেই গিয়েছে। গান্ধীজীর আহ্বানে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে পেয়েছেন বৃহত্তর জীবনের সন্ধান। গুরুদেবের 'সার্টিফিকেট' কর্ম জীবনেও হয়েছিলো আর্থিক উন্নতির সোপান–কাবুলে। শুধু 'Cabinet Minister' হতে পারেননি মগজটি 'donkey'-র ছিলো না বলে!

---

* প্রকাশনা সংস্থা 'মিত্র-ঘোষ'-এ কর্মরত শ্রীযুক্ত মনীষ চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। পত্রিকার নাম পাওয়া যায়নি।

তথ্য-নির্দেশ

১. সৈয়দ মুজতবা আলী : কি করে সাহিত্যিক হলাম; ৮ই এপ্রিল, ১৯৬৯-এ আকাশবাণী, কোলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত।
২. ইন্দ্রমিত্র : আরেক পঞ্চতন্ত্র, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৬, পৃ. ১৮৫।
৩. পরিমল গোস্বামী : পত্রস্মৃতি (১ম প্রকাশ), পৃ.২৪৫।
৪-৫. সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরি–১; বিভাব, আশ্বিন, ১৩৮৭, পৃ. ২০-২১।
৬. সৈয়দ মোস্তফা আলী : আত্মকথা, পৃ. ৩।
৭. সৈয়দ মুর্তাজা আলী: আমদের কালের কথা, পৃ. ২১।
৮. The Calcutta Gazette, 17 June, 1926. পৃ. ২৯৫।
৯. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ১।
১০. সৈয়দ মোস্তফা আলী : আত্মকথা, পৃ. ১০৮।
১১. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ৩।
১২. সৈয়দ মুজতবা আলী : সিংহ মূষিক কাহিনী, কত না অশ্রুজল, পৃ. ১৮৫।
১৩. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : আমাদের কালের কথা, পৃ. ৭৬।
১৪. ভবঘুরে, ভবঘুরে ও অন্যান্য, পৃ. ১৮৮।
১৫. ধূমকেতু, ২৬শে আশ্বিন, ১৩২৯; মুস্তফা নূরউল ইসলাম : সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, পৃ. ২১৫-১৬।
১৬. আল্-এস্লাম, পৌষ, ১৩২৬; ঐ, পৃ. ২৬১।
১৭. আমাদের কালের কথা, পৃ. ১০০।
১৮. আত্মকথা, পৃ. ১১০।
১৯. শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী (প্রথম খণ্ড), পৃ. ১৮৮।
২০. নটরাজনের একলব্যত্ব, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৩, পৃ. ৪২২।
২১. ভবঘুরে, ভবঘুরে ও অন্যান্য, পৃ. ২০৪।
২২. মুসাফির, পৃ. ১৪০।
২৩. জলে-ডাঙায়, পৃ. ১৪১।
২৪. গুরুদেব, গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১১।
২৫. কত না অশ্রুজল, ১ম প্রকাশ, পৃ. ২২৫।
২৬. অনাদিদেব! অনন্তভব! শতংজীব! সহস্রংজীব!!, গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন, পৃ. ১৮০।
২৭. গুরুদেব, গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৪।
২৮. ভবঘুরে, ভবঘুরে ও অন্যান্য, পৃ. ১৮০-৮১।
২৯. দর্পণ, কত না অশ্রুজল, পৃ. ১৫৬।
৩০-৩১,৩৩. শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথ, বেতার জগৎ, শারদীয় বিশেষ সংখ্যা, ১৯৬১, পৃ. ১৯-২০।
৩২. শহর্-ইয়ার, ১ম প্রকাশ, পৃ. ২৩০।

৩৪. বড়বাবু, ১ম প্রকাশ, পৃ. ১১।
৩৫. সৈয়দ মুজতবা আলী : এ্যান্ড্রুজ সাহেব, গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন, পৃ. ৯৩।
৩৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী (১ম খণ্ড), পৃ. ২১০।
৩৭. সৈয়দ মুজতবা আলী : আচার্য তুচ্চি, ময়ূরকণ্ঠী, ১৪শ সংস্করণ, পৃ. ১০৩।
৩৮-৩৯ ঐ, বিশ্বভারতী, ময়ূরকণ্ঠী (১৪শ সংস্করণ) পৃ. ১১৭।
৪০. ঐ, গুরুদেব, গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন, পৃ. ৯-১০।
৪১. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : সৈয়দ মুজতবা আলী, দেশ, ৬ মার্চ, ১৯৭৪, পৃ. ৫১৪।
৪২. পরিমল গোস্বামী : স্মৃতিচিত্রণ, ২য় পর্ব, পৃ. ১৩৩।
৪৩. শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লিখিত পত্র-৬, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩১০-১৩।
৪৪. শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লিখিত পত্র-৩, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩০৩-০৪।
৪৫. The Catcutta Gazette (Part IB), 17 June, 1926 (Aprill to June), পৃ. ২৯৫।
৪৬. সৈয়দ মুজতবা আলী ঃ মুসাফির, পৃ. ৭১।
৪৭. ঐ, পৃ. ৭৮।
৪৮-৫০ ধবলদন্ড, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪-২৫।
৫১-৫২. ঐ, পৃ. ৩২৬–২৭।
৫৩. সৈয়দ মুজতবা আলী : দেশে-বিদেশে, পৃ. ৩৫৯।
৫৪. সত্যপীর : জ্ঞান সঞ্চয় না চাকুরী-সন্ধান, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা,১০ আগস্ট ১৯৪৬, পৃ. ৪।
৫৫. সৈয়দ মুজতবা আলী : দেশে-বিদেশে পৃ. ৩৫৩-৫৪।
৫৬. সৈয়দ মুজতবা আলী : রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮২।
৫৭. ঐ, দর্পণ, কত না অশ্রুজল, পৃ. ১৫৬।
৫৮. দর্শনাতীত, পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব), পৃ. ১২।
৫৯. বন্, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৬।
৬০. ঐ, পৃ. ১৯৭।
৬১. কত না অশ্রুজল, (১ম প্রকাশ), পৃ. ৫৫।
৬২. Biography- থেকে উদ্ধৃত।
৬৩. বিদেশে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭২।
৬৪. সৈয়দ মুজতবা আলী : মুসাফির, পৃ. ১০৬।
৬৫. মুজতবা কথা, দেশ, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪।
৬৬-৬৭. গুরুদেব, ময়ূরকণ্ঠী, পৃ. ৩।
৬৮. ঐ পৃ. ৪।
৬৯. ছাত্র বনাম পুলিশ, পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব), পৃ. ১০৭।
৭০. নীলমণি, উভয়-বাংলা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড পৃ. ৪০১।
৭১. আধুনিকের আত্মহত্যা, দু-হারা, পৃ. ২৪৮।
৭২. কোদণ্ড মুখহানা, পঞ্চতন্ত্র, পৃ. ১৩৭।
৭৩. রহস্য লহরী, কত না অশ্রুজল, পৃ. ২১৩।
৭৪. মরহুম ওস্তাদ ফৈয়াজ খান, পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব), পৃ. ৫২।
৭৫. শ্রীমতী সুনন্দা সেনকে লিখিত পত্র–১; সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪২৬।
৭৬. শহর্-ইয়ার (১ম প্রকাশ), পৃ. ৭৯।
৭৭. ফের্ডিনান্ট জাওয়ারব্রুখ, পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব), পৃ. ২৭।
৭৮. ধূপছায়া, পঞ্চতন্ত্র, পৃ. ১১০।
৭৯. ক্রন্দসী, চতুরঙ্গ, পৃ.১৮৪।
৮০. দেশভ্রমণ, ধূপছায়া, পৃ.৩।
৮১. Dr. Syed Mujtaba Ali : Autobiography of an academician, পৃ.৩-৪।

অধ্যায় : চার

০১.

অর্থোপার্জন তথা জীবিকা নির্বাহের জন্য চাকুরি অথবা অন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন। এ' প্রয়োজনে সৈয়দ মুজতবা আলী কখনো চাকুরি গ্রহণ করছেন, কখনো বা কলম ধরেছেন। কিন্তু কোনটাকেই যেন জুৎসই ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারেননি। ফলে শেষাবধি তাঁকে অনিশ্চিত জীবনই যাপন করতে হয়েছে। এর জন্যে মূলতঃ দায়ী তাঁর মধ্যেকার চিরচঞ্চল বোহেমিয়ান মানুষটি—যিনি কখনো বিশেষ কোনো গণ্ডীতে আবদ্ধ হতে চাননি। সংসারের প্রচলিত বিধি-বিধানের প্রতি অপরিসীম অনাস্থা সর্বক্ষণ তাঁর হৃদয়-মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে (১৯২০-২১) বৃটিশবৈরী কিশোর মুজতবাকে সরকারি কর্মচারী নিরুপায় পিতা দৈনিক দেড় টাকা-দু' টাকা উপার্জনের জন্যে এবং রাজনৈতিক উত্তপ্ত হাওয়ার বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে মোজার কলে কাজে লাগিয়েছিলেন। মাস দুয়েকের শ্রমবৃত্তির পর পুনরায় শিক্ষাজীবনে প্রত্যাবর্তন এবং বিশ্বভারতীর স্নাতক হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের বাসনায় অর্থ-সংস্থান করতে ১৯২৭ সালে আফগানিস্তানের শিক্ষা বিভাগে চাকুরি নিয়ে কাবুলের কৃষিবিজ্ঞান কলেজে ফরাসী ও ইংরেজি ভাষার প্রভাষক নিযুক্ত হন।[১] মাসিক দুশো টাকা বেতন। বছর খানেক যেতে না যেতেই কাবুল সরকার মুজতবা আলীর জর্মন ভাষায় গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বেতন আরো একশত টাকা বাড়িয়ে দিলেন। ফলে ঈর্ষাকাতর "পাঞ্জাবি শিক্ষকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে (শিক্ষামন্ত্রীর নিকট) তাঁরা ডেপুটেশন নিয়ে গিয়ে বললেন, 'সৈয়দ মুজতবা আলীর ডিগ্রি বিশ্বভারতীর, এবং বিশ্বভারতী রেকগনাইজড্ য়ুনির্ভার্সিটি নয়।'

... শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, 'আপনাদের সনদ-সার্টিফিকেটে রয়েছে পাঞ্জাব গবর্নরের দস্তখত। আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্থানেও গবর্নরের অভাব নেই। কিন্তু আগা মুজতবা আলীর কাগজে দস্তখত রয়েছে মশহুর শাইর রবীন্দ্রনাথের। তিনি পৃথিবীর সামনে সমস্ত প্রাচ্য দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন (চশ্‌ম্‌ রওশন্‌ করদে অন্দ্‌)।' "[২]

কাবুলে তাঁর অধ্যাপনা জীবনের আয়ুষ্কাল মাত্র দু' বছর। ১৯২৯-এ বাচ্চা-ই-সাকাওর নেতৃত্বে শিনওয়ারী বিদ্রোহের সময় আমীর আমানুল্লাহকে দেশত্যাগ করে প্রাণ বাঁচাতে হয় এবং মুজতবা আলীও ফিরে আসেন দেশে। অবশ্য তাঁর কাবুল প্রবাসের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিলো।

০২.

১৯৩২-এ ডক্টরেট হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন এবং '৩৩-এ চাকুরির সন্ধানে মুজতবা আলী ঢাকা আসেন। "তখন জে ডব্লিও ফুক্ পি-এইচ.ডি...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর অধ্যাপক ছিলেন।...তাঁর ইচ্ছা ছিল মুজতবা আলীকে অধ্যাপক নিযুক্ত করা। দুর্ভাগ্যবশত ফুকের চাকুরির টার্ম শেষ হলে তাঁকে চলে যেতে হয়। কাজেই তিনি মুজতবা আলীকে সাহয্য করতে পারেননি।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্নেহধন্য ছাত্রের জন্য চাকুরির ব্যর্থ তদ্বিরও করেছিলেন। মুজতবা আলী লিখেছেন :

"রবীন্দ্রনাথ ...'না চাহিতে যারে দেওয়া যায়' ভাবখানা মুখে মেখে পিল পিল করে সার্টিফিকেট বিলোতেন। আমাকে পর্যন্ত একখানা দিয়েছিলেন—...চাকরির জন্য। আমি তাঁর 'কৃতী ছাত্র' এ ধরনের বহুবিধ আগড়ম-বাগড়ম লিখে তিনি আমাকে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ বাবু বিচক্ষণ লোক; তিনি আমাকে চাক্‌রি দেননি। অন্যত্র চেষ্টা করার জন্য সার্টিফিকেটখানা ফেরত পেলুম না—কারণ চিঠিখানা ছিল নিতান্ত প্রাইভেট এবং পার্সনাল। শ্যামাপ্রসাদবাবু রবিবাবুর সার্টিফিকিটের মূল্য না দিলেও রবিবাবুর হাতের লেখা চিঠির মুল্য জানতেন। চিঠিখানা সযত্নে শিকের হাঁড়িতে তুলে রেখে দিয়েছিলেন।"[৪]—চাকুরি লাভে ব্যর্থতার জন্যে নয়, কবিগুরুর অসম্মান এবং দেশনেতার অতিমাত্রায় বাস্তববোধে বিক্ষুব্ধ মুজতবা-মানসের পরিচয় উদ্ধৃতিতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুজ শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'অ্যালবাম/বেজো না চরণে চরণে' লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথের সেই "নিতান্ত প্রাইভেট এবং পার্সনাল" চিঠিখানি মেজদার (শ্যামাপ্রসাদবাবুর) পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে পাওয়া গেছে তাঁকে-লেখা রবীন্দ্রনাথের আর একখানি চিঠি,—রবীন্দ্রনাথ এতে লিখছেন :

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়েষু

মাঝে মাঝে নিতান্ত দায়ে পড়ে তোমাকে উপরোধপত্র দিতে হয়। তুমি তার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র কোরো না।

যদি বিশেষ কারণে কর্তব্যবোধে তোমাকে কারো জন্য বা কিছুর জন্য অনুরোধ করা আবশ্যক হয়ে ওঠে তবে সে চিঠি কোনো আবেদনকারীর হাত দিয়ে পাঠাব না—সে আমি নিজেই তোমার হাতে পৌঁছিয়ে দেব।

ইতি

৩ মে ১৩৩৪

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এ-চিঠির সঙ্গে মুজতবা আলীর বর্ণিত ঘটনাটির সরাসরি কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা এখন জানার উপায় নেই।...'

বন্ধনীতে উমাপ্রসাদবাবু বিষয়টি আরো স্বচ্ছ করার উদ্দেশ্যে দু'-একটি তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন : "১৯৩৪ সালে আলী সাহেব কায়রো থেকে ফিরে এসে বরদার মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড়ের সহায়তায় বরোদা কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগ দেন। কায়রোতে থাকার সময়েই মহারাজার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানি প্রায় সেই সময়েরই। আর, মেজদা তখন কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সবে উপাচার্য হয়েছেন।)"[৫]

প্রামাণিক তথ্যানুযায়ী মুজতবা আলী ১৯৩৪ সনের শুরুতেই য়ূরোপ চলে যান এবং সেখান থেকে কায়রো। আল-আজহারে প্রায় বছরখানেক অধ্যয়নের পর বরোদার মহারাজার আমন্ত্রণে বরোদা কলেজে অধ্যাপনায় যোগদান করেন ১৯৩৫-এ। সুতরাং উদ্ধৃত পত্রটির সঙ্গে আলী সাহেবের সম্পর্ক আবিষ্কারের প্রচেষ্টা অবান্তর। আবার ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯-এ লিখিত মুজতবা আলীর একটি পত্রে জানা যাচ্ছে, শ্যামাপ্রসাদকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি খোদ্ আলী সাহেবের নিকট থেকেই খোয়া যায়। তিনি জানিয়েছেন, 'থিসিস সমাপ্ত হলে আমি তাঁকে (ডঃ সি. ক্লেমেনকে) একখণ্ড টাইপ্‌ট্ কপি পাঠাই। তিনি খুশী হয়ে আমাকে একটি পত্র লেখেন। (১৯৪৭ সালে আমার ঘর bargled হওয়ার ফলে যে বাক্সে সেটি ছিল সেটা যায়—মায় গুরুদেব, এন্ড্রুজ, পিয়ার্সন, বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, বগদানফ, তুচ্চি, বেনওয়া এবং সর্বোপরি মার্ককলিনস, তথা Winternitz, Levy-এর সার্টিফিকেটসহ, শ্যামাপ্রসাদকে লেখা, আমাকে recommend করে গুরুদেবের চিঠি)।" (প-২৭৫)। এ' সমস্ত তথ্য-প্রমাণ থেকে শুধুমাত্র এটুকুই সুনিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব যে:

ক. রবীন্দ্রনাথ মুজতবা আলীর জন্যে চাকুরির সুপারিশ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছিলেন।

খ. মুজতবা আলীর চাকুরি হয়নি এবং

গ. সুপারিশপত্রটি খোয়া যায়।

বরোদার প্রগতিশীল ও গুণগ্রাহী মহারাজা তৃতীয় সয়াজীরাও ভারতবর্ষের কতিপয় শ্রেষ্ঠ সন্তানকে বরোদার রাজকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯), মৌলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩১), অরবিন্দ ঘোষ (১৮৪৮-১৯৫০), ডঃ আম্বেদকর প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিশর ভ্রমণকালে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মুজতবা আলীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রীত মহারাজ তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন আপন রাজ্যে। ১৯৩৫ সালের শেষার্ধে মুজতবা চাকুরির অভিপ্রায় জানিয়ে পত্র লিখলে মহারাজ তাঁকে বরোদা কলেজে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত করে কাইরো থেকে বরোদা যাওয়ার রাহাখরচ দরাজহস্তে প্রদান করেন।[৬] উক্ত বছরই তিনি চাকরি নিয়ে বরোদা পৌঁছন[৭] এবং ১৯৪৪ পর্যন্ত বরোদা কলেজে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন।[৮] এতো দীর্ঘ সময় অন্য কোথাও তিনি কর্মরত থাকেননি। যুবক মুজতবা প্রাণমন উজাড় করে দিয়ে এ' সময় নিজেকে নানা কার্যে ব্যাপৃত রাখেন এবং এখানে তিনি রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা লাভ করেছিলেন। সদাশয় মহারাজের স্নেহ-প্রীতির কথা আজীবন তাঁর মনে ছিলো সমুজ্জ্বল।—

"রাজপ্রাসাদ আমি পূর্বে দেখেছি। বরোদার স্বর্গত মহারাজ তৃতীয় সয়াজীরাও ... আমাকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর মকরপুরা এবং লক্ষ্মীবিলাস দুই রাজপ্রাসাদে রেখেছিলেন। রাজভোগ খেয়েছি, রাজশয্যায় শুয়েছি, রাজোদ্যানে ভ্রমণ করেছি।"[৯] মুজতবার প্রতি মহারাজার গভীর স্নেহপ্রীতিশ্রদ্ধা এবং মহারাজাকে তিনি যে কতোটা আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন একটি ঘটনা থেকে তার প্রমাণ মেলে। তাঁর সুপারিশে ১৯৩৬ সালে মহারাজ বরোদার 'কীর্তিমন্দিরে' mural painting করার জন্য নন্দলাল বসুকে আমন্ত্রণ জানান। এ' প্রসঙ্গে শ্রীসাগরময় ঘোষকে মুজতবা লিখেছেন, "... এই কীর্তিমন্দিরে নন্দলাল না এঁকে যেন কে এক মহারাষ্ট্রী করমারকর না ধুরন্ধর আঁকেন সেই ছিল সয়াজীরাওয়ের প্যারাদের ইচ্ছা। আমি কমিটিতে জোর dissent জানিয়ে রায় দি। মহারাজ সেইটেই গ্রহণ করেন। আমার মনে কোনো ভয় ছিল না, নন্দলাল will be able to deliver the good; শুধু ভয় ছিল, ঐ সব পাঁটারা যেন কোনো অজুহাৎ ছবিতে না পায়।" (প-৯৮)।

সৈয়দ মুজতবা আলীর বরোদা কলেজে যোগদানের এবং পদত্যাগের সঠিক তারিখ আমাদের জানা নেই। তাঁর রচনাতেও সন-তারিখ এবং তথ্য সংক্রান্ত কিছু বৈপরীত্য ও গরমিল রয়েছে। নিয়মিত রোজনামচা না লেখার ফলেই এমনটি হয়েছে।

১৯৩৯-৪০ সালের Baroda Administration Report (BAR)-এ পাচ্ছি "A seminar for the comparative study of religions was established in 1935. Dr. Ali was placed in charge and two research scholars were appointed under him."[১০] পুনরায় ১৯৪০-৪১-এর প্রতিবেদনে উল্লিখিত, "The seminar which was established in 1935 was reorganised and continued for three years. A committee was appointed to guide the Director. Dr. Ali was continued as Director, was also entrusted with the translation of Mirate-Ahmadi into English."[১১] সুতরাং ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী যে ১৯৩৫ সালে বরোদা বলেজে যোগদান করেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ১৯৪১-৪২ সালের BARএ-ও তাঁর উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী কয়েক বছরের অর্থাৎ ১৯৪২-৪৩, '৪৩-৪৪ ও ১৯৪৪-৪৫-এর প্রতিবেদনে তাঁর প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত। অবশ্য মুজতবা আলী যে ১৯৪৪ সালেও বরোদায় ছিলেন একটি পত্র থেকেও এব প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। মিসেস শান্তি কবির জানাচ্ছেন, "মনে আছে ১৯৪৪ সালে আমরা একবার বরোদা গিয়েছিলাম ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির সাহেবের (হুমায়ুন কবির)এক লেকচারের উপলক্ষে— আলী সাহেবও তখন ওখানে art & culture Dept.-এ একজন অধ্যাপক —কি আনন্দ গল্পগুজবের মধ্যে যে আমাদের দিনগুলো কেটেছিল ...।" (প-২১৯·০২)। বস্তুতঃ বরোদা কলেজটিই ১৯৪৯-এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। হুমায়ুন কবির বরোদা কলেজেই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং ১৯৪৪-এ সেখানেই আলী সাহেবকে দেখেছেন তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে।

প্রাপ্ত তথ্যাবলীর আলোকে বরোদায় মুজতবা আলীর অবস্থানকাল ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করা যায়।

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হলেও বরোদায় মুজতবা আলীর কর্মজগতের পরিধি বিস্তৃত ছিল। ১৯৩৫-৩৬ সনের BAR-অনুযায়ী উক্ত বৎসরে তিনি

'ধর্ম' সম্বন্ধে এগারোটি বক্তৃতা করেন এবং "These were attended by members of the college staff and by about 60 to 70 college students each time." এতদ্ব্যতীত "He gives to Kumar Yashpalsingh six lessons a week in propaganda work. He also delivered a series of lectures to the students of the Secondary Teacher's Training College on religion and education."[১২]

১৯৩৬-৩৭ সালের BAR অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে মুজতবা আলী কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশে সপ্তাহে দুটো ধর্ম সংক্রান্ত বক্তৃতা করেছেন এবং Secondary Teacher's Training College-এর ছাত্রদের উদ্দেশে ধর্ম ও শিক্ষাসংক্রান্ত বক্তৃতামালাও অব্যাহত রেখেছেন। তদুপরি "The proposal for forming a seminar was sanctioned by H. H. the Maharaja Saheb and two fellows were appointed. Dr. Ali is directing the fellows in research work and also delivering lectures to them. Mr. Yashpalsingh attends the seminar lectures and is at present preparing a brochure on 'The life of Muhammad and Islam.' Dr. Ali is also giving four weekly lessons in German language and literature, and one in French conversation. "[১৩] পরবর্তী বৎসরের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে তিনি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। "He has collected material for an exhaustive work on the spiritual history of medieval India, dealing with the Gujrati, Marathi, Hindi, Maithili, and Bengali saints and their followers."[১৪] আমাদের দুর্ভাগ্য, এমন মূল্যবান কাজ সম্পর্কে আর কিছু জানা যাচ্ছে না, সম্ভবত কাজটি তিনি সম্পূর্ণ করেননি—যেমন আরো বহু মূল্যবান গবেষণাকর্মে তাঁর আত্মনিয়োগের বাসনা অকালে পরিত্যক্ত হয়েছে কিংবা অসমাপ্ত থেকেছে প্রধানত আগ্রহের অভাবে।

এ' সময় তিনি সপ্তাহে জার্মান ভাষা ও সাহিত্যের চারটি ক্লাস নেওয়া ছাড়াও বি. এ. ক্লাসে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য পড়াতেন।[১৪]

১৯৩৮-৩৯ সালের BAR-এ দেখা যাচ্ছে যে মুজতবা আলী ফরাসী ভাষার প্রভাষক হিসেবেও কাজ করছেন এবং ১৯৪১-৪২ সালের প্রতিবেদনে উল্লিখিত 'The work of translating Mirate-i-Ahmedi is in progress.'[১৫] আরবী ভাষায় লিখিত গুজরাটের এই ইতিহাস গ্রন্থটির অনুবাদ ও সম্পাদনাও তিনি সমাপ্ত করতে পারেননি। "পরে পাণ্ডুলিপি দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হয়ে যায়।"[১৬]

মোটকথা, বরোদায় মুজতবা আলী অনুকূল পরিবেশ ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। মহারাজ তৃতীয় সয়াজীরাওয়ের চৌষট্টি বৎসরের সুদীর্ঘ শাসনকাল ছিলো সে রাজ্যের সুবর্ণযুগ। ১৯৩৯-এর ৬ই ফেব্রুয়ারি এই প্রজাবৎসল ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজার লোকান্তরে সে-যুগের অবসান ঘটে। অতঃপর তাঁর পৌত্র প্রতাপ সিং গাইকোয়াড় মহারাজার আসনে সমাসীন হলে অবস্থার বেশ কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। পরিবর্তিত পরিবেশ মুজতবা আলীর স্বাধীনতা সম্ভবতঃ অনেকটা খর্ব করেছিলো। এরপরও তিনি বছর পাঁচেক বরোদায় কাটিয়ে ১৯৪৪ সালে কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

০৩.

বরোদার সঙ্গে প্রায় দীর্ঘ নয় বৎসরের বন্ধন ছিন্ন করে বোম্বাই শহরে কিছুদিন অবস্থানের পর ১৯৪৪-'৪৫-এ সৈয়দ মুজতবা আলী কপর্দকহীন অবস্থায় এলেন কোলকাতায়। চাকুরি নেই। জীবিকার্জনের বিশেষ কোনো পথনির্দেশও পাচ্ছেন না। অর্থাভাবে সঙ্গীনাবস্থায় সাময়িকভাবে একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা হলো। অবশ্য আর্থিক নিরাপত্তার স্থায়িত্ব তাঁর জীবনে কখনো আসেনি এবং তার উপাদানও মুজতবা-চরিত্রে অবর্তমান। কর্মহীন অবস্থার একটি রম্য বিবরণ তাঁর রচনায় রয়েছে।

"১৯৪৪-এর কাছাকাছি আমি বে-car (বে-কার) তো বটেই, এবং নির্জলা বেকার। শ্যামপেন বরগণ্ডী মাথায় থাকুন জল এস্তেক জোটে না। মাথার উপরে ছাতখানাও যদি না থাকে তবে ট্যাপই বা কোথায় কুঁজোই বা কই ? কাজেই রাস্তার কল থেকে আঁজলা আঁজলা জল খেতুম। তদভাবে পার্কের পুকুর কিংবা মা-গঙ্গার স্তন্যরসই ছিল আমার সম্বল।

অবস্থা যখন চরমে তখন শ্রীমান কানাই... সরকারের সঙ্গে দেখা। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ... যে আমি তখন (শান্তিনিকেতনের) ইস্কুলের সাহিত্য সভায় বেনামীতে কয়েকটি রচনা পেশ করি। ... মহারাজ শ্রীমান ভজু-কানাই সাহিত্য সভার সেক্রেটারি ...

... আমার রচনা পড়ে ... তার একটা অন্ধ ধারণা হয়ে গিয়েছিল আমি কালে রীতিমত ডাকসাইটে কেউকেডা লেখক হব। তাই দেখা হওয়া মাত্রই আমাকে পকড়কে নিয়ে গেল স্বর্গত সুরেশ মজুমদার মহাশয়ের সমীপে।

আহা! এ-রকম আরেকটি সংবাদপত্র কর্ণধার আমি ত্রিভুবন চষেও পাইনি। ... তিনি আড়নয়নে আমার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই কানাইয়ের দিকে ... কি যেন একটা মুদ্রা দেখালেন। এ রকম বিনা মেহ্নতে আমি কোনো পরীক্ষা পাস করিনি।

"সত্যপীর" ছদ্মনামে সপ্তাহে দুবার দুই কলম, আফটার এডিট লিখতুম।"[১৭]

আসলে আলী সাহেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের কথা শুনে সুরেশচন্দ্র মজুমদারই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এ' প্রসঙ্গে শ্রীযুত কানাইলাল সরকারের বক্তব্য, "... আনন্দবাজার পত্রিকার তৎকালীন স্বত্বাধিকারী শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের অনুরোধে সৈয়দদাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। সুরেশবাবু একটি শর্তে তাঁকে আনন্দবাজারে গ্রহণ করেন। শর্ত হলো, মুজতবা আলীকে অফিসে প্রতিদিন আসতে হবে না। সপ্তাহে একদিন কিংবা দু'দিন এসে তিনি সুরেশবাবুর সঙ্গে গল্প করবেন আর আনন্দবাজারে সপ্তাহে দু'টি কিংবা তিনটি কলাম লিখবেন। ...

..... সুরেশবাবুর অনুরোধে সৈয়দদা হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'-এ রায়পিথৌরা নামেও লেখেন।" (সা-২৭)। তবে বাঙলা পত্র-পত্রিকাই ছিলো মুজতবা আলীর ভাব প্রকাশের বাহন। এবং ' দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'সত্যপীর' তাঁর কলামে লিখেছেন, "... আনন্দবাজার বাঙলা পত্রিকা; অধিকাংশ পাঠক ইংরাজি জানেন না। কাজেই তাঁহারা বহু বিষয়ের রসগ্রহণ করিতে পারেন না। আমি প্রধানতঃ তাহাদিগের সেবা করিতে চাহি বলিয়াই 'আনন্দবাজারে' লিখি। ...

... আমি অত্যন্ত সাধারণ রাস্তার লোক, ম্যান ইন দি স্ট্রীট। দুর্বলতাবশতঃ মাঝে মাঝে পণ্ডিতি করিবার বাসনার উদ্রেক হয়। এবং করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া লাঞ্ছিত

হই।"[১৮] সেই সঙ্গে অযত্নে লালিত মাতৃভাষার প্রতি মুজতবার অকৃত্রিম দরদও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। মাতৃভাষাবিমুখ পল্লবগ্রাহীদের হীনমন্যতার প্রতি বর্ষিত ব্যঙ্গবিদ্রূপ তীক্ষ্ণ সূচিমুখ হয়ে উঠেছে। "...আপনি কেন ভাবেন, আমি বহু ভাষা জানি। যদি জানিতাম তবে ' নেটিভ' বাঙলা ভাষায় লিখিব কেন ? এই দেশের যেই দুই পাতা ইংরিজি পড়িতে পারে সেই চারি কলম ইংরিজি লেখে। আমার কি চিৎ হইয়া শুইবার সখ হয় না ?"[১৯]

সম্ভবতঃ সুরেশ মজুমদারের সঙ্গে মুজতবা আলীর সাক্ষাৎকার ১৯৪৫-এর ঘটনা। কেননা, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় 'সত্যপীর'-এর কলম ১৯৪৫ সনের ১৮ই জুলাই থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রায় একই সময় সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায়-ও তাঁর দু'-একটি লেখা মুদ্রিত হয়। মোটকথা এ' সময় থেকেই সৈয়দ মুজতবা আলী 'কলম'কেই জীবিকার আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তা' ছিলো অব্যাহত। মাঝে মাঝে চাকুরি গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করেছেন। উল্লিখিত পত্রিকাদুটো ছাড়া বসুমতী, সত্যযুগ, মাতৃভূমি, কালান্তর প্রভৃতি দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় লিখে অন্নসংস্থান করেছেন। তবে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর জীবনে কখনো আসেনি এবং সে চেষ্টাও আলী সাহেবের চরিত্রে নির্লক্ষ্য।

০৪.

মুজতবা আলীর চাকুরি জীবনের পরবর্তী অধ্যায় আলোচনার প্রারম্ভে তাঁর একটি মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য।

"একবার ফ্রান্সে ঢোকবার ফর্মে প্রশ্ন ছিল— 'তোমার জীবিকা নির্বাহের উপায় কি?'

উত্তরে লিখেছিলুম, 'কিছুদিন অন্তর অন্তর চাকরি রিজাইন দেওয়া। (রিজাইনিং জব্ ফ্রম টাইম টু টাইম)।'

ফরাসী শুধোলে, 'তাহলে চলে কি করে ?'

বললুম, 'তুমি রেজিগনেশনগুলো দেখছো; আমি জব্‌গুলো দেখছি।"[২০]

বস্তুত ১৯৪৯ থেকে মুজতবা আলী বারংবার ওই কর্মই করেছেন—কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বা অনিচ্ছায়।

১৯৪৯ সনের জানুয়ারি মাসে সৈয়দ মুজতবা আলী বগুড়া আজিজুল হক কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর এখানে আসবার পটভূমিটি মোটামুটি বিস্তৃত এবং মাত্র সাত মাস স্থায়ী অধ্যক্ষ জীবনও বেশ ঘটনাবহুল। এ পদের জন্য কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়নি কিংবা মুজতবাও মফঃস্বল কলেজের অধ্যক্ষ পদের জন্য উমেদার ছিলেন না।

১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। বগুড়া কলেজে ছাত্রদের মধ্যে তখন দুটো দল—একটি সরকার-সমর্থক, অপরটি সরকার-বৈরী। শিক্ষকদের মধ্যেও প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে দুটো দল ছিলো। তাঁরা নানাভাবে ছাত্রদের বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন বলে বৈরী দলটি স্বভাবতঃই ছিলো মুসলিম লীগ বিরোধী। প্রত্যেক দলই স্বমতাবলম্বী অধ্যক্ষের প্রত্যাশী

ছিলেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্ কলেজ পরিত্যাগ করলে বিভিন্ন মহলে অধ্যক্ষ নিয়োগের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

এ' প্রসঙ্গে বগুড়া পৌর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং আজিজুল হক কলেজের প্রাক্তন ছাত্র জনাব জালালউদ্দীন আকবরের বক্তব্য: "১৯৪৬-৪৮ সন পর্যন্ত 'শিল্পায়ন' নামে একটি সংস্কৃতি সংস্থার অস্তিত্ব বগুড়া আজিজুল হক কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে ছিল। এই সংস্থা বগুড়ায় সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দান করতো। শিল্পায়ন দলের সদস্যবৃন্দ প্রগতিশীল দল হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেন। এদের মধ্যে ডঃ প্রীতীশ দত্ত, অধ্যাপক আতাউর রহমান*, এডভোকেট গাজীউল হক* প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়।" (সা-২১)।[২১] অন্যদিকে ১৯৪৮ সনে কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে প্রগতিশীল চিন্তাধারাসম্পন্ন ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান 'ছাত্র ফেডারেশন' জয়ী হয়। তৎকালীন ছাত্রনেতা এবং 'দৈনিক উত্তরবার্তা' পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক জনাব আবদুল মতিন বলেন, "... অনেকের দৃষ্টিতে এই দলটি ছিল কম্যুনিস্টদের সৃষ্ট। অবশ্য এ' কথা অনস্বীকার্য যে, ছাত্র ফেডারেশনের বহু কর্মীর সঙ্গে কম্যুনিস্ট দলের যোগাযোগ ছিল। কেউ কেউ কম্যুনিস্ট দলের সদস্যও ছিলেন। প্রগতিশীল ছাত্রদের পশ্চাতে কয়েকজন সমৃদ্ধতর চিন্তাধারার অধিকারী অধ্যাপক অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। ... তাঁদের পরামর্শ মতোই এ দলের ছাত্ররা চলতেন। অধ্যাপকদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয় অধ্যাপক প্রীতীশ দত্ত, অধ্যাপক আবুল খায়ের আহমেদ, অধ্যাপক ফখরুদ্দীন প্রমুখের। ... কলেজের প্রগতিশীল গোষ্ঠীকে মুসলিম লীগ পন্থীরা কখনো সুনজরে দেখেনি।" (সা-২০)। অধ্যক্ষ নিয়োগ প্রসঙ্গে একই সাক্ষাৎকারে জনাব মতিন উল্লেখ করেছেন, "আমরা এ' ব্যাপারে অধ্যাপক প্রীতীশ দত্তের সঙ্গে আলোচনা করি। আমরা চেয়েছিলাম আবু সঈদ আইউব কিংবা গোপাল হালদারকে অধ্যক্ষ হিসেবে বগুড়া নিয়ে আসতে। কিন্তু আমাদের হাই কমান্ড সেই মুহূর্তে গোপাল হালদারকে নিয়ে আসা সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ হবে না বলে বিবেচনা করেন। আর আবু সঈদ আইউবের বগুড়া আসবার সম্ভাবনা প্রীতীশবাবু সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দেন। তবে ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর আসবার সম্ভাবনার কথা বলেন।" এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখে 'শিল্পায়ন' গোষ্ঠীর পরোক্ষ পরিচালনায় কলেজের ছাত্র সংসদ একটি সাহিত্য সম্মিলনীর আয়োজন করে এবং সভাপতি হিসেবে সৈয়দ মুজতবা আলীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ' প্রসঙ্গে সৈয়দ মুর্তাজা আলী লিখেছেন:

"১২ই ডিসেম্বর সকালে তিনি (মুজতবা আলী) "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা ছিল সারগর্ভ ও তাঁর বিদগ্ধ মনের স্পর্শে অনুরঞ্জিত। ...বিকালে তিনি বক্তৃতা দেন 'ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' সম্বন্ধে। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও বাগ্মিতা শ্রোতাদের অভিভূত করে। পরের দিন তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।"[২১] 'ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' সংক্রান্ত ভাষণটি ছিল ইংরেজীতে। সভার প্রতিবেদনে নিষিদ্ধ 'কলেজ বার্ষিকী'তে সম্পাদকীয় স্তম্ভে ছাত্র-সম্পাদক মুহাম্মদ মমতাজুর রহমান তরফদার লিখেছেন, "...সাহিত্য চর্চা ও সংস্কৃতিগত আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা এবার কলেজ ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি সাহিত্য সম্মেলনীর আয়োজন করেছিলাম। ... প্রধান অতিথি দিনাজপুর কলেজের সুযোগ্য

*এঁরা বগুড়া আজিজুল হক কলেজের প্রাক্তন ছাত্র।

অধ্যক্ষ ডঃ গোবিন্দবাবু বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ, এবং দর্শন ও সমাজ সম্বন্ধে সুন্দর ও গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি সুসাহিত্যিক ডাঃ মুজতবা আলী তাঁর সারগর্ভ অভিভাষণে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের পদ্ধতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করবার পর মন্তব্য করেন যে বাংলা সাহিত্য জনগণের বোধগম্য ভাষায় রচিত হওয়ার দরকার—তবেই উহা সর্বসাধারণের উপযোগী হবে। অতঃপর তিনি ইসলামিক কালচারের অফুরন্ত সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন যে বর্ত্তমান যুগে ইসলামিক সংস্কৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা ও ধনসম্পদের পূর্ণ-বণ্টন—এই দুটী উদারনৈতিক আদর্শের বলেই ইসলাম একসঙ্গে সিরিয়া, ইরাক, ট্রান্সজর্ডান, স্পেন, মিশর, পারস্য ও অন্যান্য দেশে প্রসার লাভ করেছে। এ যুগের মুসলমানদের এই দুটী ইসলামিক নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। মুসলীম কালচারের সত্যিকার অনুসরণকারী বর্তমান যুগের কম্যুনিজমের চ্যালেঞ্জকে নির্ভীক বীরের মতোই গ্রহণ করে দেখাতে পারে যে ইসলাম মানব সমাজকে বর্ত্তমান জগতের অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় হতে রক্ষা করতে পারে।"[২২]

মুজতবা আলীর অসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, মনীষা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতায় অভিভূত ছাত্র-সমাজ কলেজের ঐতিহ্যানুযায়ী একজন 'ডক্টরেট' ডিগ্রিধারী অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য দাবী জানালেন। ইতিপূর্বে বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন যথাক্রমে :

১. ডঃ এম. এম. মুখার্জী : কার্যকাল ১লা আগস্ট ১৯৩৯-সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।
২. ডঃ কে. পি. মুখার্জী : কার্যকাল ২রা অক্টোবর ১৯৩৯-ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪।
৩. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : কার্যকাল জুলাই ১৯৪৪-অক্টোবর ১৯৪৮।

ছাত্রসমাজ অধ্যক্ষ নিয়োগের দাবীতে সুস্পষ্টভাবে ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর নাম প্রস্তাব করতেও কোনোরকম দ্বিধা করেননি।

স্থানীয় মুসলিম লীগ-পন্থীরা অধ্যক্ষ হিসেবে মুজতবা আলীর নিয়োগের দাবী সমর্থন করেননি। "যখন কর্তৃপক্ষ অনমনীয় ভাব ধারণ করলেন, তখন বাধ্য হয়ে আমরা আমাদের পছন্দমতো অধ্যক্ষ নিয়োগের দাবীতে ধর্মঘট আহ্বান করি। ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করেন এবং সৈয়দ মুজতবা আলীকে অধ্যক্ষ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অর্থাৎ মুজতবা আলীকে একটা আন্দোলনের মাধ্যমে কলেজে আনা হয়। ... তাঁকে আনবার দায়িত্ব অধ্যাপক প্রীতীশ দত্ত গ্রহণ করেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ... লীগ-পন্থীরা তাঁকে আনবার বিরোধী হলেও বগুড়ার তদানীন্তন মুসলিম লীগের সেক্রেটারি এবং কলেজ 'গভর্নিং বডির' সেক্রেটারি (মরহুম) আবদুস সাত্তার তরফদার ছাত্রদাবীর সপক্ষে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন।" (সা-২০)। তাঁরই পরামর্শে অধ্যাপক প্রীতীশ দত্ত দু' জন ছাত্রনেতাসহ কোলকাতায় যান এবং মুজতবা আলীকে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করতে সম্মত করেন (সা-১৬)। "তবে একটি শর্ত তিনি আরোপ করেন। সেটি হচ্ছে—তিনি অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করবেন কিন্তু অর্থ সংক্রান্ত দায়িত্ব বহন করতে পারবেন না। মুজতবা আলী যতদিন অধ্যক্ষ ছিলেন, ততদিন কলেজের অর্থসংক্রান্ত দায়িত্ব অধ্যাপক গোলাম রসুল পালন করেন।"(সা-২১)। আমাদের অনুমান, বগুড়ায় সাহিত্য সম্মিলনীতে এসে তিনি পূর্বাহ্ণেই কলেজের

অর্থসংক্রান্ত অবৈধ কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন।

মুজতবা আলী একটা বৈরী পরিবেশের মধ্যেই বগুড়ায় পদার্পণ করেন। প্রথমতঃ সরকারি দল ও কর্তৃপক্ষের মনোভাব তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলো না। অধ্যাপকমণ্ডলীর একাংশ-ও মুজতবার আগমনে প্রীত হননি ব্যক্তিগত স্বার্থ-হানির আশঙ্কায়। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও আমূল পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, রাজশাহীর নাচোল, বগুড়ার ভাতকোট প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠছে। সশস্ত্র আন্দোলনের তরঙ্গে সর্বত্র কিছুটা কাঁপন লেগেছে। ফলে শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কিত। নবোদ্ভূত আন্দোলনকে সূতিকাগারেই নির্মমভাবে নিষ্পেশনে তারা বদ্ধপরিকর। পুলিশী নির্যাতন রুদ্র রূপ পরিগ্রহ করে এবং 'কম্যুনিস্ট' দমন ও 'কম্যুনিজম' প্রতিরোধের নামে তখন থেকেই এক বীভৎস বর্বরতার সূচনা। কম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্ররা আত্মগোপন করায় কলেজের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র ছিন্ন হলো। তাদের সমর্থক অধ্যাপকবৃন্দও পড়লেন বিপাকে। ফলে মুজতবা আলী কলেজে এসে একটা বিরূপ পরিবেশের শিকার হলেন। কলেজের বহু দুর্নীতির কথা তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিলো। এজন্যে অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেও হিসেবপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে না দেয়ার জন্যে তিনি কোন কাগজপত্রে স্বাক্ষর দানে বিরত থাকেন। এতেও স্বার্থান্বেষী মহলের ক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ নিহিত। বহুদিন থেকেই এ মহল কলেজের অর্থে নধরকান্তি লাভ করেছে। জনাব জালালউদ্দীন আকবরের অভিমত : "বগুড়া কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে যাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন কোলকাতা মহামেডান স্পোর্টিং-এর এককালীন খ্যাতিমান ফুটবল খেলোয়াড় জনাব আব্বাস মির্জা। তিনি তখন বগুড়ার ডিস্ট্রিক্ট্ কন্ট্রোলার অব ফুড। 'শিল্পায়ন' গোষ্ঠীর আড্ডা বসতো মির্জা সাহেবের বাড়ির উল্টো দিকেই। তিনি মধ্যে মধ্যে সেই আড্ডায় আসতেন। মির্জা সাহেব আশ্বাস দিলেন, বিজ্ঞান বিভাগ খোলার ব্যাপারে তিনি সাহায্য করবেন। এই উদ্দেশ্যে তৎকালীন ডি.এম. সাহেবের অনুমতি নিয়ে খাদ্যদ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত সামান্য Tax বসিয়ে তিনি ডিলারদের নিকট থেকে টাকা সংগ্রহ করে কলেজ কর্তৃপক্ষকে দেন।" (সা-২১)। জনাব আবদুল মতিন 'কর্তৃপক্ষের' মুখপাত্রদের মুখোস উন্মোচন করতে গিয়ে অত্যন্ত অপ্রিয় সভ্যভাষণে বলেন, "আসল কথা, ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের আমলে কলেজের উন্নতির জন্যে তৎকালীন ডি. এম. সাহেবের অনুমোদনক্রমে টিনের ওপর বান্ডিল প্রতি অতিরিক্ত দু' টাকা কর ধার্য করা হয়েছিলো। সে-টাকা কলেজফান্ডে জমা হতো। ফান্ড বেশ স্ফীত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে-টাকার যথাবিহিত হিসেব সংরক্ষিত হয়নি। তার একটা বড় অংশ কলেজ কর্তৃপক্ষের চাঁইদের পেটে যায়। ... বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে দু' জন অধ্যাপককে কোলকাতায় পাঠানো হয়। তাঁদের একজন আর ফিরে আসেননি। সে-সঙ্গে টাকা বা যন্ত্রপাতিও বগুড়ায় আর পৌছায়নি। এমনি ধরনের বহু অঘটন কলেজে ঘটেছে। সুতরাং হিসেব বোঝার চেষ্টা করলে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনেকেই এসব অপকর্মের দায়ে অভিযুক্ত হতেন। কাজেই তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন, কৌশলে মুজতবা আলীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে কলঙ্কের বোঝা থেকে আত্মরক্ষা করতে। কিন্তু তিনি তা' করেননি। স্বার্থহানির কারণেই

একদল তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন এবং অধ্যক্ষ সাহেবকে বগুড়া থেকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে হীন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছিলেন।" (সা-২০)।

বগুড়ার তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মুজতবা আলীর মধ্যমাগ্রজ সৈয়দ মুর্তাজা আলী। অধ্যক্ষের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বাড়ি না থাকায় মুজতবা আলী বগুড়ায় এসে তাঁর সহোদরের বাড়িতেই ওঠেন।

নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করায় সৈয়দ মুর্তাজা আলীর স্মৃতিচারণে উল্লিখিত— "যে সকল অধ্যাপক নিজ খেয়াল-খুশিমতো কলেজে গমনাগমন করতেন তাঁরা মনে মনে অসন্তুষ্ট হন। তাঁদের অবাধ স্বচ্ছন্দ বিচরণে নতুন অধ্যক্ষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর (মুজতবা আলীর) উদার ধর্মমতের জন্য গোঁড়া মুসলমানেরা আমার ভাইকে সুনজরে দেখতেন না।"[২৩] অতঃপর শুরু হলো মুজতবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পালা। কলেজের জনৈক প্রবীণ অধ্যাপক প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্রদের পরিচালনা করতেন। অধ্যক্ষকে তাড়াতে সমর্থ হলে কলেজের সার্বিক কর্তৃত্ব তাঁর হাতে আসবে—এই প্রলোভনে বগুড়ার মুসলিম লীগ-পন্থী একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী বাড়ির সমর্থন ও সহযোগিতায় উক্ত অধ্যাপক আলী সাহেবের বিরুদ্ধে এক জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত হন। পরবর্তী কোনো অধ্যক্ষই এর চক্রান্ত-জাল থেকে পরিত্রাণ পাননি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি বগুড়া কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল হতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে চক্রান্তের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে জনাব জালালউদ্দীন আকবর বলেন, "এ সময় ফিজিক্সের অধ্যাপক হিসেবে কোলকাতা থেকে অমলবাবুকে (সঠিক নামটা মনে পড়ছে না) মুজতবা সাহেব বগুড়ায় নিয়ে আসেন। পরীক্ষায় নকল করার অপরাধে অমলবাবু জনৈক গোলাম ফেরদৌসকে পরীক্ষাকক্ষ থেকে বহিষ্কার করেন। ক্রুদ্ধ গোলাম ফেরদৌস কলেজের বাইরে অমলবাবুকে প্রহার করে। এ' ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে মুজতবা আলী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। ...এরপর গোলাম ফেরদৌস ও অন্যান্যরা অধ্যক্ষের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করে পোস্টার লাগাতে থাকে।" (সা-২১)। ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকেও কাজে লাগাতে এরা বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেনি, 'তার প্রমাণ রয়েছে কলেজের তৎকালীন 'প্রবীণ অধ্যাপক' জনাব আবদুল ওয়াদুদের সাক্ষাৎকারে :

"বগুড়া কলেজে তখন শিক্ষকদের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু ছিলেন। এদের অনেকেই অধ্যক্ষ সাহেবকে পরিবৃত করে রাখতেন। নানাভাবে তাঁকে প্রভাবিত করতে চাইতেন। শান্তিনিকেতনী প্রভাবে হিন্দু আচার-আচরণ তাঁর (অধ্যক্ষের) মধ্যে ছিল। যেমন হঠাৎ করে বলে ফেলতেন 'মা কালী রক্ষা করিস'। মুসলমানদের মধ্যেও তাঁর বিরুদ্ধ মনোভাব স্পষ্ট ছিল।" (সা-২২)।

এ' দল প্রথমাবধিই মুজতবা আলীকে অধ্যক্ষপদে নিয়োগের বিরোধিতা করেছিলেন। সুতরাং এঁদের পক্ষে আলী সাহেবকে অপদস্ত করার প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যাঁদের ভরসায় কিংবা আগ্রহাতিশয্যে তিনি কোলকাতা ছেড়ে মফঃস্বল শহরে এসেছিলেন, তাঁরাও ক্রমশঃ আলী সাহেবের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠতে থাকেন। সম্ভবতঃ এঁরা চেয়েছিলেন, তাঁদের সমর্থন ও প্রচেষ্টায় আগত অধ্যক্ষ সর্বদা তাঁদের পরামর্শানুযায়ী

কলেজ পরিচালনা করবেন কিংবা কলেজের যাবতীয় নীতিনির্ধারণী বিষয়ে তাঁদের বুদ্ধি-পরামর্শে অবিচলিত প্রশ্নবিহীন আস্থা রাখবেন। এঁদের অবচেতন মনে হয়তো এমন একটা বিশ্বাসও জন্মেছিল যে, অধ্যক্ষ পদ দান করে এঁরা আলী সাহেবের প্রতি যথেষ্ট অনুকম্পা তথা অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং অধ্যক্ষকে তাঁদের নির্দেশমতোই কলেজ পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু মুজতবা আলী সে চরিত্রের লোকই ছিলেন না। তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন যে যোগ্যতার নিরিখেই অধ্যক্ষ পদ লাভ করেছেন এবং স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনার সাহায্যেই তাঁকে কলেজের দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে—অন্যের ভরসায় নয়। সুতরাং অচিরেই "প্রশাসনিক গাফিলতির জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রদের কলেজ-পরিচালনা নীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতার অভাব" পরিলক্ষিত হতে থাকে। (সা-১৬)। অকস্মাৎ এঁদের দৃষ্টিতে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে মুজতবা চরিত্রের বিবিধ ত্রুটি। যেমন, "...শিক্ষকদের সঙ্গে ব্যবহারে সর্বদা শিক্ষকসুলভ আচরণ করতে পারেননি। হয়তো চেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে দিয়েই অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলছেন—যা' একজন শিক্ষকের পক্ষে আচরণীয় নয়। এবং তাঁর মদ্যাসক্তি ছিলো যথেষ্ট।" (সা-১৭)।

মুজতবা আলীর বগুড়া আগমনের পূর্ব থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের বীজ দানা বাঁধতে থাকে। সৈয়দ মুর্তাজা আলী আত্মকথায় লিখেছেন, "বগুড়ায় চাকরিতে যোগ দিয়ে (১৯৪৮ সালে) দেখলাম সরকারি উকীল জনাব হবিবুর রহমান (বর্তমানে রেঙ্গুনে রাষ্ট্রদূত) প্রমুখ অনেকে ইংরীজী দরখাস্তেও বাংলা ভাষায় নাম দস্তখত করেন। তাঁদের কাউকে জিজ্ঞেস করা হলে ... বললেন যে, শুধু ব্যাংকের চেক্ লেখা ছাড়া অন্যত্র তাঁরা বাংলা অক্ষরেই নাম দস্তখত করেন। শুনতে পেলাম আমার পূর্ববর্তী এক উর্দুভাষী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরবী হরফে তাঁর নাম দস্তখত করতেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বাঙালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বাংলায় নাম দস্তখত শুরু করেন।"[২৪]

ভাষা বা শিক্ষাসংক্রান্ত আলোচনা মুজতবা আলী উচ্চকণ্ঠেই করতেন। মজলিশি আলাপ আলোচনায় তাঁর মুসলিম লীগ বিরোধী মনোভাবও কখনো অপ্রচ্ছন্ন থাকেনি। ইতিপূর্বে ৩০শে নভেম্বর, ১৯৪৭-এ সিলেটের মুসলিম সাহিত্য সংসদ আয়োজিত আলোচনা সভায় 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে 'উর্দুপ্রেমী'দের হাতে তাঁকে নাজেহাল হতে হয়েছিলো। এটিই ১৯৪৮-এ নিবন্ধাকারে কোলকাতার 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অধুনা কেউ কেউ এ' প্রবন্ধটিকেই তাঁর বগুড়া ত্যাগের কারণ[২৫] বলে নির্দেশ করলেও উক্ত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদারের বিবেচনায় 'এ কথাটি রীতিমতো after thought' (প-২১৫); তবে তাঁর বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীলদের মনঃপূত হতো না। তাঁকে পাকিস্তানবিরোধী প্রমাণ করবার জন্যে তারা উপকরণ যোগাড় করতে শুরু করলো। এবং মুজতবা আলীও কয়েক মাসের মধ্যেই বগুড়া কলেজে অনেকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে জনাব আদুল মতিনের অভিমত: "মনে হয়, তাঁদের (অধ্যাপকদের) মধ্যে মুজতবা আলী ঠিক যে স্তরের মেধামনীষা প্রত্যাশা করেছিলেন, তা পাননি। অধ্যাপকবৃন্দও এক ধরনের সংকীর্ণতায় ভুগতেন। পরিণামে অধ্যক্ষের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এঁদের কেউ কেউ

মুজতবার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হন।" (সা-২০)। ক্রমেই তিনি বৈরী পরিবেশে অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। মুজতবার বিরুদ্ধে অভিযোগ—তিনি কম্যুনিস্ট, পাকিস্তান-বিরোধী, কোলকাতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, নিয়মিত ক্লাস নেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ডামাডোলের মধ্যে 'কলেজ বার্ষিকী' প্রকাশ যেন মুজতবাবিরোধী মহলে ঘৃতাহুতি হলো। বার্ষিকীর একটি নিবন্ধে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের তথা ক্ষমতাসীন লীগ সরকারের কঠোরতম সমালোচনা করা হয়। পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন এবং রচনা নির্বাচনপর্ব পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিলো। মুজতবা আলী কলেজে যোগদানের পর বার্ষিকীটি প্রকাশিত হয় এবং প্রথানুযায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর একটি আশীর্বাণী তাতে স্থান লাভ করে এবং সেটি কবিতায়। ক্ষুব্ধ লীগপন্থীরা বার্ষিকী প্রকাশের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব অধ্যক্ষের স্কন্ধে চাপিয়ে তাঁকে অপদস্থ করার চেষ্টা করে। উক্ত প্রবন্ধে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি অশোভন মন্তব্য ছিলো। প্রবন্ধটির জন্য শুধুমাত্র অধ্যক্ষকেই নয়, যেহেতু তিনি ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেটের সহোদর এবং একই নিবাসে অবস্থান করছিলেন, সেজন্যে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে ডি.এম. সাহেবকেও জড়ানো হয়। পরিণতিতে সৈয়দ মুর্তাজা আলীর পদাবনতি এবং অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে চট্টগ্রাম গমন। এ' প্রসঙ্গে কলেজ বার্ষিকীর তৎকালীন ছাত্র-সম্পাদক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক (প্রয়াত) ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার : "কলেজ ম্যাগাজিনটিকে কয়েকজন মুসলিম লীগ কর্মী সেকালের প্রধানমন্ত্রীর কাছে হাজির করেন। ফলে ডঃ আলীর বড় ভাই, বগুড়ার ডি. এম. মুর্তাজা আলীকে সরিয়ে এ. ডি. এম. হিসেবে চট্টগ্রামে পাঠানো হয় এবং ম্যাগাজিনের শিক্ষক-সম্পাদক প্রফেসর গোলাম রসুলের চাকুরি যায় এবং বেশ কিছুদিন তাঁকে চাকুরিবিহীন অবস্থায় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সে-কালের আরেক শিক্ষক, অধ্যাপক প্রীতীশ দত্তের উপরেও হামলা আসে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি নির্বাচনের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না—এই মর্মে আমি ছাত্র-সম্পাদক হিসেবে ড: তরফদার একটি লিখিত বিবৃতি দিলে তিনি রেহাই পান। ডঃ মুজতবা আলী এই ডামাডোলের মধ্যে প্রায় আট-নয় মাস চাকুরি করার পর ১৯৪৯-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে কলেজ ছেড়ে চলে যান। যদি কলেজে থাকতেন, তবে বোধ হয় ভাগ্যে তাঁর নিগ্রহ জুটত। ... ম্যাগাজিনটি ... চোখের পলকে বাজেয়াপ্ত করা হয়।" (প-২১৫)। অধ্যাপক আবদুল ওয়াদুদেরও এ বিষয়ে অভিন্ন মত—"তাঁকে (মুজতবা আলীকে) পালিয়ে বগুড়া ত্যাগ করতে হয়। অন্যথায় তাঁর গ্রেফতার হওয়ার একটা আশঙ্কা ছিল।" (সা-২২)।

'নিষিদ্ধ' কলেজ বার্ষিকীতে[২৬] মুদ্রিত অধ্যক্ষের বাণী :

অবতরণিকা–

কত না সাহিত্যরথী, কবি, শিল্পী কত গুণী জ্ঞানী
বিজয় পতাকা তুলি কত লক্ষ বিদ্যা-অভিমানী
ঘর্ঘরিয়া চলিয়াছে—জয়রথ করে দিগ্বিজয়
দিকে দিকে, দিশে দিশে। বিশ্বজন গায় জয় জয়—

প্রতিধ্বনি আসে তার বগুড়ারো নিভৃত প্রান্তরে।
তাইতো বিস্ময় মানি, কী সাহস ধরিয়া অন্তরে
ক্ষুদ্র এই বিদ্যালয়, ক্ষুদ্রতর তার সাহিত্যিক
বাজায় বিজয়ডঙ্কা ঘন ঘন। হেরো, দিগ্বিদিক্
জ্ঞানশূন্য! নাই কি রে ভয় ? জানিস্‌নে এ-সংগ্রামে
সর্বশেষ রক্তবিন্দু দিতে হয় যে-ই রণে নামে ?
তাইতো বিস্ময় আমি মানি
তরুণের স্পর্ধা দেখে, তবে মনে জানি আমি জানি
হোক না গঙ্গার স্রোত খরতর, হোক না পদ্মার
বিশাল বিপুল বক্ষ, তবু যারা করতোয়া মা'র
মাতৃস্তন্য করে পান—জানে তারা ক্ষুদ্রের মহিমা
দীনের বৈভববিত্ত। ফোটায়েছে, হেরো, শ্যামলিমা
ভানুমতী মন্ত্র দিয়ে গণ্ডীমাঝে যে-লীলা ভঙ্গীতে
তেমনি মুখর হোক এ-অঞ্চল এ-'পত্র'-সঙ্গীতে।

মালতীনগর। ১৫/৩/৪৯ সৈয়দ মুজতবা আলী

যে-নিবন্ধটির জন্য কলেজ-বার্ষিকীটি বাজেয়াপ্ত করা হয়, অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ নিগৃহীত হন—তার শিরোনাম 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের কর্ত্তব্য'; লেখক : মোঃ মতিয়র রহমান (তৃতীয় বর্ষ, বগুড়া মেডিক্যাল স্কুল)। রচনাটির শেষে উল্লিখিত হয়েছে 'বগুড়া কলেজে অনুষ্ঠিত পূর্ব্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মিলনীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত'। প্রবন্ধটির উদ্ধৃতাংশ থেকে ক্ষমতাসীন দলের মর্মজ্বালা ও উষ্মার হেতু উপলব্ধ হবে।

"... যে ছাত্র সমাজ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম কাতারের সৈনিক ছিল, সেই ছাত্র সমাজ পূর্ব্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতাদের কাছে যে ব্যবহার লাভ করেছে তা' ছাত্র সমাজের কলজের রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে। গত এক বছর ধরে ছাত্রদের গুলি, লাঠি চালিয়ে বিনা বিচারে ছাত্রদের জেলে আটক রেখে, নেতাদের মতে 'অবাঞ্ছিত' ছাত্রদের কলেজ থেকে রাজ-টিকেট (রাষ্টিকেট) করে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমউদ্দীন ছাত্রদের 'একাগ্রচিত্তে পাঠাভ্যাসে' লিপ্ত থাকতে উপদেশ দিচ্ছেন।

... ১৯৪৮ এর ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনমতকে পদদলিত করে উর্দ্দুকে রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করা হলো। ছাত্রসমাজ এই অন্যায় মাথা পেতে নিতে পারেনি, তারা এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ...।

প্রাথমিক শিক্ষা

... পূর্ব্ব পাক সরকার বহু জেলায় প্রাথমিক স্কুলগুলি কমিয়ে দিচ্ছেন ... প্রাথমিক শিক্ষকরা যে সভ্যজগতের জীব তা' হয়তো তাদের বেতনের কথা শুনে বিশ্বাস করা যাবে না। ...অনাহারের তাড়নায় আত্মহত্যা করেছেন প্রাথমিক শিক্ষক—যার ফলে সরকারী প্রেস-নোট বলে প্রাথমিক শিক্ষকরা রাতারাতি কমিউনিষ্ট হয়ে পড়েছে।

উচ্চশিক্ষায় সরকারের গাফিলতি

... পাকিস্তানকে গড়তে হলে—ডাক্তার চাই, ইঞ্জিনিয়ার চাই, বৈজ্ঞানিক চাই, হাজার হাজার বক্তৃতা দেন খাজা নাজিমুদ্দীন, লিয়াকত আলী থেকে শুরু করে পূর্ব্ববঙ্গের নুরুল আমিন, বাহার সাহেব, এমনকি চুনোপুটি মন্ত্রী মফিজউদ্দীন পর্য্যন্ত তাই বলেন।

... ছাত্র-যুব সমাজের এই অসহনীয় অবস্থার প্রতিকার চাওয়ায় নেতারা গত এক বছর ধরে ছাত্রদের পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছেন। ছাত্রেরা আখ্যা পেয়েছে 'পঞ্চম বাহিনী' ও 'রাষ্ট্র দুশমন' বলে। পাকিস্তানের উজীরে-আজম লিয়াকত আলী ... বলেছেন যে "পাকিস্তান অর্জনে ছাত্রসমাজ সাহায্য ও ত্যাগ করেছেন সেজন্য আমি তাদের প্রশংসা করি কিন্তু এখন তাদের উচিত রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে মনোযোগ দিয়ে লেখা-পড়া করা।" ছাত্ররা রাজনীতি ছাড়তে পারে কিন্তু রাজনীতি ছাত্রদের ছাড়ে না। ...

সংগ্রাম শেষ হয়নি

পূর্ব্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজের স্বাধীন, সুখী, গণতান্ত্রিক পাকিস্তান গড়ার আদর্শ আজও পদদলিত। আজও পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হয়নি। ... গত ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনকে ধাপ্পাবাজী দিয়ে আজ পূর্ব্ব পাকিস্তানের, পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসীদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে—ইহা কি স্বাধীনতা? ...

... ছাত্ররা আজ বুঝতে পেরেছে তাদের সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি—হতে পারে না যতদিন দেশের অগণিত জনগণ মানুষের মত মানুষ হয়ে দাঁড়াতে না পারবে। আজ ছাত্র সমাজকে লড়তে হবে ওয়াদা পূরণের জন্য, দেশের তথাকথিত নেতাদের 'হোয়াইট হাউস'কে ভেঙ্গে চুরমার করে স্বাধীন, সুখী গণতান্ত্রিক পাকিস্তান গঠন করতে।"

এ' প্রবন্ধ পাঠে উত্তেজিত স্থানীয় মুসলিম লীগাররা কয়েকজন দলীয় ছাত্রনেতাসহ পত্রিকা সমেত ঢাকা গিয়ে উল্লিখিত 'চুনোপুটি' শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে অনতিবিলম্বে কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। চক্রান্তের আভাস পেয়ে গ্রেফতার এড়ানো এবং সম্ভবতঃ সরকারি চাকুরে নিরপরাধ মধ্যমাগ্রজকে বাঁচানোর জন্যে মুজতবা আলী রাত্রির অন্ধকারে সকলের অলক্ষ্যে কোলকাতার উদ্দেশে বগুড়া ত্যাগ করেন। ফলে তিনি চাকুরিচ্যুত হন। অর্থাৎ তাঁকে বরখাস্ত করার দায় সরকারকে বহন করতে হয়নি—অনুপস্থিতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই তিনি কর্মচ্যুত হন এবং শিক্ষাবিদের 'স্বাধীনতায়' হস্তক্ষেপের কলঙ্ক থেকে সরকারও অব্যাহতি লাভ করে!

নথিপত্রের হিসেবে ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৪৯ সনের ৮ই আগস্ট পর্যন্ত বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার পালন করেন।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী উল্লিখিত বগুড়া-চক্রান্তের বিবরণে লিখেছেন, "এ সকল ষড়যন্ত্রের কথা আমি কিছুই জানতাম না। হঠাৎ স্পেশাল মেসেনজার মারফত আমার কৈফিয়ত তলব করা হলো। আমার অপরাধ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করা। এই সভা স্থানীয় এডওয়ার্ড লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে ডাকা হয়েছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন মুজতবা আলী।"[২৭]

ডি. এম. সাহেবকে 'কারণ দর্শানোর' গোপন পত্র :২৮

Office of the Commissioner,
Rajshahi Division,
Rajshai, the 20th June, 1949

SECRET

D. O. No. 1133 C–

Dear Mr. Ali,

This has reference to the Bogra Aziz ... College Magazine for the year 1948-49, about ... received a communication from the Government ... from which is given below :—

"There is a foreword in poem in B ... Principal of the college, Syed Muztaba Ali ... contains objectionable articles in Bengali ... the Bengali article by Matiur Rahman (Bog ... ca ... School) contains not only anti-Pakistan ... seditious matter and excites the student community against the officers of Government but also a veiled attack on the .... Quicid-i-Azam."

In this connection certain allegations have been made against you the substance of which is contained in the following extract of the above mentioned Government communication :—

"The Principal of the College is a brother of the District Magistrate of Bogra and lives with him. It is alleged that on the day on which the general strike was declared by the East Pakistan Muslim Student's League the District Magistrate was requested by a section of the students to see that those who wanted to attend the College were not ... from doing so by the strikers and his attention was invited to the statement made in that connection by the Hon'ble the Prime Minister. It is alleged the district Magistrate replied that he could not interfere in that matter and expressed the view that H. P. M. had no business to issue such a statement. It is further alleged that when the district Magistrate was invited to preside over the Iqbal Day by a certain organisation he declined to do so but on the contrary attended a Rabindra Jayanti organised by another society."

As regards action to be taken against the college Authority in connection with publication of the article in the Bogra Azizul Huq college Magazine, a communication from the Education Department will be received shortly.

You are requested to let me have your report in duplicate immediately regarding the Magazine and also the allegations which have been made against you.

The special messenger who is carrying ... will wait for your reply which should ... second July.

S. M. Ali, Esqr, Y ....
District Magistrate ....
Bogra.

সৈয়দ মুজতবা আলীর অসাধারণ অধ্যাপনা-নৈপুণ্য সম্বন্ধে তাঁর স্বপক্ষ-বিপক্ষ সকলেই ছিলেন অভিন্নমত। অনার্স ক্লাসে তিনি অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বগুড়া কলেজে মুজতবা ইংরেজী, বাঙলা সাহিত্য এবং ইতিহাস পড়াতেন। জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রেই ছিলো তাঁর অবাধ স্বচ্ছন্দ বিচরণ। অধ্যাপক মুজতবার মূল্যায়নে ডঃ প্রীতীশ দত্ত :

"ক্লাস (মুজতবা) ঘড়ি ধরে নিতেন। ঢুকতে বা বেরুতে এক মিনিটও বিলম্ব হতো না—ঠিক যেন জার্মান প্রফেসার। শিক্ষকতায় যে চারটি গুণ দরকার—বপু, বচন, বিদ্যা ও বুদ্ধি—তার প্রত্যেকটি পুরো মাত্রায় তাঁর মধ্যে ছিল।" (সা-১৬)।

মুজতবা আলী প্রচলিত প্রথানুযায়ী ক্লাসে পড়াতেন না। বিষয়বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাচ্যাতিরিক্ত কবির যে বক্তব্য কিংবা কবি যে অলৌকিক জগতের সন্ধান দিতে চাইতেন, তিনি ছাত্রদের সেই জগতে নিয়ে যেতে প্রয়াস পেতেন। তিনি সচেতন ছিলেন যে, তাঁর ক্লাসে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্ররা উপস্থিত রয়েছে। সুতরাং বক্তৃতাও হতো সেই স্তরের। 'কিন্তু মুজতবার দুর্ভাগ্য, তাঁর ছাত্ররা স্কুলের স্তর অতিক্রম করলেও ডঃ আলীর প্রজ্ঞামথিত বক্তৃতা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা অনেকের ছিলো না। ... তাঁর ক্লাসে বাইরে থেকেও ছাত্ররা আসতো। বিস্ফারিত নেত্রে বিমুগ্ধ হয়ে বক্তৃতা শ্রবণ করতো। কিন্তু সকলের নিকট বিষয়বস্তু স্বচ্ছ হতো না। আসলে তারা চাইতো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সহজ পন্থা, আর মুজতবা তাদের নিয়ে যেতেন রসের রাজ্যে। ফলে কিছু কিছু ছাত্রের মনে হয়েছে তিনি ভালোভাবে পাঠদান করছেন না। একই কবিতা পড়াচ্ছেন তিন মাস ইত্যাদি। এ ধরনের মন্তব্য সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর শ্রুতিতে এলে গভীর রসজ্ঞানের অধিকারী চৌধুরী সাহেব বলেছিলেন যে, মুজতবা আলী বিচরণ করেন কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে এবং যারা তাঁর কাছে আসে তারা নেহায়েতই সমতল ভূমির প্রাণী। সুতরাং উভয়েই পরস্পরের নিকট অপরিচিত থেকে যাচ্ছে। মুজতবা আলীও এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমি পথনির্দেশ করি এবং বই পড়া শুরু করি। সমাপ্ত করার দায়িত্ব ছাত্রদের, আমার নয়।" (সা-২০)। অপূর্ব ভঙ্গিমায় সরস বাক্‌ভঙ্গী সহযোগে এবং সুচয়িত শব্দাবলী প্রয়োগে তিনি পাঠ্যবস্তুকে সরস ও মনোহারী করে তুলতেন। দীর্ঘদিন একই কবিতা পড়ালেও কখনো ছাত্রদের মনে হয়নি যে তিনি ফাঁকি দিচ্ছেন কিংবা একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। (সা-২১)। প্রাক্তন ছাত্রদের এমনি উপলব্ধি মুজতবা আলীর শিক্ষকজীবনের সার্থকতার নির্দেশক।

০৫.

বগুড়ায় মাস সাতেক অধ্যক্ষ পদে থেকে কোলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর মাস ছয়েকের জন্য মুজতবা আলী পুনরায় বেকার হয়ে পড়লেন। অতঃপর মাত্র মাসিক দুশো টাকা বেতনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে অস্থায়ী খণ্ডকালীন প্রভাষক (Part time lecturer) নিযুক্ত হন। কার্যকাল মাত্র চারমাস—১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০ থেকে ৩১ শে মে, '৫০ পর্যন্ত।[২৯]

সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি স্থায়ী চাকুরির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর শুভানুধ্যায়ীরা অবহিত ছিলেন। তাঁর বন্ধু হুমায়ুন কবির তখন ভারতের কেন্দ্রীয়

সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এবং মৌলনা আবুল কালাম আজাদ শিক্ষামন্ত্রী। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতিগত ভাবের আদান-প্রদান ও সুসম্পর্ক স্থাপনের অভিপ্রায়ে নবগঠিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স', সংক্ষেপে 'আই. সি. সি. আর.'-এর জন্যে মৌলানা আজাদ একজন সুযোগ্য লোকের সন্ধানে ছিলেন। হুমায়ূন কবির তাঁকে বহু ভাষাবিদ মুজতবা আলীর কথা বলেন। মৌলানা সাহেব কোলকাতা এলে মুজতবা তাঁর সঙ্গে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। মৌখিক আলাপে সন্তুষ্ট হয়ে মৌলানা তাঁকে আই. সি. সি. আর.-এর সচিব পদে নিযুক্ত করেন এবং মুজতবাই ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রথম সচিব। ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময়ে নোতুন দায়িত্ব গ্রহণ করে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। ২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০-এ প্রাণতোষ ঘটককে লেখা একটি পত্রে মুজতবা আলী নোতুন চাকুরির সংবাদ এবং প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ও ব্যাপক কর্মসূচির তথ্য দিয়েছেন :

" মৌলানা সাহেব আমাকে কলকাতা থেকে ধরে নিয়ে আসেন উপরের প্রতিষ্ঠানটির (আই.সি.সি.আর.) সেক্রেটারিরূপে। আমার অপরাধ আমি আরবী, ফার্সী এবং ফরাসী জানি। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান (এবং বর্তমানে একমাত্র) কর্ম হচ্ছে আরবী-ফার্সী-তুর্কীভাষী মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত যোগসূত্র স্থাপন করা। দিল্লীর পররাষ্ট্র বিভাগ ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃ এ কর্মটি করতে পারেননি বলে মৌলানা সাহেবের শরণাপন্ন হন। ...

উপস্থিত আমরা একখানা আরবী ত্রৈমাসিক চালাচ্ছি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ করে মিশর এবং ইরাকের কৌতূহলের অন্ত নেই—আমরা সেই কৌতূহলের উপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের সনাতন বাণী এবং পরবর্তী যুগের কৃষ্টি সামঞ্জস্য এবং বর্তমান যুগের গান্ধী রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্মুখে পরিবেশ করবার চেষ্টা করছি। সাধারণের মনোরঞ্জন করবার জন্য পঞ্চতন্ত্র অনুবাদ করছি ...।

তুর্কীতে সংস্কৃতের অধ্যাপক আছেন; আমরা ইরানে একজন সংস্কৃতের অধ্যাপক পাঠিয়েছি। কাইরো, বাইরুৎ, দমস্কস, বাগদাদেও পাঠাবার বাসনা রাখি।

তাছাড়া ছাত্র-পাঠানো, বিদেশী ছাত্রের আমন্ত্রণ, ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ, কলা-নিদর্শনের ফিল্ম্ ও ল্যান্টার্ন স্লাইড, সঙ্গীতের রেকর্ড, বেতারযোগে যোগাযোগ স্থাপনা—এসব বিস্তর কাজ সামনে পড়ে আছে। ভারতবর্ষের মৌলবী-মওলানারা আমাদের কাজে সাহায্য করছেন,— ... বিদেশ থেকেও কৌতূহলের উৎসাহ পেয়েছি।

আসছে বছর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিভাগ খোলা হবে। তখন কাজ হবে, সিংহল, বর্মা, মালয়, থাই এবং ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করা। তারপর ক্রমে ক্রমে চীন-জাপান, পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকা।

... ইংল্যান্ডে কোনো বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্য, গাঁধী জন্মাননি তবু British Council for Cultural Relations প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে; আর আমাদের কর্তারা উপস্থিত এক লক্ষ টাকা খরচ করছেন। ওদিকে ইংরেজ দু'শ বৎসর ধরে বিদেশে আমাদের মুখে বিস্তর কলঙ্ক প্রলেপ প্রাণপণ 'প্রেমসে' লেপেছে—তার বিরুদ্ধে লড়তে হলে কত টাকার প্রয়োজন বিবেচনা করুন!'[৩০]

উল্লিখিত আরবী ত্রৈমাসিক 'Thaqafat-ul-Hind' মুজতবা আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। অত্যন্ত মহৎ এবং উচ্চতর উদ্দেশ্য নিয়ে চাকুরিতে যোগদান করলেও

ধরাবাঁধা কাজের কাঠামোতে নিজেকে আবদ্ধ রাখা এবং প্রচলিত অনুশাসনের অনুবর্তী জীবন ছিলো মুজতবা চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তদুপরি 'আমলাতন্ত্র' নামে প্রচলিত 'তন্ত্রের' প্রতি তাঁর ছিলো সীমাহীন বিতৃষ্ণা ও অবজ্ঞা। ফলে দীর্ঘদিন সনিষ্ঠ হয়ে একই প্রতিষ্ঠানে টিকে থাকা মুজতবার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আই. সি. সি. আর.-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সঙ্গে একাধিকবার পত্র যোগাযোগ করেও উক্ত সংস্থায় সৈয়দ মুজতবা আলীর যোগদান ও কর্ম ত্যাগের সঠিক দিন-ক্ষণ জানা সম্ভব হয়নি। আই. সি. সি. আর.-প্রকাশিত জার্নাল Indo-Asian Culture-এর জানুয়ারি, ১৯৫৩ সংখ্যার ৩৫২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত-"Shri S. H. Burney, LL.B., has succeeded Dr. S. M. Ali as Secretary of the I. C. C. R. From Ist November."—এ থেকে প্রতীয়মান হয় ডঃ আলী ৩১ শে অক্টোবর, ১৯৫২ পর্যন্ত আই.সি.সি. আর. এর সচিব পদে সমাসীন ছিলেন। (প-২৭৪)।'

৩০শে অক্টোবর, ১৯৫১ থেকে মুজতবা আলী দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় 'রায়পিথৌরা' ছদ্ম নামে 'দেহলি প্রান্তে' কলামটি লিখেও কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জন করছিলেন।

দিল্লী তথা চাকুরি পরিত্যাগের কাল যে আসন্ন তা' তাঁর একটি লেখাতে সুস্পষ্ট এবং এতে মূর্খ আমলাতন্ত্রের প্রতি ব্যঙ্গমিশ্রিত কটাক্ষও উপভোগ্য।

"তিন পা ভালো করে চলতে জানে না—এদিকে আরম্ভ করে দিয়েছে নৃত্য। ... তার উপর 'কম্পোজিশান!' ... তিনি এমনি ... বাঘা জিনিয়াস যে কোনো রাগ-রাগিণী না শিখেই নূতন রাগিণী বানিয়ে বসেছেন, এ্যাসা ককটেল বানিয়েছেন যে, তার ভিতর আপনি ভরত, কথক, কথাকলি, মণিপুরী সব মালই পাবেন। এ যেন নিউ দিল্লী সেক্রেটারিয়েটের স্থাপত্য,—সাঁচী, ইলোরা, তাজ, ফতেহ্পুর সব শৈলী এখানে কোলাকুলি নয়, ঘুষোঘুষি করছেন।

চাপে পড়ে, বন্ধু-বিচ্ছেদের ভয়ে, ডেপুটি সেক্রেটারিকে খুশী করার লোভে এসব জিনিস দেখতে হয় এবং 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, আনন্দবাজারে লিখব বই কি ?' বলে বাড়ী ফিরি।

কলকাতাতেও খারাপ নাচ হয়, প্যারিসেও গাধা আছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, কলকাতার লোক অতখানি সইত না। তার উপর কলকাতার লোক স্বল্লায়ু—জীবনের এসব বেদনা তাদের বেশী দিন সইতে হয় না। দিল্লীর লোক বাঁচে বেশী দিন।

অতএব কলিকাতা ফিরে যাবো বলে মনস্থির করেছি।"[৩১]

এই কলামে ১৮ই ডিসেম্বর, '৫২-তে পুনরায় লিখেছেন, "দিল্লী ছাড়ার আমার সময় ঘনিয়ে এল। বিচক্ষণ জন দিল্লীতে বেশীদিন থাকে না। পঞ্চপাণ্ডব পর্যন্ত মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল দেখে হিমালয় মুখো রওয়ানা দেন। এমন কি সামান্য কুকুরটা পর্যন্ত এখানে পড়ে থাকে নি।"

কিন্তু দিল্লী তো অবহেলা করার মতো স্থান নয়। বহুদিন তাঁর কেটেছে ঐতিহাসিক এই শহরে। অজ্ঞাতে হৃদয়ের গভীরে শহরটি সম্পর্কে কিছুটা দুর্বলতাও সঞ্চিত হয়েছে।

"এ-রকম দিনের পর দিন গভীর নীলাকাশ আপনি কোথায় পাবেন ? সকাল বেলা সোনালি রোদ ট্যারচা হয়ে আপনার চোখের উপর এসে পড়েছে, ...

আহা! সবুজ ঘাসে শিশিরের ঝিলিমিলি, প্রাতঃস্নাত শান্ত ঋজু ঝাউ সামনে দাঁড়িয়ে, শীতের বাতাসে বুগন ভেলিয়ার মৃদু কম্পন, তারপর ধীরে ধীরে প্রখর হতে প্রখরতর

রৌদ্রে বিশ্বাকাশের আলিঙ্গন, ধূপছায়াতে কালো সবুজের স্নেহচিক্কণ আলিঙ্গন, আপনার আমার মত গরীবের ফালি অঙ্গনটুকু নন্দন-কানন হয়ে উঠল—আপনি সেই সৌন্দর্যের মোহে আপিস কামাই দিয়ে আনন্দঘন দিন স্বর্ণরৌদ্রে চক্ষু মুদ্রিত করে কাটালেন—

এ টুকু দিল্লীতেই সম্ভবে।

দিল্লী ত্যাগ করা তাই সহজ কর্ম নয়।”৩২

মোহময়ী এই নগরী-ই কি মুজতবা আলীকে কর্মোপলক্ষে পুনর্বার দিল্লী টেনে নিয়ে গিয়েছিল ? কোলকাতা প্রত্যাবর্তন করে কি বিমলানন্দই না তিনি উপভোগ করেছিলেন। এ আনন্দ বন্ধনমুক্তির, স্বস্তির ও স্বাধীনতার। জঠর-জ্বালায় ম্লান প্রবাসী বাঙালির জন্য হৃদয়নিংড়ানো ভালোবাসা ও সমবেদনা পার্বত্য তরঙ্গিণীর ন্যায় উচ্ছ্বসিত।

“এই যে কলকাতা! জয় মা গঙ্গা!

আর যেন মা তোমার কূল ত্যাগ করে ভিনদেশে যেতে না হয়!

... কিন্তু বঙ্গসন্তান মাত্রই কলকাতা ছাড়ে পেটের দায়ে। হেথায় অন্ন জুট্‌ছে না বলেই সে হোথাপানে ধেয়ে যায়—হায়, তার জীবনে স্বাধীনতা কোথায় ? ‘তার জীবন’ কথাটিই ভুল। তা না হলে আজ ঢাকার পয়সা-ওলা ছেলে কলকাতার রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করছে কেন, কলকাতার বাচ্চাই বা দিল্লীর এর দোরে ওর দোরে হানা দিচ্ছে কেন ? ‘তার জীবন’ তো এখন দৈন্যের জীবন, দুমুঠো অন্নের কাছে গচ্ছিত, এক টুকরো কাপড়ের কাছে বেচে-দেওয়া।”৩৩

১৯৫২ সনের ডিসেম্বরের শেষে দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে মুজতবা আলী কোলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন এবং দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ৬ই জানুয়ারি, ১৯৫৩ থেকে ‘রায়পিথৌরা’ ছদ্ম নামেই ‘সপ্তপর্ণী’ কলামটির সূচনা। বেকার জীবনে ‘কলম’ই তাঁর ভরসা।

০৬.

কিছুদিনের মধ্যে ‘অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো’র (এ. আই. আর.) ‘ স্টেশন ডিরেক্টর’ (এস. ডি.) পদে লোক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেখে আলী সাহেব কারো সঙ্গে পরামর্শ না করেই দরখাস্ত করেন। এই পদে সাধারণত সরাসরি লোক নিয়োগ না করে বিভাগীয় লোকজনদেরই পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হয়। ইন্টারভ্যু বোর্ড তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং মুজতবা আলী নির্বাচিতও হলেন। তাঁর একান্ত আগ্রহ ছিলো কোলকাতা স্টেশনে চাকুরি করা এবং সম্ভবতঃ এ' বাসনা নিয়েই তিনি আবেদন করেছিলেন। তিনি দৃঢ়-প্রত্যয়ী ছিলেন, কোলকাতায় থাকতে পারলে কেন্দ্রটির উন্নতি সাধনে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাতে পারবেন এবং নির্ভেজাল বঙ্গ সংস্কৃতির চর্চায় বেতার মাধ্যমকে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার সম্ভব হবে। সমান্তরালভাবে চলবে সাহিত্য চর্চা।

বঙ্গ সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী কোলকাতা কেন্দ্র বিভাগ পূর্বকাল থেকেই পরিচালনার নানাবিধ ত্রুটির জন্যে নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিফলনে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়নি। এর জন্যে বেতার কেন্দ্রের স্থানীয় প্রধান কর্মকর্তাও অনেকাংশে দায়ী।

মুজতবা সখেদে ১৯৪৫ সনের ১লা সেপ্টেম্বরে লিখেছিলেন : "অল ইন্ডিয়া রেডিওর আরেকটি রহস্য আমাকে চিরকালই অভিভূত করিয়াছে। এই ধরুন বাঙলাদেশের বুকের উপর চেপে বসা কলিকাতা কেন্দ্র। বর্তমানে তার ডাইরেকটর অবাঙালী... তাঁহার পূর্বে ছিলেন পাঠান শ্রীমান বুখারী সাহেব;...তাঁহার পূর্বে ছিলেন মদ্রদেশীয় শ্রীমান পরাণজ্যোতি;... তাঁহার পূর্বে কয়েক মাসের জন্য নাকি একজন বাঙালী সিভিলিয়ান ছিলেন—আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাঁহার পূর্বে ছিলেন শ্রীমান স্টেপলটন সাহেব; তিনিও বাংলা জানিতেন না।

...আপনি যদি বাঙলা প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কোনো ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া উপস্থিত হন তবে বেচারা প্রোগ্রাম ডাইরেকটর বলেন,"...'স্টেশন ডাইরেকটরের সঙ্গে আলাপ করুন।' ডিরেকটর অবাঙালি, বাংলার 'ক' অক্ষর তাঁহার কাছে গোমাংস। অথবা যাহাকে বলে আলিপের নামে ঠেঙ্গা। ফলম্--অরণ্যে রোদন।"[৩৪] শুধু তাই নয়, এ' ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কোনো কোনো আমলার সীমাহীন অজ্ঞতা যে তমসার কোন্ অতল গহ্বরে আবদ্ধ তার উল্লেখ করে একই কলামে ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬ সালেও তিনি আলোকসম্পাত করেছিলেন। লেখকের পরিচিত কোলকাতার একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদের মাত্র দুটো লেখা প্রকাশিত হলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের প্রথম সাক্ষাতে উপস্থিত মুজতবা লিখেছেন :

"....কবিগুরু তরুণের কী উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই না করিয়াছিলেন। সেই গুণীকে কলিকাতা কেন্দ্র আধুনিক বাঙলা কবিতা সম্বন্ধে একটি ভাষণ দিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার রচনাতে এই মর্মে একটি বাক্য ছিল যে, কবিতায় রবীন্দ্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রথম করেন কাজী নজরুল ইসলাম। বেতার কেন্দ্রের এক বিচক্ষণ কর্মচারী ব্রডকাষ্টের দশ মিনিট পূর্বে পূর্বোক্ত সাহিত্যিকের সঙ্গে তর্ক লাগান যে—শুধু কাজীর নাম কেন করা হইল, অমুকের নাম কেন উল্লেখ করা হইল না, তুমুক বাদ পড়িলেন কেন? সাহিত্যিক হতভম্ব। তিনি সর্বশেষে বলিলেন, 'আমি আমার মত বলিয়াছি, আপনি আপনার মত বলিয়া বক্তৃতা করিলেই পারেন।' না হয় ম্যাট্রিক ক্লাশের কোনো ছোকরাকে ডাকাইয়া বেতার কেন্দ্রের মতানুযায়ী ভাষণ লেখাইয়া লউন।"[৩৫]

সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিদের উপস্থিতির ফলে বেতার কেন্দ্রগুলোর মান অধোগামী। সম্ভাব্য প্রতিকারার্থে এবং 'নিরিবিলিতে কাজ...সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চা'র মানসে ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৫৩ সনের ২৯শে এপ্রিল, ও.এস.ডি. হিসেবে নয়াদিল্লী বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে চাকুরি মুজতবা আলীদের জন্যে নয়। বিশেষতঃ আমলা-প্রাধান্যের যুগে। তোয়াজ তোষামোদে কর্তার সন্তুষ্টিই যেখানে উন্নতির সোপান সেখানে তো নয়ই। নোতুন কর্মে যোগদানের দু' মাসের মধ্যেই আলী সাহেব কর্মত্যাগের কথা ভেবেছেন। ২২শে জুন, '৫৩-তে শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষকে লিখছেন, "এবারে চাকরী নিয়ে আমার মনে আর কোনো দ্বিধা রইল না যে আমাকে আবার লেখাতেই ফিরে যেতে হবে। কলকাতা স্টেশনে কর্তারা আমাকে যদি বদলি না করেন তবে পুনরায় সিংহরূপে ৫নং পার্ল রোড। এখানে এসেছিলাম মূষিকরূপে।" (প-৬৪)।

নয়াদিল্লীতে দু' মাস বার দিনের অন্তর্বর্তীকাল কাটিয়ে '৫৩ সনের ১১ই জুলাই ও.এস.ডি. হিসেবে মুজতবা কোলকাতা কেন্দ্রে প্রেরিত হন। তখন শ্রী এইচ. আর. লুথ্রা

কোলকাতার স্টেশন ডাইরেকটর। এখানে তিনি ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চার মাস ছাব্বিশ দিন প্রায় কর্মহীন অবস্থায় থেকে ৭ই ডিসেম্বর, '৫৩ সনে 'কটকে' স্টেশন ডাইরেকটর হিসেবে বদলি হন। কোলকাতা পরিত্যাগের ইচ্ছে না থাকলেও কটকে যেতে তাঁর তেমন কোনো আপত্তি দেখা দেয়নি।

নবকৃষ্ণ চৌধুরী তখন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী। (স্বর্গত) চৌধুরী ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন বিদ্যার্থী এবং মুজতবা আলীর সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিলো অত্যন্ত নিবিড়। আলী সাহেবের কটকে বদলির সংবাদ শুনে উচ্ছ্বসিত নবকৃষ্ণ চৌধুরী ভুবনেশ্বর থেকে তাঁকে স্বাগত জানান। (প-৩০)।

কটকের দিনগুলো ছিলো তাঁর জীবনের আনন্দঘন মুহূর্ত। সেখানকার প্রকৃতি ও পরিবেশ তাঁকে আকর্ষণ করেছিলো। বন্ধু মুখ্যমন্ত্রী প্রায় প্রতি বিকেলেই উপস্থিত থাকতেন মুজতবার আড্ডায়। ভেবেছিলেন কিছুদিন সুস্থ পরিবেশে বসবাস করতে পারবেন। তাই 'full time মালী' রেখে হাঁস-মুরগি পুষছেন, গাভীর সন্ধান করছেন। কোলকাতা থেকে মনের মতো ফুলের চারা পাঠানোর জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন। (প-১)। '৫৪ সনের ১২ই অক্টোবরের চিঠিতে এক সুহৃদকে বেশ গর্বভরেই মুজতবা কটকের 'সংসারের' বর্ণনা দিয়েছেন : "....আলসেশিয়ন কুকুরছানা, রোডেসের মুর্গী-মোর্গা, হাঁস, ফুলবাগান, সব্জীবাগান, বারবিট পাখি (গাছে তার বাসার সুব্যবস্থা), পুকুরের পদ্ম—কত বলবো। বিরাট ধুন্দুমার।" (প-২৩৩)।

এখানেই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অবিশ্বাস্য'-এর সূচনা।

বিধি বাম। এই মধুময় দিনগুলো এসেছিলো মাত্র তেরো মাস সতের দিনের জন্যে। আকাশে কালো মেঘ ছায়া বিস্তার করেছে তারও আগে। কটক থেকে '৫৪ সনে শ্রীমতী সুলেখা দাশগুপ্তকে লেখা তারিখবিহীন একটি পত্রে উল্লিখিত:

"আমার মন অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে আছে। কিছুদিন পূর্বে রেডিয়ো ষ্টেশনে একটি বাঙালী মেয়ে একটা উড়িয়া ছেলেকে জুতো পেটা করে। উড়িয়া ছেলেটা দিল্লীতে তার আপনজন দিয়ে আমার বিরুদ্ধে নানা রকম অনুযোগ জানায়। এদিকে অনেক ওড়িয়া ছেলেটাকে সাহায্য করছে বাঙালী মেয়ের বিরুদ্ধে—প্রভিনশিয়াল ব্যাপার। আমি বাঙালী।

এদিকে উড়িয়ারা সন্দেহ করছে আমি ছেলেটাকে সাজা দেব, কারণ ও দোষী তাই লেগেছে আমার বিরুদ্ধে; ওদিক দিল্লী আমার দিকে রোষ কষায়িত লোচনে তাকাচ্ছে।" (প-১১১)

আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও স্থিতিশীল হতে পারলেন না। মাত্র তেরো মাস সতেরো দিন পর মুজতবা আলীকে পাটনায় পাঠানো হলো তাঁর প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে। অমলেন্দু সেনকে লিখিত পত্রে কী গভীর বেদনার প্রকাশ:

"হায়, আমার বারবিট।... আমাকে কটক থেকে বদলী করে দিলে। সেই বদলী ঠেকাবার জন্য কী চেষ্টাই না করেছিলুম! কটক ষ্টেশন কেউ চায় না, ফাইলেরিয়ার ভয়ে—আমাকে টেনে নিয়ে গেল পাটনায়! ...এখন আমার সঙ্গী এক আলসেশিয়ন—তার দশ দিন বয়স থেকে তাকে 'মানুষ' করেছি।" (প-২৩৬)।

১৯৫৫ সনের ২৪শে জানুয়ারি স্টেশন ডাইরেকটর হিসেবে মুজতবা আলী পাটনায় এলেন। এবং অল্পদিনের মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তিনি আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের

শিকার। বৎসর খানেক পর এক পত্রে তাঁর হতাশা চরমভাবে প্রতিফলিত এবং চাকুরি পরিত্যাগের ব্যাপারে তিনি মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টা করছেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারি, '৫৬-তে শ্রীযুক্তা সুলেখা দাশগুপ্তকে লিখছেন, "সত্যই এ-একটা বৎসর আমার শারীরিক ও মানসিক নানা জ্বালাযন্ত্রণায় গিয়েছে। গেল বছরের আগস্ট থেকে ভাবছি চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এসে বসে থাকবো। অর্থাভাবে যদি না খেয়ে মরতে হয় তাও সই।" (প-১১২) । তারও আগে ৩রা অক্টোবর, ১৯৫৫-তে স্ত্রীকে লেখা পত্রে চাকুরি পরিত্যাগের ব্যাপারে তাঁর বল-ভরসা প্রার্থনা করেছেন। (প-২৭)।

চাকুরি পরিত্যাগের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষই যেন মুজতবাকে এক স্তর অগ্রগামী করে দিলেন। পাটনায় অবস্থানের মেয়াদ এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার অব্যবহিতকাল পরেই জনৈক কর্মকর্তা তাঁকে ট্রাঙ্ককলে দিল্লী স্টেশনে অনতিবিলম্বে যোগদানের নির্দেশ দেন মুজতবার তীব্রতম আপত্তি সত্ত্বেও। ৬ই মার্চ, '৫৬-তে তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, "তবুও হয়ত যেতে হবে। তাই যদি হয়, তবে জিনিসপত্র সব কলকাতায় পাঠিয়ে এক বস্ত্রে মাসখানেকের জন্য যাবো--দুম্‌করে বিন্‌-নোটিসে চাক্‌রি ছাড়া যায় না—সেখানে resignation with notice দেবার জন্য!" (প-১২)। এবং সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৫৬ সনের ১৭ই মার্চ দিল্লীতে যোগদানের পর প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস ও.এস.ডি. থেকে 'অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো'র মুখপত্র Indian Listener'-এর সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন। ইত্যবসরে তাঁর বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে চক্রান্তজাল বিস্তারিত হতে থাকে এবং এর সূতিকাগার—মুজতবার বিবেচনায়—দিল্লীর সেক্রেটারিয়েট। এ সময় চরম হতাশা ও মানসিক পীড়াগ্রস্ত মুজতবা আলী তাঁর এক অনুজপ্রতিমকে '৫৬ সনের ৪ঠা এপ্রিল লিখেছেন: "আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় দিন যাপন করছি। চতুর্দিকে অন্ধকার। আমার জন্য প্রার্থনা করো।" (প-১৪)। পুনশ্চ 'জীবনের ভার সইছে না।' (প-১৫)। দিল্লীত্যাগ আসন্ন জেনেই সম্ভবত তাঁর প্রিয় গাড়িটি বিক্রি করে দেন। (প-১৬) ।

কটক থেকে বদলি হওয়ার পর মুজতবা আলী চেয়েছিলেন কোলকাতা বেতার কেন্দ্রে ফিরে আসতে। এর জন্যে তিনি চেষ্টাও করেছিলেন। মুজতবার অনুরোধ এবং নিজের আগ্রহে তৎকালীন বিধান পরিষদের সদস্য ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে কোলকাতা আনবার উদ্দেশ্যে পশ্চিম বঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের হস্তক্ষেপও কামনা করেন। তখন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ছিলেন মহারাষ্ট্রের ডঃ বি. ভি. কেস্‌কর। তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুজতবার সঙ্গে যে-কোনো কারণেই হোক মন্ত্রীমহোদয়ের সুসম্পর্ক ছিলো না এবং মন্ত্রীর প্রতি তাঁর ঘৃণাও ছিলো প্রকট। মুজতবার কোলকাতা কেন্দ্রে বদলির ক্ষেত্রে তিনি প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান। '৫৬ সনের একটি তারিখবিহীন পত্রে (সম্ভবত এপ্রিল-মে মাসের লেখা) ডঃ আলী শুভার্থী তারাশঙ্করকে লিখছেন:

" ...ধূর্ত কেসকরের একটা মোক্ষম প্যাঁচ জানা আছে। সে অতি persuasive ভাষায় মানুষকে convince করতে জানে। শয়তানের ঐ গুণ আছে বলেই সে আদমকে আপেল খাওয়ার জন্য Persuade করতে পেরেছিল। ...

তার বিরুদ্ধে মানুষের একমাত্র অস্ত্র দার্ঢ্য, firmness. ইংরিজিতে বলে, তখন একমাত্র পন্থা, you must put your foot down & say, 'No.No.No.' and again 'No'

কিন্তু বিধানবাবু কোন্ দুঃখে এ রকম দৃঢ় হতে যাবেন? শয়তান যখন বলবে, 'আলীকে তো একবার পাঁচ মাসের তরে কলকাতায় পাঠিয়েছিলুম।' ... তখন তাঁকে (ডাঃ রায়কে) কে বোঝাবে যে আলীকে পাঠানো হয়েছিল, OSD অর্থাৎ sub-ordinate রূপে এবং তখনকার কর্তা SD (station director), শ্রীলুৎরা (H.R.Luthra) আলীকে কোনো কাজ করতে দেননি, পাছে সে successful হলে তাকেই কলকাতার Station Director করে দেওয়া হয়, এবং লুৎরাকে সেই prize স্টেশন থেকে চলে যেতে হয়।

তারপর শয়তান বলবে, 'আলী administration জানে না। তখন কে বোঝাবে যে কটক বা পাটনায় আমার বিরুদ্ধে কাগজে, কিংবা অন্য কোনো প্রকারে কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়নি, কে বোঝাবে Directorate General-এ আমার বিরুদ্ধে এক রত্তি নিন্দাসূচক কাগজ নেই, যাবতীয় Cooking করা হয়েছে Ministry-তে? কে শোধাবে নবকৃষ্ণকে যে পাটনা স্টেশন আমি কি রকম চালিয়েছিলুম।

তাই একমাত্র ভরসা, যদি তুমি বিধুদাকে (ডাঃ রায়কে) জোর করে বলো, 'আমি কেস্‌করের কোনো যুক্তি শুনতে চাইনে। আমি বলছি, আমরা বাঙলা সাহিত্যিকরা ওকে চাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ও যদি আসে তবে বাঙলা সাহিত্য ও কলকাতা station of AIR উপকৃত হবে।" (প-২৫৩)।

তারাশঙ্কর তথা কোলকাতার সাংস্কৃতিক মহলের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুজতবা আলীকে কোলকাতায় বদলি করা হয়নি—পাঠানো হয়েছিলো অপর এক বাঙালিকে। বন্ধু তারাশঙ্করকে লেখা একাধিক পত্রে তাঁর বেদনা-ক্ষোভ-হতাশা তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গবিদ্রূপে প্রকাশিত।

"....এবার শুনুন, মজার খবর। আপনারা সবাই 'বাঙালী, বাঙালী' চাইছিলেন তো? এরা সেটাকে কি রকম twist করে নিজের কাজে লাগিয়েছেন দেখুন। নন্দীকে (বি.কে .নন্দী) কলকাতা পাঠাচ্ছেন। ওদিকে নন্দী আমার জানা মতে UPSC থেকে দু' দু'বার rejected হয়েছেন এবং মাত্র কয়েক মাস হলো SD হয়েছেন। ইনি তাবৎ SDর ভিতর junior most! তাদের সক্কলের claim overlook করে এটা যে করেছেন তার কারণ সরল। কর্তাদের ideal Station Directon হল সেই ব্যক্তি যে তাদের জন্য ফুলের মালা, civic reception, State Govt. Director-এর তরফ থেকে banquet ইত্যাদির ব্যবস্থা, বেলুড় মঠ যাবার জন্য মিনি পয়সায় লঞ্চ-জোগাড় সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে। নন্দী এ বাবদে তালেবর ব্যক্তি।...নন্দী তাঁদের (মন্ত্রী ও আমলাদের) popularity কলকাতায় বাড়িয়ে দিতে পারলে ভালোই। আর যদি bungle করে তবে তোমরা কিছু বলতে পারবে না। যদি বলো, তবে তাঁরা অভিমান করে বলবেন, 'দেখলে? বাঙালীদের মন কিছুতেই পাওয়া যায় না। বাঙালী চাইলে আমরা দিলুম, এখন দেখো ফের ফরিয়াদ করছে। আর Senior SD-দের বলবে, 'আমরা তো ওকে আদপেই দিতে চাইনি। বাঙালীরা যা চেল্লাচেল্লি আরম্ভ করলে, বাঙালীর জন্যে, যে আমরা না দিয়ে যেতুম কোথায়?'

....তোমরা যে জেহাদ শুরু করবে, আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবার জন্য, 'বাঙালী চাই', 'বাঙালী চাই', বলে সে গুড়ে এঁরা খাসা বালি ছাড়লেন। ওঁরা বলবেন, 'ঐ তো নন্দী রয়েছে, তোমাদের দিল্-জানের জাত-ভাই বাঙালী।'

প্যারা নন্দীকে কলকাতায় নিয়ে গেল তোমাদের ওজুহাতে!

এখন বুঝলে এরা কতখানি ঘড়েল? তোমাদের হাত দিয়ে কৈসন্ গুড়ুক খেয়ে নিলো, প্রেমসে, আরামসে।" (প-২৫৪)।

আমালাতন্ত্র যে কতোটা ঝানু এবং কৌশলে গণপ্রতিনিধিদের দিয়েও কতোটা সুচারুরূপে নিজেদের অভিসন্ধি চরিতার্থ করিয়ে নেয় সে-কথাও আলী সাহেব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন:

"...তুমি আমাকে প্রথমে meeting attend করেই বলেছিলে, 'বোর্ডটা তৈরী করা হয়েছে, পার্লামেন্টে শুদ্ধ মাত্র বলবার জন্য, আমরা তো বোর্ডের কথা মতো চলি।' অর্থাৎ তোমাদের হাত দিয়ে তামাক খাবার জন্য খাসা ব্যবস্থা করা হ'ল।

এ জিনিসটা (স্বর্গত) সুরেশ মজুমদারও বুঝতে পেরেছিলেন এবং শেষটায় বিরক্ত হয়ে বোর্ডের মিটিঙে (বোধ হয় কলকাতা স্টেশনের) আর যেতেন না।"(প-২৫৪)।

মোক্ষম সত্য উদ্ঘাটিত অপর একটি পত্রে, "কলকাতার জন্য বাঙালী চেয়েছিলে, মিঃ নন্দী যাচ্ছেন। ...আলীও বাঙালী কিন্তু সে তো মারাঠীর সেবা করবে না।" (প-২৫৬)। দৃপ্ত তেজে মহীয়ান, আত্মগৌরবে সমুজ্জ্বল মুজতবার সশ্রদ্ধ ভক্তি ও আস্থা আত্মাবমাননার বিরুদ্ধে সংগ্রামীদের প্রতি, —'যারা লড়ে তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা থাকে। হার না মানাতে শ্লাঘা অনেক বেশী। ফল তো শেষ পর্যন্ত একই।"(প-১১৪)।

এবার মুজতবা আলী কৃতসঙ্কল্প—সরকারি চাকুরি আর নয়। অকপটে সে-কথা তারাশঙ্করকে লিখেছেনও :

"...আমি এদের কাছ থেকে চাই মাত্র একটি জিনিস—নিষ্কৃতি! আমি বলি, 'ছেড়ে দে, মা, কেঁদে বাঁচি।' কাজেই নন্দী কলকাতা গেল না আর কোনো ভেঙ্কটরমণ বা কুঞ্চিতপদম গেল তাতে আমার কোনো interest নেই। তুমি দরদ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেয়েছিলে বলেই তোমাকে সব-কিছু সাত-কাহন করে শোনালুম। অবশ্য এ-কথা ঠিক কলকাতায় কোনো উপযুক্ত বাঙালী গেলে আমি খুশি হই—আমার গলা কাট্যা ফালাইলেও আমি আর আকাশবাণীতে কাজ কোরব না, না,না। AIR-এ ঢোকার সময় আমি ভেবেছিলুম কোনো একটা স্টেশনে নিরিবিলিতে কাজ করবো, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও করবো। কটকে সেটা খানিকটে হয়েও ছিল। কিন্তু তখনো বুঝিনি, কি-সব Thugদের পাল্লায় পড়েছি। এদের সঙ্গে ঘর করে আমার জাত গেছে, ধর্ম গেছে।' (প-২৫৪)।

এমনকি এ' সময় কর্তৃপক্ষ মুজতবা আলীকে 'Station leave' অর্থাৎ দিল্লী ত্যাগের অনুমতি পর্যন্ত না দিয়ে চরমতম মানসিক নির্যাতনের মধ্যে রাখে, ..."আমাকে এরা আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে মারছে এবং মারবে।

....আমি অন্য কিছু ভাবতেও পারছিনে। আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।...আমার রাত কাটে দুঃস্বপ্নে, দিন কাটে ভেবে ভেবে কি করে নিষ্কৃতি পাই।" (প-২৫৭)।

মুজতবা আলী বছরে নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা পর্ব উপলক্ষে দু' একবার স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যেতেন। চাকুরির গণ্ডগোল এবং ছুটি ও প্রয়োজনীয় অনুমতির অভাবে এ' বছর পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হতে পারেননি। পিতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা যেন তাঁকেই ধিক্কৃত করছে:

"এবার আর ঢাকা যাওয়া হলো না। ছেলেটার বয়স চার। শুধু আব্বু আব্বু করে। তার মা তাকে আশা দিয়েছিল, আমি শিগগীরই আসবো। ঐ বয়সের ছেলেকে তো আর

বোঝানো যায় না, কেন তাকে নিরাশ হতে হল।" (প-২৫৪)। অন্যত্র মুজতবা যেন বেদনার প্রতিমূর্তি, "অনেক আঘাত পেয়েছি, কিন্তু মানুষে বিশ্বাস আমি হারাইনি, হারাবোও না। কিন্তু মানুষ আমাতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। ছুটি পেলুম না বলে ঢাকা যেতে পারলুম না। স্ত্রী পুত্র ভেবেছে, আমার দোষ। এই করে ধীরে ধীরে ওরা আমাতে বিশ্বাস হারাবে। দুঃখ সেইখানে।" (প-২৫৫)।—সহধর্মিণী কিংবা আত্মজ-ও যার প্রতি বিমুখ, আস্থাহীন,যার স্নেহ-প্রেমেও সন্দেহ-অবিশ্বাস—তার চেয়ে অভাজন আর কে!

অপ্রসন্ন কর্তৃপক্ষ মুজতবা আলীকে সরাসরি অপসারিতও করতে পারছেন না। তখন দেশে বিদেশে-পঞ্চতন্ত্র-ময়ূরকণ্ঠী-চাচা কাহিনী-অবিশ্বাস্য-র গ্রন্থকারের অবস্থান খ্যাতির তুঙ্গে। ১১ই জুলাই, '৫৬ সনের একটি পত্রে তার উল্লেখ রয়েছে:

"আমাকে দিল্লী বদলি করা হয় মার্চ মাসে। এসে অবধি দু' মাসের পাওনা ছুটির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে চোখের জলে নাকের জলে। কর্তারা আমার পিছনে লেগেছেন। তাঁদের ইচ্ছা আমি চাকরী resign দি। ওঁরা আমাকে dismiss করতে ভয় পান। আমি রাজী হয়েছি—কিন্তু আমার পাওনা ছুটির টাকাটা মারা যাবে বলে বখেড়া বেধেছে।" (প-১১৪)।

চক্রান্তের জাল কোলকাতা অবধি বিস্তৃত হয়েছিলো। তারাশঙ্কর ও অন্যরা মুজতবাকে কোলকাতা বদলি করার জন্যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সাহায্য কামনা করেছেন—এ' সংবাদ পেয়ে দুই 'ভদ্রলোক' (এবং নিশ্চয়ই এঁরা ডঃ রায়ের পরিচিত) ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করে মুজতবার ব্যক্তিজীবন ও নানাবিধ চারিত্রিক দুর্বলতার কাহিনী সাড়ম্বরে সব্যঞ্জন তাঁর কর্ণগোচর করে এ' ব্যাপারে সম্ভবতঃ ডাঃ রায়কে নিরস্ত থাকতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। ঘটনাটি মুজতবার শ্রুতিতে এলে তিনি তারাশঙ্করকে নিঃসঙ্কোচে নির্দ্বিধায় জানিয়ে দেন :

"আমার নিন্দা যারা করেছেন, তাঁরা পঞ্চ ম'কার করতে পারেন কি না জানিনে। তবে খুব সম্ভব আমার মতো বই লিখতে পারেন না। আমি সবই পারি। বিশেষতঃ, তুমি তো জানো, আমি সৈয়দের ব্যাটা। আমাকে পাপ স্পর্শ করতে পারে না। আমি 'মদ্য বিং' পান করে টলটলায়মান হইনে। দ্বিতীয় ম' কারের সময় কারো পাকা ধানে মইও দিই নে। তবে ওসব যৌবনের কাহিনী। ... ঐ দুই ভদ্রলোক তো আমার উপকারই করলেন। বিধানবাবু জানলেন, I am such an important man that these two gentlemen also take interest in my private life ! হেজিপেজির চরিত্রদোষ আছে কি না, সে খবরের সন্ধান বিধু বাবুর সহচররা তো করেন না।

বিধু বাবুকে বলো, আমি ভারি খুশি। আমার দু' মুঠো অন্নের জোগাড় হয়ে যাবে।" (প-২৫৫)।

সঙ্কট যখন গভীরতম আবর্তের সৃষ্টি করেছে তখন সম্ভবত মৌলানা আজাদ এ' ব্যাপারে একটা সমঝোতার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জোড়াতালির রফারফি সর্বদাই অতিশয় ভঙ্গুর। ৩১শে জুলাই, '৫৬-তে লেখা আলী সাহেবের একটি পত্রাংশ:

"·····কর্তাদের সঙ্গে বনছে না। তাই চাকরী ছেড়ে দিয়েছিলুম। কাল মৌলানা আজাদ ফের বাধ্য করলেন চাক্‌রীতে থাকতে। অথচ আমি পালাতে পারলে বাঁচি। ইচ্ছা ছিল, তাড়াতাড়ি শান্তিনিকেতন গিয়ে সেখানে শান্তিতে থাকবো। দিল্লীর চাকরীর মহল যে কি রকম তার কিছুটা, অতি অল্পই বলতে হবে, আভাস যাযাবর মহাশয় দিয়েছেন।"(প-১১৫)।

এই দ্বন্দ্বের মধ্যে '৫৬ সনের ১লা সেপ্টেম্বর, মুজতবা আলী ভারতীয় বেতারের মুখপত্র 'Indian Listener'-এর সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন এবং ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন মাস সাত দিন ছুটি ভোগ করেন। ছুটিতে থাকাকালীন সময়েই তিনি রেডিয়োর চাকুরি থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য পদত্যাগপত্র পেশ করেন এবং ১৯৫৬ সনের ১৪ই ডিসেম্বর থেকে তাঁর ইস্তফা কার্যকর হয়। এ' পর্যায়ে দিল্লীতে সৈয়দ মুজতবা আলীর কার্যকাল প্রায় নয় মাস।

০৭.

জীবন সংগ্রামে পর্যুদস্ত একান্তভাবে শান্তিনিকেতনেরই সৃষ্টি সৈয়দ মুজতবা আলী সরকারী চাকুরী থেকে অব্যাহতি নিয়ে কোলকাতা কিংবা শান্তিনিকেতনে থেকে সাহিত্যচর্চা করে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেবেন মনে করেছিলেন। অবশ্য নিয়তির অমোঘতায় সংশয়হীন বলে আপন শক্তির সীমাবদ্ধতা ও ফলাফল যে পূর্বনির্ধারিত—এই উপলব্ধিতেও তাঁর মন বারংবার উদ্বেলিত :

"মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার তার হাতে সৃষ্টিকর্তা কতটুকু দিয়েছেন ? .... খুব ছেলেবেলায় আমি ওমর খৈয়ামের এই কবিতাটি পড়েছিলুম;

প্রথম মাটিতে গড়া হয়ে গেছে শেষ মানুষের কায়
শেষ নবান্ন হবে যে ধান্যে তারো বীজ আছে তায়
সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে লিখে রেখে গেছে তাই,
বিচারকর্ত্রী প্রলয়রাত্রি পাঠ যা করিবে, ভাই।

এ-রুবাঈটি আমার মন থেকে কখনো মুছে যায়নি, যাবেও না। কত সামান্য জিনিসের জন্য মাথা খুঁড়েছি—পাইনি। আর হঠাৎ আশাতীত, কল্পনাতীত আনন্দ এসেছে জীবনে যা দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি। তারপর যখন ভাবলুম, ঠিক বন্দর পেয়েছি—তখন আবার দমকা হাওয়া এসে দড়িদড়া ছিঁড়ে ফেলে নিয়ে গেল ঝড়ের ভিতর।

নিজের শক্তি দিয়ে কিছু কি করতে পেরেছি ?

যে মনের সঙ্গে ঘর করলুম এতদিন তার সঙ্গে কি বোঝাপড়া করতে পেরেছি ?" (প-১১৪)।

এই দ্বন্দ্বে আজীবন ক্ষতবিক্ষত মুজতবা আলী নিগ্রহ-নির্যাতনের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব নিয়তি কিংবা সৃষ্টিকর্তার স্কন্ধে আরোপ করেননি এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর পরিমিতিবোধও প্রশংসাযোগ্য : "মানুষের দুঃখ কষ্ট কিছুটা নিজের কিছুটা বিধিদত্ত। নিজেরটার অন্যতম কারণ, মানুষ নিজের শক্তি না বুঝে অনেক ideal follow করতে চায় যার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তার নেই।"(প-১৮)। অভিজ্ঞতালব্ধ এই বোধ তিনি কখনো বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেননি। ফলে একের পর এক আঘাতে তাঁর জীবন নৈরাশ্যের তমসায় নিমজ্জিত। মুজতবা আলীর দৃঢ় প্রত্যয় ছিলো কোলকাতা অথবা শান্তিনিকেতনে আব্রু রক্ষা করে বাঁচবার মতো একটি চাকুরী জুটবেই। যাঁদের ওপর নির্ভর করেছিলেন তাঁরাও এতোদিনে মুজতবা-চরিত্র সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত অবহিত। এবং কোলকাতায় অতি প্রত্যাশিত পত্রিকা-গোষ্ঠী তাঁকে চাকুরে হিসেবে গ্রহণ করলেন না। "লিখে যান, পয়সার

অভাব হবে না।" —অপ্রত্যাশিত এই আশ্বাসবাণীতে বিক্ষুব্ধচিত্ত মুজতবা এবার যেন নিঃসংশয় হলেন—শান্তিনিকেতনই তাঁর ধাত্রী; সুতরাং চলে গেলেন সেখানে, বাকী জীবন 'শান্তিতে' অতিবাহিত করার বাসনায়। বাসা নিলেন গুরুপল্লীতে । ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭ সালে অমলেন্দু সেনকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর কামনা অভিব্যক্ত :

"চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখানে একটি বাসা ভাড়া করে বাড়ী করেছি। অর্থাৎ এ স্থান আমি এ-জীবনে ত্যাগ করতে চাইনে। .....দিবারাত্র সেই প্রার্থনাই করছি।...

এখানে এসেছি মৃত্যুর জন্য তৈরী হবার জন্য। পেটের তাতের জন্য লিখতে হবে—সেইটুকু লিখবো। .....এবং কোনোদিন যদি লেখা বন্ধ করেও পেটের ভাত জোটে তবে চেষ্টা করবো, বই-পড়া থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য।" (প-২৩৬)

একই পত্রে অভিমানী মুজতবামানস: ".....আমি এ জীবনে কলকাতা আর পারতপক্ষে যাবো না।" যে-মুজতবা দিল্লীতে বসেও কোলকাতার জন্য আকুলিবিকুলি করেছেন, হঠাৎ সে নগরীর প্রতি তাঁর এ বিরূপতার হেতু ? চাকুরী হয়নি বলে ? অথবা সুহৃদ হিসেবে চিহ্নিত জনদের কৃতঘ্নতা ? এ' সময় তাঁর 'জলে-ডাঙায়' এবং আরো দু'-একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও সাপ্তাহিক 'দেশ' কিংবা দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মুজতবা আলীর লেখা প্রকাশিত হয়নি বললেই চলে। আনন্দবাজারে '৫৭ সালে তাঁর কোনো রচনা প্রকাশিত হয়নি। '৫৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত মাত্র তিনটি লেখা মুদ্রিত হয়। অতঃপর নভেম্বর থেকে ধারাবাহিক 'মুসাফির'-এর আত্মপ্রকাশ। 'দেশ'-এও ১৯৫৭-৫৮ সালে মাত্র দু'/তিনটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এ' প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন:

"মুজতবা আলী শান্তিনিকেতনে সস্ত্রীক চাকুরী চেয়েছিলেন। কিন্তু আর্থিক কারণে তখন তাঁদের চাকুরী দেয়া সম্ভব হয়নি। আনন্দবাজার গ্রুপও তাঁকে চাকুরি দেননি। পরে শান্তিনিকেতনে তাঁর (মুজতবার) চাকুরী হয়।" (সা-২৩)।

একেতো চাকুরিবিহীন, তদুপরি লেখা খুবই কমিয়ে দিয়েছেন। ফলে এ' সময় তাঁকে আর্থিক সংকটের মধ্যে কাটাতে হয়। ২৯শে অক্টোবর, '৫৭-য় লিখছেন, "মোটরখানা বেচে দিয়ে তারই পয়সায় দিব্য বেঁচে আছি।

...একটা ঝাঁ চকচকে বাইসিক্ল আছে; এখন সেইটে বেচব। ওতে কয়েক সপ্তাহ চলবে।

সেই যে খৈয়াম বলেছিলেন,

"মসজিদে আমাকে দেখে ভাবছ, আমার বুঝি সুমতি হয়েছে, তা নয়; গেল বারে একখানা জায়নামাজ চুরি করেছিলুম, তারই পয়সায় কেনা মদ কাবার হয়ে গিয়েছে—আবার তাই এসেছি, আরেকখানা চুরি করতে!

আমি যাই কোন্ মসজিদে তাই ভাবছি!" (প-২৩৮)।

সম্ভবতঃ বছর দুয়েকের মধ্যে শান্তিনিকেতন সম্পর্কেও তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। যে আশাভরসায় বুক বেঁধে এখানে এসেছিলেন ক্রমেই দিকচক্রবালে তা' বিলীন হয়ে যেতে থাকে। মানুষের হীনমন্যতা নগ্নরূপে তাঁর সম্মুখে ধরা দেয়। নিম্নোক্ত স্তবক দুটো যতই 'রম্য' হোক না কেন, তা গভীর বাস্তববোধ সঞ্জাত :

"এক বৃদ্ধ বাজীকর তার ছেলেকে বলছে, 'দ্যাখ ব্যাটা, এই বয়সেই তুই আমার মত হুনুরীর কাছে সব এলেম রপ্ত করে নে।...

শুনবি না বুড়ো বাপের কথা ? তা হলে আল্লার কসম…তোকে পাঠাবো পাঠশালে, তারপর ইস্কুলে, তারপর কলেজে, এম-এ, পি-এইচ.ডি. পাস করে বেরনোর পর যখন দোরে দোরে ভিক্ষে মাঙবি, লাথি-ঝ্যাটা খাবি তখন বুঝবি রে, ব্যাটা, তখন বুঝবি, বুড়ো বাপ হক্ক কথা বলেছিল কি না!"[৩৬]—স্মরণে আসে, কৈশোরে মুজতবা আলীকে মোজা বোনার কারিগর হিসেবে তৈরী করার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিলো!

১৯৫৯ সনের একটি তারিখবিহীন পত্রে তিনি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টচার্যকে লিখেছেন, "যবে থেকে আপনি শান্তিনিকেতনের তথাকথিত 'শান্তি' থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কলকাতায় ঢুকলেন তবে থেকে আমিও পূজোর ধুন্দুমারের ভিতর 'আন্ধাধোন্দা' হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছি।...

আপনার খবর নিশ্চয়ই ভালো। শান্তিনিকেতনের চক্রব্যূহ ভেদ করতে পারলে আর কোনো গর্দিশ মানুষকে বহুকাল কাতর করতে পারে না। আপ্তবাক্য।" (প-১৮৯)।

এ' সময় লেখা পত্রাদিতে মুজতবা আলীর আর্থিক সঙ্কটের কথা জানা যায়। এবং তাঁর মানসিক পীড়নও অনেক সময় অপ্রকট থাকেনি। পারিবারিক বিচ্ছিন্নতায় বিহ্বল নিরুপায় আলী সাহেবের অনুরোধ: "আমার বউ বাচ্চার চিন্তা মাথা থেকে দূরে ঠেলে রাখি। আপনার পিতৃদেবকে তাদের জন্যে প্রার্থনা করতে বলবেন।" (প-২৪০)। ১৯শে ডিসেম্বর, '৫৯-এ শ্রীযুক্ত অবিনাশ চক্রবর্তীকে লিখছেন : "অত্যন্ত বিপদে পড়ে তোমাকে লিখছি। আমাকে পত্রপাঠ যদি T.M.O. করে একশতটি টাকা পাঠাও তবে বড় উপকৃত হই। সব কথা খুলে লেখার মত আমার মনের অবস্থা নয়।" (প-২৩)। পুনশ্চ ৬ই ফেব্রুয়ারি, '৬০-এর পত্র :"আমার বড় কষ্টে দিন যাচ্ছে। তোমাকে বলেছি কী বৌদি রাজশাহী বদলি হওয়ার পর থেকে তিনি আমার উপর অপ্রসন্ন। আর বাড়ির অসুবিধা আছেই তো। মানুষ after all পশু। একটু খেতে চায়। সেই বা কোথায় ?" (প-২৪)। আলোচ্য সময়েও চোখের জলে তিনি আমাদের চিত্তলোক সরস সতেজ রেখেছেন।

"আর (বউকে) ডরায় না কে ? 'পঞ্চতন্ত্র' পড়ে দেখুন—বিষ্ণুশর্মার লেখাটা নয়, অন্য একজনের। লাইব্রেরী থেকে ধার করে নয়, কিনে। লোকটা অন্নাভাবে আছে।"[৩৭] কোনো সহৃদয় পাঠকের কল্পনায় এক নিমেষের তরেও কি কখনো উদিত হয়েছে, কী কঠিন সত্য কতো অবলীলায় লেখক স্বীকার করে গেলেন ?

আর্থিক কৃচ্ছ্রতা বরাবর থাকলেও বিবাহোত্তর জীবনে এ' সঙ্কট মুজতবার পৌরুষকে বারংবার আঘাত করেছে। তাঁর স্ত্রী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চাকুরি করে দুই পুত্রকে নিয়ে সংসার চালিয়েছেন। অর্থপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আলী সাহেব স্ত্রী-পুত্রের জন্যে দেদার ব্যয় করেছেন। কিন্তু তা' ছিলো নিতান্তই অনিয়মিত। সর্বোপরি বিলাসী ও বন্ধুবৎসল মুজতবার ব্যক্তিগত ব্যয়ের পরিমাণও ছিলো মাত্রাতিরিক্ত। অন্যথায় তখনো লিখে যা অর্জন করছিলেন, তাতে তাঁর আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ ছিলো না। ২০শে জুলাই, '৬০-এ শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষকে লেখা পত্র: ".....বড় কষ্টে আছি। বৃদ্ধ হয়েছি। শরীর আর সইছে না। কানাইকে (শ্রীকানাইলাল সরকারকে) বলবো, তোমরা এক সঙ্গে বসে ঠিক করে দাও, কোথায় গেলে একটু শারীরিক সুখ-সুবিধে পাব। কলকাতা ছাড়া।"(প-৭৯)। পুনরায় ১লা ডিসেম্বর '৬০-এ শ্রীযুক্ত ঘোষকে টাকার জন্যে তাগিদ : "কঠোর অর্থাভাবে আছি। এর টাকাটা তাড়াতাড়ি, please. এ দুমাস আমার খারাপ যাবে। তারপর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো আশা করি।" (প-৮১)। 'দেশ'-এ

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'শব্‌নম্‌'-এর টাকাটাই চেয়েছেন। তাঁর আশা, উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে আর্থিক অনটন সাময়িকভাবে প্রশমিত হবে। এমনিভাবে শুধুমাত্র 'লেখনী' ভরসা করে ১৯৫৭ থেকে '৬১ সালের আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত হালভাঙা নৌকার মতো সৈয়দ মুজতবা আলী কোনোক্রমে নিজেকে চালিয়েছেন। ইত্যবসরে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাস বিশ্বভারতীর উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নীরোদবিহারী রায়ের মৃত্যুতে বিশ্বভারতীর ইসলামের ইতিহাস বিভাগে রীডারের পদটি তখন শূন্য। স্বর্গতঃ দাসের আগ্রহাতিশয্য ও আন্তরিক প্রয়াসের ফলে এই শূন্য পদে 'এড-হক' ভিত্তিতে ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৬১ সালের ১৮ই আগস্টে যোগদান করেন। অর্থাৎ শান্তিনিকেতনে সাড়ে চার বৎসরাধিককাল বসবাস করার পর তিনি বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার সুযোগ লাভ করলেন। ২০শে আগস্ট '৬১-তে শ্রীসোমেন চট্টোপাধ্যায়কে নোতুন চাকুরি প্রাপ্তির সংবাদে লেখেন:

"শেষটায় আমিও চাকরী নিয়েছি। গত শুক্রবার, পয়লা ভাদ্র বিশ্বভারতীতে জঈন করেছি, as Reader of Islamic History & German. 15th august····দেশ স্বাধীন হলো, আমি 18th august এ স্বাধীনতা হারালুম।····

এ কাজ নিয়ে হয় তো মুহম্মদের জীবনীটি লেখা হয়ে যাবে—এই যা সান্ত্বনা।" (প-৩৯)।

'ইসলামিক স্টাডিজ'-এর অধ্যাপক নিযুক্ত হলেও এ বিভাগে কোনো ছাত্র-ছাত্রী না থাকায় মৌখিক চুক্তি অনুযায়ী মুজতবা আলী জার্মান ভাষা পড়াতেন এবং উচ্চতর গবেষণা কর্ম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও পেয়েছিলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি দায়িত্বের গণ্ডীতে বন্দি হওয়ার মন-মানসিকতা কোনো কালেই মুজতবা আলীর ছিলো না। জীবনধারণের তাগিদে তিনি চাকুরিতে যোগ দিয়েছেন বটে, কিন্তু একনিষ্ঠভাবে তাতে লেগে থাকতে কিংবা স্থায়ী হওয়ার জন্যে নয়—পরিত্যাগ করবার সঙ্কল্প মনে রেখেই। একমাত্র বিশ্বভারতীতে নির্দিষ্ট বয়ঃসীমার পরেও অধ্যাপনায় বহাল থাকবার প্রবলতম বাসনা তাঁর ছিলো। কিন্তু অনিবার্যকারণবশতঃ কর্তৃপক্ষ তাঁকে অব্যাহতি দান করতে বাধ্য হন। প্রসঙ্গটি পরে আলোচ্য। কাজের তেমন চাপ না থাকলেও কর্মে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই দেখছি মুজতবা আলী অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। '৬১ সনের একটি তারিখবিহীন পত্র:

"··· আমি চাকরী নিয়ে ন্যাজে-গোবরে। German আর Islamic Culture পড়াতে হয়।

কেরালা ফ্রেস্কো সম্বন্ধে দু একটি ছোকরা থিসিস লিখছে। সেটাও দেখে দিতে হয়।"(প-২৪৮)।

তখনো আলী সাহেব সঙ্কটোত্তীর্ণ হননি, অভাব-অনটন প্রশমিত হয়নি। '৬১ সনের ৫ই নভেম্বর বন্ধুকে জানিয়েছেন :

'দোস্ত!

আপনার ঝামেলার কথা শুনে ভাবলুম, আমার ঝামেলার কথা লিখি। তারপর সেই উর্দূ প্রবাদটি মনে পড়ল—

মুসীবৎ কা অহ্‌বাল হর্‌ এক এক সে কহ্‌না
মুসীবৎ সে হৈ য়হ্‌ মুসীবৎ জ্যাদাহ্‌—

মুসীবতের অবস্থা...প্রত্যেক এক একজনকে বলা (আসল) মুসীবতের চেয়ে এটা আরো বেশী মুসীবৎ!

...বড্ড অর্থকৃচ্ছ্রতা যাচ্ছে।' (প২৪৯)।

যদিও এ সময় তাঁর অনটনের সঙ্গত কারণ ছিলো না।

১৯৬২ সালে রিডারের স্থায়ী পদে লোক নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। আবেদনকারীদের মধ্যে বিভাগীয় প্রার্থী সৈয়দ মুজতবা আলীসহ মোট তিনজনকে নির্বাচনী সাক্ষাৎকারে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তারমধ্যে দু' জন ১. ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী এবং ২. ডঃ হরেন্দ্রচন্দ্র পাল ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬২ সালে নির্বাচনী বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন।

"After interviewing the above candidates and considering their qualifications and experiences the committee recomends Dr. S. M. Ali for appointment to the post on an initial salary of Rs. 700-40-1100.00. The committee also recomends that the period of probation be waived in this case and he be viewed as an continuous service, from the date of his first appointment."[৩৮]

নির্বাচনী বোর্ডের সিদ্ধান্ত ১৯৬২ সনের ২২শে সেপ্টেম্বরে নিম্নোদ্ধৃত পত্রের মাধ্যমে বিশ্বভারতীর রেজিস্ট্রার মহোদয় মুজতবা আলীকে অবহিত করেন।

"I am directed to let you know that you have been appointed substantively to the post of Adyapak in Islamic Studies at this University on an initial salary of Rs. 740.00 per month with effect from September 18, 1962 in the scale of pay Rs. 700-40- 1,100 with benefits of provident Fund.

The appointment shall be viewed to have taken effect from the date of your first appointment to the post as a temporary Adhyapak viz: August 18, 1961 and the annual increment in the time scale shall henceforth become due on September 18."[৩৯]

সুতরাং, রীডার পদে স্থায়ী করতে গিয়ে মুজতবা আলীকে কোনোরকম অগ্রিম increment দেওয়া হয়নি। probation period-এর অনুশাসনটি শিথিল করা হয়েছিলো মাত্র এবং তখন তাঁর বয়স আটান্ন বৎসর—ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন ত্রিশ বৎসর পূর্বে।

কাঙ্ক্ষিত বিশ্বভারতীতে যোগ দিয়ে মুজতবা আলী মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগলেন যুগের পরিবর্তন। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বের তাঁর দীক্ষাপীঠের তৎকালীন মাধুর্য বর্তমানের মধ্যে আবিষ্কারের ব্যর্থ প্রয়াস তাঁর হৃদয়দাহ বৃদ্ধি করেছে বৈকি। ১৯৬২ সনে পৌষ মেলায় আগত জনৈক আত্মীয়কে প্রাঞ্জল সিলেটী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন, "শান্তিনিকেতন কেমন লাগতাসে ?" আমি উত্তর দিলাম, "ভালোই।" তিনি বলিলেন, "না না, তুমি হাচা কথা কইবায় না। শান্তিনিকেতন-এর শান্তি তো গুরুদেবের লগে লগে ঐ গেছে গিয়া, আর দেখছনি চাইর দিকে খালি নিকেতন গজাইতাছে।"[৪০]

তাঁর বেদনার গভীরতা পরিমাপ করা যায় অপর একটি ঘটনা থেকে। তখন ভারত এবং বিশ্বের অন্যত্র সাড়ম্বরে রবীন্দ্র-জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। শান্তিনিকেতনই তখন সকলের লক্ষ্যস্থল। কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্যে সমবেত হয়েছেন দেশ-বিদেশের গুণীজন। পুণ্যতীর্থে চলছে মহোৎসব। গুরুদেবের ভাবশিষ্য হয়েও শান্তিনিকেতনবাসী মুজতবা সেই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। যথা, শ্রীমতী লীলা মজুমদার স্মৃতিচারণে লিখেছেন :

"তাকে (মুজতবা আলীকে) শেষ দেখেছিলাম বারো বছর আগে, শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক বৃহৎ সাহিত্য মেলায়। সেখানে বাংলার আরো তিন-চারজন কৃতী সন্তানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শশীভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস। এঁদের সঙ্গে মুজতবার পুরনো বন্ধুত্ব, তবু শান্তিনিকেতনবাসী হয়েও তিনি সাহিত্য মেলায় যোগদান করতে রাজী হননি। এসব ব্যাপারে তিনি আন্তরিকতার অভাব দেখে মনে মনে রুষ্ট হতেন। তাঁকে না দেখে সকলেই দুঃখিত হয়েছিলেন।"[৪১]*

এ' প্রসঙ্গে স্বয়ং মুজতবা আলীর সুস্পষ্ট বক্তব্যে তাবৎ আন্তরিকতা-শূন্য বাহ্যাড়ম্বরের কৃত্রিমতার প্রতি তাঁর অন্তহীন ঘৃণা অভিব্যক্ত:

"এখানে যা হয়েছে (রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে) তা অবর্ণনীয়। বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে কেউ স্মরণ করেনি। করেছে পোয়েট টেগোরকে। প্রধান পুরোহিত ছিলেন পণ্ডিতজী ও রাধাকৃষ্ণণ। এঁরা তো 'সোনার বাংলার' কবি রবিঠাকুরকে চেনেন না; এরা চেনেন গীট্যান্জলি, চিট্রা, স্যাড্নার (সাধনা) লেখক মিষ্টার টেগোরকে। আর তাবৎ কার্যক্রম ইংরাজিতে! আমি অবশ্য কোনো পরবে যাইনি—বেতারে যা শুনেছি তার থেকে বলছি।"[৪২]

বিশ্বভারতীতে যোগদানের পর মুজতবা আলীর হাতে প্রচুর সময়—ক্লাসের সংখ্যাও ছিলো অত্যল্প। আর্থিক ভাবনায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ারও কোনো সঙ্গত হেতু ছিলো না। অনুকূল পরিবেশ পেয়েও কোনো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় তিনি আত্মনিয়োগ করেননি। ফলে অকারণে তাঁর পদটির অস্তিত্ব বজায় রাখার সার্থকতা সম্পর্কেও উচ্চতর মহলে প্রশ্ন জাগে। মুজতবার গুণগ্রাহী তৎকালীন উপাচার্য (প্রয়াত) সুধীরঞ্জন তাঁকে চাকুরি দিয়েছিলেন এবং আলী সাহেবের চাকুরি বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব তাঁকেও কিছুটা বহন করতে হয়। '৬৩ সনের জুনে সাগরময় ঘোষকে লিখিত মুজতবা আলীর একটি পত্রাংশ: "Islamic Cuture-এ কোনো ছাত্র নেই বলে উপাচার্যকে একটা কিছু excuse খুঁজতে হবে for U. G.C. তাই তিনি আমাকে 'বিশ্বভারতী পত্রিকায়' মুসলিম সংস্কৃতি সম্বন্ধে লিখতে বলেছেন। সে সীরিজ না লিখে উপায় নেই বলে আরম্ভ করেছি।" (প-৮৭)। 'বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি' শীর্ষক একটি সুলিখিত প্রবন্ধেই এই সিরিজের সমাপ্তি এবং এটি বিশ্বভারতী পত্রিকায় শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর একমাত্র গবেষণা-নিবন্ধ। এ' সময়কার অলস মুহূর্তগুলোর কথা অনুজাকেও জানিয়েছেন,—"সপ্তাহে তিন ঘণ্টা পড়তে হয়। বাকি সময় শুয়ে বসে কেটে যায়। সাহিত্যচর্চাও বন্ধ করে দিয়েছি।" (প-১৫৮)। মুজতবা আলীকে কেন্দ্র করে তখন একটি আড্ডা শান্তিনিকেতনে জম-জমাট আসন পেতে বসেছে। কোলকাতা থেকেও গুণমুগ্ধ বন্ধুজন নিয়মিত আসছেন। কিন্তু তাঁর কর্তব্যকর্মে তখন প্রায় যতি পড়েছে। এমনকি শান্তিনিকেতন-কোলকাতার বাইরের ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গেও যোগাযোগে ধরেছে কিঞ্চিৎ ভাটার টান। কারণ হিসেবে বন্ধু সয়ফুল আলম খানকে পরিবেশিত সংবাদ রীতিমতো কৌতূহলোদ্দীপক:

The fact is, I have entirely devoted myself to TASAWWUF for a fairly long time past now. As I am in the early stages yet, it leaves me little desire

---

* এ মন্তব্যে বৈপরীত্য রয়েছে এবং বক্তব্যটি বিভ্রান্তিকর। রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে ১৯৬১ সনের ৮, ৯ ও ১০মে—তিনদিনের কর্মসূচির সমাপ্তি অধিবেশনে সৈয়দ মুজতবা আলী স্মৃতিচারণ করেন। দ্র.ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ.১৪৫।

to communicate with anyone, ····I know positively that after achieving some success at it, I shall be in a position to write to you in detail and behave in the normal way (outwardly) human beings do,····Meanwhile do not tell any-one about the content of this letter. I do not want the notoriety of a "Faqir" after having one of literature" (প-১৩৭)।

মুজতবা আলী সজ্জন, বন্ধুবৎসল—তেমনি তাঁর রসনাও ছিল অত্যন্ত শাণিত। তিনি যেমন প্রতিভার সম্মান করতেন, তেমনি ছিলেন পল্লবগ্রাহীদের প্রতি খড়্গহস্ত। বিদেশে এবং বিভিন্ন পরিবেশে বসবাস করে তাঁর জীবনধারা পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটেছিলো। যে-পরিবর্তন একজন নিবেদিতপ্রাণ 'শান্তিনিকেতনী'র কাছে প্রত্যাশিত বা বাঞ্ছিত নয়। এর বিষময় ফল ধীরে ধীরে প্রকটিত হতে থাকে শান্তিনিকেতনে মুজতবা-বিরোধী একটা মনোভাবের মধ্য দিয়ে। মদ্য-মাংস একসময় শান্তিনিকেতনে ছিলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই ওলট-পালট হয়ে যায়। তবু পুরনো মূল্যবোধ ও আদর্শকে ধরে রাখতে অনেকেই ছিলেন আন্তরিকভাবে প্রয়াসী। আবার অনেকে এ' চেতনাকে নিজেদের চক্রান্ত সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারে ছিলেন সচেষ্ট। আলোচ্য সময়ে মুজতবা আলী খ্যাতির মধ্যগগনে—এ' কথাটাও বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে এবং সহজেই তিনি খ্যাতিলিপ্সু ঈর্ষাকাতর অক্ষমজনদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলেন।

মুজতবা পানাসক্ত হয়ে শান্তিনিকেতনে এলেও প্রকাশ্যে কখনো পানোন্মত্ত অবস্থায় অশোভন বা অশালীন আচরণ করেননি। তবু তাঁর এ' দুর্বলতা নিয়ে একটা গুঞ্জন ওঠে। সে-সঙ্গে অন্যবিধ দুর্বলতার কাহিনীও সুপরিকল্পিত প্রচারণায় প্রায় সত্যের ভিত্তি খুঁজে পায়। সংবেদনশীল মুজতবার অভিমানী হৃদয় স্বভাবিক কারণেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং পারিপার্শ্বিক বৈরিতাকে দৃষ্টিসীমায় না এনে তিনি আপন মত ও পথে অবিচল থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে গুঞ্জরিত অভিযোগ: ১. মদ্যপান, ২. ক্লাসে তথা কর্তব্যকর্মে অনিয়ম এবং ৩. গবেষণাকর্মে অনীহা। সুতরাং তাঁকে অধ্যাপক পদে বহাল রাখার পক্ষে কোনো যুক্তিপূর্ণ কারণ নেই। দু'-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় শান্তিনিকেতনের প্রতি মুজতবাও ক্রমশঃ বিরূপ হয়ে উঠতে থাকেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন :

"১৯৬৪ সালে যখন উভয় বাংলায় দুর্বৃত্তরা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর নিজের জন্য না হলেও তাঁর বাড়ির কর্মরত দু'-একজন লোকের নিরাপত্তার কথা ভেবে কর্তৃপক্ষের নিকট একটি টেলিফোন সেট চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুরোধ বিবেচিত হয়নি। এই প্রত্যাখ্যানের বেদনায় বিমূঢ় আলী সাহেব ঘটনাটি নিজে আমাকে বলেছেন। তাঁর বক্তব্য এবং বলার ভঙ্গী থেকে বঞ্চনার তীব্রতা সহজেই অনুধাবন যোগ্য ছিল।" (সা-৩৭)।

বিশ্বভারতীর আইনানুসারে চাকুরির সময়-সীমা ষাট বৎসর পর্যন্ত নির্দিষ্ট হলেও অনেককে পঁয়ষট্টি বৎসর পর্যন্ত চাকুরির অনুমতি প্রদান করা হতো এবং নির্দিষ্ট বয়সের পর তখন প্রায় সকল অধ্যাপকেরই অধ্যাপনার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। ১৯৬৪ সনের ১২ই সেপ্টেম্বরে ষাট বৎসর পূর্ণ হলেও মুজতবা আলীকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দানের উদ্দেশ্যে কোনো পত্র দেওয়া হয়নি। তাঁকে মৌখিক যে ধারণা দেওয়া হয়েছিলো তাতে মুজতবার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, তিনি পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পর্যন্ত বিশ্বভারতীতে

অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকতে পারবেন (সা-২৯)। কিন্তু ৬০ বৎসর পূর্তির প্রায় ৮ মাস পর আকস্মিকভাবে ১৯৬৫ সনের ৩০শে জুন থেকে মুজতবা আলীকে বিশ্বভারতীর অধ্যাপনা থেকে অব্যাহতি দানের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৬৫ সনের ২৯শে এপ্রিল, নিম্নোক্ত পত্রে রেজিস্ট্রার মহোদয় তাঁকে অবহিত করেন:

"On the eve of your retirement from the services of the University after completion of the Academic Session 1964-65, during which fell the date of your superannuation, viz. September 12, 1964, the undersigned is desired by the Upacharya to convey to you the letter's deep sense of appreciation of the very valuable services rendered by you to the Visva-Bharati and also to inform you that your services will come to an end on June 30, 1965 afternoon."[৪৩]

যে মুজতবা আলী ইতিপূর্বে শুধু চাকুরি থেকে 'নিষ্কৃতির' পথ খুঁজেছেন, তিনিই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিকভাবে চাকুরিচ্যুতির সংবাদে মর্মান্তিক আহত হন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করে বোলপুরে চলে যান। শান্তিনিকেতন ত্যাগের প্রাক্কালে বন্ধু বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর শেষ বাক্যটি গভীর বেদনায় অনুরণিত: "I am leaving. Now either I will hear you are dead or you will hear I am dead." (প-২১৬)।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য : "কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে তিনি (মুজতবা) এতই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন বললেন, 'আমি জীবনে আর শান্তিনিকেতনে যাব না।'·····আমি যখন কয়েক মাস পর আমার মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য মুজতবার বাড়ী যাই তখন তিনি বলেন যে, 'আমি তো প্রতিজ্ঞা করেছি শান্তিনিকেতনে আর যাবো না। এখন কি করি! মেয়ের বিয়ে।' বস্তুতঃ মুজতবা আমার সন্তানদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিন্তু বিয়েতে তিনি আসেননি। যদিও দই-মিষ্টি এবং উপহার পাঠিয়েছিলেন।" (সা-২৯)।

চাকুরির তোয়াক্কা না করলেও এভাবে অপসারণকে 'সেন্টিমেন্টাল' মুজতবা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। এবং extension না পাওয়ার ক্ষোভ শেষদিন পর্যন্ত তিনি লালন করেছেন। তাঁর পদচ্যুতি নিয়ে নানা মহলে জল্পনা-কল্পনার নিরসন এখনো হয়নি। বিশেষ করে তাঁর অগণিত ভক্ত এবং গুণগ্রাহী এ বিষয়ে সমালোচনায় উচ্চকণ্ঠ। বিষয়টি মুক্ত-বুদ্ধিতে সযৌক্তিক চিন্তাধারায় বিশ্লেষণ করলে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে, আর যাই হোক, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সমীচীন মনে হয় না। এ' প্রসঙ্গে ডঃ আলীর অকৃত্রিম সুহৃদ অকপটে জানিয়েছেন, "মুজতবা আলীর বিভাগে ছাত্র না থাকায় তিনি জার্মান ভাষা পড়াতেন। এ' ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষককে কিছু-না-কিছু গবেষণা-কর্ম করতে হতো। কথা ছিল মুজতবা আলী 'ÈLife and Teachings of Muhammad' সম্বন্ধে কাজ করবেন। কিন্তু তাঁর চাক্‌রীর মেয়াদ যখন শেষ হলো, তখন দেখা গেল কাজটি তিনি শুরুই করেননি। ফলে চাকরিতে extension দেওয়ার ব্যাপারে বিদ্যাভবনের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য তাঁর জন্যে সুপারিশ করতে পারেননি এবং মুজতবার চাকরীর মেয়াদ তাই আকস্মিকভাবেই সমাপ্ত হয়।" (সা-২৯)। শ্রীযুত অমিতাভ চৌধুরীও এ বিষয়ে একমত : "...এটা (ডঃ আলীর চাকুরী) অনেকটা চুক্তিবদ্ধ চাকুরীর মতো। কথা ছিল তিনি (মুজতবা আলী) ইসলামিক স্টাডিজের প্রধান হলেও জার্মান ভাষা পড়াবেন এবং গবেষণাকর্মে নিযুক্ত থাকবেন। সৈয়দদার সর্বগুণ থাকা সত্ত্বেও আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, এ' সময় তিনি তাঁর কর্তব্যকর্ম

সুচারুরূপে সম্পন্ন করেননি এবং উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মও করেননি।...বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনের প্রতি অনীহার ফলেই প্রকৃতপক্ষে সৈয়দদা পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর চাকুরীতে extension পাননি।' (সা-২৬)।

যে-স্থান তিনি 'এ-জীবনে ত্যাগ করতে' চাননি, যেখানে এসেছিলেন 'মৃত্যুর জন্য তৈরি হবার জন্য'—সেই শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করে বাসা বাঁধলেন বোলপুরের 'নিচাপট্টিতে'। এ সময় থেকে আমৃত্যু 'কলম'ই ছিলো তাঁর অন্নসংস্থানের একমাত্র অবলম্বন। লিখে উপার্জন করেছেন—ব্যয় করেছেন সামর্থ্যের বাইরে। নোতুন নিবাসে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। তাঁর পরিবার-পরিজন এমন কেউ সেখানে ছিলেন না যিনি মুজতবাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। গভীর বিষাদ ও আক্ষেপে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন :

"মুজতবার শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ তাঁর জন্যে এবং আমাদের জন্যেও দুর্ভাগ্যের কারণ। শান্তিনিকেতনে থাকতে তিনি পরিমিত পান করতেন আর নিয়মিত লিখতেন। শান্তিনিকেতন পরিত্যাগের পর তাঁর পানের মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে যায়। কলকাতার প্রচুর বন্ধুও জোটে। তাঁদের অনেকেই মুজতবার পয়সায় পান করতেন।" (সা-২৯)।

এই সর্বনাশা পথ থেকে সৈয়দ মুজতবা আলী আর কখনো নিজেকে ফেরাতে পারেননি, অনিবার্য ধ্বংসের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে অগ্রজপ্রতিম পরিমল গোস্বামীর একটি লেখা পড়ে মুজতবা তাঁকে অভিনন্দিত করেন। প্রত্যুত্তরে ১৫ই অক্টোবর, '৬৭-তে শ্রীযুক্ত গোস্বামী লেখেন, "বেতার জগতের লেখা পড়ে শান্তিনিকেতনের সুধাকান্ত চিঠি দিয়েছেন। সাঃ বসুমতী পড়ে তুমি চিঠি দিলে। উদারতা এবার বীরভূমেই আসর জমিয়েছে দেখছি।" তার পূর্বে তিনি যা লিখেছেন তা' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ :

"...তুমি ক্রমে নিচে নামছ কেন ? ঠিকানায় দেখছি নিচাপট্টি। আর কত অধঃপতন হবে ?" (প-১৯৬)।

তথ্য-নির্দেশ

১. অভিসন্দর্ভে উদ্ধৃত 'Biography' থেকে।
২. সৈয়দ মুজতবা আলী : দেশে-বিদেশে, পৃ.৩৯০।
৩. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ.৯-১০।
৪. বেজো না চরণে চরণে, চতুরঙ্গ, পৃ.১১২।
৫. দেশ, ১৫ই জুন, ১৯৮৫,পৃ.৩৫।
৬. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ.৯১।
৭. মরহূম ওস্তাদ ফৈয়াজ খান, পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব), পৃ.৫৩।
৮. সৈয়দ মুজতবা আলী : শহ্‌র-ইয়ার, পৃ.১৯।
৯. ঐ : পথ মধ্যে আত্মচিন্তা, পঞ্চতন্ত্র, দেশ, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১,পৃ.২৫৪।

১০. Baroda Administration Report (BAR), Chapter XII, Education, পৃ-১৮৯।
১১. BAR, Chapter XXIV, Education,পৃ. ১৭৬।
১২. BAR, 1935-36 Chap. XII.,Education, পৃ.২৫৮।
১৩. BAR, 1936-37 Chap. XII.,Education, পৃ.২৪২।
১৪. BAR, 1937-38 Chap. XII.,Education, পৃ.২৫৭।
১৫. BAR, 1941-42,Chap. XXX,Education, পৃ.২০১।
১৬. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ.১১।
১৭. সৈয়দ মুজতবা আলী : মুসাফির, পৃ.১১৯-২০।
১৮. সত্যপীর : হযবরল, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই জানুয়ারি,১৯৪৬, পৃ.৪।
১৯. ঐ, ঐ, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা,১৪ই জুলাই, ১৯৪৬, পৃ.৪।
২০. সৈয়দ মুজতবা আলী : দরখাস্ত, বড়বাবু,পৃ.১০৯।
২১. মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ.১৪।
২২. বগুড়া আজিজুল হক কলেজ ম্যাগাজিন,১৯৪৯, পৃ.৪।
২৩. আমাদের কালের কথা, পৃ.২৬৪।
২৪. ঐ, পৃ.২৬৬।
২৫. সৈয়দ মুর্তাজা আলী, মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ.১৫।
২৬. কলেজ বার্ষিকীটি অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার সাহেবের সৌজন্যে প্রাপ্ত ।
২৭. আমাদের কালের কথা, পৃ.২৬৫।
২৮. সৈয়দ মুর্তাজা আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র সৈয়দ মহবুব আলীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। ডট চিহ্নিত বিনষ্ট স্থানগুলোর পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।
২৯. As per Service Register of thc University of Calcutta, পৃ.৬৫৬।
৩০. প্রাণতোষ ঘটককে লিখিত পত্র-১,সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ.৪০৮-০৯।
৩১. রায় পিথৌরা : দেহলি প্রান্তে, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৫২, পৃ.৪।
৩২. ঐ, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫২, পৃ.৪।
৩৩. বাঙালী, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ.৩২।
৩৪. সত্যপীর : হযবরল, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, পৃ.৪।
৩৫. ঐ, পৃ.৪।
৩৬. সৈয়দ মুজতবা আলী : দর্পণ, কত না অশ্রুজল, পৃ.১৪৭।
৩৭. ঐ, ছুছুন্দর কা সির্ পর চামেলি কা তেল, চতুরঙ্গ, পৃ.১৯৫।
৩৮. বিশ্বভারতীর কার্যালয়ে সংরক্ষিত ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর ব্যক্তিগত 'নথিপত্র' থেকে, Memo No. G/ACE-256.
৩৯. ঐ,।
৪০. আমীনুর রশীদ চৌধুরী : মুজতবা কথা, দেশ, ২১শে ভাদ্র, ১৩৮১, পৃ.৪১৬।
৪১. লীলা মজুমদার : সৈয়দ মুজতবা আলী, অমৃত, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৮০, পৃ.১২।
৪২. শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লেখা, পত্র নং ৮, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড,পৃ.৩১৬।
৪৩. বিশ্বভারতীর কার্যালয়ে সংরক্ষিত ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর ব্যক্তিগত 'নথিপত্র' থেকে, Memo No. G/ACE-256

অধ্যায় : পাঁচ

০১.

সৈয়দ মুজতবা আলী পরিণত বয়সে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বাগ্‌দেবীর বরমাল্য জয় করে নেন অর্থাৎ 'দেশে-বিদেশে'র প্রকাশনার মধ্য দিয়েই বাঙলা সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর অক্ষয় প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তাঁর প্রস্তুতির পটভূমিও খুব হ্রস্ব নয়। সাহিত্যরস-ধারার একটা পারিবারিক পরিমণ্ডলে বাল্য ও প্রথম কৈশোর অতিবাহিত করে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্ন থেকেই কবিগুরুর সান্নিধ্য তথা শান্তিনিকেতনে তৎকালীন পরিবেষ্টনী তাঁকে রসের মহাসমুদ্রসঙ্গমে অবগাহনের অবারিত সুযোগ এনে দেয়। প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহারের প্রস্তুতিও তিনি নিয়ে এসেছিলেন। সিলেটে অবস্থানকালেই পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত শিশু-কিশোরচিত্তের উপযোগী গ্রন্থাবলীর রসগ্রহণে তাঁর কোনো বাধা হয়নি। এই গ্রন্থগুলো শুধু চিত্তের সাধারণ কৌতূহল নিবৃত্ত করেনি, অজানার রাজ্যে তাঁকে প্রলুব্ধ করেছে, তৃষ্ণা জাগিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে 'হয়েছে ভাষা শিক্ষার সহায়ক'।

বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে খানবাহাদুর সৈয়দ সিকন্দর আলীর নিবিড় সম্পর্ক ছিলো—এমন নয়। কিন্তু তিনি ছিলেন একাধিক পত্র-পত্রিকার স্থায়ী গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক এবং বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ দুর্বলতার প্রসঙ্গও আমাদের আলোচনায় এসেছে। পিতার পাঠাভ্যাস ও এই সুমহৎ দুর্বলতা প্রকারান্তরে তাঁর সন্তানদের মধ্যে সাহিত্যপ্রীতির সঞ্চার করলেও—সৈয়দ মুর্তাজা আলীর ভাষ্য—"আমাদের পারিবারিক জীবনে সাহিত্য রসধারার উদ্গাতা ছিলেন আমার অগ্রজ সৈয়দ মোস্তফা আলী। ...তিনিই পত্র-পত্রিকা, পাঠ্যবহির্ভূত নুতন বাংলা বই সংগ্রহ করে পারিবারিক জীবনকে সাহিত্য রসধারায় সিঞ্চিত করেন। এই রসধারা আমার কনিষ্ঠ মুজতবা আলীর জীবনেই সম্যক বিকাশ লাভ করে।"[১] প্রবাসী, মানসী, সাহিত্য, কোহিনুর ইত্যাদি পত্রিকা নিয়মিত তাঁদের হাতে আসতো। সৈয়দ মুজতবা আলী উল্লেখ করেছেন যে ১৯১৯-২০ সালে আচার্য তেজেশচন্দ্র সেন "আনাতোল ফ্রাঁসের রচনা বাঙলায় অনুবাদ করেন ও তখনকার 'শান্তিনিকেতন' মাসিক পত্রিকায় পরপর প্রবন্ধ লেখেন। সুদূর শ্রীহট্টে বসে সেগুলো পড়ে আমি বড়ই উপকৃত হই।"[২] পড়ার নেশা শৈশবেই মুজতবাকে গ্রাস করেছিলো। বিশেষ করে ওমর খৈয়ামের রুবাঈ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণের ফলেই সেই বয়সে তিনি রুবাইয়াতের নানাজনকৃত ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদ সংগ্রহ করে সাগ্রহে পাঠ করেন। তাঁর সঙ্গী এক খণ্ড রুবাইয়াত প্রথম শান্তিনিকেতন যাবার পথে অসাবধানতাবশতঃ খোয়া যায় এবং ঘটনাটি বর্ণনা করে বন্ধুকে লিখেছিলেন, "কেবল

ওমর খাইয়াম না থাকায় কষ্ট হইতেছে।"(প-১৩৩)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্কুল জীবনেই মুজতবা আলীর সাহিত্য-প্রীতির উন্মেষ ঘটে। এই প্রীতিজাত অনুপ্রেরণায় মুজতবা ও তাঁর মধ্যমাগ্রজ যথাক্রমে ১৫ ও ১৭ বৎসর বয়সে একটি ক্ষণস্থায়ী হাতে লেখা পত্রিকা বের করেন। "সম্পাদকের গৌরবান্বিত আসনের অধিকারী ছিলাম আমি নিজে। সহকারী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুজতবা আলী। পত্রিকার নাম ছিল 'কুইনিন'। অপ্রিয় সত্যভাষণই আমাদের লক্ষ্য ছিল।"[৩] পত্রিকাটির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে স্বয়ং মুজতবা আলী শ্রীমতী অর্চনা মিত্রকে এক পত্রে লিখেছেন, 'ঐ বয়সে সর্ববালক হয় সব-জান্তা (all knowing age, কুকুর ছানার যে-রকম ছ' মাস বয়সে হয় all growing age, চটিজুতো থেকে সোফার মখমল তাবৎ জিনিস চিবিয়ে কুটিকুটি করে), তদুপরি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে আগা-পাশ-তলা রিফর্ম করার দুর্বার কামনা জাগলো আমাদের চিত্তে। তাই কাগজের নাম করা হল "কুইনিন"—আমরা শুদ্দুমাত্র তেতো কথাই শোনাবো।

...অত্যল্পকালের মধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে দুশমন বানিয়ে ফেললুম। কিন্তু কাগজ বন্ধ হওয়ার আরো একটি কারণ ছিল। আজ না হয় আমার হাতের লেখা বগের ঠ্যাঙ কাগের বাসার মত চিত্তির বিত্তির। তখন ছিল রীতিমত খুশ্‌খৎ...অতএব আমারই উপর পড়লো তাবৎ পত্রিকা আদ্যন্ত লেখার ভার।

এই দুই কারণে কাগজটি অচিরাৎ তাঁর সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করলেন।"[৪] এবং মুজতবা আলী এলেন শান্তিনিকেতনে—অধ্যয়নের মানসে। বিশ্বনন্দিত বিদ্বজ্জনের উপস্থিতিতে বিশ্বভারতীর তখন সুবর্ণ যুগ। সেখানে বিদ্যাচর্চার পরিবেশও ছিলো কিছুটা স্বতন্ত্র। জ্ঞানান্বেষণের সমান্তরালে চিত্তবিনোদনের শৈল্পিক মাধ্যমগুলোর তৎপরতা সহজেই ছাত্র-ছাত্রীদের কোমল হৃদয়ে গভীর রেখাপাত এবং তাদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্যচর্চা নিয়মিত চলছে। ঘরোয়া পরিবেশে গুণীজনদের ধ্যানধারণা, জগৎ ভাবনার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীর পরিচিতি তাদের জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করেছে। বিচিত্র জিজ্ঞাসা, বিবিধ সমস্যার সমাধানে তারা সমুৎসুক। শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আয়োজিত সাহিত্য-সভায় স্বয়ং গুরুদেব অংশগ্রহণ করছেন, অন্যান্য শিক্ষক তো রয়েছেনই। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে 'হস্ত প্রেস মুদ্রিত' একাধিক পত্রিকা। আর এ সমস্ত পত্রিকায় ভাবীকালের মহীরুহদের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে। গুরুদেবের আশীর্বাদ ও প্রেরণা হয়েছে তাদের পাথেয়। সৈয়দ মুজতবা আলী এঁদের অন্যতম। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন (কঙ্কর সেন) বলেছেন, 'বিশ্বভারতীর ছাত্র থাকাকালে মাত্র ১৯-২০ বৎসর বয়সে মুজতবা আন্তন চেখফ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত সাহিত্যসভায় অধ্যাপকবৃন্দ ও উঁচু শ্রেণীর ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর তাঁরা মুজতবাকে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রশ্নও করেন। এবং প্রবন্ধটি ছিল অত্যন্ত উন্নত মানের। ফলে তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়।" (সা-৩৯)। তিনি আরো জানিয়েছেন, তখন শান্তিনিকেতনে বৎসরে একদিন 'বাঙাল দিবস' উদ্‌যাপিত হতো। তার প্রধান আকর্ষণ ছিলো বিভিন্ন বক্তার আঞ্চলিক ভাষায় বক্তৃতা। এমনি এক অনুষ্ঠানে "গুরুদেব সৈয়দদাকে আহ্বান করে বললেন সিলেটী ভাষায় বক্তৃতা করতে। তাঁর চমৎকার বক্তৃতা শুনে গুরুদেব মুজতবার প্রশংসা করেছিলেন।" 'তখন (শান্তিনিকেতনে) ইস্কুলের সাহিত্যসভায় বেনামীতে কয়েকটি রচনা পেশ' করার সংবাদ আলী সাহেব দিয়েছেন।[৫]

শ্রীসাধনা কর উল্লেখ করেছেন, 'বিশ্বভারতী'র (১৩৩১ সালে) পত্রিকাতে তাঁর (মুজতবা আলীর) দু-তিনটি গল্প এবং প্রবন্ধ পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যেও লেখার তীক্ষ্ণতা এবং সরসতা ফুটে উঠেছে। বোঝা যায় এ কলম ব্যর্থ হবার ছিল না। ১৩৩০ সালের বিশ্বভারতীতে 'নেড়ে' নামে তাঁর একটি গল্প আছে। ভাষায় বর্ণনায় অতি সুন্দর।"[৬] 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৩২৮ সালে 'বিশ্বভারতী' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। হস্তলিখিত পত্রিকাটির সম্পাদনায় ছিলেন সর্বশ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু, অসিতকুমার হালদার, বিভূভিভূষণ গুপ্ত এবং প্রমথনাথ বিশী। লেখকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও কর্মীবৃন্দ।[৭] 'নেড়ে' প্রসঙ্গে শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন বলেন, "১৯২২ সালে সৈয়দদা 'নেড়ে' গল্পটি শাল-বীথিতলে অনুষ্ঠিত ছাত্রদের সাহিত্যসভায় পড়েছিলেন। বিশ্বভারতীর হাতে লেখা পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। অতঃপর দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদিত মাসিক 'মুক্তধারা' পত্রিকায়ও মুদ্রিত হয়। এটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা।" (সা-৩৯) 'মুক্তধারা' দু-তিনটি সংখ্যার বেশি সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয়নি। এবং পত্রিকাটির কোন সংখ্যাও আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। শ্রীযুক্ত সেনের বক্তব্য গ্রাহ্য হলে আমরা শুধু এ' সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ১৯২৩ থেকে '২৬ সালের মধ্যেই সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনা প্রথম মুদ্রিত হয়েছিলো। ১৯২১-এ তাঁর একটি লেখা পড়ে দার্শনিক ও পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "উত্তম হয়েছে, চমৎকার লিখেছ।" আমি (মুজতবা) তদ্দণ্ডেই বুঝতে পারলুম, সৃষ্টিকর্তা তাঁকে সেই অসাধরণ গুণটি দিয়েছেন যার প্রসাদাৎ তিনি নিতান্ত নিরেস বস্তু থেকেও দু'একটি সামান্য সাধারণ জিনিস আপন প্রতিভা দ্বারা আবিষ্কার করে আনন্দ পেতে জানেন।"[৮] দার্শনিক-পণ্ডিত এবং সাহিত্য-রসজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রনাথ দূরদৃষ্টি প্রভাবে তখনই উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে এ' কলিকা বিকশিত হয়ে দীর্ঘদিন বাঙালীকে আনন্দ-সৌরভে বিমোহিত করবে।

বিশ্বভারতীর শিক্ষার্থীদের মনোলোকে সাহিত্যরস সিঞ্চনে কবিগুরু মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। শুধুমাত্র সাহিত্যসভায় নয়, ক্লাসেও তিনি শিল্প-সাহিত্যের আলোচনাকে শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করতেন। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচিত করার সঙ্গে সঙ্গে স্বরচিত সাহিত্য পাঠ ও তার পর্যালোচনা করতেন। এতে সাহিত্যের রসাস্বাদে তারা আগ্রহী ও পারঙ্গম হয়ে ওঠে। 'কথা সাহিত্য'-এ গোরা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়ে মুজতবা প্রাবন্ধিককে অবহিত করেন :

"১৯২২-২৫ এর মাঝখানে ...রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর উত্তরবিভাগের ছাত্রদের সামনে সম্পূর্ণ গোরা পড়ে শোনান। পাঠারম্ভের পূর্বে তিনি অতি হ্রস্ব একটি ভূমিকা দেন। তিনি বলেন—"স্যর জগদীশ সিস্টার নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে শিলাইদহে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। খাওয়া-দাওয়ার পর নিবেদিতা আমাকে বললেন, I am told...that you are a very good story teller; do tell us one' আমি সে সময়ে যে neo-Hinduism..নিয়ে প্রবল উচ্ছ্বাস উত্তেজনা...আরম্ভ হয়েছিল সেটা পছন্দ করতুম না। এবং নিবেদিতাকে বোঝাতে চাইলুম যে তিনি নিজেকে যতই 'হিন্দু' হিন্দু' বলুন না কেন, হিন্দু সমাজ তাঁকে গ্রহণ করবে না, কারণ তিনি হিন্দু ঘরে জন্মাননি। তাই গোরাকে করলুম ইংরেজের ছেলে। সে একটি ব্রাহ্ম মেয়েকে বোঝাতে আরম্ভ করলো সত্য হিন্দু ধর্ম কি। (গোরাতে যে প্লট আছে, রবীন্দ্রনাথ হুবহু সে-প্লটই বলে গেলেন—আলী)। মেয়েটিও সেই

অনুযায়ী হিন্দু আচার-বিচার করে ২ পুরো হিন্দু হয়ে গেল...। তারপর একদিন যখন জানতে পারলো সে হিন্দু নয় তখনই ছুটে গেল মেয়েটির কাছে। সে সব শুনে বললো, 'তুমি যখন হিন্দু বংশে জন্মাওনি তখন আমি গ্রহণ করতে পারিনে।'

কবি তারপর বললেন, 'গল্পটা তখন ট্র্যাজেডিতে শেষ হয়েছিল। পরে লেখবার সময় কি যেন হল...আমি ওটাকে মিলনান্ত করে দিলুম।"(প-৬১) শান্তিনিকেতনের সাহিত্যিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠার কিছু নেপথ্য তথ্য দানের উদ্দেশ্যেই উপর্যুক্ত দীর্ঘ পত্রাংশের উদ্ধৃতি।

মুজতবা আলীর মধ্যে বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁর একাধিক অপ্রকাশিত কিংবা হস্তলিখিত পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার প্রতি গুরুদেবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিলো। মুজতবা লিখেছেন :

"আমার বয়েস যখন উনিশটাক তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বললেন, 'এবার থেকে তুই লেখা ছাপাতে আরম্ভ কর্। আর দেখ্ লেখাগুলো আমাকে দিয়ে যাস। আমি ব্যবস্থা করবো।'

আমি শান্তিনিকেতন ছাড়ি ১৯২৬-এ। গুরুদেবকে প্রণাম করতে এলে তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোনো লেখা ছাপাচ্ছি না কেন ?"[৯]

রবীন্দ্রনাথ মুজতবাকে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন। তখনো তিনি প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যাঙ্গনে অবতীর্ণ না হলেও কবিগুরুর জীবদ্দশাতেই তাঁর গুটিকয়েক অনবদ্য প্রবন্ধ 'মাসিক মোহাম্মদী' ও ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। প্রবন্ধগুলো হয়তো রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পড়েছিলো এবং নিশ্চয়ই তিনি শিষ্যের ক্ষেত্র-বিশেষে আলস্য কিংবা প্রচারবিমুখতা ও সাহিত্য রচনায় অনীহার সংবাদ অনবহিত ছিলেন না। তাই তাগিদ দিয়ে তাঁকে লিখতে উৎসাহী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে প্রকাশিত মুজতবা আলীর পাঁচটি প্রবন্ধের সন্ধান আমরা পেয়েছি।

১. বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দ, মাসিক মোহাম্মদী, পৌষ, ১৩৩৯। —এটিই অদ্যাবধি প্রাপ্ত মুজতবা-বিরচিত মুদ্রিত প্রাচীনতম নিদর্শন।

২. বাঙালী মুসলমানের ভবিষৎ সাহিত্য, মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র, ১৩৪১।

৩. মিসরের বিদ্যায়তন, মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪২।

১৪ই মে, ১৯৩৯-এ সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদ আয়োজিত বার্ষিক সাহিত্যসভায় প্রদত্ত 'সাহিত্য ও কালচার' শীর্ষক সভাপতির অভিভাষণটি যুগপৎ দুটো মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. ক. সাহিত্য ও কালচার, আল্-ইস্লাহ্ (সিলেট), বৈশাখ, ১৩৪৬ এবং
   খ. ঐ, মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়, ১৩৪৬।

৫. মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের, চতুরঙ্গ, আষাঢ়, ১৩৪৬।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সৈয়দ মুজতবা আলীর যে কটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে তা' পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও সংখ্যায় অকিঞ্চিৎকর। অনেকের বদ্ধমূল ধারণা, রবীন্দ্রপ্রয়াণের পূর্বে তাঁর একটি লেখাও প্রকাশ করার দুঃসাহস মুজতবার ছিলো না। সম্ভবতঃ এর পশ্চাতে 'দেশে-বিদেশে'র নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকুই দায়ী।

> "... সে গরমে নেশা ছিল, তা না হলে কবিতা লিখব কেন ? বিবেচনা করুন—

'দেখিলাম পোড়া মাঠ। যতদূর দিগন্তের পানে
দৃষ্টি যায়—দগ্ধ, ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা। শান্তি নাহি প্রাণে
ধরিত্রীর কোনোখানে। সবিতার ক্রুদ্ধ অগ্নিদৃষ্টি
বর্ষিছে নির্মম বেগে। গুমরি উঠিছে সর্বসৃষ্টি
অরণ্য পর্বত জনপদে। যমুনার শুষ্ক বক্ষ
এ তীর ও তীর ব্যাপী—শুষিয়াছে কোন্ ক্রূর যক্ষ
তার স্নিগ্ধ মাতৃরস। হাহাকার উঠে সর্বনাশা
চরাচরে। মনে হয় নাই নাই নাই কোনো আশা
এ মরুরে প্রাণ দিতে সুধা-সিক্ত শ্যামলিম ধারে।
বৃত্রের জিঘাংসা আজ পর্জন্যের সর্বশক্তি কাড়ে
বাসব আসবরিক্ত। ধরণীর শুষ্ক স্তনতৃণে
প্রেতযোনি গাভী, বৎস হৃত-আশ ক্লান্ত টেনে টেনে।'

কী কবিতা! পশ্চিমের মাঠের চেয়েও নীরস কর্কশ। গুরুদেব যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন এ পদ্য ছাপানো হয়নি। গুরুশাপ ব্রহ্মশাপ।"[১০]

পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত গ্রন্থপাঠ, হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এবং পারিবারিক প্রতিবেশের আনুকূল্যে প্রথম কৈশোরেই মুজতবা আলীর জীবনের গতিধারা চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলো।—"আর কোনো দেবতার সেবা করার মতো সুবুদ্ধি আমার (মুজতবার) হয়নি— প্রথম জীবনে মা সরস্বতীই আমার স্কন্ধে ভর করেছিলেন ...।"[১১] একই নিবন্ধে বন্ধুর বেনামীতে মুজতবা স্বপ্রসঙ্গে বলেছেন :

'নিতান্ত বালক যবে পুরাণের দেব-সভাস্থলে
চুপে চুপে দেখিয়াছি ইন্দ্র যম বরুণের গলে
মন্দারের মালা আর হস্তে নানা রতন সম্পদ-
বৈভব সৌন্দর্য কত। অপরূপ নর্ম লঘুপদ
উর্বশীর সম্মোহনী ইন্দ্রজাল নৃত্যচ্ছন্দময়
শুনেছি সুরের কণ্ঠে হর্ষধ্বনি আর জয় জয়।
লক্ষ্মীর বৈভব হেরি নিষ্কল্প তরুণ আঁখি মম,
মহেন্দ্র-অঞ্চলার পশ্চাতে ফিরিছে ছায়াসম।
হে পিথৌরা, আজি আমি লজ্জা নাহি মানি,
মুগ্ধ মোরে করেছিল সর্বাধিক শ্বেত বীণাপাণি।
কি মন্ত্রে সে ভানুমতী বালকের চিত্তাসনখানি
জয় করে নিয়েছিল; মর্ম তার আজও নাহি জানি।'[১১]

'দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ আত্মপ্রকাশের পূর্বে প্রকাশিত মুজতবা আলীর আরো দুটো নিবন্ধের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ক. গুরুদেব : কবিপ্রণাম, ১৯৪১।—এটিই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখা মুজতবার প্রথম নিবন্ধ এবং

খ. মরহুম কবি আবদুর রাজ্জাক, আল্-ইসলাহ, শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ, ১৩৫১।

০২.

জীবিকার্জনের জন্যে নয়, আপনজনদের অনুরোধ-উপরোধে কালেভদ্রে এতদিন মুজতবা লিখেছেন, অতিশয় অনিচ্ছায়। কিন্তু বরোদার চাকুরি পরিত্যাগের পর সুহৃদ কানাইলাল সরকারের মাধ্যমে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে পরিচিত হন এবং শর্তানুযায়ী 'সত্যপীর' ছদ্মনামে সপ্তাহে 'দুবার দুই কলম, আফটার এডিট' লিখতে থাকেন।[১২] অবশ্য শর্তানুযায়ী কর্মে নিবিষ্ট থাকা মুজতবা আলীর পক্ষে কোনো কালেই সম্ভব হয়নি। এখন থেকে প্রধানত কলমই হয়েছে তাঁর রুজিরোজগারের মাধ্যম।

বাংলা সাহিত্যে ছদ্মনাম গ্রহণের সংখ্যায় শীর্ষে অবস্থান করছেন রবীন্দ্রনাথ। সৈয়দ মুজতবা আলীরও পাঁচটি ছদ্মনামের সন্ধান মিলেছে। নিম্নোক্ত পত্রিকাসমূহে উল্লিখিত ছদ্মনামের অন্তরালে অপ্রকাশিত থেকে মুজতবা লিখেছেন :

১. দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ও সাপ্তাহিক দেশ : 'সত্যপীর'।
২. শনিবারের চিঠি : ' টেকচাঁদ'।
৩. দৈনিক সত্যযুগ : 'ওমর খৈয়াম'।
৪. মাসিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী : 'প্রিয়দর্শী'।
৫. দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড : 'রায় পিথৌরা'।

এতদ্ব্যতীত 'ইন্দ্রাণী সরকার' বেনামীতে তিনি 'দেশ'-এ একটি নিবন্ধ লেখেন।

কোলকাতার মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত ' সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর' নবম খণ্ডে 'মিজো সমস্যা ঃ সরকার' শীর্ষক একটি লেখা সংকলিত হয়েছে। রচনাটি ১৯৬৬ সনের ১০ই মার্চ, আনন্দবাজারে 'দারাশিকো'র কলাম 'দেহলিনামচা'য় প্রকাশিত। অনেকের দৃঢ়বদ্ধ ধারণা 'দারাশিকো' ছদ্মনামে সৈয়দ মুজতবা আলীই 'দেহলিনামচা' কলামটি লিখতেন এবং তাঁর রচনাবলীতে উক্ত রচনাটি সংকলিত হওয়ায় এ' ধারণা প্রায় বিশ্বাসে রূপান্তরিত। ১৯৬৬ সালের জুলাই-আগস্টে হঠাৎ 'দেহলিনামচা' কলামে ছদ্মনামের অবগুণ্ঠন মোচন করে যে, লেখক আবির্ভূত হলেন তিনি শ্রীখগেন দে সরকার! এ বিষয়ে শ্রীযুত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪-র একপত্রে সুস্পষ্টভাবে জানান, "আনন্দবাজারে 'দারাশিকো' নামে আমিই লিখেছিলাম। আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় সৈয়দদা লেখেননি।" (প-২১৯·০১)। সুতরাং মুজতবা আলী রচনাবলীর নবম খণ্ডে সংকলিত উল্লিখিত রচনাটি প্রক্ষিপ্ত হিসেবে ধরা যায়—যদিও 'মিত্র ও ঘোষ'-এর ফাইলে সংরক্ষিত উক্ত লেখাটির শীর্ষদেশে হুবহু আলী সাহেবের হস্তাক্ষরে রচনাটির প্রকাশনার তারিখ উল্লিখিত। ফলে সংশয়ের একটা ছায়া থেকেই যাচ্ছে।

ছদ্মনাম গ্রহণের পশ্চাতে একাধিক কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। আসল উদ্দেশ্য পাঠক সাধারণের নিকট থেকে সন্তর্পণে নিজেকে সংগোপন রাখা। এ' প্রসঙ্গে মুজতবা আলীর অভিমত :

"ছদ্মনামে বা বেনামিতে যে বই লেখে—ধরে নিচ্ছি কাপুরুষের মত অন্যকে আক্রমণ করার জন্য সে বেনামিতে গা ঢাকা দেয়নি—তার সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে পাঠক সাধারণের কৌতূহল থাকা উচিত নয়। কারণ সে খ্যাতি চায় না, তার পদমর্যাদা বা অন্য কোনো ভারের জোরে সে তার বক্তব্য পাঠকের উপর চাপাতে চায় না। ...

বলতে গেলে এ দেশের লেখকরা প্রায়শঃ—অন্ততঃ সংস্কৃতে ছদ্মনামে বা বেনামিতে লিখেছেন; চিত্রকর ভাস্কর স্থপতির নামটি পর্যন্ত জানবার উপায় নেই। ... এঁরা সত্যই একটি মাত্র জীবন-যাপন করেছেন—সেটা ষোল আনা প্রাইভেট লাইফ।...

তাঁদের লেখা ('তাঁদের লেখা' বলাটাও ভুল, তাঁরা যেন ইলিশ মাছের মত জনসমাজের গঙ্গানদীর মিষ্টি জলে ডিম পেড়ে নির্বিকার সমুদ্রে—প্রাইভেট লাইফে ফিরে গিয়েছেন। পাঠক সাধারণ কৌতূহলের জাল পেতে তাঁদের ধরতে পারবে না, কিন্তু তাঁদেরও কণামাত্র কৌতূহল নেই ডিমের কি হল না হল) নিয়ে যার যা খুশী ছিনিমিনি খেলতে পারতো।"[১৩]

ছদ্মনাম ধারণের ক্ষেত্রেও সৈয়দ মুজতবা আলীর রসবোধ এবং প্রজ্ঞার পরিচয় সুস্পষ্ট। বিশেষতঃ প্রথম যে নামটি গ্রহণ করেছিলেন—'সত্যপীর'। পরাধীন উপমহাদেশে স্বাধীনতার জয়ডঙ্কা ধ্বনিত হচ্ছে এবং শেষ মুহূর্তেও বৃটিশরাজ বিভেদনীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি। সাময়িক অরাজকতাকে সুদূরপ্রসারী সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ পথে ঠেলে দিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনকে অবিশ্বাস আর হননের রাজনীতিতে রূপান্তরিত করার অপকৌশলে শ্বেতশাসক তখন সক্রিয়। ভাবাবেগে তাড়িত সাধারণ মানুষ আশু মুক্তিকামনায় উদ্‌গ্রীব। সমষ্টির চেয়ে ব্যষ্টি, জাতির চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থের প্রাধান্য দেশের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলেছে। এই পটভূমিতে 'সত্যপীর'-এর আবির্ভাব দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায়, ১৮ই জুলাই, ১৯৪৫ সালে। বাঙালীর নিজস্ব সৃষ্টি সর্বশেষ লৌকিক দেবতা 'সত্যপীর' সম্বন্ধে 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' বলেছেন 'পীরের বেশধারী সত্যনারায়ণ'।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সামন্তরাজ ও সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই, জলপথে মঘ-হার্মাদের দৌরাত্ম্য এবং বহুবিধ শোষণের শিকার "জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত মানুষ পুরোনো শাস্ত্রে ও নীতি-আদর্শে আস্থা হারিয়ে বিশ্বাসের নতুন বন্দরে নোঙর ফেলে আশ্বস্ত হতে চায়, এ মনোভাব থেকেই ষোল শতকের শেষ পাদের ও সতেরো শতকের শোষিত পীড়িত উদ্বিগ্ন মানুষ উদ্ভাবন করে নির্জিত দুস্থ মানুষের এক মিলনমন্ত্র—সে মন্ত্র হচ্ছে 'সত্য'। যেন শাস্ত্র-সমাজ-সংসার, পুরোনো নিয়মনীতি সব জটাজটিল মায়াজাল—সব মিথ্যে। অনির্বাণ সত্য ছাড়া আর কিছু নেই, কেউ নেই—যে বা যা দুঃখ-যন্ত্রণা-বিপদ থেকে দীন দুর্বল অসহায় মানুষকে রক্ষা করতে পারে। সত্য নির্ভেজাল অকৃত্রিম। তাই সত্য কাউকে কখনো প্রতারণা করে না। হিন্দুরা বহু দেবতার পূজারী। তাই সত্য হিন্দুর কাছে সহজেই ইষ্টদেবতার প্রতিভূ-প্রতীক নারায়ণ। মুসলিম মনে ছিল নিরাকার একেশ্বর তত্ত্বের প্রবল ধারণা, তাই সত্য তাদের কাছে 'পীর'। ... বুদ্ধিমানেরা বলে 'হিন্দুর দেবতা হৈল মুসলমানের পীর। দুই কুলে সেবা লয় হৈয়া জাহির।'... একদিন স্বস্তিতে ভাতে কাপড়ে বাঁচবার আগ্রহে জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত নির্জিত বিপন্ন দীন-দুঃখী হিন্দু-মুসলিম বাঙালী 'সত্য' নামের ভেলায় চড়ে বসেছিল, সেদিন ভিন্ন অবয়বের শাস্ত্রের ও মানবসত্যের অভিন্নতা অবলীলায় স্বীকৃত হয়েছিল— সেদিন নবী-কৃষ্ণও অভিন্ন আত্মা নন কেবল, অভিন্ন কায়ও ছিলেন ঃ

মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম।
ফকির হয়ে ভ্রমি তোমার কারণ
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ।

নবী-কৃষ্ণের সমন্বিত রূপ ঃ

অর্ধেক মাথায় কালা একভাগে চূড়া টানা
বনমালা ছিলিমিলি তাতে
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরাণ পুরাণ দুই হাতে।"[১৪]

সৈয়দ মুজতবা আলীও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে মনুষ্যত্বের সাধনার ব্রত নিয়েছেন, ধর্ম নয়—মনুষ্যত্বই মানুষের একমাত্র পরিচয়—এই সত্যবোধ অন্যদের মধ্যেও জাগ্রত করতে হয়েছেন প্রয়াসী। বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্যের সেতুবন্ধনের জন্যে আমরণ নিরলস সংগ্রাম করেছেন। ফলে সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঙালির একান্ত সুহৃদ, আপনজন হিসেবে বরেণ্য হয়ে তাঁর 'সত্যপীর' নামের সার্থকতা প্রমাণ করেছেন। সত্যপীরের রচনায় সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণা তথা নির্জিত পরাধীন জাতির প্রতি তাঁর অসীম করুণা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামী চেতনার প্রতি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন, সর্বোপরি হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামনায় তাঁর আর্তি সুপ্রকাশিত।

০৩.

'পরাজিত জর্মনি' শীর্ষক রচনার মধ্যে দিয়ে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় 'সত্যপীর'-এর আত্মপ্রকাশ এবং ১৯৪৬ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিবিধ শিরোনামে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক, শিক্ষা ও রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিবিধ নিবন্ধ রচনা করেন। একই বছরে ২৫শে আগস্ট থেকে 'সত্যপীর' আনন্দবাজারে 'হযবরল' শীর্ষক আরেকটি নিয়মিত কলাম লিখতে থাকেন এবং এই কলামটি ২২ শে সেপ্টেম্বর, '৪৬ পর্যন্ত ছিলো অব্যাহত। মধ্যে মধ্যে স্বনামে 'রবিবাসরীয়' আনন্দবাজারে রম্যনিবন্ধ, গল্প ইত্যাদিও লিখতে থাকেন। রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় 'সত্যপীর'-এর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'তপঃ শান্ত', মুদ্রণকাল ২৫শে নভেম্বর, ১৯৪৫। এরপর সত্যপীর কখনো আত্মগোপন করেছেন, কখনো আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোনো ধরাবাঁধা নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিলেন না। অতঃপর দীর্ঘদিন আর সত্যপীরের সাক্ষাৎ মেলে না। হঠাৎ করে আবার তিনি আনন্দবাজারে হাউই-এর মতো চকিতের তরে দর্শন দিলেন ১৯৫৯ সনের ১লা মার্চে—'সাধু, না চলিত' রচনাটি শীর্ষে ধারণ করে। দশ বৎসরাধিককালের ব্যবধানে পুনরাবির্ভাব ১৯৬৯ সালের ১৪ই অক্টোবর, একটি রাজনৈতিক নিবন্ধ 'রাবাৎ-ইনসল্ট' নিয়ে। সেই সঙ্গে পত্রিকায় একটি ঘোষণাও ছিল— 'সত্যপীর' নামের আড়ালে একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক এখন থেকে নিয়মিত আনন্দবাজারে লিখবেন।" মুজতবার স্বভাবজাত গুণে মাত্র মাস দু-এক পরেই তা' অনিয়মিত হয়ে ওঠে। এ' পর্যায়ে নিয়মমাফিক সর্বশেষ লেখা 'সিলেটী সাগা' প্রকাশিত হয় ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৯-এ। পরের বৎসর সত্যপীরের একটি মাত্র রচনা '৫৭০-১৯৭০/১৪০০ বৎসর, হজরত মুহম্মদ (দ)-এর চতুর্দশ জন্মশতবার্ষিকী' প্রকাশিত হয় ১৮ই মে, '৭০-এ। ১৯৭১ সনে প্রকাশিত হয় তিনটি লেখা এবং ৭ই মার্চ, '৭১-এ 'নটিংহাম' প্রকাশের পর আনন্দবাজার থেকে 'সত্যপীর' চিরদিনের জন্যে অন্তর্ধান করেন।

সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ 'সত্যপীর'-এর সর্বমোট ছ'টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯৪৫ সালে তিনটি লেখার মধ্যে প্রথম দু'টি কবিতা 'এষাস্য পরমা গতি ?' ও 'নন্দলালের দেয়াল ছবি' যথাক্রমে ২৮শে জুলাই এবং ১৫ই সেপ্টেম্বরে মুদ্রিত। তৃতীয়টি রাজনৈতিক নিবন্ধ '১৯৪২-'৪৫', প্রকাশকাল ২২ শে সেপ্টেম্বর। ১৯৫০-এ প্রকাশিত দু'টি রচনার প্রথমটি পুস্তক সমালোচনা এবং দ্বিতীয়টি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত সংক্রান্ত নিবন্ধ 'জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা'—মুদ্রণকাল যথাক্রমে ৭ ও ২৮ শে জানুযারি। শ্রীযুক্ত সরলাবালা সরকারের মহাপ্রয়াণে রচিত শোক নিবন্ধ 'সরলাবালা' ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬১ সনে 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'সত্যপী'র-এর সর্বশেষ রচনা। ইতিমধ্যে 'দেশ'-এ সৈয়দ মুজতবা আলীর স্বনামে 'কাফে দ্যে জেনি' গল্প, 'আফগান ইতিহাসের মদনাঙ্ক' রম্যনিবন্ধ এবং ' বৈশাখী রবি' কবিতা যথাক্রমে ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, শারদীয় সংখ্যা ১৩৫২ এবং ১লা জুন, ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য সময়ে সৈয়দ মুজতবা আলী 'টেকচাঁদ' ছদ্মনামে 'শনিবারের চিঠি'-তে দু'টি লেখা—ক. 'বর্ব্বর জার্মান' ও খ. 'বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়' যথাক্রমে পৌষ, ১৩৫২ ও বৈশাখ, ১৩৫৩ সালে প্রকাশ করেন। স্বনামে 'মাসিক মোহাম্মদী', মাঘ, ১৩৫২ সংখ্যায় ' মোল্লা ফয়েজ' এবং ১৩৫৪ সালে মাসিক 'মাতৃভূমি'র মাঘ ও চৈত্র সংখ্যাদ্বয়ে 'ব্যক্তি-ব্রহ্মের সন্ধানে' শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধের প্রথম দুটো কিস্তি প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ প্রবন্ধটি অসমাপ্তই ছিলো।

এ সময়কালকে আমরা মুজতবা আলীর সাহিত্যজীবনের 'প্রস্তুতি পর্ব' হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এবং এ সময়ে প্রাপ্ত মুজতবা-রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংবাদপত্রীয় নিবন্ধ ও রম্যরচনা, দু'টি গল্প এবং চারটি কবিতা।

০৪.

১৯৪৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধ। দেশবিভাগের প্রারম্ভিক পর্বে ভ্রাতৃহনন পালা সদ্য সমাপ্ত। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎই তখন অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এবং সন্ত্রাসের বিভীষিকা তখনো ভ্রূকুটি হানছে। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত তরুণ বুদ্ধিজীবী বন্ধু আবু সঈদ আইয়ুবকে নিয়ে সেই দুর্যোগের সময় মুজতবা আলী গেলেন দাক্ষিণাত্যের মদনাপল্লী স্বাস্থ্যনিবাসে। কয়েক মাসের মধ্যে আইয়ুব আরোগ্য লাভ করে প্রত্যাবর্তন করলেন কোলকাতায়। মুজতবা থেকে গেলেন দক্ষিণভারতে। রমণ মহর্ষির অরুণাচল আশ্রমে সাধুসান্নিধ্যে কিছুদিন অতিবাহিত করে বাঙ্গালোরে গেলেন বেশ কয়েক মাসের জন্য এবং সেখানেই রচিত হয় বাঙলা ভ্রমণ তথা রম্যরচনার 'কুতুব মিনার' 'দেশে-বিদেশে'। (প-২৫২)।

যে গ্রন্থটি অগণিত বঙ্গভাষীকে আনন্দলোকের সন্ধান দিয়েছে তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি করুণ স্মৃতি, যে-স্মৃতি শুধু লেখককে নয়, তাঁর রচনার রসগ্রাহী পাঠক চিত্তকেও বিহ্বল করে তুলবে। মুজতবা আলী বলেছেন :

"... আমি তখন অর্থাৎ ১৯৪৮ (হবে '৪৭) খ্রীস্টাব্দে আমার এক অন্ধ্রদেশীয় বন্ধু বীরভদ্র রাও-এর সঙ্গে মাদ্রাজের বেলাভূমিতে নির্মিত তস্য-গৃহে কাল যাপন করছি।

সেখানে সমুদ্রের ওপারে চমৎকার সূর্যোদয় হয়। সূর্যাস্ত অবশ্য সমুদ্রগর্ভে হয় না। অর্থাৎ পূর্বাকাশে যে রঙে রঙে রঙিন চিত্রলেখা অঙ্কিত হয় সেটি কারো দৃষ্টি এড়াতে পারে না। আমি মাঝে মাঝে তারই বর্ণনা আপন ডাইরিতে লিখি। বীরভদ্র রাও-কে মাঝে মধ্যে পড়ে শোনাই। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, সে একখানা অত্যুত্তম green leaf খাতা তথা ভারী সুন্দর একটি কলম এনে দিয়ে বললে, 'সূর্যোদয় সূর্যাস্তের স্কেচ্ অর্থাৎ বর্ণনা তো এঁকেছো বিস্তর; এবার একটি পূর্ণাঙ্গ কেতাব লেখো।'

তখন মনে পড়লো, আমাদের পরিবারের প্রথম সন্তান, আমার বড় দাদার বড় মেয়ে জাহানারা একাধিকবার ব্যঙ্গ করে আমাকে বলেছে, ' হেঁঃ! ছোট চাচার শুধু মুখে মুখে হাই জাম্প আর লঙ্ জাম্প! একখানা বই লিখে দেখান না, আপনি কিছু একটা করতে পারেন ?' আমার তখন বড্ডই গোশ্‌শা হতো। তদুপরি অর্থকৃচ্ছ্রতা। তখন গত্যন্তর না পেয়ে লিখলুম 'দেশে-বিদেশে।' ... সেইটি নিয়ে চললুম সুদূর মাদ্রাজ থেকে সিলেটে। বইখানা জাহানারাকে নিজেই পড়ে শোনাবো বলে।

ওই মেয়েটিকে আমি বড্ডই ভালোবাসতাম। গিয়ে দেখি জাহানারা সিলেটে নেই। তার স্বামী কক্সবাজারে বদলি হয়েছে বলে দুই পুত্র ও তার পাতানো এক ভাইসহ সেখানে যাবার জন্য চাটগাঁ থেকে জাহাজ ধরেছে। দু' দিন পরে খবর এলো জাহাজডুবিতে সবাই গেছে।

এই শোক আমার কলিজায় এখনো তাজা দগ্‌দগে ঘা হয়ে আছে! বইখানা তাই জিন্নতবাসিনী জাহানারার স্মরণে উৎসর্গিত হয়েছে।"[১৫]

জাহানারা 'স্বামীপুত্রকন্যাসহ কক্সবাজারে স্টীমারডুবিতে মারা যান ১৯৪৭ ইং ২৪শে অক্টোবর।'[১৬] সুতরাং মুজতবা সদ্যসমাপ্ত প্রথম গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিয়ে '৪৭-এর অক্টোবরেই সিলেট গিয়েছিলেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর কোলকাতার নিবাস ৫নং পার্ল রোডে তখন তাঁর আড্ডা বসতো। সেখানেই লেখক তাঁর প্রথম গ্রন্থটি বন্ধু-বান্ধবদের পড়ে শোনাতেন। ব্যতিক্রমধর্মী রচনাটির অসাধারণত্বে বিমুগ্ধ শ্রীকানাইলাল সরকার পাণ্ডুলিপিটি এনে শ্রীসাগরময় ঘোষের হাতে সমর্পণ করেন এবং অনতিবিলম্বে 'দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে অনুরোধ করেন। (সা-২৭)। এ' সম্বন্ধে সাগরময় ঘোষ একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি যখন তাঁর দপ্তরে বসে তন্ময় হয়ে সদ্যপ্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি পড়ছেন তখন প্রাত্যহিক আড্ডার বন্ধুরা একে একে এসে জুটলেন। রাবীন্দ্রিক ধাঁচের হস্তাক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতি সাগরময়ের মুগ্ধদৃষ্টি লক্ষ্য করে " বৈঠকের গাল্পিক সাহিত্যিক ... বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বললেন– '...রাবীন্দ্রিক হাতের লেখার যে বিরাট পাণ্ডুলিপিটার উপর আপনি অতক্ষণ হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন সে-বস্তুটি কী জানতে পারি?'

'ভ্রমণ-কাহিনী।'

আমার কথা শুনে সব্যসাচী-সাহিত্যিক গাল্পিক-সাহিত্যিককে একটু ভরসা দেবার সুরে বললেন—

'যাক্, বেঁচে গেলেন। উপন্যাস তো নয়। উপন্যাস হলেই ভয়—আবার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিল।'

আমি বললাম—'না-ই বা হল উপন্যাস। এ লেখার জাতি-পাঁতি স্বতন্ত্র। উপন্যাস এর ধারে কাছে লাগে না।'

দশ জোড়া বড় বড় চোখে এক রাশ বিস্ময় ভরা প্রশ্ন জেগে উঠল—'লেখকটি কে?'

—'আপনারা চিনবেন না। সৈয়দদা।'

—'ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। সেই সুবাদে আমার সৈয়দদা।'

সব্যসাচী লেখক বললেন—'তা হলে তো আর কিছু বলা যাবে না।

একে রাবীন্দ্রিক হস্তাক্ষর তদুপরি শান্তিনিকেতনিক। এ লেখা তো অবশ্য প্রকাশিতব্য।'

আমি বললাম–'আগামী সপ্তাহ থেকেই লেখাটি প্রকাশিত হবে। আপনারাই তখন বিচার করবেন লেখাটি প্রকাশিতব্য কি না। তবে এটুকু আপনাদের বলে রাখছি, এই এক বই লিখেই ইনি বাংলা সাহিত্যের পাঠকচিত্ত জয় করবেন।' " [১৭]

সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ ১৩ই মার্চ, ১৯৪৮ থেকে ১৮ই সেপ্টেম্বর '৪৮ পর্যন্ত মোট ২৮ কিস্তিতে 'দেশে-বিদেশে' প্রকাশিত হয়ে সাহিত্যরসপিপাসু চিত্তে রীতিমতো চমক সৃষ্টি করে। ধারাবাহিক রচনাটি পাঠক মহলকে কতোটা আকৃষ্ট করেছিল তার পরিচয় বিধৃত ৫ই আশ্বিন, ১৩৫৫-তে লেখা 'জনৈক পাঠক'-এর পত্রে :

"আপনার 'দেশে-বিদেশে' 'দেশে' শেষ হয়ে গেল দেখে অকস্মাৎ একটা শূন্যতা অনুভব করলাম। এর পর কয়েক সংখ্যা 'দেশ'-পাঠে আর আগ্রহ থাকবে কি না সন্দেহ।

আপনার রচনাটি আমি খুব মন দিয়ে পড়েছি। এত ভালো লেগেছে, কী বলব! ...

আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি রচনাটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করুন। তাতে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বাড়বে বই কমবে না।" (প-১৯১)।

শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকারের সনির্বন্ধ অনুরোধে আলী সাহেব 'নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড'কে গ্রন্থটি প্রকাশের অনুমতি দেন এবং বৈশাখ, ১৩৫৬ (এপ্রিল, ১৯৪৯) সালে 'দেশে-বিদেশে' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে বাঙলা সাহিত্যে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়। শ্রীযুত সরকার ব্যতীত গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো দু' জন কৃতী শান্তিনিকেতনীর প্রতি লেখক সবিনয় 'ঋণ স্বীকার' করেছেন। একজন কলাভবনের তৎকালীন সহকারী অধ্যক্ষ শিল্পী বিনায়ক রাও মসোজী পুস্তকটির প্রচ্ছদ চিত্রিত করেন এবং অপরজন রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ পুলিনবিহারী সেন 'অশেষ যত্নের সঙ্গে ... প্রুফ দেখে দিয়েছেন।' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে আলী সাহেবের নামের পূর্বে 'ডঃ' ব্যবহৃত হয়েছিলো। 'দেশে-বিদেশে' প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি সাহিত্যিক হিসেবে চিহ্নিত হন এবং বিজয়মাল্য বরণ করেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা। 'কি করে সাহিত্যিক হলাম' শীর্ষক আলী সাহেবের 'বেতার কথিকা'তে এ' উক্তির সমর্থন রয়েছে। এবং নিজেকে সাহিত্যিক হিসেবে আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই নামের পূর্বে ব্যবহৃত সনদের অভিজ্ঞানসূচক 'ডঃ' শব্দটি এ্যাপেনডিক্স্ বিবেচনায় উৎপাটন করে নিজেকে আরো হাল্কা করে ফেলেন। লেখক-জীবনে আনাতোল ফ্রাঁসের একটি বক্তব্য তিনি বীজমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন —'If you wish to travel more, travel light. তোমার লেখাকে তুমি যদি সর্বত্রগামী করতে চাও, হালকা হয়ে লেখ, পণ্ডিতী ফলিও না।'[১৮] সুতরাং পাণ্ডিত্যের নির্মোক থেকে আশুমুক্তিই ছিলো তাঁর কাম্য।

১৯৫০ সালে 'দেশে-বিদেশে' বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় সৈয়দ মুজতবা আলীকে নরসিংহদাস পুরস্কার দিয়ে

সম্মানিত করেন।[১৯] প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৪৯।

মুজতবা আলী সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন যে, সাধারণ পাঠক লেখকের কাছে বৃহত্তর চিন্তাজগতের সন্ধান চায়, মহত্তর আদর্শের দৃষ্টান্ত খোঁজে, চায় নিত্য আনন্দলোকে বিচরণের গোপন সূত্র। সর্বশ্রেণীর পাঠকের বাসনাকে হেলায় ডানে-বাঁয়ে সরিয়ে তিনি নির্বিকার চিত্তে স্বীকারোক্তি করেন, — "লেখকের কর্তব্য যদি পাঠককে মহত্তর করে তোলাই হয়, তবে নিঃসন্দেহে কুমতলব নিয়েই আমি সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলুম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, অর্থলাভ।"[২০] এই 'কুমতলবের' অভিপ্রায় মুজতবার রচনার যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। সংখ্যায় এরা নগণ্য নয়। একই পথের পথিকদের মধ্যে তাঁর প্রিয় কবি হাইনে, ফ্লেমিঙ, বাল্‌জাক্‌, ডিকেন্স, স্কট, ট্রলোপ প্রমুখের নাম উল্লেখ করে তিনি সাফ কবুল করেছেন যে, শুধুমাত্র জঠরজ্বালা নিবৃত্তির জন্যেই তিনি লিখেছেন। এবং এই জ্বালা প্রশমনের বিকল্প পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া মাত্রই কলম পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞা করলেও বহু চড়াই-উৎরাই পরিক্রমণ করে মুজতবা আলী সুনিশ্চিত হলেন "ঐ এক বই লেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে পয়সা কামাবার মতো বিদ্যে আমার (মুজতবার) ব্রেন-বাক্সে নেই। আশ্চর্য, তারপর একটা চাকরি পেয়ে গেলুম। কাজেই লেখা বন্ধ করে দিলুম। চাকরী ইস্তফা দিলুম। ফের কলম ধরতে হল। ফের চাকরি। ফের কলম।"[২১]

সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর অন্যতম সাহিত্যগুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণে এক পত্রে লিখেছেন :

"স্বয়ং বিদ্যেসাগর কী দুঃখেই—না, I mean কী ক্ষোভেই না বলেছিলেন

অস্য দগ্ধ উদরস্যার্থে কিং কিং না ক্রিয়তে ময়া!
বানরীমিব বাগ্দেবীং নর্তয়ামী গৃহে গৃহে ॥
ওরে পোড়া পেট, কত কী না করি, হায়! আমি তোর তরে
বানরীর মত সরস্বতীরে নাচাচ্ছি ঘরে ঘরে।
(আমার অনুবাদ, বিদ্যাসাগরের দোষ দিয়োনি!)।

বাগ্দেবী কটা লোকের সামনে আবির্ভূত হন, ... সেই দেবী যখন অকারণ করুণায় এই অভাজন জনের সামনে মৃন্ময়ীরূপে দেখা দিলেন, তখন কোথায় না আমি তাঁর পা' দুটো জোরসে জাবড়ে ধরে, বুক চিরে রক্ত বের করে তাঁর রাঙা পা দু'খানি তাজা রাঙা করে দিয়ে নিদারুণ কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ ছাড়বো, সকরুণ আকুবাকুসহ কাকুতিমিনতি জানাবো, "দয়া যদি করলি মা, এই আকাট গবেটের উপর, তবে আর আমাকে ছেড়ে যাসনি মা, আমি হত্যে দেব মা, আমি মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব মা। আরো দয়া কর, দেবী, ঐ দেখ, —হৃদয়ে এঁকেছি

রক্ত রেখায় পদ্ম আসন—

তোমার কমল বনের ধ্যান করতেও সাহস পাইনি এতদিন। তাই যখন এসেছো, রক্তরেখায় আঁকা এই পদ্মাসনে বসো। তুমি প্রসন্ন,আমি ধন্য।"

এসব কিচ্ছুটি না করে, বলেছেন বিদ্যেসাগর,—চট্‌সে, বাঁদরওলার মত একটা ছিটের রঙ-বেরঙা ঘাগরা বেঁধে দিলেন বাগ্দেবীর কোমরে—বাঁদরীটার মত তাঁকে ঘরে নাচিয়ে—ছবিটা চোখের সামনে ধরো তো—বিদ্যেসাগর ডানহাতে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে বাঁ হাতে বাঁদরীটার শিক্‌লিটা ধরে সুরে করে গাইতে গাইতে চলেছেন,

"সাপে বাঁদর লয়ে খেলা করো গো,
ও-সাপ!
লয়া লয়া সাপ।"

যে-বিদ্যেসাগর তার অগাধ অকূল (দাদা, অপরাধ নিসনি—আমি যে কত অসংখ্যবার লোকটার লেখা আগা-পাস্তলা পড়েছি, তার গদ্য পাতার পর পাতা ঝাড়ানাগারে কণ্ঠস্থ করেছি, গড় গড় করে এই বার্ধক্যেও সেই গদ্য, মশাই গদ্য, পদ্য নয়—আউড়ে যেতে পারি তা আপনি জানবে কি করে? আমার চেয়ে ঐ ওস্তাদস্য ওস্তাদকে বেশী চেনে এমনতর গুমোর যে করে "তার পিতা নির্বংশ হোক"—এটাও ঈশ্বর ঝেড়েছিল মহেশ ন্যায়রত্নের মাথার উপর তাকে "কপিরত্ন"—(আসলে বিটেল বামুনরা "যশোর ধর্মরক্ষিণী সভাতে" তাকে "কবিরত্ন" উপাধি দিয়েছিল)—টাইটল দেওয়ার পর, ... বিদ্যের শেষ কণাটুকু—হেন বিদ্যে নেই, মশাই, ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত-সাংখ্য-মীমাংসাদ্বয় এবং সর্বোপরি অলঙ্কার, যার বদৌলতে এ্যাসন খাসা বাঙলা লিখেছে আমার মুরশীদের মুরশীদ ঈশ্বরচন্দ্র—হেন বিদ্যে নেই মশয়, যেটা ঐ বাম্‌না গুলে খায়নি, আর নব্যন্যায় যে কী অদ্ভুত কায়দায় twist করে মহেশাদির মাথায় ঝুনো নারকেল ফট্‌ফট্ করে ফাটাতো বিধবা-বিবাহের পোলেমিক্‌সে সে বলে শেষ করা যায় না—তারাব্রহ্মময়ীবজ্রযোগিনীর কসম-কিরে গিলে বলছি, আমার পেটে এলেম আর কতটুকু যে তাঁর বিদ্যের চৌহদ্দী জরীপ করবো? মাইরি, দাদা ঐ মহেশ-টহেশকে ঈশ্বর তার কড়ে আঙুলের চতুদ্দিকে যে তুর্কীনাচন নাচাতো, সে কী অবহেলে, তুরি মেরে, সর্বশেষ এক ফুঁয়ে ওদের কাহাঁ কাহাঁ মুল্লুকের " হে পারে" জাহান্নামে পাঠাতো সে কি আর কেউ তলিয়ে দেখে, বোঝে?— সেই অগাধ বিদ্যের এক ফোঁটাও ভদ্রলোক কক্‌খনো exploit করেনি। বাগ্‌দেবীকে নাচিয়েছে এ-কথা ঈশ্বর বলুন; আমরা বললে, হে উপরের ঈশ্বর, আমাদের মুখে যেন গলিত কুষ্ঠ হয়।" (প-১৫৪)।

আমরাও অবহিত, প্রয়োজনের তাগিদে বিদ্যাসাগর বাগ্‌দেবীর অযাচিত বর্ষিত অজস্র করুণাধারায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতে পারেননি, সৈয়দ মুজতবা আলীও সেই করুণাবারিতে স্নাত হয়েছেন বটে, কিন্তু দেবীর প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শনে প্রায়ই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তবু আমরা স্বীকার করতে বাধ্য, শুধু 'পোড়া পেটের' জন্যে নয়, প্রাণের টানেই তিনি বাগ্‌দেবীর পদতলে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। এবং যে-সমস্ত গ্রন্থ—পঞ্চতন্ত্র, চাচাকাহিনী, ময়ূরকণ্ঠী, অবিশ্বাস্য, টুনিমেম—তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতিকে অক্ষয় করেছে–সেগুলো তাঁর চাকুরী-জীবনেই রচিত। এবং দেবীর করুণাধন্য বলেই বিধিবদ্ধ কর্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে তিনি কখনো পরাঙ্মুখ হননি। 'দেশে-বিদেশে' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে 'চাকরি-কলম, কলম চাকরি' করেই চলছিলো মুজতবা আলীর। সর্বশেষ ১৯৬৫ সালে বিশ্বভারতীর চাকুরির সময়সীমা বর্ধিত না হওয়ায় কলম আশ্রয় করলেন—সেই কলমই শেষ পর্যন্ত তাঁর অন্ন, বস্ত্র এবং 'সুরা' যুগিয়েছে।

স্বেচ্ছায় না লেখার চারটি কারণ মুজতবা আলী নির্দেশ করেছেন।

"(১) আমার লিখতে ভাল লাগে না। আমি লিখে আনন্দ পাইনে।

(২) এমন কোনো গভীর, গূঢ় সত্য জানি নে যা না বললে বঙ্গভূমি কোনো এক মহাবৈভব থেকে বঞ্চিত হবেন।

(৩) আমি সোসাল রিফর্মার বা প্রফেট নই যে দেশের উন্নতির জন্য বই লিখব।

(৪) খ্যাতিতে আমার লোভ নেই।"[২২]

এতদসত্ত্বেও মুজতবা আলীর নিকট থেকে আমরা যা পেয়েছি তার পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর নয় এবং গুণ ও মানে অনন্য। অবশ্য এই ধীমান তাঁর প্রজ্ঞা ও সৃজনীশক্তির তুলনায় যা দিয়েছেন তাকে প্রভূত বিত্তশালী রাজাধিরাজের রাজভাণ্ডার থেকে নিতান্ত অবহেলায় নিরন্ন প্রজার প্রতি অতিশয় অবজ্ঞায় নিক্ষিপ্ত খুদকুঁড়োর সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

১৩৫৫ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ সংখ্যার 'চতুরঙ্গ' ত্রৈমাসিকের সংখ্যা দুটোতে মুজতবা আলীর একমাত্র 'পোলেমিক', 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' এবং কার্তিক সংখ্যায় একটি কবিতা 'ইন্দ্র-লুপ্ত' প্রকাশিত হয়। এ বছরই মাসিক 'মাতৃভূমিতে তাঁর একাধিক রাজনৈতিক নিবন্ধ, 'মৃত্যোর্মামৃতং গময়' নামে অতি উচ্চাঙ্গের একটি প্রবন্ধ এবং আষাঢ়, ১৩৫৫ সংখ্যা থেকে 'চাচা-কাহিনী'র গল্পগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ভাদ্র, ১৩৫৫ সংখ্যা পর্যন্ত এ' ধারার তিনটি গল্প প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে মুজতবা আলীর আরো লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো—এ' অনুমান যুক্তিবহ। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পরবর্তী কোনো সংখ্যার সন্ধান পাইনি। শারদীয় কালান্তর, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৫৫ সংখ্যায় বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প 'পাদ-টীকা' প্রকাশিত। অতঃপর কার্তিক, ১৩৫৫ সংখ্যা থেকে মাসিক কালান্তরে 'চাচা-কাহিনীর গল্পগুলো মাতৃভূমি থেকে পুনর্মুদ্রিত হতে থাকে। যদিও পুনর্মুদ্রণের স্বীকৃতি কালান্তরে অনুল্লিখিত। এ' সংখ্যায় লেখক পরিচিতিতে উল্লিখিত :

"তীক্ষ্ণ চক্ষু, উচ্চনাসা এনসাইক্লোপিডিয়া-বিলাসী পণ্ডিত দেখে যাঁরা ভয় পান, তাঁরা সৈয়দ মুজতবা আলীকে দেখলে আনন্দিত হবেন। তিনি সুপণ্ডিত এবং বিনয়ী, স্পষ্টবক্তা হয়েও প্রিয়ভাষী। অনেক দেশ বিদেশ ঘুরেছেন, কিন্তু ভালবাসেন মাতৃভূমিকে। অধিকার আছে বহু ভাষায়, কিন্তু অনুরাগ মাতৃভাষার ওপর। তিনি প্রিয়দর্শন অথচ অবিবাহিত। সুরসিক পাণ্ডিত্য তাকে স্বচ্ছতা দিয়েছে, আবরণ নয়।"[২৩]

ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৫৫ সংখ্যা পর্যন্ত কালান্তরে চাচা-কাহিনীর চারটি গল্প পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যাগুলোর সন্ধান অজ্ঞাত। মাসিক 'বসুমতীতে ১৩৫৫ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা এবং ১৩৫৬ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মোট চার কিস্তিতে 'শ্রমণ রায়োকোয়ান' চরিত নিবন্ধটি প্রকাশিত। ১৩৫৬ সালের অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় 'নর্তকী'র দুটো কিস্তি প্রকাশিত হয়ে অসমাপ্ত অবস্থায় থেকে যায়। ফলে বাঙালী পাঠক নিঃসন্দেহে একটি সম্ভাবনাময় লেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। 'কোদণ্ড মুথহানা'র মর্মস্পর্শী জীবনকাহিনীটি দৈনিক বসুমতী, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৬-তে প্রকাশিত। মুজতবা 'প্রিয়দর্শী' ছদ্মনামে ১৩৫৬ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মাসিক বসুমতীতে 'টলি-হলি কোলাকুলি' নামে একটি অত্যুৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র সমালোচনা করেছেন। প্রায় সমসাময়িককালে অধুনালুপ্ত তৎকালীন 'দৈনিক সত্যযুগ' পত্রিকায় 'ওমর খৈয়াম' ছদ্মনামে তিনি অনিয়মিতভাবে 'নিয়মিত' একটি 'কলাম' লিখতেন।

০৫.

অতঃপর সৈয়দ মুজতবা আলী প্রধানতঃ সাপ্তাহিক 'দেশ' ও দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিয়মিত লেখকে পরিণত হন। আনন্দবাজারের সঙ্গে প্রায়ই যোগসূত্র ছিন্ন হলেও দেশ-এর সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগে কখনো যতি পড়েনি এবং এ' ব্যাপারে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষের প্রাপ্য। একজন লেখক তৈরী এবং তাকে সচল সক্রিয় রাখবার জন্য কতোটা ধৈর্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজন সম্পাদক হিসেবে সাগরময় ঘোষ তার সফল দৃষ্টান্ত।

সৈয়দ মুজতবা আলী এবং সাগরময় ঘোষের সম্পর্ক শুধুমাত্র লেখক-সম্পাদকের মধ্যে সীমিত ছিলো না। তাঁদের হার্দিক সম্প্রীতি বিশেষভাবে অত্যধিক সংবেদনশীল ও অভিমানী মুজতবার জন্যে ছিলো আশীর্বাদস্বরূপ এবং সে-আশীর্বাদই মুজতবা-রচনাবলীর বদৌলতে বাঙালীর চিত্তভূমিকে রসসিক্ত করে রেখেছে। সাগরময়ের কাছে তিনি যেমন পেয়েছেন অগ্রজের শ্রদ্ধা ও ভক্তি, তেমনি অনুজপ্রতিম সম্পাদকের প্রতি ছিলো তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতি। এবং সেই দাবীতেই মুজতবাকে তাগিদের অঙ্কুশে সদা ক্ষিপ্র রেখে প্রায় নিয়মিত লেখা আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত ঘোষ। শুধু তাই নয়—বয়স, পাণ্ডিত্য ইত্যাদির খোলস মুক্ত হয়ে লেখা সংক্রান্ত স্বীয় দুর্বলতা-সীমাবদ্ধতার কথা অকপটে উল্লেখ করে সাগরময়ের পরামর্শ চেয়েছেন—কখনো তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন। আর কোনো সম্পাদকই মুজতবার সঙ্গে এতোটা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন না। 'দেশ'-এ 'পঞ্চতন্ত্র' কলামে প্রথম লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি সাগরময়কে লিখেছেন, "যদি কখনো পর পর দু তিনটে লেখা পড়ে মনে করো আমার লেখা ঝুলে পড়েছে ... তাহলে আমাকে জানিয়ো। কাঁচা লেখা, কিন্তু সৈয়দদার লেখা, তাই ছাপাতেই হবে, এ আমি চাইনে।" পত্রে তাঁর লেখার তিনটি শৈলীর (style)—গুরুগম্ভীর, হাস্যাত্মক ও মিশ্রিত—উল্লেখ করে জানতে চেয়েছেন কোন্ শ্রেণীর রচনার প্রতি পাঠকবর্গের আসক্তি। সে-সঙ্গে আশ্বস্ত করেছেন, "একটা দুটো লেখা মাঝে মাঝে কাঁচা হবে। তাতে ঘাবড়িয়ো না। হরবকত এক তাল রাখা বড় কঠিন।" পত্রশেষে 'পুনশ্চ' অংশে পাঠকের অভিনন্দনে উৎফুল্ল ও অনুপ্রাণিত লেখকমানস সমুদ্ভাসিত। "পুঃ। অমিতা শান্তিনিকেতন থেকে লিখেছে আমার লেখাটা (পয়লা) খুব ভালো হয়েছে। প্রমাণ হ'ল, অমিতা* আমাকে স্নেহ করে।" (প-৬২)।

'পঞ্চতন্ত্র' নিয়মিত পাঠকদের চিত্তবিনোদন ও মনন ক্ষেত্রের প্রসারণ ঘটিয়েছে উত্তরোত্তর। কিন্তু এর পশ্চাতে যে কী আন্তরিক প্রচেষ্টা সক্রিয় ছিল— সে-সংবাদ শুধু সম্পাদকই জানেন।— "দিল্লী অনেক দূর। সেখান থেকে 'পঞ্চতন্ত্রের' লেখা ঠিক সময়ে হাতে এসে না পৌছলেই চিত্তির। চোখে সর্ষে ফুল, এ-সপ্তাহে লেখা বুঝি বাদ গেল। বসে গেলাম চিঠি লিখতে, জোর তাগিদের চিঠি। সৈয়দদার ওই এক দোষ। নিত্য নিয়মিত-তাগাদার তাওয়া গরম না রাখলে ওঁর হাতের আঙ্গুল চলে না, কলমের কালি বরফ।"[২৪] আর বরফ গলানোর জন্যে 'উপরোধ, অনুরোধ উষ্মা, অভিমান সব কিছুর মসলা ঢেলে' নিয়মিত পত্র-তাগিদ দান সাগরময়ের ছিল নৈমিত্তিক দায়িত্ব।

মাঝে মধ্যে 'কঠোর অর্থাভাবের' কথা জানিয়ে মুজতবা তাঁকে চিঠি লিখেছেন। আর 'অর্থাভাব' তো ছিলো তাঁর নিত্য সঙ্গী। ২৮শে ফেব্রুয়ারী, '৬১-তে সাগরময়কে অনুরোধ, "তুমি দয়া করে ১০০টি টাকা T.M.O. করে পাঠাও।" (প-৮২)। ২৯ শে মে,

*ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা এবং ড. অমর্ত্য সেনের মাতা (প্রয়াতা) অমিতা সেন।

'৬১ সনে আনন্দবাজারের জ্যোতিষবাবুকে লিখেছেন, "ইতিমধ্যে আমি মহাবিপদে পড়েছি, ১) জলসা, ২) Calcutta Municipal Gazette, ৩) বসুমতী, ৪) আনন্দবাজার ...এদের কেউই দক্ষিণার টাকা পাঠায়নি। যে-কোন একজন পাঠিয়ে দিলেই আমার কোনো ভাবনা থাকতো না—দিন পনরোর জন্য।

... কানাইকে বলে, যদি আমার 'দেশে'র চার সপ্তাহের (মে মাসের) দক্ষিণা দুশ টাকা পাঠিয়ে দেন তবে উপকৃত হই।" (প-৮৩)। মুজতবা আলী লেখার পারিশ্রমিক যেমন অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো পাননি তেমনি কখনো অগ্রিম 'দাদন' নিয়ে কথামতো লেখা দিতে সমর্থ হননি।

সৈয়দ মুজতবা আলীর জ্ঞানের ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলেও লিখে অন্নসংস্থান করতে হতো বলে পাঠকের কথাও তাঁকে স্মরণ রাখতে হয়েছে। এবং লেখকের কাছে পাঠকেরও কিছু দাবী থাকতে পারে সে বিষয়ে তিনি ছিলেন সদাসচেতন। ফলে পণ্ডিতবর্গের চাহিদা সম্পূর্ণ পূরণ করতে সমর্থ না হলেও তিনি রম্যরচনার আবরণে 'সিরিয়াস' তথা গভীর জ্ঞানের কথাও পরিবেশন করেছেন। গুরু-গম্ভীর বিষয় লঘুশৈলীতে পরিবেশিত হওয়ায় তা' সাধারণের চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। সমালোচনামুখর কিছু পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি তাঁর রচনার Style-এর অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করেছেন—সামান্য বিলম্বে। দ্বিতীয় দফায় ধারাবাহিক 'পঞ্চতন্ত্র'-এর সূচনায় বিষয়বস্তু নির্বাচনের উদ্দেশ্যে তিনি সাগরময় ঘোষের নিকট কয়েকটি তথ্য জানতে চেয়েছিলেন।

"(১) লোকে কি চায় ?

(২) তার কতটা মেনে নিয়ে কি লেখা যায় ?

(৩) লোকে চায় না, অথচ লিখলে জনপ্রিয় হবে কি বস্তু ?

(৪) জনপ্রিয় হবে না, তবু আমার লেখা উচিত কি জিনিস।" (প-৭৭)।

মুজতবার চিরচঞ্চল মন তথা অস্থিরচিত্ততার উল্লেখ আমরা করেছি। অস্থিরতার জন্যেই তাঁর বহু বাসনা অপূর্ণ থেকে গেছে। জ্ঞানগরিমাপূর্ণ বিষয়বস্তুর সারগর্ভ আলোচনা করতে চেয়েছেন। মহাপুরুষদের জীবনী রচনার প্রবল ইচ্ছায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজ শুরুর ইঙ্গিতও রয়েছে। কিছু অসমাপ্ত রচনার সন্ধানও আমরা পেয়েছি এবং তাতে শুধু লেখকের মনোবাঞ্ছাই অপূর্ণ থাকেনি, আমরাও বঞ্চিত হয়েছি মূল্যবান সৃষ্টি থেকে। ১৪ই আগস্ট, ১৯৬৪-এর একটি পত্র :

"... শুধু মন চায়, মানুষের খুব প্রয়োজনীয় কোনো একটা কঠিন জিনিস—যেটা শাস্ত্রের জটিল ভাষার দরুন সাধারণের নাগালের বাইরে—সেই রকম কিছু একটা নিয়ে লিখি। লেখা আরম্ভও করেছিলুম, তারপর আর পেরে উঠি না। বাঙলা ভাষা যে দুর্বল সে দোহাই পেড়ে আর কি লাভ! নিজের দুর্বলতাটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো।" (প-৮৮)।

বন্ধুবাৎসল্য এবং আর্থিক কারণে মুজতবা আলী অন্যান্য পত্রিকায়ও লিখেছেন। এর মধ্যে সিনেমা পত্রিকা ও বহু অখ্যাত-অজ্ঞাত সাময়িকী এবং সংকলনও রয়েছে—অনেক লেখার সন্ধান পেলেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

বিংশ শতাব্দীর 'বিষ্ণুশর্মা' সৈয়দ মুজতবা আলী 'দেশ'-এ তাঁর বহু নন্দিত 'পঞ্চতন্ত্র'-এর কলাম প্রথম পর্যায়ে ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১ থেকে ২৩ শে আগস্ট, ১৯৫২ পর্যন্ত লেখেন। মূলত এই লেখাগুলোই ১৯৫২ সালে 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'ময়ূরকণ্ঠী' গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ' বছরই তাঁর প্রথম গল্প সংকলন 'চাচা-কাহিনী'ও প্রকাশিত হয়। মুখ্যত প্রথম

প্রকাশিত গ্রন্থচতুষ্টয়ই মুজতবাকে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছে দেয়। ১৯৫২-এর সেপ্টেম্বর থেকে '৬০-এর নভেম্বর পর্যন্ত 'দেশ'-এ পঞ্চতন্ত্র শীর্ষক মাত্র তিনটি লেখা প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ৮ই জুন, ১৯৫৭, ১৫ই মার্চ, ১৯৫৮ এবং ৮ই আগস্ট, ১৯৫৯ সালে। অতঃপর তিনি ১৯৬০ সালের ১০ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩-এর ১২ই মে পর্যন্ত একটানা 'পঞ্চতন্ত্র' লেখা অব্যাহত রাখেন। মধ্যে মধ্যে বিরতি হলেও একেবারে বন্ধ হয়নি। এই কলামে চরিতকাহিনী 'নয়রাট', ভ্রমণ কাহিনী 'ভবঘুরে' এবং 'কত না অশ্রুজল' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ২৪মে '৫২ থেকে ১১ই অক্টোবর '৫২, ২৫ শে মার্চ ১৯৬১ থেকে ৭ই অক্টোবর '৬১ এবং ১১ই জানুয়ারি ১৯৬৯ থেকে ৩রা মে ১৯৬৯ পর্যন্ত। একই কলামে 'বিদেশে', 'বাংলাদেশ' এবং 'উভয় বাংলা' পর্যায়ের লেখাগুলোর প্রকাশকাল যথাক্রমে ৩০শে জানুয়ারি ১৯৭১ থেকে ১ লা জানুয়ারি '৭২, ২০ শে মে ১৯৭২ থেকে ১১ই নভেম্বর '৭২ এবং ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ থেকে ৫ই মে ১৯৭৩ পর্যন্ত। 'পঞ্চতন্ত্র'-এ এবং তাঁর খ্যাতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় সৈয়দ মুজতবা আলীর সর্বশেষ লেখা 'ভাষা-বাঙলা' প্রকাশিত হয় ১২ই মে, ১৯৭৩-এ।

'পঞ্চতন্ত্র' কলাম যে কতোটা জনপ্রিয় হয়েছিলো তার উল্লেখ রয়েছে সমকালীন একজন প্রখ্যাত রস-স্রষ্টার স্মৃতিচিত্রে—"আমাদের দেশের তান্ত্রিক মতের সাধক সম্প্রদায়ের কথা জানা আছে, কিন্তু সেটি একতান্ত্রিক। মুজতবা আলী বহুদিন যাবৎ পঞ্চতান্ত্রিক হয়েছে, অর্থাৎ প্রায় বিষ্ণুশর্মা। এ তন্ত্র প্রজাতন্ত্র স্বৈরতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রের সঙ্গে মিলবে না।"[২৫]

সৈয়দ মুজতবা আলী দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় 'রায় পিথৌরা' ছদ্মনামে ৩০ শে অক্টোবর, ১৯৫১ থেকে ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫২ পর্যন্ত 'দেহলি প্রান্তে' এবং ৬ই জানুয়ারি, ১৯৫৩ থেকে ২১শে এপ্রিল, ১৯৫৩ পর্যন্ত 'সপ্তপর্ণী' কলাম দুটো প্রায় নিয়মিত লিখেছেন। এতে অন্যান্য বিষয় ব্যতীত দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাষ্ট্রভাষা এবং বঞ্চিত বাঙালীর বঞ্চনার স্বরূপ ও তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে নানাভাবে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন।

মুজতবা আলীর তিনটি উপন্যাসই সর্বপ্রথম 'দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১. অবিশ্বাস্য : ৭ই নভেম্বর, ১৯৫৩ থেকে ৩রা এপ্রিল, '৫৪, ২. শব্‌নম্: ১৪ই মে, ১৯৬০ থেকে ২৭ শে আগস্ট, '৬০ এবং ৩. শহ্‌র্-ইয়ার: ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ থেকে ২রা আগস্ট, '৬৯-এর মধ্যে প্রকাশিত। ১৯৭২ সালে লেখা চতুর্থ উপন্যাস 'তুলনাহীনা' তাঁর মৃত্যুর পর এপ্রিল, ১৯৭৪-এ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ভ্রমণকাহিনী 'জলে-ডাঙায়' মাসিক 'বসুমতী'র ছোটদের আসরে বৈশাখ, ১৩৬১ থেকে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে মুদ্রিত হয়েছে। অনিয়মের জন্যে লেখক খুদে পাঠক-পাঠিকার কাছে সবিনয় মার্জনা প্রার্থনা করেছেন।[২৬]

অপর ভ্রমণকাহিনী 'মুসাফির' আনন্দবাজারে ১৩ই নভেম্বর, ১৯৫৮ থেকে ৫ই মার্চ, ১৯৫৯ পর্যন্ত ১৬ কিস্তি প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। যদিও ষোড়শ কিস্তির শেষে নিবেদন ছিল, "অনিবার্য কারণবশতঃ 'মুসাফির'-এর পরবর্তী অংশের প্রকাশ ছয় সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকিবে।"— কিন্তু অবশিষ্টাংশ আনন্দবাজারে আর প্রকাশিত হয়নি—১৯৭১-এর নভেম্বরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে মুদ্রিত 'পাকিস্তান লেখক সংঘের' পূর্বাঞ্চল শাখা প্রকাশিত মাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্র 'পরিক্রম'-এর ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ সংখ্যায় মুজতবা আলীর ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত একটি নিবন্ধ 'সিলেটী' প্রকাশিত হয়।

০৬.

ষাটের দশকে সৈয়দ মুজতবা আলীই ছিলেন বাঙলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তম লেখক— উক্তিটি অতিশয়োক্তি নয়। ফলে কিছু বৈরী সমালোচক এবং বিরুদ্ধবাদীর আবির্ভাব স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছিলো। অবশ্য ভক্তের তুলনায় এদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য। মুজতবার এক গুণমুগ্ধ বন্ধুর পত্রে এদের স্বরূপ ও মনোবৃত্তি আংশিক উপলব্ধি করা যায়। ১৯৫৫ সালে তিনি লিখেছেন :

"বাংলা লেখক ছাড়া আর সকলেই আপনার ভক্ত। লেখকরা jealousy complex-এ ভক্ত হতে পারে না। তাদের ৫ বছরে দ্বিতীয় সংস্করণ হয় আর আপনার হয় বছরে ৮টা - ১০টা মুদ্রণ। কি করে তারা আপনাকে down করবার cheap notoriety-র লোভ সামলাতে পারবে ? যে পাঁচখানা অপূর্ব্ব বই লিখে বাঙ্গালী পাঠকের (রসিক ও অরসিক উভয়েরই) চিত্ত জয় করেছেন তা শত্রুর শাণিত অস্ত্রের অসংখ্য আঘাতও ব্যর্থ করবে। 'পরশুরামের' ও আপনার লেখা অতুলনীয়; বাংলা ভাষায় এদের জোড়া নেই।" (প-২১২)।

এ' প্রসঙ্গে প্রকাশক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন :

"... আমরা তাঁর (সৈয়দ মুজতবা আলীর) 'পঞ্চতন্ত্র', 'ময়ূরকণ্ঠী', 'অবিশ্বাস্য' ইত্যাদি বই প্রকাশ করি। 'পঞ্চতন্ত্র' (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হবার মাত্র দু'-তিন মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। 'অবিশ্বাস্য' এক সপ্তাহে ১১ শত কপি বিক্রয় হয়। ১৯৫০ থেকে '৬০-এর মধ্যে মুজতবা আলী সর্বাধিক জনপ্রিয় বাঙালী সাহিত্যিক।" (সা-৪১)।

চাকুরি নেই। সুতরাং লিখেই সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হয়েছে। এবং এই 'জনপ্রিয়' সাহিত্যিককে প্রকাশকরা যে কী দরাজহস্তে [!] প্রাপ্য টাকা বুঝিয়ে দিতেন কিংবা নোতুন লেখার জন্য অগ্রিম 'দাদন' দান করতেন তার নমুনা হিসেবে ৭/৮ মে, ১৯৬৭ সনের একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত হলো। ঃ

"(1) Under Mitra Ghosh : Received by M.O. on the 6th May as 'advance for a new book.' Rs 100/- (one hundred).

(2) Under Ananda-Publishers cheque No. B 342164, dated th 27th April, 67 as "Advance ag. Royalty, Rs. 500/- (five hundred.)

(NB Although written as "advance" Phani Deb tells me that as far as he recollects they owe me some money; kindly therefore get a statement of account from them.)

(3) Under Triveni Publications : cheque No. B 118880, dated the 5th May '67 (signed by N. K. Goswami & sushil Bannerji) for Rs. 500/- (five hundred)." (প-৫১)।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে সৈয়দ মুজতবা আলীর উত্থান তথা সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 'দেশ' পত্রিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও Formal ছিলো না। এই পত্রিকার প্রতি মুজতবার বিশেষ দুর্বলতা বরাবর ছিলো। সাধারণতঃ কোনো নোতুন লেখা সমাপ্ত হলে তিনি সাগরময় ঘোষকে জানিয়েছেন এবং পূজোর সময় তাঁর বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ লেখা 'দেশ' পত্রিকাতেই দিয়েছেন। (প-৮০)। তাঁর রচনা অন্যত্র প্রকাশিত হলে কখনো কখনো 'দেশ-সম্পাদক' অনুজের দাবীতে

অভিমানও করেছেন। ইরাক-সম্পর্কিত একটি নিবন্ধ কোনো দৈনিকে প্রকাশিত হলে সাগরময় রচনাটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং লেখাটি থেকে 'দেশ'-কে বঞ্চিত করায় কিছুটা অভিমানও প্রকাশ পায়। প্রত্যুত্তরে মুজতবা সান্ত্বনা দানের সুরে লিখেছেন, 'দেশে' যে লেখা যেতো না তা নয়, কিন্তু যে ঢঙে রচনাটি আরম্ভ করি সেটি প্রধানতঃ দৈনিক কাগজের, দেশের মত সাহিত্য-ঘেঁষা পত্রিকার জন্য নয়।" (প-৭৫)।

পত্রিকা 'বিজ্ঞাপনে কণ্টকাকীর্ণ' দেখে তিনি সম্পাদককে সতর্ক করতে গিয়ে স্মরণ করিয়ে দেন, "বিজ্ঞাপন না নিয়ে 'সবুজপত্র' মরে, বেশী নিয়ে STRAND মরে।" (প-৭০)। এটা শুধু প্রবীণের অযাচিত উপদেশ বর্ষণ নয়, পত্রিকার প্রতি প্রীতিবশতঃই এই সাবধান বাণী। আলী সাহেব অসাধারণ পণ্ডিত হলেও সম্পাদকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল পূর্বাপর। তাঁর একটি লেখার বিরুদ্ধে অযৌক্তিক প্রতিবাদ এলে সম্পাদক তা' মুজতবার গোচরীভূত করেন। উত্তরে তিনি জানান, "সম্পাদক হিসেবে এ নিয়ে আলোচনা করা দেশের এবং দশের পক্ষে লাভ কি, না, সে সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ দেবার মত ঔদ্ধত্য আমার নেই। 'Kick up a row, & sell!' এটা আমেরিকান পদ্ধতি। আবার সব Controversy এড়িয়ে গেলে কাগজ পানসে হয়ে যায় এবং দেশের লোককে মত প্রকাশ করতে না দিয়ে তার প্রতিও কর্তব্য বিচ্যুতিও হয়। এ-দুটোর মাঝখানে যিনি উত্তম লাইন কাটতে পারেন তিনিই উত্তম সম্পাদক। ওটা তোমাকেই স্থির করতে হবে। ভগবান সেখানে তোমাকে সাহায্য করুন।" (প-৭২)। পত্রাংশটি আলী সাহেবের উদার সহিষ্ণু মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। শুধু তাই নয়, মুজতবার পরম শ্রদ্ধেয় এবং বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম মহীরুহ রাজশেখর বসুর জীবনসায়াহ্নে তিনি সাগরময়কে অনুরোধ করেন যেন 'দেশে' শ্রীযুক্ত বসুর শেষ লেখাটি প্রকাশিত হয়।— " শেষবারের মত 'দেশ'-ই যেন তাঁর লেখা ছাপাবার সম্মান পায়—'এ সম্মান সে অর্জন করেছে'—এই কথা বলতে পারো।" (প-৭৮)। একই পত্রে তখনো প্রায় অজ্ঞাত ফাদার ফালোঁ এবং ফাদার দ্যতিয়েনের প্রতি সাগরময়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উদ্দেশ্য 'দেশ' যেন এই বিদেশীদের লেখা প্রকাশের গৌরব অর্জন করতে পারে। মুজতবার এই আন্তরিক শুভেচ্ছার ফলপ্রসূ অবদান 'দেশ'-এর পাঠকবর্গ সানন্দে উপভোগ করেছেন। লেখক এবং সম্পাদকের মধ্যে আত্মিক যোগ যে কতোটা শুভদায়ক ও ফলপ্রদায়িনী হতে পারে সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে 'দেশ'-এর সম্পর্ক তার অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

জনপ্রিয়তার শীর্ষে থেকেও মুজতবা আলী তাঁর সুহৃদদের বিস্মৃত হননি এবং সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পশ্চাতে যাঁদের অনুপ্রেরণা ও সহানুভূতি সহায়ক হয়েছিলো সকৃতজ্ঞচিত্তে তিনি তা স্মরণ করেছেন। ১৩ই জুন, '৬৩-র এক চিঠিতে সাগরময় ঘোষকে লিখেছেন :

"... বাঙলা সাহিত্যে আজ আমার যে-স্থান তার জন্য তুমিই প্রধানত—প্রধানত কেন, সবচেয়ে—দায়ী (কানাইও কিন্তু সে অন্যভাবে)। আমি কল্পনাই করতে পারিনে, কত লোকের কত আপত্তি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ তুমি সহ্য করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বছরের পর বছর আমার পঞ্চতন্ত্র ছাপিয়েছ! তার অনেকগুলো, আজ বুঝি, একেবারে অখাদ্য। ... দুদশটা flop লেখাতে বিচলিত হওনি। ... একাধিকবার বন্ধ করেছি। তুমি আবার undaunted, undefeated হয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লিখিয়েছ। আর কী Carte blanche-ই না তুমি আমাকে

দিয়েছ! কখনো একটা লাইন কাটো-নি, একটা শব্দও বদলাওনি। যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, assistant-দের বলছো, 'ঐরকমই ছাপান। কে জানে, ওর মাথায় কি ? কোন্ দিকে নল চালাচ্ছেন, ভগবান জানেন।' ... আমার লেখার জন্য আমাকে তুমি যতখানি সেধেছো, এমনটা আমার চেয়ে অনেক গণ্যমান্য লেখককে—indeed কাউকেই করোনি। ...

আর এ-সব করে আসছ, প্রথম দিন থেকেই। যখন আমায় কেউ চিনতো না।

এ-কথা বলছি না, তুমি সাহায্য না করলে আমি একদম অখ্যাত থেকে যেতুম। কিন্তু এ-কথা কসম খেয়ে বলবো, এমনিতেই আমার লেখার volume কম; তুমি না খোঁচালে এর অর্ধেকও হত না। 'পঞ্চতন্ত্রে'র যদি কোনো মূল্য থাকে ... তবে তার সৃষ্টিকর্তা তুমি!" (প-৭৮)। এবং এ' কারণেই সাহিত্যজগত থেকে কোন অজ্ঞাত অভিমানে বিদায় নিতে ইচ্ছুক মুজতবা সসঙ্কোচে লিখেছেন, "...আমি সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে চাই। সে ইঙ্গিত আমি ইতিপূর্বেই দিয়েছি। তুমি তখন নিশ্চয়ই ideal ছোট ভাইয়ের মত বলেছ, What nonsense! It is I who shall decide when Syed-da is to retire—if at all!' এবারে তুমি আমাকে সে Rightটা দাও।" (পে-৮৭)। পরবর্তী সময়েও দু-একবার এ ধরনের অশুভ ইঙ্গিত দিয়ে মুজতবা তাঁর ভক্তবৃন্দকে আতঙ্কিত করেছেন। ১লা ডিসেম্বর, '৬৭ সালে আলী সাহেবের উদ্দেশে জনৈক বিচলিত পাঠকের পত্র :

"এক প্রবন্ধে আপনার অবসর নেওয়ার চিন্তা আমাদের মত শত-সহস্র আপনার অনুরাগী পাঠককে পীড়িত করছে। ভগবান করুন আপনার এ রকম দুর্মতি যেন জীয়ন্তে না হয়।" (প-১৯৮)। তাঁর লেখার প্রতি ভক্তদের অনুরাগ কতো গভীর এবং রচনার মধ্য দিয়ে লেখক-পাঠকের মধ্যে যে বন্ধুত্ব ও প্রীতিপূর্ণ মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে তার স্বাক্ষর বিধৃত পুলিশের জনৈক এস. আই.-এর পত্রে : "প্রিয় লেখক মহাশয়, আপনি এত কৃপণ কেন ? লেখেন ত কুল্লে দেড়পাতা ...এর উপরে আবার এই সপ্তাহের 21/8/71 দেশে আপনার লেখা না দেখে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছি।

দেশ খুলেই প্রথম আপনার লেখাটা না পড়তে পারলে মনে হয় যেন বইটার শুরুটাই মজার হয়নি।" (প-২০০)। শুধু সাধারণ পাঠকই নন, 'দেশ' পত্রিকার বহু গুণী পাঠক-সাহিত্যিকও একই অভিমত পোষণ করতেন। ১৯৭৩-এর জুলাই মাসে আলী সাহেবকে লেখা সাহিত্যিক ও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র :

" 'দেশ' পত্রিকায় অনেকদিন আপনার লেখা নেই, তাই ঐ পত্রিকার স্বাদ আজকাল আমার কাছে জোলো লাগে। কলকাতায় আপনার সঙ্গে আমার অবশ্য দেখা হতো না বিশেষ—তবু অনেকের মুখে শুনছি, আপনি নেই বলে এই শহরটাও যেন ফাঁকা ফাঁকা! আপনি আপনার দাদাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে... আত্মজীবনী লিখছেন কবে ? এটা আমাদের দাবী।" (প-২১০)। এ' দাবী কখনো গ্রাহ্য হয়নি। কেননা, আলী সাহেবের বিবেচনায় 'আমার জীবন এমন কিছু একটা নয় যা নিয়ে লোকের কৌতূহল থাকতে পারে।"[২৭] এ সব প্রশস্তি অবহেলে হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার কি অপূর্ব ক্ষমতাই না তিনি ধারণ করতেন, "আপনি যখন আপনার naif সরলতায় বলো আমার লেখা না থাকলে "দেশ" ফাঁকা ২ ঠেকে, তখন বলতে ইচ্ছে করে, "হাসাস্নি রে ছোঁড়া, হাসাসনি—বগল ঘামিয়ে হাসাসনি।" বাগদাদের এক খলিফার ৪০ বৎসর রাজত্বকালে একবারের তরেও

দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনাবৃষ্টি, বন্যা, যুদ্ধবিগ্রহ কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। ও দিকে হারুন-অর-রশীদের তাবৎ দৌলৎ তাঁর ভাণ্ডারে তো ছিলই, ... সেই সম্রাট আমীর-উল-মুসলিমীন, খলিফাৎ উল-মুসলিমীন, জিল্লুল্লাহ (ধরণীতে আল্লার ছায়াময় প্রকাশ) তাঁর রোজনামচাতে লিখেছেন, "হিসেব করে দেখলুম, আমার জীবনে মাত্র এগারোটি দিন আমি, যাকে বলে 'সুখীর জীবন' সেই কাটিয়েছি।" আমার সাকুল্য লেখাতে যদি এগারোটি ছত্র মাত্র আমি পাই যা পড়ে বলতে পারি, "বাঃ! বেশ হয়েছে" তবে আল্লাহর দরবারে আমার কোনো ফরিয়াদ নেই। বাগ্দেবীকে বলবো, "সুন্দরী, এগারোটি ছত্র তোমার অঞ্চলের বাতাস পরশ পেয়েছে" এবং ড্যাং ড্যাং করে পাড়ি দেবো দু'কান-ছোঁয়া হাসি হেসে, আপন পিঠ আপনি থাবড়াতে থাবড়াতে। এগোরোটা ছত্র। বাপ্‌স্!" (প-১৫৪)।

০৭

সৈয়দ মুজতবা আলীর অনুবাদ কর্মের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'প্রেম'। এটি মাসিক চলচ্চিত্র পত্রিকা 'উল্টোরথ'-এ পূজো সংখ্যা ১৯৬৫-তে প্রকাশিত। পত্রিকা কর্তৃপক্ষের বিষয়বুদ্ধি সম্পর্কে মুজতবা সামান্য আভাস দিয়েছেন।

"উল্টোরথের লেখাটা অনুবাদ। তাই বেদম খাটতে হয়েছে। সিঙ্গী* সেটা চেপে গেছে। জানে অনুবাদ লোকে পড়তে চায় না।" (প-৮৯)। পত্রিকার বিজ্ঞাপনে 'প্রেম'-কে মুজতবার মৌলিক রচনা হিসেবে চালানোর চেষ্টা হয়েছিলো। এই পত্রিকায় তাঁর আরেকটি অনুবাদকর্ম আন্তন চেখফের 'বিয়ের প্রস্তাব' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সনের জানুয়ারি সংখ্যায়। মুজতবার অপর দুটো অনুবাদ রিচার্ড কনেলের 'সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় শিকার' এবং আলফঁস দোদের 'বুড়োবুড়ী' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মাসিক 'কথাসাহিত্য', আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৭২ সংখ্যায় এবং 'দেশ'-এর 'পঞ্চতন্ত্র' কলামে ১২ই মার্চ, ১৯৬৬ সনে। 'ময়ূরকণ্ঠী'তে সংকলিত 'ভারতীয় নৃত্য' শ্রীমতী ঠাকুরের গুজরাতি নিবন্ধের অনুবাদ।

মুজতবা আলীর সর্বশেষ কবিতা 'সোক্রাতেসের প্রার্থনা' মুদ্রিত হয় 'কথা সাহিত্য'-এর পৌষ, ১৩৭১ সংখ্যায়।

কবিতা সংক্রান্ত আলোচনা 'কাব্যলোক' 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় এপ্রিল-জুন, ১৯৭৩-এ প্রকাশিত।

দৈনিক পত্রিকায় সৈয়দ মুজতবা আলীর সর্বশেষ কলাম 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' ঢাকার 'দৈনিক পূর্বদেশ'-এ ২১শে জুলাই, ১৯৭৩ থেকে ২৪শে অক্টোবর, '৭৩ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের নেপথ্য কাহিনী এর অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে। লেখকের লোকান্তরের পর এটি ফাল্গুন, ১৩৮২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

ছোটদের উদ্দেশে রচিত মুজতবা আলীর কিছু লেখার মধ্যে দৈনিক আনন্দবাজারে ছোটদের আসর 'আনন্দ মেলা'য় ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১-এ প্রকাশিত 'ক্লাইন এর্ণা-য় তিনি স্বয়ং ছবিও এঁকেছিলেন। তাঁর একটি বেতার কথিকা 'গুরুদেব' ছোটদের আসরে

*প্রসাদ সিংহ।

আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এবং ৭ই অক্টোবর, ১৯৫৩ সনে 'বেতার জগৎ'-এ প্রকাশিত।

সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টির স্বীকৃতি হিসেবে আনন্দবাজার পত্রিকার পক্ষ থেকে ১৩৭৬ সালে সৈয়দ মুজতবা আলীকে 'সুরেশ স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

জনপ্রিয় 'বাক্‌শিল্পী' নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা এবং সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভের পরও নিজেকে একজন "বিশিষ্ট সাহিত্যিক" হিসেবে পরিচয় দানে অস্বস্তি বোধ করতেন, কুণ্ঠিত হতেন। ১৯৬৯-এ আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে যশস্বী সাহিত্যিকদের জন্যে একটি অনুষ্ঠান 'কি করে সাহিত্যিক হলাম' সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয় এবং মনোনীত সাহিত্যিকরা এই অনুষ্ঠানে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। মুজতবা আলী কিছুতেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে রাজী হননি। গর্‌রাজীর হেতুটি সুযৌক্তিক কি না সে বিষয়ে বিতর্ক চলতে পারে—কিন্তু তাতে কোনো রকম ভণ্ডামী কিংবা প্রতারণার লেশমাত্র ছিলো না। এ' বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রায় একযুগ পূর্বে ব্যক্ত করেছিলেন। 'দেশ'-এ 'আমার সাহিত্যজীবন' শীর্ষক 'কলামে' লিখবার জন্যে খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানানো হলে মুজতবা অস্বীকৃতি জানিয়ে সম্পাদককে লিখলেন:

"নিজের 'সাহিত্যজীবন' (বা অন্য কোনো জীবন) নিয়ে লেখার মত দম্ভ এখনো আমার হয়নি–...

তার চেয়েও মারাত্মক, যদি কোনো হীনপ্রাণ লেখক...হঠাৎ বলে ওঠে রবিবাবু আমার গুরু—তখন রবিবাবুর কি অবস্থা হয় ? যদি মনে করো,...মত নির্ভেজাল dull লেখক যদি বলে উঠে 'পরশুরাম তার লেখার' উপর 'প্রভাব' বিস্তার করেছেন সবচেয়ে বেশী তখন রাজশেখর বাবুর মনের অবস্থা কি হয় ?...

অতএব বৎস, জেনে রেখো, এ-সব বাবদে লেখকরা সব সময় সাধু নয়। কার কাছে সত্যই ঋণী সেটা লুকোবার জন্য বাৎলে দেবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তির নাম—শুঁড়ী যে রকম পুলিশকে বাৎলে দেয় উল্টোপথ; যে পথে মাতাল আদপেই যায়নি।" (প-৭৪)। শেষ পর্যন্ত আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্রের তৎকালীন Programme Executive এবং আলী সাহেবের স্নেহধন্য শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তীর অনুরোধ-অভিমানে তাঁর মন কিছুটা কোমল হয় এবং নিজের সাহিত্যিক হওয়ার নেপথ্যকাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

'...."এ দেশে সব্ব ধাপ্পাবাজিতে মানুষ হার মানার পর হয় বনে যায় পলিটিশিয়ান, নয় লেখক। তোমার (মুজতবা আলীর) বেলাও কি তাই ?"...বলি 'জ্বি'। কারণ, নাম্বার ওয়ান,—আমি আদৌ বিশ্বাস করিনে, আমি সার্থক লেখক। আমি ফার্স্ট ক্লাশ লেখক তো নই-ই, সেকেণ্ডও নই। মেরেকেটে ইন্টার ক্লাশ।...

দুই নম্বর : আমি মা গঙ্গায় কোমর অব্দি ডুবিয়ে তাঁবা-তুলসী স্পর্শ করে, মাতায় কোরান শরীফ রেখে, যজ্ঞোপবীত উত্তোলন করে তথা ক্রুশচিহ্ন ভক্তিসহ স্পর্শ করে বলছি, বৌদ্ধদের ত্রি-শরণের দ্বিতীয় শরণ স্মরণ করে 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি' উচ্চারণ করে বলছি, ধর্ম জানেন আমি কক্‌খনো কস্মিনকালেও সজ্ঞানে অজ্ঞানে সাহিত্যিক হতে চাইনি।

তিন নম্বর : আমি আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সর্ব সমক্ষে কোনো কিছু বলতে বড়ই লজ্জা বোধ করি। হয় সত্য গোপন করতে হয়, নয় ডাহা মিত্যে কতা কইতে হয়।...

চার নম্বর : আমি কোনো প্রকারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গ সাহিত্যাঙ্গনে পদক্ষেপ

করিনি। আমার এমন কোনো বাণী নেই, এমন কোনো message নেই—যা' না বললে এই সোনার বঙ্গভূমি কোনো প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি সেথায় নেমেছি সুদ্দুমাত্র পেটের অন্নের জন্যে। আজ যদি আমি ডার্বিতে বা চুরিচামারি করে লাখ পাঁচেক টাকা পেয়ে যাই, তবে অতি অবশ্যই, কলেমা খেয়ে বলছি—ভবিষ্যতে আর কলম ধরবো না।..."[২৮]

কারণে-অকারণে অনেক সময় মুজতবা আলী অন্যের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়েছেন। তিনি পারতপক্ষে যাবতীয় কোন্দল বিতর্ক থেকে সন্তর্পণে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। তাঁর ঋজু বক্তব্য: "আমাকে আক্রমণ করে এযাবৎ যেসব incompetent লেখা বেরিয়েছে আমি তো তার একটারও উত্তর দিইনি। তাতে সময় নষ্ট, শক্তিক্ষয় এবং সব বেফায়দা।"[২৯] একটি অমূলক অভিযোগের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন:

"...অতিশয় অনিচ্ছায় সবিনয় নিবেদন, আল্লা সামনে, আমি সস্তা দামী কোনো হাততালির জন্য কখনো লিখিনি। তবে একথা নিশ্চয়ই সত্য, আমি পণ্ডিতজনদের জন্য লিখেছি অতি অল্পই। প্রধানত লিখেছি সেই ম্যান ইন দি স্ট্রীটের জন্য, যে হয়ত সামান্য ইংরিজি জানে, বাংলাটা মোটামুটি বুঝতে পারে এবং সিরিয়াস বই পড়তে নারাজ। ...দশম শতাব্দীর কবি আবদুর রহমান (অদ্‌হমান) তাঁর কাব্য, অপভ্রংশে লেখা সন্দেশ রাসকে বলেছেন, 'পণ্ডিতজন কুকবিতার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন না, আর অজ্ঞজন অজ্ঞতাবশত কবিতায় প্রবেশ করে না। এজন্য যে মূর্খ নয়, এবং পণ্ডিতও নয়, অর্থাৎ মধ্যম শ্রেণীর, আমার এ কাব্য তার জন্য।"[২৯]

আলী সাহেবও সমগোত্রের। এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস:

"...posterity-র জন্য যারা লেখে তারা এ generation ও generation কাউকেই কিছু দিতে পারে না। আমার লক্ষ্য তো আরো সীমাবদ্ধ। আমি লিখি যারা 'পানি পিয়ে পিছে জাত বিচারে'—অর্থাৎ রসের বাজারে যারা ছুঁৎবাইগ্রস্ত নয়'—তাদের জন্য, এবং এই দু পাঁচ বছরের জন্য। কিছুটা সফল হয়েছি, কারণ unluckily for mother Bengali & luckily for myself. এখন বাংলা সাহিত্যে আমার মতো বাজে লেখকদেরই জয়-জয়কার। এক রাজশেখর বাবুকেই লেখক বলা যেতে পারে। গল্প না ওৎরালেও তাঁর সব সময়ই একটা Standard থাকে। আর আমাদের হল তাক্-তুক্কার কারবার।" (প-২৩২)।

মুজতবার কোনকিছুই গোপন ছিলো না। পানীয়ের প্রতি তাঁর দুর্বলতার কথাও অপ্রকাশ নয়। তিনি স্বয়ং অনেকটা কৈফিয়তের সুরে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গীতে বলেছেন, "আমি ভ্রমণের খোঁয়ারী ভাঙ্গি মদ্যপান করে। সাদা চোখে পাটনা, কলকাতা, হেথা হোথা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য স্পেশাল সলুনে যদি আমার কেতাবপত্র কেউ গুছিয়ে দেয় তবে অন্য কথা। কিংবা/এবং যদি অসাধারণ কোনো গুণীর সঙ্গ পাই। তিনি তখন এমন সব কথা বলবেন যে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা তখন furiously তার সঙ্গে fight দেবে। অর্থাৎ আমার মনটা ভূতের মত। তাকে সর্বক্ষণ কাজ না দিলে সে আমার ঘাড় মটকাতে চায়। তখন তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে দি।"[৩০] সেই 'মাতাল মনটা' আর কখনো সুস্থ স্বাভাবিক হয়নি। স্বয়ং মদ্যপান করেছেন অপরিমিত। পানাসক্তিই তাঁর জীবনীশক্তি ও সৃজনশীলতাকে পঙ্গু করে দেয়। কিন্তু 'শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে পানীয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অবশ্যম্ভাবী'—এই ভণ্ডামীকে তিনি সরাসরি অগ্রাহ্য করেছেন।

"মদ্যপান করলে ভালো লেখা বেরয় এ কথা আমি বিশ্বাস করিনে। মেঘনাদ কাব্য রচনার সময় মাইকেল ক্লান্তি দূর করার জন্য অল্প খেতেন, শেষের দিকে যখন মাত্রা বেড়ে গেল, তখন দু'চার পাতা লেখার পরেই বে-এক্তেয়ার হয়ে ঢলে পড়তেন—তাঁর গ্রন্থাবলী সেসব অসমাপ্ত লেখায় ভর্তি। এবং তার চেয়েও বড় কথা, আপনি আমি মাইকেল নই। একখানা মেঘনাদ লিখুন; তারপর না হয় মদ খেয়ে লিভার পচান—কেউ আপত্তি করবে না।"৩১

'দেশে-বিদেশে' মুজতবা আলীর খ্যাতির মূলে এবং এটিই যে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা—এ' প্রায় সর্বজনসম্মত অভিমত। "বার বার চেষ্টা দিয়েছি, কিন্তু এখনো 'সর্বশ্রেষ্ঠ' রচনা লিখতে সক্ষম হইনি।"৩২ —এ উক্তি সত্ত্বেও সম্ভবতঃ 'দেশে-বিদেশে'র শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মুজতবার মনে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। পুস্তকটি সম্পর্কে আশাবাদী লেখকও কাবুলী প্রবাদের স্মরণে মনে করেন:

"সিংহের এক বাচ্চাই ব্যস্ (যথেষ্ট)।" বইখানি (দেশে-বিদেশে) তাই এখনো লিক্‌লিক্ করে টিকে আছে।"৩৩

৩৮.

এ' দেশে লেখাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ যে কতোটা দুঃসাহসিক কর্ম সেটা আলী সাহেব সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। সম্পাদক-প্রকাশকের ঔদ্ধত্য ও নির্মম শঠতা তো রয়েছেই। তদুপরি পাঠকের সংখ্যা নগণ্য—ক্রেতার হাল লেখকের পক্ষে আশঙ্কাজনক। সুতরাং নামীদামী লেখকের বইয়ের এক সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার পূর্বে তাঁদের অনেকেরই প্রাণ-প্রদীপ নির্বাপিত হয় আর্থিক অনটনে। লেখকদের মর্মন্তুদ অবস্থা হাসির আড়ালে অশ্রুজলে প্রকাশ করেছেন তিনি।

"বিধাতা গয়লা আমার লেখাতে যেমন যেমন শনৈঃ শনৈঃ ব্যাকরণের ভুল বাড়াচ্ছেন, শৈলীর শিরদাঁড়া আর ভাষায় পাঁজরকটা মট মট করে ভাঙছেন, আমার বইয়ের কাটতি তেমন তেমন হুশ্ হুশ্ করে বেড়ে যাচ্ছে। পূর্বে যে-স্থলে আড়াইশ' বইয়ের এক সংস্করণ কাটতে ঝাড়া কুড়িটি বছর কেটে যেত এখন মাত্র উনিশটি বছর! হরি হে তুমিই সত্য।"৩৪

সৈয়দ মুজতবা আলীর বেশ কিছু অসমাপ্ত রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাওয়া গেছে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম করার বাসনা তাঁর ছিলো। এবং দু'-একটির কাজ শুরু করার উল্লেখও তাঁর পত্রাদিতে রয়েছে। সেগুলো সমাপ্ত হয়নি, কোনো পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়নি। বরোদায় থাকাকালীন " 'মিরাতে আহমদী' নামক আরবী ভাষায় লেখা গুজরাটের ইতিহাস অনুবাদ ও সম্পাদনায় হাত দেন। নানা কারণে এ কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। পরে পাণ্ডুলিপি দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হয়ে যায়।"৩৫

৮ই নভেম্বর, ১৯৬৬ সনের এক পত্রসূত্রে জানা যাচ্ছে তাঁর দুটো গ্রন্থ—১. হযরত মুহম্মদের জীবনী এবং ২. হিটলারের জীবনী—অর্ধসমাপ্ত হয়ে আছে। (প-১৩৮)

হিটলারের প্রামাণিক জীবনী লেখার প্রস্তুতি তিনি বহু পূর্ব থেকেই নিচ্ছিলেন। সহোদরাকে লেখা ১৯৫৪ সনের একটি পত্রাংশ :

"তোমাদিগকে বেনামিতে, কটুকাটব্য করিয়া যে উপন্যাস লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তাহা আর উপস্থিত হইল না। 'অবিশ্বাস্য' শীঘ্রই বাহির হইবে।...

তারপর 'জলে-ডাঙ্গায়'—...

তারপর 'হিটলার'। বোধ হয় তিন খণ্ডে সমাপ্ত হইবে। সেই উপন্যাস তার পর। এবং যদি তখনো মনে হয়, কলম যথেষ্ট পাকে নাই তবে আরো দেরীতে। কিম্বা হয়ত ততদিনে বেহেশ্‌তে আম্মা ও জাহানারার সঙ্গে চন্দ্র-সূর্য ভ্রমণের জন্য টাইম-টেবিল দেখিতেছি।" (প-১৬২)

সেই 'উপন্যাস'টি সম্ভবতঃ আর লেখা হয়নি এবং তাঁর পরিকল্পিত 'হিটলার' প্রসঙ্গে বন্ধুকে লেখা ১০ই জুন, ১৯৬৭ সনের পত্র : "...I have grave doubts whether I shall ever be able to finish my book on "Hitler" for which I have been collecting material since 1934 & for which another journey is absolutely essential. Even then who knows? Alas, the spirit is willing but the Flesh is weak. But should I ever be able to finish it, this much remains 'Puccah', that I shall seek permission from you to dedicate the book to you." (প-১৪৩)।

এই সংবাদে উৎফুল্ল আত্মীয় ও বন্ধু আমীনুর রশীদ চৌধুরীর পত্রোত্তর:

"...It is very kind of you to think of dedicating the book on "Hiter" to me. I can only say that it would be great honour." (প-১৯৪)

মুজতবা আলী ১৯৭০-এ শেষবারের মতো জার্মানী ভ্রমণও করেন। কিন্তু ঈপ্সিত ও বহু কাঙ্ক্ষিত 'হিটলার' আর প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য ১৯৭০-এ 'হিটলার' নামে তাঁর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—প্রকৃতপক্ষে সেটি হচ্ছে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে হিটলার সম্পর্কে তাঁর লেখা প্রবন্ধের সংকলন এবং গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছে তাঁর স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মিত্র ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী অর্চনা মিত্রের নামে। উল্লেখ্য শেষবার জার্মানী যাওয়ার ব্যাপারে শ্রীমিত্র আলী সাহেবকে নানাভাবে সাহায্য করেন এবং কোলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর নিজ ব্যয়ে তাঁর সুচিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন।

৭ই জুন, ১৯৬১ সনের অপর একটি পত্র :

"...একটা উপন্যাস বছর তিনেক পূর্বে লিখতে আরম্ভ করেছিলুম কিন্তু বিরাট উপন্যাস লিখতে যতখানি প্রশস্ত অবকাশ দরকার তা পাইনি বলে সেটার ১/১০ অংশও লেখা হয়নি। সেটা তিন পুরুষের ইতিহাস এবং তৃতীয় পুরুষে আসে বাঙালী মেয়ে তবে সে পশ্চিম বাঙলার মেয়ে, ঠাকুর্দা দিল্লীর লোক, ঠাকুরমা ও মা বাঙালী। বিয়ে হবে পূর্ব বাঙলায়, কাজেই সেই সুবাদে পূর্ব বাঙলার ছবি খানিকটে ফুটবে।

অবশ্য যদি সময় করে উঠতে পারি। কারণ বেশীর ভাগ সময়ই চলে যায় টুকিটাকি লিখে হাঁড়ির চাল জোগাড় করতে। তদুপরি আমার লেখার শখ নেই, আছে পড়ার শখ। অবকাশ পেলেই মনে হয়, আরেকটুখানি পড়ে নিই। এ যেন এক মৌতাত। এর থেকে

এ জীবনে আর নিষ্কৃতি পাব না।' (প-১৭৩)। এই উপন্যাসও আর কোনোদিন লিখিত হয়নি। গৌতম-বুদ্ধ এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও প্রামাণিক গ্রন্থ রচনার প্রবল বাসনা বহুবার ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিলো যে, "রবীন্দ্র-কাব্যের নূতন নূতন অর্থ শুধু নয়, এমন সব কঠিন প্যাসেজও আমি মোলায়েম করতে পারি যা অন্যে পারে না।"[৩৬] ২০শে মার্চ, ১৯৬০-এ পরিমল গোস্বামীকে লেখা পত্র :

"....Pot-boiler না লিখতে হলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক বই লেখার বাসনা ছিল। বছর তিনেক লাগত। ততদিন খাব কি? তাই অবসর সময়ে 'পূরবী'র একটি টীকা লিখছি। বিপদ হয়েছে সাধারণ পাঠক কতখানি রবীন্দ্রনাথ বোঝে তার স্টানডার্ডটা ধরতে পারছি না। বাংলায় এম-এ পাস ছোকরার কবিতা-বোধশক্তি দেখে তো নিরাশ হতে হয়।"[৩৭]

পরবর্তী সময়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সম্ভবতঃ মুজতবা আলী 'ছাত্র-সুহৃদ' জাতীয় পুস্তক রচনারও ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। পুলিনবিহারী সেনের নিম্নোক্ত পত্রটি এ' ধারণারই সম্পূরক:

"...আজ আপনার ঠিকানায় Calcutta Universityর B. A ও M. A. পরীক্ষার পাঠ্য-তালিকা পাঠিয়েছি।... IA র তালিকা ছাপা Universityর দোকানে পেলাম না।

...যদি বিক্রির দিকে লক্ষ্য রেখে লিখতে হয় তাহলে প্রথমতঃ পরীক্ষার যে বই পাঠ্য আছে তারই টীকা লিখতে হবে, দ্বিতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের প্রশ্ন আসে তার উত্তর দিতে সুবিধা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে পারলে ভালো হয়।" (প-১৯৩)।

সম্ভবতঃ সৈয়দ মুজতবা আলীকে ৫নং পার্ল রোড থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা চলছিলো অনেকদিন থেকেই। এমনকি অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর ঘরের তালা ভাঙার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর এ ধরনের একটা দুঃসংবাদে বিচলিত আলী সাহেব ঢাকা থেকে তাঁর এক শুভানুধ্যায়ী 'সেবককে' তীব্র উৎকণ্ঠার সঙ্গে লেখেন:

"খান* (এবং/কিংবা) তোমার অপারগতায়...যদি তালা ভেঙে আমার আজীবন সঞ্চিত notes, memoranda খুইয়ে দেয় তবে আমার দুঃখের অবধি থাকবে না। দুই বাংলাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না জানিনে।"(প-৬০)। উল্লিখিত 'notes, memoranda' গেলো কোথায়? সেগুলোর মধ্যে হয়তো সৈয়দ মুজতবা আলীর অসমাপ্ত-অর্ধ সমাপ্ত মূল্যবান পাণ্ডুলিপি এবং অটোগ্রাফে খাতার হদিস্‌ও পাওয়া যেতে পারে। তাঁর অটোগ্রাফ খাতায় 'দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল রায়, লেভি, অ্যাণ্ড্রুজ, ইত্যাদির লেখা তো ছিলই, তাঁর উপর গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, কারপেলেজের ছবিও ছিল।"[৩৮] অবশ্য কাবুলে অরাজকতার সময় এবং ১৯৪৭-এ কোলকাতায় তাঁর বাড়ীতে চুরির ফলে কিছু মূল্যবান কাগজপত্র মুজতবা আলী হারিয়েছেন।

---

*পশুপতি খান

০৯.

সার্থক রস-স্রষ্টার স্বরূপ নির্দেশ প্রসঙ্গে মুজতবার অভিমত: "যে কবি, যে সাহিত্যিক আপন নিজস্ব সত্তা সম্পূর্ণ বিস্মরণ করে, অপরের সত্তায় বিলীন হয়ে যতো বেশী গ্রহণ করে আপন সৃজনে প্রকাশ করতে পারেন তিনিই তত বেশী সার্থক কবি, সাহিত্যক।"[৩৯]—এ' সংজ্ঞার নির্দেশানুযায়ী সৈয়দ মুজতবা আলী একজন জাত-শিল্পী তথা সাহিত্যিক। তাঁর অধ্যয়নের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা ছিলো ব্যাপক। তিনি ছিলেন নিরলস পাঠক ও নিরর্গল কথক। তিনি পড়েছেন, বিষয়বস্তুকে আত্মস্থ করেছেন। অতঃপর মনোরম ভাষা ও শৈলী সহযোগে স্বকীয় অননুকরণীয় বাচনভঙ্গীতে শুনিয়েছেন তাঁর গুণগ্রাহী ভক্ত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে। তিনি পণ্ডিত হিসেবে মান্য, লেখকরূপে শ্রদ্ধেয় এবং কথক তথা বাক্‌শিল্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মনীষা, বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও সরসতার সমন্বিত রূপ সৈয়দ মুজতবা আলীর বাঙলা গদ্য। তাঁর সাহিত্যকৃতির মূল্যায়নে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

"A volume of his (S. M. Ali) experience as a Professor in Kabul during the stormy days of Bacca-i-Saqao's coming to power after expelling Amanullah from the rulership of Afghanistan by Dr. Saiyad Mujtaba Ali (Dese-Videse), and his essays on all sorts of topics in a light vein, as well as his beautiful short stories, all written in a language which would be the envy of any Hindu Writer, are among the best things produced in Bengali in recent years."[৪০]

জ্ঞানীগুণী ও শিল্পীর যথাযোগ্য মর্যাদাদানে মুজতবা ছিলেন অকৃপণ। তাঁর প্রিয় কবি-লেখকদের তালিকা স্বভাবতঃই কিছুটা দীর্ঘ। প্রথমেই বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদন, সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথ চৌধুরী, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু প্রমুখের নামোল্লেখ করতে হয়। শশিশেখর বসুকে তিনি অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লেখক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা ও শৈলীতে তিনি ছিলেন মুগ্ধ। আলী সাহেবের বিবেচনায় সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হিউমারিস্ট। অনুজপ্রতিমদের মধ্যে গৌরকিশোর ঘোষকে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান লেখক মনে করতেন। এতদ্ব্যতীত শংকর, সমরেশ বসু ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আশাবাদী। প্রায় সমবয়সীদের মধ্যে প্রমথনাথ বিশী, শিবরাম চক্রবর্তী, জরাসন্ধ, সতীনাথ ভাদুড়ী এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবের প্রতিভা ও শক্তিমত্তার প্রতি তাঁর ছিলো অপরিসীম শ্রদ্ধা। বিদেশী লেখকদের মধ্যে ওমর খৈয়াম, ফ্লোব্যেব, হাইনে, টলস্টয়, পিয়েরে লোতি, ল্যাম, তুর্গেনেফ, আনাতোল ফ্রাঁস এবং চেখভ তাঁর হৃদয়মন অধিকার করেছিলো। বিশেষতঃ চেখফকে তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প লেখক মনে করতেন। স্বকীয় শৈলীতে মুজতবা আপন সাহিত্যগুরুদের উল্লেখ করেছেন:

"আমি মুসলমান। আমার শাস্ত্রে আছে বিধর্মীর ভয়ে আল্লা রসুলকে বর্জন করা মহাপাপ। আমার সাহিত্যধর্মে গুরু-মুর্শীদ হয়ে আছেন রবি ঠাকুর, হাইনে, তুর্গেনেফ, মাইকেল।"[৪১] এবং তাঁর আরেক মুর্শীদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 'কস্যচিৎ ভাইপোস্য'র ভাষায় তিনি আপন রচনা-শৈলীর দিক্‌নির্দেশ লাভ করেছিলেন। তাই "বীরসিংহ গ্রাম" "তাঁর তীর্থ ভূমি।" (প-২৩২)।

সৈয়দ মুজতবা আলীর গ্রন্থাবলী
ও
প্রথম প্রকাশকাল

১.	দেশে-বিদেশে	ঃ	১৩৫৬
২.	পঞ্চতন্ত্র	ঃ	১৩৫৯
৩.	চাচা-কাহিনী	ঃ	১৩৫৯
৪.	ময়ূরকণ্ঠী	ঃ	১৩৫৯
৫.	অবিশ্বাস্য	ঃ	১৩৬১
৬.	পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা	ঃ	১৩৬৩
৭.	ধূপছায়া	ঃ	১৩৬৪
৮.	দ্বন্দ্বমধুর	ঃ	১৩৬৫
৯.	জলে-ডাঙায়	ঃ	১৩৬৭
১০.	চতুরঙ্গ	ঃ	১৩৬৭
১১.	শব্‌নম্‌	ঃ	১৩৬৭
১২.	সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প	ঃ	১৩৬৮
১৩.	ভবঘুরে ও অন্যান্য	ঃ	১৩৬৯
১৪.	বহুবিচিত্র	ঃ	১৩৬৯
১৫.	সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	ঃ	১৩৬৯
১৬.	টুনি মেম	ঃ	১৩৭০
১৭.	প্রেম	ঃ	১৩৭২
১৮.	বড়বাবু	ঃ	১৩৭২
১৯	দু-হারা	ঃ	১৩৭২
২০.	পঞ্চতন্ত্র (দ্বিতীয় পর্ব)	ঃ	১৩৭৩
২১.	হাস্যমধুর	ঃ	১৩৭৩
২২.	পছন্দসই	ঃ	১৩৭৪
২৩.	রাজা-উজীর	ঃ	১৩৭৬
২৪.	শহ্‌র্‌-ইয়ার	ঃ	১৩৭৬
২৫.	হিটলার	ঃ	১৩৭৭
২৬.	কত না অশ্রুজল	ঃ	১৩৭৮
২৭.	মুসাফির	ঃ	১৩৭৮
২৮.	তুলনাহীনা	ঃ	১৯৭৪
২৯.	গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	ঃ	১৩৮৮
৩০.	The Origin of Khojahs and their Religious life today	ঃ	১৯৩৬

'দ্বন্দ্বমধুর' সৈয়দ মুজতবা আলী ও রঞ্জনের গল্প-সংকলন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সংশ্লিষ্ট মুজতবা আলীর প্রবন্ধ সংকলন 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন' তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত।

স্ত্রী, পুত্রদ্বয় এবং সুহৃদ সাগরময় ঘোষকে সৈয়দ মুজতবা আলী একাধিক পুস্তক উৎসর্গ করেছেন। দুর্ঘটনায় অকাল প্রয়াতা ভ্রাতুষ্পুত্রী 'জাহানারা' এবং পাকিস্তানী সেনাদের জিঘাংসার শিকার ভাগিনেয় 'ওয়ালি'র স্মৃতির উদ্দেশে যথাক্রমে 'দেশে-বিদেশে' ও 'তুলনাহীনা' গ্রন্থদ্বয় উৎসর্গিত। এ' ছাড়া অগ্রজদ্বয় সৈয়দ মোস্তফা আলী ও সৈয়দ মুর্তাজা আলী, মুজতবার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন রাজশেখর বসু, প্রমথনাথ বিশী, সরলাবালা সরকার এবং বন্ধু, অনুজপ্রতিম ও ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকার, পুলিনবিহারী সেন, অবধূত, ডঃ শ্রীলা ঘোষ, সরোজিনী হটী সিং, আবু সঈদ আইয়ুব ও গৌরী আইয়ুব, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, পশুপতি খান, দ্বারিকানাথ মিত্র ও অর্চনা মিত্র প্রমুখকে আলী সাহেব তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গ করেন।

তথ্য-নির্দেশ

১. আমাদের কালের কথা, পৃ.১০৯।
২. আচার্য তেজেশচন্দ্র সেন, ভবঘুরে ও অন্যান্য পৃ.৮৩।
৩. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : আমাদের কালের কথা, পৃ.১০৩।
৪. শ্রীমতী অর্চনা মিত্রকে লেখা চিঠি-২, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ.৪২৪।
৫. মুসাফির, পৃ.১১৯।
৬. শ্রীসাধনা কর : শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়, পৃ. ২৩-২৪।
৭. ঐ, পৃ. ৪।
৮. সৈয়দ মুজতবা আলী : কাব্যলোক, কৃত্তিবাস, বিশেষ বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৮০, পৃ. ৫৪।
৯. দরখাস্ত, বড়বাবু,পৃ. ১০৮।
১০. দেশে-বিদেশে, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১৩-১৪।
১১. রায়পিথৌরার কলমে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৮৩।
১২. মুসাফির, পৃ. ১২০।
১৩. সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরী (১) : বিভব, শরৎকালীন সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৮৭, পৃ. ২০-২১।
১৪. আহমদ শরীফ : বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড ,পৃ. ৮০৫-০৬।
১৫. সৈয়দ মুজতবা আলী : কি করে সাহিত্যিক হলাম, শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং আকাশবাণী, কোলকাতা কেন্দ্র থেকে ৮ই এপ্রিল, ১৯৬৯-এ সম্প্রচারিত কথিকার 'টেপ্' থেকে অনুলিখিত।
১৬. সৈয়দ মোস্তফা আলী : আত্মকথা, পৃ. ১১৩-১৪।
১৭. সাগরময় ঘোষ : সম্পাদকের বৈঠকে, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৮৩, পৃ. ৬৩।
১৮. ঐ, পৃ. ৬৩-৬৪।
১৯. দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯শে জুলাই ১৯৫১, পৃ. ৮।

২০. সৈয়দ মুজতবা আলী : দরখাস্ত, বড়বাবু, পৃ. ১০৬।
২১. ঐ, পৃ. ১০৯।
২২. দরখাস্ত, বড়বাবু, পৃ. ১০৯-১০।
২৩. মাসিক কালান্তর, কার্তিক ১৩৫৫, পৃ. ৫১৭।
২৪. সাগরময় ঘোষ : সম্পাদকের বৈঠকে, কলকাতা, ১৩৮৩, পৃ. ১২৮।
২৫. পরিমল গোস্বমী : পত্রস্মৃতি, পৃ. ৩৪৬।
২৬. মাসিক বসুমতী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩, পৃ. ৩১৪।
২৭. দরখাস্ত, বড়বাবু, পৃ. ১০৯।
২৮. সৈয়দ মুজতবা আলী : কি করে সাহিত্যিক হলাম, আকাশবাণী, কোলকাতা কেন্দ্র থেকে ৮ই এপ্রিল, ১৯৬৯-এ প্রচারিত কথিকার 'টেপ্' থেকে অনুলিখিত।
২৯. বোপদের শর্মাকে লেখা পত্র-২, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ.৪০৭ ।
৩০. শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লেখা পত্র-৯, ঐ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩১৭।
৩১. সৈয়দ মুজতবা আলী : মুসাফির, পৃ. ৪১।
৩২. ঐ, পৃ. ১২৩।
৩৩. ঐ, পৃ. ১৩৩।
৩৪. ঐ, পৃ. ১১৬।
৩৫. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ,পৃ. ১১।
৩৬. শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লেখা পত্র-২, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড পৃ.৩০০।
৩৭. পরিমল গোস্বামী : পত্রস্মৃতি, পৃ. ৩৪৫।
৩৮. 'উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্বাসিতের আত্মকথা', ময়ূরকণ্ঠী,পৃ. ১৫৩।
৩৯. শহ্র্-ইয়ার, পৃ. ২৪০।
৪০. Languages And Literatures of Modern India, (1962), পৃ. ১৯১-৯২।
৪১. সৈয়দ মুজতবা আলী : ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ, চতুরঙ্গ, পৃ. ১১৯।

অধ্যায় : ছয়

০১.

সৈয়দ মুজতবা আলী মওকা মেলা মাত্রই অন্ততঃ একবার বলেছেন যে, ভ্রমণে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। শুধুমাত্র নির্ভেজাল ভ্রমণ এবং তজ্জাত আনন্দের জন্যে তিনি কখনো বাড়ীর সীমানা অতিক্রম করেননি। নিতান্ত দায়ে পড়েই বারবার ঘর ছেড়েছেন। মাত্র একবার স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ইহুদী-খ্রিস্টান-মুসলমানের পুণ্যতীর্থ --'ধর্মের ত্রিবেণী' জেরুজালেম গিয়েছিলেন এবং সে-জন্যেই এ-ভ্রমণ বৃত্তান্ত রুজি-রোজগারের 'কুমৎলবে' আখ্যানাকারে লিপিবদ্ধ করেননি। পর্যটনে অনীহার [!] ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে গুরুদেবের শরণ নিয়েছেন।

"নিতান্ত বিপদে না পড়লে আমি আপন গাঁ ছেড়ে বেরতে রাজী হইনে। দেশভ্রমণ আমার দু'চোখের দুশ্‌মন্। তাই যখন রবিঠাকুর আপন ভূমির গান গেয়ে ওঠেন তখন আমি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য আরম্ভ করি।" এবং রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত আপন ভুবনের মোহমুগ্ধ শিশুটির দৃঢ় সংকল্পে মুজতবা আলীরও অবিচল আস্থা!

"স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁকি
বলছি, কাকী,
দেখব আমায় কে কী-করে।
চিরকালই
রইব খালি
তোমার ঘরে।

এ ছেলে তার কাকীমার কোলে বসে গলা জড়িয়ে যা বলেছে সে-ই আমার প্রাণের গান, তাতে আমার সর্ব দেহমন সাড়া দেয়।"[১] হয়তো তাই। অন্যথায় কায়রোর রসনা-লোভন ভোজ্যবস্তুর বিপুল সমাহার উপেক্ষা করে লেখকের মন বাঙলার রন্ধনশালার আনাচে কানাচে বিচরণ করবে কেন ? "আমার (মুজতবার) প্রাণ...তখন কাঁদছিল চারটি আতপ চাল, উচ্ছে ভাজা, সোনামুগের ডাল, পটল ভাজা আর মাছের ঝোলের জন্য।"[২]

আমাদের পর্যবেক্ষণ কিন্তু বিপরীত সাক্ষ্য দেয় সৈয়দ মুজতবা আলীর বাঙালী মনন-মানসিকতা স্বীকার করেও । যখনি সুযোগ এসেছে এবং গাঁটে কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হয়েছে অমনি তিনি পা বাড়িয়েছেন বহির্বিশ্বে এবং তাঁর প্রবাসজীবনের অধিকাংশ কাল ও আনন্দঘন মুহূর্তগুলো অতিক্রান্ত হয়েছে জার্মানীতে। তাঁর দেশ-পরিক্রমার বিশদ বর্ণনা ও সঠিক সন-তারিখ আমাদের হাতে নেই। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যাচ্ছে--

গৃহকোণ ছেড়ে ১৯২১ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে বিদ্যার্জন। একই উদ্দেশ্যে পরবর্তী ন্যূনাধিক এক বৎসর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে। অতঃপর আফগান সরকারের চাকুরি নিয়ে কাবুল যাত্রা এবং ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান। মাঝখানে দু' মাসের গ্রীষ্মাবকাশ দেশে মাতৃসান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। রাজনৈতিক অরাজকতার ফলে১৯২৯-এর মাঝামাঝি দেশে প্রত্যাবর্তন। দু' বছর কাবুল প্রবাসের ফসল 'দেশে-বিদেশে'। অতঃপর পর্যায়ক্রমে বিদেশ পাড়ির পালা।

আলেকজাণ্ডার ফন্‌হুমবলড্ বৃত্তি নিয়ে ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বরে বোম্বাই বন্দর থেকে জাহাজযোগে জার্মানীর উদ্দেশে ইউরোপ যাত্রা। জলপথে এই ভ্রমণ কাহিনী 'জলে-ডাঙায়' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। অতঃপর তিনি ফ্রান্সের মার্শাল বন্দর থেকে রেলপথে গন্তব্যস্থল বার্লিন পৌছেন। মুজতবার বার্লিন উপস্থিতির মনোরম বর্ণনা রয়েছে 'মুসাফির'-এ। সংকটময় মুহূর্তে প্রায় দেবদূতের মতোই আবির্ভূত সহৃদয় জার্মান পুলিশ তাঁকে হোটেলের পরিবর্তে 'হস্‌পিৎসে' নিয়ে গেলেন। তিনি লিখেছেন"—হোটেল জিনিসটি 'দ্য লুক্স'–হস্‌পিৎস্ তারই গার্হস্থ সংস্করণ। ডাক-বাঙলো আর চট্টিতে যে তফাৎ তাই।

...ইতিমধ্যে আমি ভুল বাসে উঠে, ভুল জায়গায় নেমে, ট্রামের সঙ্গে বাসের নম্বর ঘুলিয়ে ফেলে, বিরাট বিরাট বাড়ির আগাপাস্তলা ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে শীতে জবু-থবু হয়ে ককাতে ককাতে যখন নিতান্তই একটা বাড়ির সিঁড়িতে ভেঙে পড়লুম, তখন সন্ধান পেলুম সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের। তিনি নিয়ে গেলেন চাটুয্যের কাছে।

...দু'লহমায় কুল্লে সমস্যার সমাধান হল।"[৩]

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় মাস অধ্যয়ন করে মুজতবা আলী 'বন্' বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন। ১৯৩১-এর শেষাবধি তিনি এখানেই অধ্যয়ন করেন। মহামান্য আগাখানের অর্থানুকূল্যে এ' সময় তিনি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এবং প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। শিক্ষাসমাপনান্তে ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে জার্মানী থেকে স্থলপথে ইতালি আসেন এবং সেখান থেকে সমুদ্র-পথে দেশে প্রত্যাবর্তন। বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, সেই জাহাজেই 'গোলটেবিল' বৈঠকের গ্লানি বহন করে কিছুদিন পূর্বে মহাত্মা গান্ধী স্বদেশে ফিরেছিলেন।[৪]

১৯৩৪ সালে মুজতবা আলী রেডিওলজিস্ট ডাঃ অজিত বসুর সঙ্গে ইউরোপ যাত্রা করেন। এ-যাত্রা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "ইউরোপে দশ মাস কেটে গেল এটা-সেটা দেখতে দেখতে। তার প্রথম চার মাস কাটল কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক পণ্ডিত অজিত বসুর সঙ্গে। তিনি সস্ত্রীক ফ্রান্স, সুইট্‌জারল্যান্ড, জর্মনি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ঘুরলেন যক্ষ্মা হাসপাতাল দেখে দেখে--আমি ছিলুম দোভাষী হয়ে।"[৫] ডাঃ বসু দেশে ফিরে এলেন এবং আলী সাহেব ঘুরতে ঘুরতে 'একদিন শুভ প্রাতে ভেনিস বন্দরে' পৌছলেন। 'তিনদিন পর আলেকজ্যান্ড্রিয়া বন্দর।' সেখান থেকে ট্রেনে কাইরো। সম্ভবতঃ ১৯৩৪-এর শেষার্ধে মিশরে গিয়ে মুজতবা 'এগারো মাস...কাইরোতে' কাটিয়েছেন।[৬] এ' সময় কয়েক মাস তিনি আল্-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তাঁর একটি লেখন থেকে জানা যাচ্ছে '১৯৩৫ খৃঃ বসন্তকালে' মুজতবা জেরুজালেমে গিয়েছিলেন।[৭] অন্যত্র লিখেছেন. "...১৯৩৪ সালে যখন আমি ফলস্তীনে (প্যালেস্টাইনে) বাস করিতেছিলাম তখন ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে আমি আরবদের বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদীরা তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করেন।"[৮] সম্ভবতঃ তিনি

১৯৩৪-৩৫-এর মধ্যে কোনো এক সময় কিছুদিন প্যালেস্টাইনে ছিলেন। এবং '৩৫-এর শেষার্ধে ভারতে প্রত্যাবর্তন ও বরোদা কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মে ইতালীয় জাহাজ 'দিয়ান ক্যামেনো'তে আরোহণ করে মুজতবা আলী বোম্বাই থেকে ইউরোপের উদ্দেশে রওনা হন এবং 'ভেনিস মিলান হয়ে বন্ শহরে' পৌছন।[৯] তখনো অপরিচিত অন্যতম সহযাত্রী বিচারপতি এস. এ. মাসুদ 'খাকী হাফপ্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট' পরিহিত সুদর্শন যুবা মুজতবাকে জাহাজের বিভিন্ন জনের সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে দেখে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য কৌতূহলী হন। তাঁর কৌতূহল নিবৃত্ত করে মুজতবা বলেন, "আমি বাঙালী তো বটেই, একেবারে বাঙাল—শ্রীহট্টের লোক। বরোদার মহারাজ গায়কোয়াড়ের ওখানে কাজ করি। ইউরোপ ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। তবে ব্রিটেন আমার ভালো লাগে না; জার্মানী, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ ভালো লাগে। ২/৩ মাস পর দেশে ফিরে আসি। চাকরী, রেডিও-তে বক্তৃতা করে কিছু টাকা সঞ্চিত হলে আবার বাইরে বেরিয়ে পড়ি।" (সা-৪০)। এ-যাত্রায় তিনি চার মাস ইউরোপে অবকাশ যাপন করেন—তার অধিকাংশ সময়ই অবশ্য জর্মনীতে ছিলেন এবং এ' সময় তাঁর নাসিকাতে অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁকে প্রায় পক্ষকাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়। ১লা আগস্টে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। (প-১৩৬)।

মুজতবা আলী যথা নিয়মে রোজনামচা লিখতেন না এবং তাঁর রচনাবলীতে সন-তারিখ ও তথ্যের কিছু গরমিল লক্ষ্য করা যায়। একস্থানে লিখেছেন, "আমি প্রথম জর্মনি যাই ১৯২৯ খৃঃ। ...১৯৩২-এ...দেশে ফিরে এলুম। ...১৯৩৪-এ আমি আবার প্রায় এক বছর জর্মনিতে ছিলুম। ... ১৯৩৮-এ আমি আবার জর্মনিতে চারমাস কাটালুম।"[১০] তাঁর অন্যান্য লেখনের তথ্যানুযায়ী অনুমিত হয় সম্ভবতঃ ১৯৩৪-এ কয়েক মাস মুজতবা আলী জার্মানীতে অবস্থান করেন।

'কত না অশ্রুজল'-এ মুজতবা আলী লিখেছেন, "১৯৪৪-এর গ্রীষ্মে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে ফের জর্মনি যাই।" (১ম প্রকাশ, পৃ.৭০)। তাঁর এ বক্তব্য বিভ্রান্তিকর। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র ভ্রমণ কিংবা চিত্তবিনোদনের জন্যে সাধারণ মানুষের পক্ষে তখন জার্মানী গমন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিলো এবং প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণে আমাদের বিবেচনায় আলী সাহেবও জার্মানীতে যাননি। সে-সময় কিছুদিন বোম্বাই শহরে অবকাশ যাপন করে তিনি কোলকাতায় আসেন কর্মের সন্ধানে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রকাশিত তাঁর একাধিক লেখায়ও এ-সত্য স্বীকৃত। যথা:

ক. "১৯৩৮-এ যখন শেষবারের মত জর্মনি ছাড়ি তখন স্বয়ং চেম্বরলিন জর্মনিতে উড়োউড়ি করছেন হিটলারের মন পাবার জন্য।" (যবনিকান্তরালে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৪৫)।

খ. "আমি (মুজতবা আলী) ১৯৩৮-এর পর সেখানে (জার্মানীতে) আর যাইনি।" (ওঘাটে যেও না বেউলো, টুনি মেম, পৃ.১৭৩)।

গ. "মোকা পাওয়া মাত্রই দু'বার জর্মানি ঘুরে এসেছি। ১৯৫৮ এবং এই গ্রীষ্মের ১৯৬২-তে।" (রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না? টুনি মেম, পৃ. ৩০১)।

সুতরাং, ১৯৪৪-এ মুজতবা আলীর জার্মানি-ভ্রমণ প্রসঙ্গ অগ্রাহ্য করাই সমীচীন।

মুজতবার সঞ্চিত অর্থ পানাহার বাদে ভ্রমণেই ব্যয়িত হয়েছে। ১৯৫৮ সনে তিন

সপ্তাহের জন্যে ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে বেশির ভাগ সময় লন্ডনেই অতিবাহিত করেন। এ' সময় বি. বি. সি. থেকে তাঁর একটি কথিকাও প্রচারিত হয়। ইউরোপে পুরনো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প-গুজব করেছেন এবং উত্তমোত্তম 'বর্দ্যো ব্যার্গান্ডি' খেয়েছেন এবং 'ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে' দেখেছেন। বিলেত থেকে ফিরে এক শুভার্থিনীর উদ্দেশে ৬ই নভেম্বর, ১৯৫৮ সনের পত্র:

"আমি যা জমিয়েছিলুম তা ত বিলেতে গিয়ে ফুঁকে দিয়ে এলুম।

যত টাকা জমাইছিলাম
শুটকী মৎস্য খাইয়া
সকল টাকা লইয়া গেল
গুলবদনীর মাইয়া।"[১১]

আলী সাহেব ১৯৬২ সনের জুন-এ জার্মানী গিয়ে আগস্টের প্রথম সপ্তাহে দেশে ফিরে আসেন। (প-২৫০)

১৯৭০-এর শেষার্ধে সৈয়দ মুজতবা আলী শেষবারের মতো জার্মানী পরিভ্রমণ করেন। তিন মাসের এই সফরে তিনি বহু পরিচিত ও স্মৃতি বিজড়িত স্থান পরিদর্শন করেন। প্রাচীন দিনের বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে প্রথম যৌবনের অম্লমধুর স্মৃতি রোমন্থনে তাঁর দিনগুলো পরমানন্দে অতিবাহিত হয়। দীর্ঘ অদর্শনের পর জীবনের প্রান্তসীমায় এসে আপনজনদের সঙ্গে পুনর্মিলন যেমন আনন্দঘন ও রোমাঞ্চকর--তেমনি বিষাদের দীর্ঘশ্বাসে ভারাক্রান্ত। এর অন্তরঙ্গ পরিচয় আলী সাহেবের ভ্রমণ তথা স্মৃতিচিত্রমূলক গ্রন্থ 'মুসাফির' এবং 'পঞ্চতন্ত্র' কলামে প্রকাশিত 'বিদেশে' শীর্ষক রচনাধারার সর্বত্র।

আলী সাহেব দেশ-বিদেশ পর্যটনের যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তা' তাঁরই উপযোগী:

"কিছুকাল পূর্বে টুরিজম-প্রসার সংস্থার আমি সদস্য হয়ে যাই--আমার একমাত্র 'গুণ' যে, কোন দেশই আমাকে দীর্ঘকাল সহ্য করতে পারে না বলে আমি সে-দেশ থেকে সংক্ষেপে বিতাড়িত হই, ফলে আমার বহু দেশবাস, বহু দেশদর্শন হয়। এসব দেশের দেওয়ানি আদালতে দেউলেদের যে লিস্ট টাঙানো থাকে তার প্রত্যেকটিতে আমার নাম পাবেন।"[১২]

০২.

সাধারণ আলাপন কিংবা হাস্যরস পরিবেশনের মধ্যেও কথক মুজতবা আলীর অসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের স্নিগ্ধচ্ছটা পাঠকচিত্ত মধুর রসে সিক্ত করে রাখে। রম্যরচনাকারের ছদ্মবেশে শিক্ষক মুজতবা প্রতিনিয়ত তাঁর পাঠকবর্গের জ্ঞানরাজ্যের পরিসর প্রসারিত করে গেছেন, অনেকটা তাঁদের অলক্ষ্যেই। এমন শিক্ষক বিরল। ১৯৭০-এ বিদেশ ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলছেন:

"... আখেরে স্থির হল আমি এ্যার-ইন্ডিয়া প্লেন থেকে সুইটজারল্যান্ডের জুরিচে (স্থানীয় ভাষায় ৎসুরিষ্) নামবো। হোথায় চেঞ্জ করে ভিন্ন প্লেনে মোকামে পৌছব--অর্থাৎ জর্মনির কলোন শহরে।

তখন বেজেছে সকাল ন'টা। রামপন্টক বলে কি না, কলোন যাবার প্লেন দ্বিপ্রহরে।

বিগলিতার্থ আমাকে নিরেট তিনটি ঘণ্টা এখানে বসে বসে আঙুল চুষতে হবে।

শুনেছি যে-রুগী দশ বৎসর ধরে পক্ষাঘাতে অসাড় অবশ সে নাকি মৃত্যুর সময় অকস্মাৎ বিকট মুখভঙ্গি করে, তার সর্বাঙ্গ খিঁচোতে থাকে, হঠাৎ দশ বৎসরের টান-টান-হাঁটু যেন ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে খাড়া হয়ে থুতনির দিকে গোত্তা মারতে চায় এবং মুখ দিয়ে অনর্গল কথা বেরতে থাকে।

আমার হল তাই।...আমার মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল আতশবাজির ঝট্‌কা, তুবড়ির পর তুবড়ির হিংস্র হিস্ হিস্ পটকা বোমার দুদ্দাড় বোম্-বাম। আর হবেই না কেন ? যে জুরিচের কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে কর্ণপটাহবিদারক তথা নয়নান্ধকারক আতশবাজি ছাড়ছি সেই আতশবাজিকেই আপন জর্মন ভাষায় বলে "বেঙ্গালিশে বেলোয়েষ্‌টুঙ" অর্থাৎ "বেঙ্গল রোনানী"; এবং এ-দেশের ফরাসী অংশে বলে "ফ্যদ্য বাঙাল" অর্থাৎ "ফায়ার অব বেঙ্গল।" পাদটীকায় উল্লেখিত: 'আমার এক সুপণ্ডিত মিত্র বহু গবেষণার পর স্থির করেছেন: এদেশে গুড় তৈরী হত বলে এর নাম গৌড় (এবং গুড় থেকে "রাম্" মদ তৈরী হত বলে তার নাম গৌড়ী–মহাভারতেও এর উল্লেখ আছে–যেমন মধু থেকে মাধ্বী মদ)। এবং এই গুড় সর্বপ্রথম চীন দেশে রিফাইন্‌ড হয়েছিল বলে এর নাম চিনি (পরে মিশরে তৈরী চিনির নাম হল মিস্‌রি বা মিশ্রী)। তাঁর মতে বারুদ প্রথম আবিষ্কৃত হয় বাঙলাদেশে–আতশবাজির জন্য। চীনদেশে সেটা সর্বপ্রথম আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহৃত হয় বলে চীনদেশকে বারুদের আবিষ্কারক বলা হয়–এবং সেটা ভুল।' তদুপরি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ফরাসী ভাষায় বঙ্গদেশকে বাঙ্গাল রূপে উচ্চারণ করে। আমি বাঙাল বঙ্গ সন্তান। আমি আমার "জন্মনি, জন্মনি" অধিকার অর্থাৎ বার্থরাইট ছাড়বো কেন ? ফায়ার ওয়ার্কস চালাবার যদি কারো হক্ক থাকে তবে সে আমার।"[১৩]

কিংবা জুরিচে যাত্রীদের ট্রান্‌জিট কক্ষ থেকে বাইরে এসে এক সময় বরোদায় কর্মরতা ফ্রলাইন ফ্রিডি বাওমানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে যখন সুকৌশলে প্রহরীর নিকট বান্ধবী-সন্দর্শন-প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন, তখন তার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা:

' "বান্ধবী! বান্ধবী!! সেরতেন্‌মাঁ (সার্টনলি) চেরৎমান্‌তে (ইতালিয়ানে, সার্টন্‌লি)" এবং তারপর জর্মনে "জিষার জিষার" (শিওর শিওর) এবং সর্বশেষে যদি কূল না পায়, মার্কিন ভাষায় শিঁয়োর শিঁয়ো।" '[১৪]

আলী সাহেবের স্বাস্থ্যেরও ক্রমাবনতি ঘটছিলো। সর্বশেষ ভ্রমণের ধকল কাটাতে কিছুটা সময় লাগে। দেশে ফিরে বন্ধুকে জানিয়েছেন: '...ঐ তিন মাসের সফর এ্যাসন তক্‌লিফদেহ্ হয়েছিল যে মাসাধিককাল অধম দণ্ডবৎ, লাঠ্যবৎ...হয়ে শয্যাশায়ী।"[১৫]

নিজবাসভূমে পরবাসী মুজতবা অন্ততঃ একটি দেশে স্বস্তি পেতেন, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন—যে-দেশ পরাধীন ভারতের প্রতি ছিলো সহানুভূতিশীল এবং ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা-ঐতিহ্যের প্রতি যার শ্রদ্ধা অবিচল, যে-দেশের কবি মানসনেত্রে গঙ্গার জলে প্রস্ফুটিত পদ্ম অবলোকন করে আত্মহারা* —সে-দেশ জার্মানী—যে-দেশকে

---

*মুজতবা আলী অনুবাদিত হাইনরিষ হাইনের কবিতা–

গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন আলো ভরা–
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতি-ধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।

মুজতবা আলীর দ্বিতীয় বাসভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং তাঁর প্রবাস-জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করেছেন জার্মানীতে। "সেখানকার জীবনকে তিনি জেনেছিলেন, বিশেষ করে সেখানকার মানুষের সময়ক্ষেপণের যে সমস্ত উপকরণ ছিল সেগুলো তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। আমরা সাধারণত যে জার্মানীকে জানি, শিলার গ্যয়টে অথবা হাইনের রচনায়, মুজতবা আলীর জার্মেনী সে জার্মেনী নয়, তাঁর জার্মেনী হচ্ছে প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে প্রবাহিত নগর-জীবনের বিচিত্র মানুষের অবসর-মুহূর্তের জার্মেনী। এ জার্মেনীকে দেখা যায় বিভিন্ন শহরের বিয়ারের আড্ডায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ক্লাবের সভায়, যন্ত্রণার মধ্যে ও রহস্যপ্রিয়তায়।....এত অন্তরঙ্গভাবে একটি জাতির পরিচয় উদ্ঘাটন করা সহজ ক্ষমতার পরিচায়ক নয়। মুজতবা আলীর রচনায় আমরা হিটলারের সমসাময়িক জার্মেনীকে পাচ্ছি, আবার হিটলারের পরবর্তী জার্মেনীকে দেখছি এবং একেবারে শেষে নতুন শোভায় সমৃদ্ধ নতুন জার্মেনীকে পাচ্ছি। এক কথায় বলতে গেলে তিনি জার্মেনীর আর্তনাদকে দেখেছেন, তাঁর বেঁচে থাকার প্রয়াসকে দেখেছেন এবং তাকে একটি উজ্জ্বল সমৃদ্ধির মধ্যে দেখেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি এ পরিচয়গুলো তথ্যভারাক্রান্ত গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকাশ করেননি। জার্মেনীর বিচিত্র স্বভাবের মানুষের কল্লোলের মধ্যে তিনি জার্মেনীকে আবিষ্কার করেছেন।"[১৬]

সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন: "আমাকে যদি কেউ শুধোয়, তোমার সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হয় কি ? আমি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বলবো, রাস্তার লোকজন।"[১৭] লোক, লোকজীবন এবং সমাজ সম্পর্কে তাঁর সকৌতুক দৃষ্টিতে যেমন ধরা পড়ে কাক্-ডাকা ভোরে 'পদ্মাতে ...রাজ্যের মেয়ে মানুষ...নাইতে আসে। তাদের ঘন ঘন অঙ্গবিতাড়ন এবং যত্র তত্র মর্দন থেকে বোঝা যায় তারা এই নিদাঘ যামিনী নিষ্কর্মা কাটায়নি;'[১৮] তেমনি অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করেন বাসের তিনজন 'মাঝারি বয়েসের...ঝি আয়া শ্রেণীর' অশিক্ষিত স্ত্রীলোককে। যান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্পেষণ এবং নগরযন্ত্রণা যাদের নারী-হৃদয়ের কোমল পেলব রূপটি এখনো ধ্বংস করতে পারেনি।[১৯] জাহাজের বৃদ্ধ মোল্লাজী ও অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ (বিদেশে), গোয়ালন্দের 'আধুনিকা', পণ্ডিত মশাই (পাদটীকা), খালাসী সমীরুদ্দী (নোনাজল), স্বাস্থ্যনিবাসের সবিতা (সাবিত্রী), কাবুলের দু'দে পড়ুয়া ইউসুফ, সতেরো বছরের 'কর্ণাইল' (দেশে-বিদেশে), মোল্লা ফয়েজ, পাঠান-কন্যা মণি, ভাগ্যহীনা মাধুরী (কোষ্ঠীবিচার), টুনি মেম, শমীম, গণেশ (সিনিয়র এ্যাপ্রেনটিস), বেণুগোপাল, আই. সি . এস. (বিদেশে), শামসাদ বানু লায়লা (ক্রন্দসী), কোদণ্ড মুখহানা, লন্ডনী আম্বরউল্লা ও তার বিদেশী পত্নী ডোরা,—আবদুর রহমানের উল্লেখ নাই বা করলাম–এদের সঙ্গে জাপানী ওস্তাদ অসিফা (নটরাজনের একলব্যত্ব), জার্মান মহিলা মাটিল্‌ডে (দু-হারা), টেরেমের 'খাণ্ডারনী' স্ত্রী, আনামারী, লটে, ক্যেটে, লিজেল, প্রাশান কর্ণেল (কর্ণেল), মাইস্টার উইলি (বিদেশে), জিনীভার 'আবুহোসেন' আঁদ্রে দ্যুপোঁ (বিদেশে), সাইপ্রিয়ট-গ্রীক রমণী হেলেনা (কোদণ্ড মুখহানা), কোন্-ভীনারের মা, অস্কার (বেলতলাতে দু'দুবার), সুইট্‌জারল্যান্ডের মসিয়ো লুই ভোতিয়ে (রোগক্ষয়—শিক্ষালাভ), সিবিলা (মা-জননী), ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট-তনয়া আনিকি পাসিকিভি, নয়রাট, পাউলের মা, 'নেভা' অঞ্চলের 'রাধিকা' তুর্গেনিয়েফের জেলেনি প্রেমিকা (নেভার রাধা)—সেই সঙ্গে এ্যারোপ্লেনের অতি আধুনিকা 'বিগত যৌবনা মার্কিন মহিলার' সহযাত্রিণী বোঁচকা-বুঁচকি সমেত বোরকাপরিহিতা মক্কাতীর্থে

হজ্বগামিনী—আরো অসংখ্য চরিত্র নিজস্ব বেশভূষা, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-ঐতিহ্য নিয়ে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত। অতি অল্প সময়ে কাবুল-মেশেদ-মিশর-ফ্রান্স-জার্মানী-সুইট্‌জারল্যান্ড-চেকোস্লোভাকিয়া-পোলান্ড-ইতালী—কতো দেশমুল্লুক ঘুরে, পাবে-কাফেতে আড্ডা জমিয়ে কখন যে কারো রন্ধনশালায় আসন নিয়ে সুখ-দুঃখের আলাপচারিতায় সকলে একাত্ম হয়ে যায়! স্বদেশ-বিদেশের ফারাক এক লহমায় অন্তর্হিত—মুজতবা আলীর লেখনীর বদৌলতে। "বেশীরভাগ লোক দেশভ্রমণে যায় নূতন কিছু দেখবার জন্য। এবং গিয়ে দেখে সেই জল, সেই ঘাস। আবার অন্য অনেক লোক বিদেশ গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেশের সন্ধানে লেগে যায়। প্যারিস গিয়ে খবর নেয়, সেখানে আপন দেশের কেউ আছে কি না। তাকে খুঁজে বের করে শুধায়, 'রাইস-কারি' কোথায় পাওয়া যায়? সেই খেয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরোতে বেরোতে বলে, 'চলো, দাদা, চট্ করে মোড়ের যদুর দোকান হয়ে যাই।'—পাড়ার যদুর পান বিখ্যাত!"[২০] ফলে বিদেশে তাঁদের আকাশ-মাটি দর্শন হয়, গাড়ী-জাহাজ চড়েন, খানাদানাও চলে। কিন্তু মানুষের সঙ্গ লাভ আর হয় না। তার সমাজ-সভ্যতা বৈদগ্ধ্য এঁদের কাছে পূর্ববৎ-ই থেকে যায় অপরিচিত। তাঁরা যেন চক্ষু আবৃত করে বিদেশে যান এবং কোনোক্রমে দর্শনেন্দ্রিয় রক্ষা করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে সর্ব আপদমুক্ত হয়ে নয়ন মেলে তাকান! সঞ্চিত অর্থের কিঞ্চিৎ ব্যয়ই তাঁদের ভ্রমণের সার্থকতা! বিদেশ পর্যটনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুজতবা আলীর সুস্পষ্ট বক্তব্য:

And what strikes me as most important is the fact that you are not merely reading books, you are not merely seeing buildings but you are coming into the closest touch with the minds and hearts of a people, and then, you come to the grand discovery, how alike they are, all over the world."[২১]

জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সর্বদেশের সর্বকালের মানুষের অন্তর্নিহিত হৃদয়ানুভূতির অভিন্ন সত্তা আবিষ্কার করে সৈয়দ মুজতবা আলীর বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অন্তর্লোকের যে মহাজ্যোতি গ্রাম-বাংলার নিরক্ষর কবিকেও সেই মহাসত্যের চিরন্তন রূপমাধুরীর সন্ধান দিয়ে পুলকিত করেছিলো—তাঁর উদাত্ত কণ্ঠেও তারই প্রতিধ্বনি:

নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম সব একই মায়ের পুত ॥

০৩.

সৈয়দ মুজতবা আলী স্বভাবতই ছিলেন প্রচারবিমুখ। নিতান্ত দায়ে না পড়লে পারতপক্ষে সভা-সমিতিতে যেতে চইতেন না। এ' সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য:

"আমার ছবি আমি বেরতে দিই না।....আমি মিটিঙ-মাটিঙে যাই অতি কম। আমি অপরিচিতের সঙ্গে সহজে দেখা করতে রাজী হইনে। বাড়িতে লেখা আছে, "দেখা-শোনা রাত নটা থেকে দশটা"—আর আকছারই নটার সময় বেড়াতে বেরই।" (প-২৪৭)—এবং আলী সাহেবের এ' স্বীকারোক্তি যে কতোটা অকৃত্রিম তার পরিচয় রয়েছে ডাইরীর পাতায়। ডাঃ এম. এ. ওয়ালীর নিকট সংরক্ষিত ডাইরীর, Jan,4th, 1959-এর পাতায়

মুজতবা লিখেছেন—"আইয়ুব সাহেব* Quest- এর তরফ থেকে একটি seminar-এর ব্যবস্থা করেছেন। Kostler ইত্যাদি আসবেন। আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি দুঃখ জানিয়েছি; ভিড়ে যেতে আমার ভালো লাগে না। আসলে এ রকম seminar-এর 'তামাশা'র দিকটা আমার চোখে কর্কশ ঠেকে।"

প্রাসঙ্গিক একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬৯-এ শিলচর গুরুচরণ কলেজের বার্ষিক মিলাদ মাহফিলে সৈয়দ মুজতবা আলী আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে জনৈক মৌলানা সাহেব তাঁকে একজন "খ্যাতিমান সাহিত্যিক এবং Spiritual ব্যক্তি" হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। আলী সাহেব "তাঁর ভাষণে এই প্রসঙ্গে বলেন, 'তিনি খান কয়েক বইপত্র লিখেছেন বটে, কিন্তু কোনমতেই Spiritual ব্যক্তি নন। তবে যদি মদ্যপান করাটা Spiritualism -এর আওতায় পড়ে, তবে তিনি সত্যি সত্যি একজন মস্তবড় Spiritual ব্যক্তি।"[২২] এ-ক্ষেত্রে মুজতবা আলীর নিন্দা কিংবা স্তুতিতে না গিয়ে আমরা শুধু সবিস্ময় লক্ষ্য করি ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাঁর যে জেহাদ, তা' শুধু মুখের কথা নয়, বুকের ভাষা। অন্যথায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকের উপস্থিতিতে নিজেকে এভাবে অনাবৃত করা সম্ভব হতো না। এ' থেকে সহজেই সভা-সমিতিতে তাঁর উপস্থিতির স্বল্পতার হেতু অনুধাবন করা যেতে পারে।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সৈয়দ মুজতবা আলী ছাত্রজীবনে প্রথম বক্তৃতা করেন শান্তিনিকেতনে, 'বাঙাল দিবস'-এ। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে সিলেটী ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করে তিনি সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন (সা-৩৯)। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীতে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। সে-সময় জাপান অন্যায়ভাবে চীন আক্রমণ করেছিলো। ১৯৬২-তে চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় আলী সাহেবের স্মৃতিচারণ:

(উক্ত বক্তৃতায়) "প্রসঙ্গক্রমে চীন-জাপানের কথা ওঠে। আমি বলেছিলুম, 'এই যে অর্বাচীন জাপান সংস্কৃতি, ঐতিহ্যে তার পিতামহ চীনের বুকে বসে তার দাড়ি ছিঁড়ছে, এর চেয়ে অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস আর কি হতে পারে! পরদিন দুই বয়স্ক চীনা ভদ্রলোক আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত। —এ'রা দুজনেই আপন দেশের অধ্যাপক। ...অপেক্ষাকৃত বয়স্কজন আমার দু-হাত চেপে ধরে বললেন, 'জাপান শক্তিশালী জাতি। অক্ষম চীনের প্রতি দরদ দেখিয়ে তার বিরাগভাজন হতে যাবে কে ? আপনি কাল সন্ধ্যায় যা বললেন, সে শুধু ভারতবাসীই বলতে পারে।' অন্যজনের চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝরঝর করে জল বেরিয়ে এসেছে। ...আমি পেলুম নিদারুণ লজ্জা। আমি পরাধীন দেশের জীবন্মৃত অর্ধ-মনুষ্য। আমার কী হক্ক এসব বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশ করবার।"[২৩]

১৯৩৩-এ সৈয়দ মুজতবা আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীর সন্ধানে এসেছিলেন এবং এ' সময় ক. সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে একটি বক্তৃতা করেন। খ. এ' বৎসর আসামের তৎকালীন রাজধানী শিলঙে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যর হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভাতেও ভাষণ দেন।[২৪]

১৯৩৪ সনে ইউরোপ ভ্রমণকালে মসিয়ো লুই ভোতিয়ের বিশেষ অনুরোধে

---

*আবু সয়ীদ আইয়ুব।

সুইট্‌জারল্যান্ডের লেজাঁয় অবস্থিত স্বাস্থ্যনিবাস 'সানতরিয়াঁ ইউনিভের্সিতের সুইসে' বক্তৃতা করেন।[২৫]

১৯৩৯ সালের ১৪ই মে, সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সৈয়দ মুজতবা আলী সভাপতিত্ব করেন। তাঁর মূল্যবান অভিভাষণটি 'মাসিক মোহাম্মদী' ও মাসিক 'আল-ইস্‌লাহ্‌' পত্রিকায় 'সাহিত্য ও কালচার' নামে মুদ্রিত হয়।

বরোদায় অধ্যাপনাকালে মুজতবা আলী 'প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে' যোগদান প্রসঙ্গে লিখেছেন,—'আমার জীবনে প্রথম এবং শেষ প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে আমি যাই তিরু অনন্তপুরমে বরদা সরকারের প্রতিভূরূপে ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি।'[২৬]

১৯৪১ সনে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কবিগুরুর শ্রাদ্ধ-বাসর উপলক্ষে

ক. আকাশবাণী, বোম্বাই কেন্দ্রের আমন্ত্রণে মুজতবা আলী একটি ভাষণ দেন। বিশেষ কারণে ঘটনাটি তিনি কখনো বিস্মৃত হননি। সে-ভাষণের সর্বশেষে বলেছিলেন, "কবিগুরুর কাব্য অজর অমর। আমরা তাহা পড়ি, অবহেলা করি–যাহাই করি না কেন, সে কাব্য বাঁচিয়া থাকিবেই, কিন্তু শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী দেশকালে সীমাবদ্ধ—তাহাকে অবহেলা করিলে তাহার ক্ষতি, এমনকি মৃত্যুও অসম্ভব নহে। বেতারকর্তা বলিলেন, আমি নাকি বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিতে উদ্যত হইয়াছি।"[২৭]

খ. ১৯৪১-৪২ সনে বোম্বাই, আহমদাবাদ, কাঠিয়াওয়াড়বাসী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং কবিগুরুর অনুরাগীরা 'টেগোর সোসাইটি' প্রতিষ্ঠাকল্পে সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে একটি প্রাথমিক সভার আয়োজন করেন। পণ্ডিত জওয়াহিরলাল নেহরু, সভায় অনুপস্থিতির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাঁর প্রেরিত বাণীটি ইন্দিরা গান্ধী পাঠ করেছিলেন। বিশ্বভারতীর প্রাচীনতম প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে সৈয়দ মুজতবা আলী বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং সভানেত্রী তাঁর ভাষণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ' প্রসঙ্গে আলী সাহেবের সবিনয় সরস মন্তব্য: "বক্তৃতার বাঘিনী (সরোজিনী নাইডু) যে ঐ-বাবদের ম্যাড়ার বাচ্চাকে (মুজতবাকে) প্রশংসা করবেন সে তো ঈসপ মহাশয় বহু পূর্বেই আপ্তবাক্যরূপে প্রকাশ করে গেছেন।"[২৮]

দেশবিভক্তির পরপরই পাকিস্তানে 'রাষ্ট্রভাষা' নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয় এবং সংখ্যাগুরু বাঙলাভাষী বুদ্ধিজীবীরা একটা অশুভ চক্রের ক্রিয়াকলাপে প্রথম থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করেন। ১৯৪৭ সালের ৩০শে নভেম্বর, 'সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদ' আয়োজিত রাষ্ট্রভাষা-সংক্রান্ত একটি সেমিনারে ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীকে প্রধান বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো। প্রতিক্রিয়াশীলদের হীন তৎপরতায় তাঁকে মাঝপথেই বক্তৃতা বন্ধ করতে হয়। এই বক্তৃতাটিই প্রথমে 'চতুরঙ্গ' ত্রৈমাসিকে এবং পরে পুস্তিকাকারে 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নামে প্রকাশিত হয়। (সা-১৫)।

১৯৪৮-এ মুজতবা আলী কিছুদিন সিলেটে ছিলেন এবং এ' সময় একাধিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

১৯৪৮ সালের ১২ই ডিসেম্বর, মুজতবা আলী বগুড়া আজিজুল হক কলেজের বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর সারগর্ভ ভাষণটি 'সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী'র দশম খণ্ডে 'রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ' নামে মুদ্রিত হয়েছে। একই দিনে বৈকালিক অধিবেশনে তিনি ইংরেজীতে 'ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি'

সম্বন্ধে আরেকটি বক্তৃতা করেন। ১৩ই ডিসেম্বরে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে আরো একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

১৯৪৯ সালে বগুড়ায় এডওয়ার্ড লাইব্রেরীতে সৈয়দ মুর্তাজা আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজয়ন্তীতে প্রধান বক্তা হিসেবে মুজতবা আলী উপস্থিত ছিলেন এবং এ' সময় তিনি ইকবাল-দিবস উপলক্ষে রাজশাহীতেও বক্তৃতা করেন। এ' বৎসর দিল্লীর আশ্রমিক সঙ্ঘ রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পঁচিশে বৈশাখ উদ্‌যাপন করেন। সভাপতিত্ব করেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী।[২৯] নরসিংহদাস পুরস্কার-প্রাপ্তি উপলক্ষে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় তিনি বক্তৃতা করেন ১৯৫১ সালে।

১৯৫৩ সনে আকাশবাণী, দিল্লী কেন্দ্র থেকে ছোটদের আসরে মুজতবা আলীর একটি কথিকা 'গুরুদেব' প্রচারিত হয়। একটি পত্রে ১৯৫৪ সালের ১৫ই নভেম্বর থেকে কোলকাতার সেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজে আলী সাহেবের চারটি বক্তৃতার কথা জানা যাচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে পাঁচ শত টাকা সম্মানী প্রদান করেন। (প-৪)। সম্ভবতঃ এ' বক্তৃতামালা তিন দিনের ছিলো। উক্ত কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর মনোহারী বক্তৃতার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন :

"গুরুদেব মর্ত্যের কবি। তিনি এক মুহূর্তে আমাদের 'নীলাম্বরের মর্মমাঝে' নিয়ে গেছেন, সেখানে 'তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জ্বলে নিদ্রাবিহীন গগনতলে'। পর মুহূর্তেই মর্ত্যে ফিরিয়ে এনেছেন, গেয়েছেন–

হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিঙ্গন
বনের পথে আঁধার-আলোর আলিম্পন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কবি,...তবু আমরা যেন না ভুলি তিনি বাংলার কবি। বুয়োনোস এইরেস থেকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন 'চিঠি'—

দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজল কোথায় ফুলের বুকের বেণু।
আতি-পাতি খুঁজে শেষে বুঝি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই জুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণী,
একটুও তো দেয় না আভাস এই দেশী ইস্পানি।
প্রকাশ্যে তার থাক না যতই সাদা মুখের ঢঙ,
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বুকের রঙ।"[৩০]

ষাটের দশকের শেষে বন্ধু-কন্যার অনুরোধে বিহারের ভাগলপুর কলেজের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। (সা-২৯)।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১-তে রবীন্দ্রজন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে সৈয়দ মুজতবা আলীকে বরোদায় আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিন দিনের তিনটি বক্তৃতা (প-১১৯) এবং আলী সাহেবই ছিলেন একমাত্র বক্তা। এ' প্রসঙ্গে মুজতবা আলীর ভাষ্য: "১৯৪৪-এ বরদা ছাড়ি। সেখানে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্বোধন করতে আমাকে আহ্বান জানানো হয়, পুরনো চেনা লোক বলে, অন্য কোন কারণে নয়। না গেলে নেমক হারামী হত।"[৩১] এতদুপলক্ষে এ' বৎসর শান্তিনিকেতনে ৮, ৯ ও ১০ই মে—তিন দিনের একটি কর্মসূচী নেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপ্তি অধিবেশনে অন্যান্যদের মধ্যে সৈয়দ মুজতবা আলী 'শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথের' শিক্ষা সম্বন্ধীয় স্মৃতিচারণ করেন।[৩২]

বাঙলা ১৩৬৯ সালে বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের 'পৌষ উৎসবে' "সৈয়দ মুজতবা আলী মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ করেন"।[৩৩] এ' প্রসঙ্গে 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরী: "৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষার দিন—শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার দিন। প্রতিবছর এই দিনটিতে হয় পৌষ-উৎসব, মহর্ষির সাধনাস্থল ছাতিমতলায় ৭ই পৌষের সকালে হয় উপাসনা। সেই সময় সৈয়দদা সেই উপাসনার আচার্য হয়েছিলেন। সৈয়দদা ফেজ টুপি, লম্বা শেরোয়ানী এবং পাজামায় একজন মৌলানার পোষাক পরে এসে ছাতিমতলায় আচার্যের বেদীতে বসেছিলেন এবং ঋগ্বেদ ও উপনিষদের সংস্কৃত শ্লোক গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি করে বাংলায় তার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছিলেন।" (সা-২৬)। আলোচনাক্রমে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-ও উল্লেখ করেন যে, মুজতবা আলীর মন্দির পরিচালনা অনন্য, অপূর্ব, অসাধারণ—অবশ্যই তাঁরা গুরুদেবকে সর্বদাই সর্ব-সমালোচনার ঊর্ধ্বে রেখে কথা বলেছেন। এ' প্রসঙ্গে আলী সাহেবের মধুর স্মৃতিচারণ: "এই তো মাত্র দু' তিন বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষ আমার উপর হামলা করে অনুরোধ—আদেশও বলতে পারেন—করলেন, পৌষমেলা ও সমাবর্তন উৎসবের প্রাক্কালে যে সাম্বৎসরিক উপাসনা করা হয় তাতে আচার্যের আসন গ্রহণ করতে। আমি সাতিশয় সবিনয় সবিস্তর অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলুম। ওঁদের বলিনি কিন্তু আমি মনে মনে জানি এসব কর্ম করে পুরুত-মোল্লারা পেটের অন্ন জোটায়—অবশ্য এ-স্থলে এঁরা আমাকে একটি কাণাকড়িও দেবেন না, সে কথা আমি বিলক্ষণ অবগত ছিলুম। আবার এ তথ্যও তো জানি যে, বিপদে-আপদে কাছে পিঠে নিতান্তই কোনো মোল্লা-মুন্শী ছিল না বলে আমার পিতৃপুরুষ এ-সব ক্রিয়াকর্ম কালেকস্মিনে অত্যন্ত অনিচ্ছায় সমাধান করেছেন। পূর্বেই বলেছি, তবুও আমি আপত্তি জানিয়েছিলুম। তখন কর্তৃপক্ষ তাঁদের আখেরী মোক্ষম বজ্রবাণ ছেড়ে বললেন, আমারই উপর ভরসা করে তাঁরা অন্য কোনো ব্যবস্থা করেননি; এই শেষ মুহূর্তে অন্য ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার সন্দেহপিচেশ মন অনুমান করলো, অন্য কোনো ডাঙর চাঁইকে হয়তো কর্তারা কাবু করে রেখেছিলেন এবং তিনি শেষ মুহূর্তে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে খবর পাঠিয়ে কত্তাদের সমূহ বিপদে ফেলেছেন। বিপদে পড়লে শয়তানও মাছি ধরে খায়। তাই এসেছেন অধমের কাছে। অবশ্য এনরা শয়তান নন, আম্মো মাছি নই। আমি শুধু রিলেটিভিটি সিমপ্লিফাইড থ্রু প্রভার্ব বোঝাবার জন্য এই প্রবাদটি উদ্ধৃত করলুম।"[৩৪]

৮ই এপ্রিল, ১৯৬৯-এ আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে মুজতবা আলীর একটি কথিকা 'কি করে সাহিত্যিক হলাম' প্রচারিত হয়। তাঁর সর্বশেষ সাক্ষাৎকার প্রচারের গৌরব অর্জন করেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ। ঢাকায় আলী সাহেবের স্ত্রীর বাড়ীতে গৃহীত সাক্ষাৎকারটি ১৯৭২ সনের ৭ই আগস্ট দূরদর্শনের ঢাকা কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত আরো কিছু সভাসমিতি ও অনুষ্ঠানে সৈয়দ মুজতবা আলীকে যেতে হয়েছে, কিন্তু আমরা তার সঠিক বিবরণ অবহিত নই।

তথ্য-নির্দেশ

১. জলে-ডাঙায়, পৃ.৮২-৮৩।
২. ঐ পৃ.১১৬।
৩. মুসাফির, পৃ.৯৩-৯৬।
৪. সৈয়দ মুজতবা আলী : গান্ধীজীর দেশে ফেরা, বড়বাবু, পৃ.২১৩।
৫. কোদণ্ড মুখহানা, পঞ্চতন্ত্র, পৃ.১৩১।
৬. ঐ, পৃ.১৩৭।
৭. জেরু সলম, রাজা উজীর, পৃ.১৮৮।
৮. বড়লাটি লাঠি, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী ১০ম খণ্ড,পৃ.২৫৮।
৯. সৈয়দ মুজতবা আলী : দু-হারা,পৃ.৪।
১০. হিটলারের শেষ দশ দিবস, দু-হারা, পৃ.৫২।
১১. শ্রীমতী সুনন্দা সেনকে লিখিত পত্র–১, ১০ম খণ্ড, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ.৪২৭।
১২. 'মদ্যপন্থা ওরফে মধ্যপন্থা', 'দু-হারা, পৃ.১১৪।
১৩. বিদেশে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ.১৪৪-১৪৫।
১৪. ঐ, পৃ.১৫৫।
১৫. চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ)-কে লেখা পত্র-২, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ.৩৯৬-৯৭।
১৬. সৈয়দ আলী আহসান : ভূমিকা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, পৃ.১।
১৭. সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরি (১), বিভাব, আশ্বিন ১৩৮৭, পৃ.২৭।
১৮. দিনলিপি, ২১ শে বৈশাখ, ১৩৬৭, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ.৩২৮।
১৯. সৈয়দ মুজতবা আলী : জীবন-বিচিত্রা, কথাসাহিত্য, বৈশাখ ১৩৬৯, পৃ.১৫৯-৬০।
২০. সৈয়দ মুজতবা আলী : মুসাফির, পৃ.৫০।
২১. A letter from India, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ.১৯০।
২২. নীলাঞ্জন রায় : মিলাদ মহফিলে মুজতবা আলী, আলোচনা, দেশ, ১১ই মে, ১৯৭৪, পৃ.১৪৫।
২৩. পঞ্চতন্ত্র, দেশ, ১৩ই পৌষ, ১৩৬৯, পৃ.৮৩৬।
২৪. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ.১১।
২৫. সৈয়দ মুজতবা আলী : রোগক্ষয়–শিক্ষালাভ, পঞ্চতন্ত্র,পৃ.২৬।
২৬. পুনরপি প্রাচ্য, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ.২৪১।
২৭. সত্যপীর : হযবরল, দৈনিক আনন্দবাজার, ২৩শে ফেব্রুয়রি, ১৯৪৬, পৃ. ৪।
২৮. রবি-কাহিনী, শারদীয়া প্রসাদ, ১৩৭৮, পৃ. ৪৪।
২৯. অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায় : রম্যরচনার সম্রাট সৈয়দদা, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯১, পৃ. ১৪১।
৩০. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : ভূমিকা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯।
৩১. সম্পাদক লেখক পাঠক, ভবঘুরে ও অন্যান্য, পৃ. ১২৬।
৩২. রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিক উৎসব, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই মে, ১৯৬১, পৃ. ৩।
৩৩. শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসব আরম্ভ, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা,পৃ. ১।
৩৪. শহ্‌র্‌-ইয়ার, পৃ. ১৫১।

অধ্যায় : সাত

০১.

জীবন ও যৌবনের লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী এ' দেশের প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় যৌবনোত্তীর্ণকালে প্রায় সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে ১১ই মার্চ, ১৯৫২ সালে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হন। বিবাহানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় ঢাকায় বুড়ীগঙ্গার তীরবর্তী মিটফোর্ড হাসপাতালের ডক্টরস্ কোয়ার্টারে। পিতামাতার মৃত্যু, আর্থিক অনিশ্চয়তা, দায়িত্ববহনে অনীহা ইত্যাদি কারণে স্বভাব-বোহেমিয়ান মুজতবার জীবনতরী বিশেষ কোনো বন্দরে নোঙর ফেলেনি দীর্ঘকাল। এবং বিয়েটাও নিষ্পন্ন হয় আকস্মিকভাবেই, বন্ধুজনদের প্রায় অজ্ঞাতসারে। সুদর্শন বিদগ্ধ, রসবোদ্ধা মুজতবার শিল্পসুষমামণ্ডিত বাক্ নৈপুণ্যে দেশবিদেশের বহু রমণী আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং এ' ব্যাপারে কোনো প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বনেরও প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। বার্ধক্যেও কতো অবলীলায় কবুল করেছেন, "কোনো রমণীর সান্নিধ্য লাভের জন্যে আমি কোনোরকম প্রস্তুতি নিতে রাজী নই এবং সে বিষয়ে আমার কোনো সচেতন প্রয়াসও নেই। তবু যদি কেউ আমার প্রতি, শুধুমাত্র আমারই আকর্ষণে আমার কাছে ধরা দেয়, তাহলে আমিই বা মুখ ফিরিয়ে নেব কেন?" (সা-৪৫)। গুরুদেবকে সর্বাবস্থায়ই তিনি স্মরণ করেছেন। হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রেও বিশ্বকবির 'পুরুষের উক্তি' তাঁর শিষ্যের জীবনে বাস্তবতা লাভ করেছে—

আঁখি মেলি যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো বলে জানি।
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না তো সে সংশয়—
যে আমারে কাছে টানে তারে কাছে টানি ॥

—মুজতবা আলী কখনো এ' উদারতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রাখেননি। এ' প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের স্মৃতিচারণ:

"দেশ-বিভাগের পূর্বে বিদেশ প্রত্যাগত সুদর্শন যৌবনময় সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন রমণী-রঞ্জন। সবাই বলতো, প্রেমে তিনি উদার এবং নিষ্কুণ্ঠ। এক ভদ্রমহিলা সৈয়দ মুজতবা আলীকে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি নাকি রমণী-রঞ্জন? কলকাতায় প্রেমের বৈকুণ্ঠ বসিয়েছেন?" উত্তরে মুজতবা আলী বলেছিলেন, "রমণী শব্দটি রমণ থেকে এসেছে। সুতরাং একান্ত নিরামিষি বৈষ্ণব না হলে যে-কোনও যুবাপুরুষ রমণী-সান্নিধ্যে নিশ্চয়ই ইতিকর্তব্য পালন করবে।"[১] এবং এ' 'ইতিকর্তব্য' তিনি কতোবার কতোভাবে পালন করেছেন তার প্রামাণিক দলিল আমাদের হাতে নেই।

স্বয়ং মুজতবা আলী তাঁর রচনাবলীতে যতোটুকু বলেছেন এবং তাঁর পত্রাবলী ও অন্তরঙ্গজনদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত সূত্রাবলীই এ' ক্ষেত্রে আমাদের দিক্ নির্দেশক। সে-সঙ্গে অতি বিশ্বস্ত ও মান্যজনদের মুখনিঃসৃত কিছু 'লোকশ্রুতির'ও আশ্রয় নেবো। কেননা, "যা' রটে, তা' কিছু বটে"—আপ্তবাক্যে আমরাও কিছুটা আস্থাশীল।

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, কুঞ্চিত কেশদাম, তীকক্ষ্ন নাসা, প্রাণবন্ত নবীন যুবা মুজতবা যখন বিশ্বভারতীর ছাত্র তখন জনৈকা তন্বঙ্গী বিদেশিনী এলেন অধ্যাপিকা হিসেবে। নিজস্ব একটি ঘরও পেলেন। ছাত্র মুজতবার সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং সেই সূত্রেই ভাষা শেখার অত্যুগ্র তাগিদে অবসর মুহূর্তে ছাত্র অতি নিয়মিত শিক্ষিকার ঘরে যাতায়াত করতে থাকেন। ঈর্ষাতুর সহপাঠীদের অসহযোগিতা কিংবা সনাতনী মনোভাব অচিরেই তাঁদের অখণ্ড জ্ঞানচর্চায় বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবং 'সত্যম শিবম সুন্দরমের' কেন্দ্রবিন্দুর কর্তৃপক্ষও এ' বিষয়ে সঙ্গত কারণেই কিছুটা অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেন।

সমকালীন বিশ্বভারতীর এক নৃত্যপটিয়সী গুজরাটি ছাত্রী মুজতবা আলীর মানসলোক অধিকার করেছিলেন। কিন্তু যথাকালে তিনি বিয়ে করলেন অত্যন্ত খ্যাতিমান পরিবারে এক যুবককে। এতে মুজতবা বেশ আহত হন। এবং ক্ষতটাকে আজীবন আবৃত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। উল্লিখিত মহিলার অনুজার সঙ্গেও তাঁর প্রীতির সর্ম্পক গড়ে ওঠে। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বন্ধুকে যখন মদনাপল্লীর স্বাস্থ্য-নিবাসে নিয়ে যান, সে-সময় এ-মহিলাই সম্ভবতঃ তাঁকে অরুণাচলে রমণ মহর্ষির আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মুজতবা আলী তাঁর একটি গ্রন্থ এঁর নামে উৎর্সগ করেন।

বিশ্বভারতীর স্নাতক হয়ে মুজতবা চলে গেলেন নোতুন কর্মস্থল কাবুলে। ডাকু জেঁকে বসলো রাজসিংহাসনে। তখনকার তাণ্ডব কীর্তিত 'দেশে-বিদেশে'। সে-সময়ের একটি ঘটনা মুজতবা তাঁর সহোদরার নিকট প্রকাশ করেছিলেন। বাচ্চা-এ সাকাও কাবুল দখল করার পর জনৈক সম্ভ্রান্ত সরদার নিরাপত্তার অভাবে কন্যার আব্রু রক্ষার উদ্দেশ্যে মুজতবাকে অনুরোধ করেন তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবার জন্য। বলেছিলেন, "কোন দায়িত্ব নিতে হবে না, শুধুমাত্র 'নিকাহ' পড়ে যেন বাচ্চার হাত থেকে তাঁর কন্যাকে রক্ষা করেন। বিদেশী এবং চলে যেতে হবে—এ' দুটো কারণে মুজতবা এ' প্রস্তাবে সম্মতি দান করতে পারেননি।"(সা-৪)। জীবনস্মৃতি রচনা না করলেও মুজতবা আলী 'মুসাফির' গ্রন্থে কৌতূহলী-জনের উদ্দেশে লিখেছেন, "...সব অভিজ্ঞতা সুসংলগ্নভাবে ক্রমানুক্রমে লিখে উঠতে পারিনি। কিন্তু আমি ভরসা রাখি যে, সুচতুর পাঠক আমার প্রকাশিত পুস্তক থেকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত টুকিটাকি ছিটে ফোঁটা জুড়ে দিয়ে জিগ্‌ল্যো পাজ্‌ল্ সমাধান করতে পারবেন—অর্থাৎ একটি মোজাইক নির্মাণ করতে পারবেন; তদর্থ: মোটামুটি একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পেয়ে যাবেন। যদিও তার আউটলাইনগুলো সূক্ষ্ম শার্প হবে না, বহু ডীটেল বাদ পড়ে যাবে।"[২] মুজতবার জীবনকাঠামো নির্মাণে তাঁর এ' বক্তব্য সগুরুত্ব বিবেচনার দাবী রাখে। তাঁর 'মণি' গল্পে এবং 'শহ্‌র-ইয়ার' উপন্যাসে পাঠানকন্যা 'মণি' প্রসঙ্গে প্রথম পুরুষে যে প্রণয়-কাহিনী উপস্থাপন করেছেন তার পাশাপাশি সহোদরার নিকট বর্ণিত ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষ্য করলে মনে হয় 'মণি' একান্তভাবেই কল্পলোকবাসী ছিলো না। লেখকের জীবনে এমনি এক কিশোরী বুভুক্ষু হৃদয়ের সর্ব আকুতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলো।

মুজতবার বিশিষ্ট বন্ধু কাবুলের ব্রিটিশ লিগেশনের ওরিয়েন্টাল সেক্রেটারি শেখ

মহ্‌বুব আলীর স্ত্রীর পরিচারিকা 'মণি'। আলী সাহেব গিয়েছেন বন্ধুর বাড়ি এবং মণির সঙ্গে প্রথম দর্শনের বর্ণনা :

"...সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ....দেখি, দীর্ঘ এবং তন্বঙ্গী একটি মেয়ে। পরনে লম্বা শিলওয়ার হাঁটু পর্যন্ত নেবে-আসা কুর্তা। ওড়না দিয়ে মাথার আধেক অবধি ঘোমটা।

শ্যামা। এবং সে অতি মধুর শ্যামবর্ণ। ...সেই শ্যাম, যেটি পর্দানশীন বাঙালী মেয়ের হয়।"[৩] অতঃপর কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। এই পাঠানতনয়া শুধু "বোঝে পাঠানদের কায়দা-কানুন। সে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় পাঠান জগতে। বিশ্বভুবনের খবর রাখে না।" এবং প্রথম দর্শনেই সর্বচৈতন্য দিয়ে ভালোবেসে ফেললো লেখককে। মুজতবার কাল্পনিক বিবাহ সংবাদে যে আহারনিদ্রা বিসর্জন দেয়, বাচ্চায়ে সাকাওর আক্রমণের ফলে "...যে কয়দিন শহর লিগেশন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল সে ক'দিন এখানে অনেক রকম গুজোব পৌছঁত, ...আর মণি ছুটোছুটি করেছে, এ চাপরাসী থেকে ও চাপরাসীর কাছে, এ-আর্দালী থেকে ও-আর্দালীর কাছে। টাকা দিয়ে লোভ পর্যন্ত দেখিয়েছে",—মুজতবা আলীর কুশলাবার্তা-প্রত্যাশায়। মুজতবা আলী লিখেছেন :

"মহবুব আলি...আমার দু'খানা হাত ধরে বললেন, 'দোস্ত আমি জানি, এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি সৈয়দ বংশের ছেলে।....লোকাচার দেশাচারও আছে। সেগুলো মানতে হয়।....কিন্তু মণিকে বোঝাই কি করে, আপনার সঙ্গে তার বিয়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে ছেলেবেলা থেকে দেখেছে যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে যে-কোনো ছেলের বিয়ে হয়। তা-যে শুধু পাঠানদের ভিতরেই, সে কি করে জানবে বলুন। বাইরের সংসারে যে অন্য ব্যবস্থা, সে কি করে বুঝবে বলুন ?"[৪]

এ' স্মৃতি প্রায় আত্মধিক্কারে রূপান্তরিত 'শহ্‌র্‌–ইয়ার' উপন্যাসে:

"মণির কাহিনী গল্প নয়, হাজার পার্সেন্ট সত্য।...আমি আমার জীবনে মাত্র একটিবার—ঐ নিষ্পাপ কিশোরী মণির কাছ থেকে—অকুণ্ঠ, সর্ব ত্যাগী, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য প্রণয় পেয়েছি।...

আমার আফসোস, আফসোস,—হাজার আফসোস—যে আমি মণির প্রেমের নেমক খেয়ে সে নেমকের কিম্মৎ দিতে পারলুম না,—আমার সব সময় মনে হয় আমি যেন নেমকহারাম রয়ে গেলুম।"[৫]—নামটি কাল্পনিক হলেও কাহিনী অলীক নয় বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মুজতবা আলী পাড়ি জমালেন সুদূর জার্মানীতে। প্রথম দফায় ছাত্র হিসেবে ছিলেন কিঞ্চিদধিক আড়াই বছর। হৃদয়ের আদান-প্রদানে এখানেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট বলিষ্ঠ। লটে, লিজেল, আনামারি ইত্যাদি নামগুলো এ' পর্যায়ে বিশেষভাবে মনে পড়ে। দশ বৎসরের লটে, ছাব্বিশ বৎসরের যুবার প্রেমে পড়েছিলো। এবং সে-কথা অকপটে স্বীকৃত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর। বালিকা লটের কালো চুল আর নীলাভ চোখ প্রবাসী যুবককে তার বোনদের কথা এবং দেশের নীলাকাশ স্মরণ করিয়ে দিতো। এবং এ' নিয়ে যুবকচিত্তে কবিত্বরসও সঞ্চারিত হয়েছিলো।—

'কাতরে শুধাই, এ কি
তোমার নয়নে দেখি,
আমার দেশের নীলাভ আকাশ
মায়া রচিছে কি ?'[৬]

চল্লিশ বৎসর পর পুরনো ভালোবাসার জনকে ফিরে পেয়ে লটে আনন্দাশ্রুতে আবেগ প্রকাশ করে। এ কী সামান্য সৌভাগ্যের কথা! "...এ পৃথিবীতে ক'টা মেয়ে দশ বছর বয়সে যাকে ভালোবেসেছে তাকেই ফিরে পেল চল্লিশ বছর পরে।"[৭] এই বালিকারও অজ্ঞাত ছিলো না যে, যার পদপ্রান্তে সে তার হৃদয়মন উৎসর্গ করেছে তার একটি 'পাকা বান্ধবী' আছে, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, নাম 'আনামারি'। যৌবনের কীর্তিকাহিনী বয়ানের সময় আলী সাহেব যেন তাঁর অতীতের মধুর দিনগুলোতে প্রত্যাবর্তন করেন। যৌবনের হাতছানি তখনো তাঁকে উৎসাহিত প্রগলভ করে তোলে। জার্মান প্রবাসকালে তিনি যে 'অন্দর মহলের' রীতিমতো আরাধ্য দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন তার অকুণ্ঠিত প্রকাশ 'বিদেশে'। লটে তাঁকে নিয়ে একটি কাফেতে ঢুকলে সেখানকার এক তন্বী—লটের মেয়ের বয়সী এবং পরিচিতা—

'বললে "মাকে ডেকে আনি।"

লটে : "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই কর্। ওর সঙ্গে হয়তো আমাদের কালামানিকের গোপন প্রেম ঘুপসি ভাব ভালোবাসা ছিল। আমাদের লটবরটি তোদের মায়ের যৌবনে ছিলেন আস্ত পেটিকোট-শিকারী ব্রা-বিজয়ী।" '[৮]—সুভাষণ না হলেও এ যে সত্যভাষণ সে সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার মতো উপযুক্ত প্রমাণ পরবর্তীকালেও পাওয়া গেছে।

মারিয়ানার সঙ্গে ভাব-ভালোবাসার কাহিনী 'Love and Friendship" শিরোনামে 'A personal experience' হিসেবে মুজতবা আলী বর্ণনা করেছেন। জার্মানীতে বিভিন্ন সেমিস্টার বা সেশনে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনের রীতি প্রচলিত থাকলেও "...neither I (মুজতবা) nor Mariana dreamed of separation. I got my doctorate in the beginning of 1932 and left Mariana and Bonn in tears. Shortly afterwards Mariana wrote to me to say that she just could not stand the sight of Bonn, the Rhine and above all the Venusbury where we used to go out for long walks and on Saturday nights often used to greet the rising sun. Bonn was a small university town forty years ago and practically everyone who had anything to do with the university students knew that our love was "feste" (unshakeable) "Solide" (Solid, pucca) and when I left for India and Mariana for Munich it was palpable to our colleague, at Mensa (Student Restaurant), the old woman at the newspaper Kiosk, the waiters, the few policemen on beat that Boon could boast of and finally even my good old professor Carl Clemen who had international fame in Comparative Religion and knew that we were inseparable would raise his hat and bow profusely whenever he met her in the street that ours was not the notoriously proverbial semesterliebe but of full five semesters when circumstances separated us,"[৯] দীর্ঘদিন তাঁদের মধ্যে আর যোগাযোগ ছিলো না। ইতিমধ্যে দু' সন্তানের মাতা মারিয়ানাকে যুদ্ধকালীন অরাজকতায় বৈধব্য বরণ করতে হয়েছে। এই দুঃসংবাদে বেদনাতুর আলী সাহেবের সমবেদনার উত্তরে মারিয়ানা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখেন, As long as I am alive you are most welcome to my house."[৯] দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর জীবনের অন্তিম প্রহরে বহু প্রতীক্ষিত মিলন তাদের যেন অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় এবং প্রথম যৌবনের অন্যতম সঙ্গিনীকে সনাক্ত করতে বৃদ্ধ আলী সাহেবের অসুবিধার কোনো হেতু ছিলো না।

"As she came towards me from the parking place I could distinctly see the same gait, the same bearing, and I believe with a view to please me she had put on a Kostüm and even the same coiffeur she used to have forty years ago."[৯]

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বিদেশী বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ মুজতবা আলী প্রায় নিয়মিত রেখেছিলেন এবং তাঁর 'dearest annemarie'-কে ৬ই জুন, ১৯৭১-এ লেখা একটি পত্র আমাদের হাতে রয়েছে। (প-১৪৮)। অতীতের স্মৃতিচারণে এবং প্রাচীন দিনের বন্ধুজনের স্মৃতি তর্পণের মধ্যে মুজতবার হৃদয়ানুভূতি তাঁর অতিশয় সংবেদনশীলতারই পরিচয়বাহী। ১৯৭১-এর জুলাইতে মুজতবা আলী জার্মান-প্রবাসী তাঁর এক স্নেহভাজনকে লেখেন:

"...Hassensteine পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে খুশী হয়েছো ...ওদের পিতা ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু। মাতা ছিলেন বান্ধবী। আমার চেয়ে ১০-১৫ বছরের সিনিয়র।...কোনো একদিন Waltrant-এর সঙ্গে appointment করে যদি ওর মায়ের গোরে গুটি কয়েক ফুল রেখে আসো তবে বড়ই কৃতজ্ঞ হব।"(প-১৪৭)।

০২.

কোলকাতায়ও বহু রমণীর উষ্ণ সান্নিধ্য তিনি পেয়েছেন এবং এঁদের দু-একজন তাঁর মনোলোকে কিছুটা ছায়াবিস্তারও করেছিলেন। সঙ্গসুখেই তিনি ছিলেন তৃপ্ত—জীবনসঙ্গিনী হিসেবে কাউকে গ্রহণ করেননি। বিয়ের প্রাক্কালে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের জনৈকা অফিসারের সঙ্গে মুজতবার ঘনিষ্ঠতা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মনোহারিণী চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আলী সাহেব ধরা দেননি। এরপরই তিনি সকলকে চমকে দিয়ে বিয়ে করে ফেললেন। সুতরাং, পরিচিত মহলে মুজতবার বিয়ে রীতিমতো আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। কোন্ দেশের মহিলা, কোথায় পরিচয়, কতোদিনের ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মুজতবার সঙ্গে তাঁর পরিণীতা রাবেয়া আলীর নিবিড় সান্নিধ্যের কোনো সুযোগই ঘটেনি। বিয়ে হয়েছিলো সম্পূর্ণ পারিবারিক উদ্যোগে, প্রস্তাবনার মাধ্যমে। (সা-২ ও ৪)। আলী সাহেব তখন দিল্লীতে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্সের' সেক্রেটারি। বিয়ের বন্দোবস্ত পাকা করে তাঁকে সংবাদ দেয়া হলে মুজতবা ঢাকা আসেন এবং ঢাকা বিমান বন্দরে বিদেশীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মানুযায়ী "Purpose of visit' প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিলেন 'To attend a marriage.'[১০]

১৯৪৭ সালে বিলেতের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত পাবনা জেলার রাবেয়া খাতুন (পরে মিসেস রাবেয়া আলী) সিলেট গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে স্থানীয় এক সাহিত্য সভায় মুজতবা আলীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা এবং ব্যক্তিত্ব তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। সামান্য আলাপ-পরিচয়ের সূচনা সেখানেই এবং পরিণতিতে প্রধানতঃ মুজতবার বোনদের সক্রিয় প্রচেষ্টায় পরিণয়। বাসর রাতে মুজতবা আলী নববধূকে মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই একখণ্ড 'দেশে-বিদেশে' উপহার হিসেবে প্রদান করেছিলেন।[১১] একমাত্র বিয়ের ক্ষেত্রে মুজতবা বৈষয়িক সুবুদ্ধি এবং

স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন। পাত্রী হিসেবে এমন একজনকে নির্বাচিত করলেন যাঁর দায়-দায়িত্ব কখনো তাঁকে বহন করতে হয়নি।

'মুজতবা-সাহচর্যে বিমুগ্ধা রমণী' প্রসঙ্গে মিসেস আলীর স্বীকারোক্তি—"আমিই যখন হয়েছিলাম তখন অন্য মেয়ে হবে, এতে আশ্চর্যের কি! দেখতে উনি সত্যি সুন্দর ছিলেন। তবে ওঁর অসাধারণ প্রতিভাই আমাকে বেশী আকৃষ্ট করে।"[১১]

আলী সাহেবের সৌন্দর্য, বৈদগ্ধ্য এবং বাক্যের ইন্দ্রজাল বিবাহোত্তর জীবনেও বহু নারীকে মোহাবিষ্ট করেছে। কখনো কখনো তাঁর চিত্তদৌর্বল্যও অনাবৃত হয়ে যেতো।

১৯৫৪ থেকে প্রায় দেড়যুগ এক লেখিকার সঙ্গে আলী সাহেবের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাই। এই গৃহবধূ স্বামী-সন্তান-ঘর সামলে সাহিত্যচর্চা করতেন। এবং অতি সহজেই মুজতবার নৈকট্য লাভ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক কী ছিলো তা' সুস্পষ্ট নয়। এবং এ' ধরনের বহু রমণী আলী সাহেবের সান্নিধ্য পেয়ে নিজেদের সৌভাগ্যবতী মনে করেছেন। তাঁদের বন্ধুত্বের স্তর সম্পর্কে একটা সাধারণ অনুমান করবার জন্যে এঁকে লেখা মুজতবার কয়েকটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করছি। তাঁদের বন্ধুত্বের প্রতি কটাক্ষ করে কারো অনুযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মুজতবা আলী কটক থেকে ৩১শে মার্চ, '৫৪-তে লেখেন :

"...আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকো। আমি যে বয়সে এসে পৌচেছি সেখানে মানুষ ঘন ঘন রঙ বদলায় না। আমি যৌবনেই রঙ বদলাতাম না, এখন তো কথাই ওঠে না। ...তোমার আমার বন্ধুত্ব যৌবনের তীব্র তৃষ্ণার জিনিস নয়, এখানে একে অন্যের সহ-অনুভূতির উপর আমাদের বন্ধুত্ব। এখানে একে অন্যের demand কম বলে, কোনো প্রকারের নৈরাশ্য আসবে না। চেয়ে না পেলে মানুষ রাগ করে বন্ধুত্ব ছিন্ন করে। আমাদের বেলা তো তা নয়।

তোমার বন্ধুত্ব আমাকে এতখানি প্রীতি এবং শান্তি দিয়েছে যে আমার মন শুধু খুশীতে চুপচাপ। এ যেন গরীব লটারি জিতে bank balance করে চুপচাপ শুয়ে আছে।" (প-১০৮)।

৯ই জুন, '৫৪-তে কটক থেকে লেখা পত্রাংশ :

"যত বারই ভেবেছি, তোমাকে লিখি, ততবারই মনে পড়ছে তোমার একাধিকবার বলা সুস্পষ্ট জোরালো অভিমত, আমার চিঠি তোমাকে আনন্দ তো দেয়ইনি, কষ্ট দিয়েছে প্রচুর।

সমস্তক্ষণ এ–কথাটি প্রহরীর মত আমার মনের দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়।

আমি শুক্রবার...কলকাতা পৌঁছব।...তুমি যদি শনিবার দিন বেলা ন'টার পর (চারটের ভিতর–...) আমার বাড়িতে আসো তবে কৃতজ্ঞ হই। যদি কোনো কারণে না আসতে পারো তবে কিছুই বলবো না। অর্থাৎ সয়ে নেবার চেষ্টা করবো। কিন্তু কোনো লোক পাঠাবার প্রয়োজন নেই।" (প-১০৯)।

কটক থেকে লেখা আরেকটি চিঠি:

"তোমার...চিঠি কাল পেয়েছি। সে-চিঠি আমাকে বড় বেদনা দিয়েছে।

আজ সকালে হঠাৎ মনে হল, হয়ত কোনোকিছু বলার জন্য তুমি অপরাধ নাওনি, হয়ত অপরাধ নিয়েছ কোনো-কিছু না-বলার জন্য।

...প্রত্যেক ছত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লুম। কোন্ খানে কোন্ গোপন ইঙ্গিত আছে যার উত্তরে তুমি বিশেষ কিছু শুনতে চাও।

তখন চোখে পড়ল, 'আপনি তো ভবঘুরে মানুষ, একটা দিন আমায় দিন না ?' আমি ভেবেছিলুম এটা metaphorically লিখেছো, অর্থাৎ তোমার ভবঘুরেমি ক্ষান্ত দিয়ে খনেকের তরে আমার কাছে দাঁড়াও।...

তোমার চিঠি আবার পড়ে মনে হ'ল, metaphorically mean করোনি, সত্যই আমাকে কলকাতা আসতে বলেছ।

খুব সম্ভব আমি তা হলে আসছে শুক্রবার (১৬ এপ্রিল) ভোর ৭॥০" টায় কলকাতা পৌঁছব।"(প-১১০)।

'৫৪-এর অপর একটি পত্রে লিখেছেন, "তোমার চিঠিগুলো কি ফেরৎ চাও। ব'লো, পাঠিয়ে দেব।"(প-১১১)। সেই চিঠিগুলোতে কী লেখা ছিল ? আলী সাহেবকে লেখা চিঠিপত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। স্বভাব-কারণেই চিঠিপত্র সংরক্ষণে তিনি যত্নবান ছিলেন না। কিছু হারিয়ে গেছে, কিছু বিনষ্ট হয়েছে। তাঁকে লেখা পত্রাবলী পাওয়া গেলে মুজতবাজীবন ও চরিতের অনালোকিত দিক সম্পর্কে হয়তো একটা নির্দেশ পাওয়া যেতো।

নানা টানা-পোড়েন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত মুজতবা প্রায়ই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। নৈরাশ্য কখনো তাঁকে অদৃষ্টবাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

দিল্লী থেকে ৩১শে জুলাই, ১৯৫৬ সালের পত্র :

"আমি অদৃষ্টের কাছে হার মেনেছি। আমার চাহিদা নিজের থেকে কমিয়ে এনে যখন সামান্যতমে পৌঁছলুম, তখনো দেখি, অদৃষ্ট কৃপণ। তাই কল্পনা করেই আনন্দ। সেখানে অদৃষ্ট কোনো বাধা দিতে পারে না। তুমি সায় দিলেই হল। তারপর তোমাকে দুনিয়ার যত গল্প শোনাবো।"(প-১১৫)।

এই মহিলার একটি অঙ্গুরীয় নিয়ে মুজতবা ধারণ করেছিলেন সৌভাগ্যের আশায়। আশার ছলনায় কাতর আলী সাহেবের ২৬শে জানুয়ারী, '৬০ সনের পত্র :

"কই আঙটিটা তো আমার কপাল ফেরাল না। গোমেদ, না ? আমার বোধ হয় দরকার বজ্রমণি। মন্দভাগ্যের শক্ত পাঁচিল ফুটো করার জন্য।" (প-১১৯)।

১৯৫৬ সনের অপর একটি পত্রাংশ :

"কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশ-কুসুম চয়নে—জীবনে যখন আর কোনো মধু পাওয়ার থাকে না তখনই তো মানুষ অভয় মেনে আকাশ-কুসুম চয়নে সমস্ত সত্তা উৎসর্গ করে দিতে পারে।...

সেই আকাশ-কুসুমকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলেই চরম নৈরাশ্য, শূন্যতার হাহাকার। তখন দুই কূলই যায়।

আমি চঞ্চল। বারান্দাতে একটা চক্কর মেরে ঘরে ঢুকতেই নজর পড়লো তোমার খোঁপা কাঁধের উপর এসে পড়েছে। জামার আর খোঁপা থেকে খসে-পড়া দুগাছা চুলের মাঝখানে সোনার সরু চেন। কাঁধটি অল্প অল্প চিক্ চিক্ করছে ঘামে। গলা কাঁধ হয়ে কনুই পর্যন্ত যে রেখাটি নেমে এসেছে সেটাকে হাত দিয়ে চোখ দিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। পিঠের উপর দিয়ে ট্যারচা হয়ে যে শাড়ীর পাড় জামার সঙ্গে মিলে গিয়ে পিঠের ডৌলের আভাস দিচ্ছে তারই দিকে তাকিয়ে থাকি।

...ছবি যে বড় ঝাপসা। দাঁড়াও, আমার মনের তুলির রঙ দিয়ে ছবিটাকে প্রাণবন্ত করে তুলি।...এক জাপানী চিত্রকর বুকের জখমের রক্ত তুলি দিয়ে তুলে নিয়ে ছবি আঁকতো।

সবাই শুধাতো, এ-রকম অদ্ভুত জীবন্ত রঙ সে পায় কোথায় ? একদিন সে মরে গেল—ঐ জখমের দরুণই। তখন ধরা পড়লো, সে শেষ রক্তবিন্দু ব্যবহার করে তবে গিয়েছে।

আমার মনে হয়, তার হৃদয়ে ক্ষীণ আশা পোষণ করতো বলে—যে একদিন তার ছবি মূর্তমান হবে তাই সে মরলো। আশার পোকা—আকাশ-কুসুমকে সার্থক করার মরীচিকা—যক্ষ্মার পোকার চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক।

কিন্তু আমি তো বসে আছি, অভয় মানি।" (প-১১৬)।

—কোন্ প্রত্যাশায় মুজতবা প্রতীক্ষা করেছেন ? কী ছিলো তাঁর প্রার্থনা ?

২৮শে আগস্ট '৬৩-তে এই মহিলার কাছে লেখা প্রাপ্ত সর্বশেষ পত্রে আলী সাহেব কৃত অপরাধের জন্য মার্জনা প্রার্থনা করে সানুনয় লিখেছেন, "...তুমি আমাকে স্বগুণে মাফ করে দিয়ো। ভবিষ্যতে আর এ রকম প্রগলভতা হবে না।"(প-১২২)।

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে একই জনের নিকট লেখা এতোগুলো পত্রাংশ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছি। যাঁর কাছে মুজতবার হৃদয়কুতি এ-ভাবে মাথা কুটেছে তাঁকে কিন্তু কোনো পুস্তক উৎসর্গ করেননি। বরঞ্চ একই সময় অন্য রমণীর সঙ্গে তাঁর অধিকতর রমণীয় সম্পর্কের তথ্য পাওয়া যায়। এঁদেরই একজনের প্রতি মুজতবার একটি গ্রন্থও উৎসর্গিত।

১৯৬০-এর দিকে অপর এক মহিলার সঙ্গে প্রৌঢ় সৈয়দ মুজতবা আলী জড়িয়ে পড়েন। এর উল্লেখ তাঁর এক পত্রেও রয়েছে। ১৭ই মে, '৬১-তে শ্রীসোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের সঙ্গে আলী সাহেব উক্ত মহিলার উদ্দেশেও একটি চিঠি দেন এবং সোমেনবাবুর প্রতি তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ:

"...পত্রপাঠ সঙ্গের চিঠিটা নিয়ে তুমি...রোডে যাবে।...সেখানে ডঃ...দর্শন চাইবে। ওঁর দেখা পেলে তবে ওঁর হাতে চিঠিটা দেবে। না হলে ফেরৎ নিয়ে আসবে। কারণ আমার একাধিক চিঠি দারোয়ানদের গাফিলতী বা শয়তানীতে গায়েব হয়েছে। ডাক্তারের রঙটি কালো পাথরের মত সুন্দর—কোঁদাই যেন কালো পাথরের। আবার বলছি, ওখানে অনেক মেয়েছেলে আছে বলে কি যে হচ্ছে বুঝতে পারছিনে—চিঠির বাবদে। ডক্টরের আপন হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত কোনো বিশ্বাস নেই।...চিঠি অন্য কারো হাতে দেবে না।

পত্রোত্তরে ফলাফল জানিয়ো। বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আছি, বৎস।

এ কাজটা please, ঠিকমতো করো।' (প-৩৮)

পত্রে মুজতবার আর্তি স্বতঃস্ফূর্ত। শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করেন যে, আলী সাহেবের পত্রবাহক হিসেবেই এই মহিলার সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। তাঁর বিবরণ :

"...আলী সাহেব যখন ...রোডে ...বাড়ীতে অবস্থান করতেন তখন ...(উক্ত মহিলা)-ও সেখানে আসতেন। শ্রীমতী...(র) চালচলন অনেক সময় দৃষ্টিকটু মনে হতো বলে... গৃহকর্ত্রী আপত্তি ও তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করলে আলী সাহেব আর..সে বাড়ীতে রাত্রিবাস করতেন না।

সৈয়দ মুজতবা আলীর নির্দেশে আমি অনেক সময়...হোটেলে 'কক্ষ' রিজার্ভ করে রাখতুম। আলী সাহেব শান্তিনিকেতন থেকে সেখানে এসে উঠতেন। এবং... সেই হোটেল কক্ষে ডঃ আলীর সঙ্গে মিলিত হতেন। শ্রীমতী... এলে আলী সাহেব আমাকে হুকুম করতেন, 'বৎস! এবার প্রস্থান কর।' "(প-৪৪)

তাঁদের ঘনিষ্ঠতা শেষ পর্যন্ত না 'পরিণয়ে' স্থিতি লাভ করে এমন একটা কানাকানি

স্ফুট হয়ে উঠলে শেষ পর্যন্ত আলী সাহেবের সুহৃদমণ্ডলী তাঁকে কোনোক্রমে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হন। অন্যত্র 'শ্রীমতীর' বাগ্‌দানপর্ব সম্পন্নের সংবাদে বিচলিত বিরলকেশ সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় আলী সাহেবের প্রাণচাঞ্চল্যে সাময়িক ভাটা পড়ে—অবশ্য এ' সবই ছিলো তাঁর জীবনে ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। এই মহিলার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ মুজতবা আলী একটি গ্রন্থ উৎসর্গ করেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের অন্যতম ছিলেন ৪২/এ, হাজরা রোডের (স্বর্গীয়) প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়। তাঁর একাধিক মজলিসী রচনায় আড্ডা প্রসঙ্গে এ' বাড়ীর উল্লেখ রয়েছে। দীর্ঘদিন বাস করেছেনও বাড়ীটিতে। প্যারীবাবুর কন্যা ডঃ পূরবী রায় প্রশ্নোত্তরে জানিয়েছেন, "চাচার (মুজতবা আলীর) একটা আকর্ষণীয় ক্ষমতা ছিল। একাধিক রমণী তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের জন্যে আসতেন—এটা আমরা দেখেছি। এতে লুকোবার মতো কিছু নেই। আর মদ তো তাঁর নিকট ছিলো জল তথা জীবনেরই নামান্তর।" (সা-৪৬)

০৩.

পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদসমূহে আমরা মুজতবা-চরিত্রের দুর্বল দিক নিয়ে কিছুটা আলোচনা করেছি। কিন্তু কোনো ব্যক্তির বিচার-মূল্যায়নে এ' দিকটিই একমাত্র নিরিখ তো নয়ই, —এমনকি মুখ্য আলোচ্য বিষয়ও নয়। অপূর্ণতা মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং অসাধারণ ব্যক্তির অপূর্ণতা, দুর্বলতাই সাধারণের দৃষ্টিতে প্রকটভাবে ধরা পড়ে। সার্বিক বিচারে—ভুল-ত্রুটির কথা স্মরণে রেখেও—দেখবো পিতা-স্বামী-আত্মীয়-বন্ধু হিসেবে মুজতবা আলী সর্ববিধ সংস্কারমুক্ত একজন সুন্দর মানুষ, প্রাণবান পুরুষ, যার সংবেদনশীল হৃদয় ছিলো মানবরসে পরিপূর্ণ। 'মনুষ্য চরিত্রের দুর্বলতা সত্ত্বেও এত ভালো, উদার, হৃদয়বান, স্নেহপ্রবণ মানুষ' সুলভ নয়। (প-২১৭)

পারিপার্শ্বিক কারণে মুজতবা আলী ছিলেন ভারতে; আর স্ত্রী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চাকুরে। আলী সাহেব কখনো চাকুরি করেছেন, কখনো লিখে উপার্জন করেছেন। কিন্তু আর্থিক নিরাপত্তা তাঁর জীবনে কখনো সুনিশ্চিত ছিলো না। পরিবার-পরিজনের সান্নিধ্য কামনা করেছেন। স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখার সাধও জেগেছে—কিন্তু আপন সাধ্যের প্রতি অনাস্থাও ছিলো সুযৌক্তিক। তাই স্ত্রীর জন্যেও শান্তিনিকেতনে চাকুরির চেষ্টা করেছিলেন, সফলকাম হননি। ফলে 'প্রিয়জন'কে কাছে রাখার বাসনাও পরিত্যাগ করতে হয়েছে। মুজতবা-চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হয়েই রাবেয়া আলী তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করেছিলেন। সাংসারিক জীবনে টেনে এনে স্বামীর প্রতিভার স্ফুরণে তিনি কোনো রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেননি এবং একই কারণে বেগম আলী স্থায়ীভাবে ভারতেও যান নি।[১২] স্ত্রীর আর্থিক নির্ভরতায় আস্থাশীল মুজতবা তাঁকে কাছে এনে অনিশ্চয়তার মধ্যে স্থাপন করতে চাননি। "এ' ছাড়া (তিনি) আয় করতেন লিখে।... পাবলিশাররাও সব সময় তাঁর প্রতি সুবিচার করেন নি।" (সা-২৪)। কাজেই ভরসা না রাখবার যথেষ্ট কারণও ছিলো। স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব এবং পিতৃকর্তব্য

যথাযথভাবে পালনে অক্ষমতার জন্যে একটা অপরাধবোধ তাঁকে সর্বদা ক্ষতবিক্ষত করেছে। ১৯৬৩ সনে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিজের তত্ত্বাবধানে এনে শান্তিনিকেতনে ভর্তিও করেছিলেন। অবশ্য সন্তানের ভবিষ্যতের কথা মনে রেখেই তাকে আবার মাতার আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। স্ত্রী এবং বিশেষ করে দুই পুত্রের জন্যে তাঁর চিত্তের অস্থিরতা প্রকট হয়ে উঠতো। এদিকটা অপ্রকাশ রাখতে চাইতেন বলে তা' ছিলো আরো মর্মান্তিক। এই অন্তর্দাহে তিনি নিজেকে নিঃশেষ করেছেন সকলের অগোচরে। "মুজতবা আলী ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেও তাঁর সন্তান-বাৎসল্য এবং পরিবারের প্রতি আকর্ষণ ও এতদ্‌সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা থেকে কখনো মুক্ত ছিলেন না।" (সা-৪৬)। সন্তান-বাৎসল্য এবং স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ মুজতবার চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে।

প্রতি বৎসর দু'-একবার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে আলী সাহেব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আসতেন কিংবা স্ত্রী-পুত্র ভারতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সম্মিলিত হতেন। বৎসরে অন্তত একবার পরিবারের সঙ্গে মিলনকে তিনি তাঁর জন্যে 'হজের' সমতুল্যই মনে করতেন। "পৌষ মেলার সময় তো আমার বাৎসরিক হজ—ভয় নেই মক্কা মু'আজম্মাতে নয়—রাজশাহীতে। ফিরোজভজু (পুত্রদ্বয়) তখন ছুটি পেয়ে হস্টেল থেকে মায়ের কাছে আসে।" (প-১৮৪)। বেগম আলী তখন রাজশাহীতে 'ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস অব স্কুল্‌স্‌'-এর পদে আসীনা। অবশ্য বার্ষিক 'পরব'-ও সর্বদা সরকারি আইন-কানুনের কঠোরতায় পালন করা সম্ভব হতো না। আমলাতন্ত্রের যাঁতাকল এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অবিশ্বাসও অনেক ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠ মানুষকে নীতিভ্রষ্ট হতে বাধ্য করে এবং অনেকে কোনোক্রমে মিথ্যাকে এড়িয়ে সত্যের নিকটবর্তী হতে সচেষ্ট হয়। ৩রা নভেম্বর, ১৯৫৪ সনে কটক থেকে মুজতবা তাঁর এক অনুজ-প্রতিমকে লেখেন, "...৩) যে form পাঠিয়েছ তার Question no-7 এ তুমি যা ঠিক ভাবো তাই লেখো।

(৪) গৃহিণী "relation" লিখেছেন Question 3এর উত্তরে। husband বললে বোধ হয় নানা অসুবিধা আছে।" (প-৩)। রাজনৈতিক কারণ এবং দেশে দেশে বৈরী মনোভাবের ফলে সাধারণ মানুষকে প্রিয়জনের সঙ্গে একান্তভাবেই পারিবারিক প্রয়োজনেও মিলিত হতে হয়েছে অসত্যের আবরণে। প্রতিকূল পরিবেশ কি ভাবে তাঁকে তিলে তিলে ক্ষয় করেছে, হতাশা চতুর্দিকে কি নিশ্ছিদ্র ঘনঘটার সৃষ্টি করেছে তার পরিচয় উদ্ধৃত পত্রাংশ:

"আমি stars-এ বিশ্বাস করিনে। তবু metaphorically বলছি, আমার উপস্থিত দিনগুলো যাচ্ছে under the worst stars! হালে আমার শাশুড়ী মারা গিয়েছেন...বাস করতেন রাবেয়ার সঙ্গে। সে একেবারে একলা হয়ে গেল এখন। ছেলে দুটো হস্টেলে। এ-সময়ে সে আমার কাছ থেকে কি আশা করেছিল জানিনে। Normal times হলে আমি যাবার চেষ্টা দিতুম। Visa নিয়ে তো কোনো বিপদ নেই—বিপদ, আমাদের সরকার permission দেন না। কারো—এ স্থলে স্ত্রী–মা মরেছে, তাকে আমি কিছুই লিখতে পারি না। মাথায় কোনো চিন্তা আসে না। এ Tragedy-র সামনে আমি একেবারে helpless. আমার মা গেছেন, ৩০ বছর হলো। অথচ আমার কাছে সেটা এখনো yesterday.

কী রকম অদ্ভুত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে আছি।" (প-১৮৫)।

বন্ধুজন পরিবৃত থেকেও পরিবার-বিচ্ছিন্ন মুজতবা মন-মানসিকতায় ক্রমান্বয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন এবং বেদনার এই হলাহল তাঁকেই কণ্ঠে ধারণ করতে হয়েছে।

মুজতবা যখন যেখানেই থাকুন না কেন, স্ত্রী-পুত্র তথা পরিবারের প্রতি তাঁর কর্তব্যের কথা সর্বদা স্মরণে রেখেছেন। তাঁদের সামান্যতম দুঃসংবাদে বারবার ছুটে গিয়েছেন ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহে। পীড়িত স্ত্রীকে দেখতে গিয়ে ময়মনসিংহে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অবিশ্বাস্য' সমাপ্ত করেন এবং সেখানেই স্ত্রীর অনুরোধে কিশোর-পাঠ্য ভ্রমণ-কাহিণী 'জলে-ডাঙায়' রচনার সূত্রপাত। জ্যেষ্ঠ পুত্রের উদ্দেশে ডাইরীতে লিপিবদ্ধ একটি পত্র:

"১৯৫৩ ইংরিজির শীতের শেষে আমি মৈমনসিংহ গিয়েছিলুম। তখন ...'অবিশ্বাস্যে'র শেষ অধ্যায়গুলো লিখছি। রোজ সকালে বারান্দায় এক কোণে বসে বই লিখি...আর তোমার মা আমাকে মাঝে মাঝে চা দিয়ে যান।

একদিন চুপ করে বসে আছি। তোমার মা জিজ্ঞেস করলেন, 'লিখছ না যে।'

আমি বললুম, 'অবিশ্বাস্য' শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই বসে বসে ভাবছি অন্য কি বই আরম্ভ করি। তোমার মা এক মুহূর্ত না ভেবেই বললেন, 'বাচ্চাদের জন্য একখানা বই লেখ।'

আমি তদ্দণ্ডেই 'জলে-ডাঙায়' লিখতে বসে গেলুম।...

উৎসাহের কারণ:

(১) তোমার মা বলেছেন,

(২) দেখলুম, তোমার বয়স যখন ১২/১৪ হবে, তখন আমি তো এ-লোকে থাকবো না, তাই তোমার জন্য তোমার ঐ বয়সের উপযোগী—কিছু লিখে রেখে গেলে তুমি খুশী হবে।"[১৩]

বইটি পুত্রকে উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখেছেন:

'বাবা ফিরোজ,

ভ্রমণ-কাহিনী তুমি যেদিন পড়তে শুরু করবে সে দিন খুব সম্ভব আমি গ্রহ-সূর্যে তারায়-তারায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। সে বড় মজার ভ্রমণ—তাতে টিকিট লাগে না, 'ভিজা'রও দরকার নেই। কিন্তু, হায়, সেখান থেকে ভ্রমণ-কাহিনী পাঠাবার কোনো ব্যবস্থা এখনো হয়নি। ফেরবারও উপায় নেই।

তাই এই বেলাই এটা লিখে রাখছি।"

অর্থাভাবে অনেক সময় সাধ-আহলাদ মেটাতে পারেননি —আবার কখনো বিরূপ প্রতিবেশ দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আনন্দঘন উৎসব উপলক্ষে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। অর্থেরও অনটন নেই। তবু মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ। হাসির অন্তরালে কী গভীর বেদনাবোধের প্রকাশ ১৯৫৫ সালে ঢাকা থেকে লেখা একটি চিঠিতে:

"দিন সাতেক পরে ঈদ। দুটো বাচ্চাকে জামা-কাপড় কিনে দেব, তারও পয়সা নেই! —কারেন্সি আইনের জ্বালায়। মীরাবাই বলেছেন, 'জলের মাঝারে বাস করে তবু যে তৃষ্ণায় মরি'—! ভগবানের কৃপায় দুটি পয়সা আছে কিন্তু তবু তার-ই অভাব! বিপদে না পড়লে মানুষের মনে ধর্ম-কথার উদয় হয় না।" (প-৬)।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৫৫-তে স্ত্রীর অর্থ কৃচ্ছতার সংবাদে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আলী সাহেবের পত্র :

"শচীনবাবুকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়ো, রাবিয়াকে যতদূর সম্ভব শীঘ্র কিছু টাকা পাঠাতে। লিখেছে, তার হাত একেবারে খালি।" (প-৮)

এ' ছাড়া শুভানুধ্যায়ীদের বারংবার অনুরোধ করেছেন পুত্রদের জন্য 'রঙচঙওয়ালা'

মজাদার বই, সুশোভন ক্যালেন্ডার ইত্যাদি পাঠানোর জন্য। স্ত্রী-পুত্রদ্বয় ভারতে এলে মুজতবা পাটনা-কটক-দিল্লী—যেখানেই থাকুন না কেন স্বয়ং কোলকাতা এসে তাঁদের নিয়ে গেছেন। তাঁদের অসুবিধার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি-টেলিগ্রাম পাঠাতেন, যেন কোলকাতায় এসে স্ত্রী–পুত্রদের কোনোরকম প্রতিকূল পরিবেশে পড়তে না হয়। পত্নীর কোলকাতা আসবার সংবাদ পেয়ে পাটনা থেকে ১৬ই ডিসেম্বর, '৫৫ সালে শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তীকে লিখেছেন :

"আমি পাঁচ নম্বরে উঠবো। রাবেয়াদেরও পাঁচ নম্বরে তুলবো। ওরা যদিও রাত্রিবাস করবে না, তবু আরেকখানা খাটের (সিলেটী চৌকি) কিম্বা খটিয়া—কিছু একটা ব্যবস্থা করে রেখো। ...তা হলে বাচ্চা দুটো ও রাবেয়া একটু জিরোতে পারবে।" (প-১০)।

সহধর্মিণীর প্রতি মুজতবার সহানুভূতির অভাব ছিলো না। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্ত্রীর উল্লেখ করতেন। এবং পুত্রদ্বয় যে মা-কে ভালোবাসে—এ কথাও শ্লাঘাভরে সুযোগ পেলেই বলেছেন। আমরা একটি পত্র থেকে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি ব্যবহার করবো। এ' থেকে স্ত্রীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং বাঙালি পরিবারের চাকুরিজীবী গৃহবধূর বিচিত্র সমস্যার স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। মনোরম পত্রটি সমাজতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যরসিক উভয়ের জন্যই মূল্যবান। ১৯৭০-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারীতে রাজশাহী থেকে লিখিত পত্রটিকে মুজতবা-জায়ার দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচিও বলা যেতে পারে।

"(১) আমাদের পাচিকাটি একটি আস্ত হাজাম। একটা বৃদ্ধ অন্ধ শিম্পানজীও ওর চাইতে ভালো রাঁধতে পারে।...

(২) বাজার থেকে কি আসবে না আসবে সে-সম্বন্ধে...বউ ভোরে উঠে তার ফর্দ করে। বাচ্চাদের ব্রেকফাস্ট খাওয়ানো ও দুপুরের রান্নার main dishes-এর প্রাথমিক রান্না (after all দুটো ছেলে এবং এ হতভাগা তো বারো মাস এখানে থাকে না...) এ-দুয়ের মধ্যিখানে টাট্টু ঘোড়ার মতো ছোটাছুটি করে দশটা অবধি, আর ভজুরাম* নকীবের মতো হাঁকে 20 minutes to go, 10 minutes to go—অর্থাৎ আপিস বেরুবার জন্য। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খুন্তী নাড়ে বলে প্রসাধনটি আর করে না (চান করে নিয়েছে আজানের পূর্বেই হেথাকার দুদ্দান্ত ঠাণ্ডা পানিতে)। যায় রিক্‌শাতে। ফিরে আসে হন্তদন্ত হয়ে—বোধ হয় curse করতে করতে যে-সব ইস্কুলের Grant সই না করলে তারা মাইনে পাবে না তাদেরকে—কখনো ল্যাটে, কখনো সময় মত which is rare—by দুটো আড়াইটে। এক ছুটে রান্নাঘর। "ঐয়্যা, আচার রোদ্দুর দিনি" বলতে বলতে। তারপর টেবিলে to wait at table কারণ পাচিকা এসব বোঝে না। ফের টাট্টু run; রান্না যে গুবলেট করছেন পাচিকা সেগুলোর shipwreck জাহাজ-ডুবি থেকে যতগুলি নাবিক বাঁচানো যায় তারই চেষ্টাতে। তার পরের বর্ণনা দেব না; কেউ দই চান, কেউ সিম খাবেন না, জলপাইয়ের আচারটা পাচিকা কোথায় রেখেছেন তার সন্ধান নেই... ইতিমধ্যে আপিস থেকে চাপরাশী একখানা টেলি (urgent) নিয়ে এল, তিনি সব ক্ষান্ত দিয়ে উত্তর লিখতে বসলেন। তারপর নিজ মুখে কি গুঁজলেন জানিনে। ফের আপিস। এলেন সাড়ে পাঁচটায়। চা টা হল। সন্ধ্যা থেকে তাঁর রাবণের গুষ্টি একা দোকা করে আসতে লাগলেন, কারণ আমি এসেছি। তাদের সঙ্গে আবার কিছু অপরিচিত জন (ওনরা

*মুজতবা আলীর কনিষ্ঠ পুত্র

নিজেদের importance দেখাবার জন্য এঁদের এনেছেন!) খাওয়াও ওদের চা, এটা, সেটা। পাচিকা একে যদি চা দিল তো ওর সামনের থেকে শিঙাড়া কেড়ে নেন। Most respectable guest–এর পা মাড়িয়ে দিলে। ইতিমধ্যে তিনি এসে আমাদের কথা বার্তার ঠিক মাঝখানে interrupt করে তীব্রতম shrill কণ্ঠে অন্তত পাঁচ বার, পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর শুধোবেন—"কুরমাতে রসুন দিমু"? etc etc. তারপর পূর্ববৎ ডিনার। এরপর to bed. বিছানা ঝাড়া, মশারি খাটানো, তৎপূর্বে flit ইত্যাদি ছেলেরাই করে।

কিংবা বিবি গেলেন most unavoidable social dinner খেতে। আমরা তো তখন এতিমখানার orphans. কিন্তু তার চেয়েও কষ্ট পায় বউ, আমাদের দশা ভেবে at the tender mercy of the cook. হাঁ, ভুলে গিয়েছিলুম, এই শীতকালে প্রায়ই পাঁচটার পর বাড়ি না ফিরে sports prize distribution করতে হয় শহরের একাধিক মেয়ে ইস্কুলে, Girl Guide এর পরবে। আর বড় বড় আপিসার এলে She being one of the few top ranking ladies—তাকে যেতেই হয় লক্ষ্মীশ্রী বর্ধনের জন্য।

এই social, semi social official functionsগুলো একটা বিরাট অধ্যায়। প্রায়ই দেখেছি ফিরে এসে দড়াম করে শুয়ে পড়ে। ফিরোজ গা টেপে। Banquet খেয়ে এলে পরের দিন আমার ভায়রা Civil Surgeon কে ডাকতে হয়, কারণ বেচারীর পেট বড় delicate.

(1) সংসার সামলাও with the worst cook, (2) আপিস করো, (3) plus বাড়িতে রাড়ী বুড়ি visit ঠেকাও। তেনারা এসেছেন নাত্নীর scholarship-এর সুপারিশ নিয়ে, কিংবা চাপাই নবাবগঞ্জের এক টীচার এসেছেন privately (আপিসে না গিয়ে) Head Mistress-এর বিরুদ্ধে Complaint নিয়ে—তার একটা, তিনি স্কুল Compound-এর পাকা আম tender না দিয়ে, বিক্রি না করে, সরকারকে টাকাটা না দিয়ে নিজে কাঁচা অবস্থায়ই অম্বল বানিয়ে খান কিংবা স্রেফ কাঁচা কাঁচা! (আসলে ইস্কুলের মেয়েরাই কাঁচা অবস্থায় সব আম সাফ করে দেয়–which is most natural)।

(4) Social functions because she is one of the few ladies; বড় ২ সরকারি কর্মচারির স্ত্রীগণ প্রায়ই আমাদেরই মেয়েদের মত কেউ পর্দা মানেন, কেউ তেমন লেখাপড়া জানেন না বলে আসেন না। এই function গুলোর স্ট্রেন সবচেয়ে বেশি। (5) Touring. এই যে তেইশ তারিখে তিনি নাটোর হয়ে বগুড়া যাচ্ছেন সেখানে পৌঁছবেন রাত সাড়ে বারোটায়। Not a very suitable time for a woman. সার্কিট হাউসে গিয়ে দেখবেন, full up, সবাই ঘুমুচ্ছেন। No one to open the door, যা পৃথিবীর সর্বত্র হয়। ...আপন educationalist বাপের মতো Moralist বলে Head Mistress- এর বাড়িতে দাওয়াত খাবেন না, খাবেন চাপরাশির তৈরী অর্ধপক্ক ভাত ও লোহাসেদ্ধ আলু। চাপরাশী গজরাচ্ছে Head Mistress- এর দাওয়াতে সে কোর্মা কালিয়া থেকে বঞ্চিত হল বলে। ওদিকে Tour clerk, চাপরাশী যদ্যপী full T. A. পান তথাপি তাঁর স্কন্ধে আরোহণ করে দুবেলা আহার, চা নাস্তা খান। ফলে When on tour, she is out of pocket, কিছু গচ্চাও যায়। (6) Family obligation. বাড়িতে অন্য পুরুষ নেই বলে প্রত্যেক আত্মীয়ের (এবং কিছু কিছু অনাত্মীয়দের) বিয়ে ফাতেহা (শ্রাদ্ধ) পালাপরবে নিজেকেই যেতে হয়। (7) Tour ধকলে অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলে শুশ্রূষা করার কেউ নেই।...(8) ছেলেদুটোর education এর পুরোপাক্কা responsibility তাঁরই। কারণ বাপ পাষণ্ডটা বিদেশে দিব্য আরামসে দিন কাটাচ্ছেন। একটা পয়সা তো দেনই না—চিঠির উত্তরও (most irregular).

ছুটিতে ছেলেরা বাড়ি এলে বাউন্ডুলী করে, হয়তো কুসঙ্গে মেশে—সেদিকে নজর রাখতে হয়। ছুটির পরই পরীক্ষা; অথচ পড়তে বসবে না। মাকে জাবড়ে ধরে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে। তখন কার মা গলবে না ? বিশেষ করে long absence & separation-এর পর যখন এসেছে ? বাপ তো নেই, কারণ সে থাকলে তার কথা অমান্য করে তাকে তো আর জাবড়ে ধরে মিষ্টি মিষ্টি কথা—ইংরিজিতে সুন্দর বলে meaningless sweeties & soft nonsense-বলে তাকে গলাবে? একটা সান্ত্বনা অবশ্য (এখনো) আছে। ছেলে দুটো কুসঙ্গে মেশে না, আর মাকে বড্ড ভালোবাসে।...কিন্তু said & done, ছেলের education, character building –এর কর্ম মায়ের নয়, বাপের। (9) Minor troubles? যেমন মনে করো ঢাকায় যে বাড়ী করেছেন তার ভাড়াটের সঙ্গে from the very begining ঝগড়া (she had bad luck in one of her tenants, he is a well known crook of Dacca), উকিল বাড়ী ছুটোছুটি (তার জন্য ঢাকা যেতে হয়) এবং টাকার শ্রাদ্ধ। অবশ্য তুমি কিংবা অন্য দরদী বলবেন, বাড়ি না তুললেই হতো। তা হলে retire করে বেচারী যাবে কোথায়? সাত পাকের (পাঁকের বললে better হতো) সোয়ামীর যে কোনো চালচুলো নেই।" (প-১২৪)

একাধিক কারণে উদ্ধৃত পত্রাংশটি গুরুত্ববাহী। এতে মুজতবা মানসের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। স্ত্রীর প্রতি মমতা ও সহানুভূতি, সন্তানবাৎসল্য এবং পিতৃহৃদয়ের ব্যর্থতা, সর্বোপরি একটি বিশেষ সামাজিক দিক এবং মুজতবার নিজস্ব ভঙ্গীতে বৈঠকী আমেজে মধ্যবিত্তের মন-মানসিকতা প্রতিবিম্বিত এর প্রতি ছত্রে।

মুজতবা আলী অতি অনিয়মিতভাবে 'দিনলিপি' লিখতেন। ১৯৬৭ সালে কিছুদিনের জন্যে রাজশাহীতে 'পারিবারিক জীবন' অতিবাহিত করেন। পদ্মার পাড়ে বেড়াতে ভালোবাসতেন। 'দিনলিপি'তে পদ্মা তথা প্রকৃতি ও প্রকৃতির সন্তানদের বর্ণনা করেছেন। এর ফাঁকে উপমা-উৎপ্রেক্ষায় তাঁর বাৎসল্যও সপ্রকাশ।

"কাল রাত্রে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কিছুক্ষণ ধরে গুমোট থাকার পর বইল উত্তর থেকে বাতাস। হঠাৎ দেখি আমার ঘরের ভিতরই তুমুল কাণ্ড। উত্তর দক্ষিণ বাতাসে লাগিয়েছে হাতাহাতি। যেন ফিরোজ আর ভজু।"[১৪]

স্ত্রী-পুত্রদের নিকট থেকে বিদায়পর্বে প্রতিবারই পিতৃহৃদয় দীর্ণ হয়েছে। মূক হয়ে গেছেন মুখর মুজতবা। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৯৬৭ সালে রাজশাহী থেকে বিদায় নিয়ে কোলকাতা প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ রয়েছে 'দিনলিপি'তে—

"ফিরোজ ভজু স্টেশনে এসেছিল। তাদের মুখ শুকনো। থাক্ সে আমি বলতে পারব না। বউ ঈশ্বরদি অবধি এল।...

আমার মনে হচ্ছিল, আমরা যেন হানিমুনে। বউ ঘুমিয়ে পড়ল। বেচারী ঐ ঢাকা এই পাবনা একাধিকবার বাসে করে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

রাত দেড়টার সময় আমার গাড়ি ছাড়ল। সেও শুকনো মুখে বিদায় নিল।

এ বড় পীড়াদায়ক। এসব কথা আর লিখব না। এ তো কাল্পনিক পীড়ার জাল বুনে বুনে উপন্যাস লেখা নয়।"[১৫]

বেগম রাবেয়া আলী যথার্থ অর্থেই একজন মহীয়সী মহিলা। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন মুজতবার জীর্ণ তরীটিকে ভরাডুবি থেকে রক্ষা করতে। সন্তানদের মানুষ করা, তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই প্রায় একক প্রচেষ্টায় সুসম্পন্ন করেছেন। স্বামীর প্রতি তাঁর ভালোবাসারও অভাব ছিলো না। নিজেকে উজাড় করে স্বামীসেবা করতে

পারেননি বলে একটা দুঃখবোধও তাঁর মধ্যে ছিলো। স্ত্রীর বিষয়বুদ্ধি এবং সুবিবেচনার প্রতি বরাবর আস্থাশীল মুজতবার লেখায় সহধর্মিণীর প্রতি ভালোবাসা ও সশ্রদ্ধ সহানুভূতি নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। দিল্লীর সরকারি প্রতিষ্ঠান 'কটেজ ইনডাস্ট্রিজ এম্পোরিয়াম' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সরকার এই প্রতিষ্ঠানে যে সব তরুণীদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা বিক্রয় করিবার কলা-কৌশল এমনি মোক্ষম আয়ত্ত করিয়াছে যে, আমার গৃহিণীর মতো কৃপণও লোহিত-বর্তিকা প্রজ্বালন করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন।"[১৬]

শেষজীবনে একই সঙ্গে থাকতে পারবেন এমন একটা সুখস্বপ্ন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বেগম আলীর চোখে ছিলো। অবশ্য স্বপ্নভঙ্গের শোক তাঁকে দীর্ঘদিন বহন করতে হয়নি। স্বামীর মৃত্যুর আড়াই বছর পর রাবেয়া আলী লোকান্তরিত হন।

০৪.

স্ত্রীর স্কন্ধে তাবৎ গুরুভার চাপিয়ে দিয়ে মুজতবা আলী যে নিশ্চিন্ত নির্বিকার থাকতেন, তা' নয়। দুঃখ-শোক-হতাশা-অক্ষমতা যতদূর সম্ভব তিনি অপ্রকাশই রাখতে চাইতেন। সুতরাং অন্তর্দহনে দগ্ধ হওয়া ভিন্ন আর পথ কি ? সম্ভবতঃ দুঃখকে ভুলে থাকবার জন্যেই জমজমাট মজলিসে সরস বাক্যজালে, অধিকাংশ সময় পানীয় সহযোগে নিজেকে বুঁদ করে রাখতেন। এটাও এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি। যখনই সম্বিতে এসেছেন ঘর-সংসার স্ত্রী-পুত্রের স্মরণে তাঁর বিদীর্ণ হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। শিশুসুলভ সরলতায় আপন অসহায়তা ব্যক্ত করে পুত্র-তুল্য ভাগিনেয়র সাহায্য কামনা করেছেন।

"তোমরা বাবারা কিছু একটা করে আমাকে বাঁচাও। আমি এখানে বসে বসে করি কী! সেই যে সিলেটীতে আছে,

হুকনাৎ ফালাইয়া জাল
গাছো উঠি দিলা ফাল!

জাল পড়েছে ঢাকা-রাজশাহী জুড়ে। আর আমি বোলপুরের গাছে 'ফাল্' দিয়ে উঠছি।" (প-১৭৭)। উল্লেখ্য, বেগম আলী তখন রাজশাহীতে কর্মরতা এবং নোতুন বাড়ী করেছেন বা করছেন ঢাকায়।

বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে মুজতবা-মানস বিশ্লেষণ করলে এই সংগ্রাম তাঁর চিত্তলোক কতোটা আন্দোলিত করেছিলো—তার মূল্যায়ন সহজ হবে। এ' সময় আত্মজনের অমঙ্গল আশঙ্কায় বহু বিনিদ্র দিনযামিনী যাপনের ফলে আতঙ্কিত মুজতবার মানসিক ভারসাম্যও বিপর্যস্ত হয়েছিলো। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও আত্মিক যোগ যে অটুট ছিলো—এটা তার অনুকূলেই রায় দেয়।

খণ্ডিত বঙ্গকে সৈয়দ মুজতবা আলী মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিতে পারেননি। তাঁর বিবেচনায় এই বিভক্তি বৃহত্তর বঙ্গসমাজের কোনো কল্যাণই সাধন করেনি, বরং সহস্র অকল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যুগ যুগ ধরে যে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বসবাস করেছে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা মননশীলতার জগতে যাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল প্রশ্নাতীত, ধর্মের নির্মোকে অধর্মের আশ্রয় নিয়ে বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে

একই সঙ্গে বঙ্গভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নস্যাৎ করে তাদের মননশীলতাকেও করা হয়েছে পঙ্গু। সমগ্র বাঙলার উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে যে মানবকল্যাণমুখী সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিলো, কৃত্রিম রাজনৈতিক বিভক্তির ফলে সেই স্বতঃস্ফূর্ত জাহ্নবীধারার প্রবাহ নিরুদ্ধ করা হয়েছে। এবং 'বাঙালি' বলতে তিনি তৎকালীন উভয় বঙ্গ ও বঙ্গ-বহির্ভূত অঞ্চলের সমগ্র বঙ্গ-ভাষীকেই নির্দেশ করেছেন।[১৭] সাহিত্য-সংস্কৃতি-কৃষ্টি কোনোদিক থেকেই বাঙলাদেশ আর পাকিস্তান সহাবস্থান করতে পারে না। চিন্তাচেতনার জগতে বন্ধ্যা মরুভূমি আর সুজলা সুফলা রসস্রোতধারা কি করে একই সঙ্গে অবস্থান করে? সৈয়দ মুজতবা আলীর এই সুদৃঢ় অভিমত পাকিস্তান-পন্থীদেরও অজ্ঞাত ছিলো না। তদুপরি পাকিস্তান সৃষ্টির প্রায় সমকালেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ও মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী প্রথমাবধিই তাঁদের অস্বস্তির কারণ ছিলো। মূলতঃ এদের হিংস্র থাবা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই তিনি কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র বরাবরই ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানে এবং বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় ভারতীয় নাগরিকের পুত্র-পত্নী হিসাবে তাঁরা ছিলেন সন্দেহভাজন।

সূচনালগ্ন থেকেই মুক্তিযুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয়ী মুজতবা অধীর আগ্রহ ও উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন। ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সঠিক সংবাদ পাওয়া দুষ্কর। প্রবল উত্তেজনায় তাঁর মানসনেত্রে হয়তো ভেসে উঠতো মুক্তিকামী জনতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে তাঁর পুত্রদ্বয়। দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ পুত্র-গর্বে গৌরবান্বিত পিতার মতোই ডঃ আলী সাগরময় ঘোষকে লিখেছেন :

"...শুনলুম, ঢাকা থেকে মেয়েদের গ্রামাঞ্চলে পাঠানো হয়েছে। ওদিকে ফিরোজ ভজু, দুজনাই ভালো রাইফেল চালাতে জানে। তারা তো চুপ করে বসে থাকবে না।" (প-১০৩)। মুজতবা আলীর পুত্রদ্বয় সম্ভবতঃ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র থাকাকালীন রাইফেল চালনায় পারদর্শিতা অর্জন করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামকালে পারিবারিক সংকটের কথা স্মরণে রেখেও প্রবল উত্তেজনায় মুজতবা তাঁর আবেগ তথা আশাবাদকে শৃঙ্খলিত করতে পারেননি। '৭১-এর মাঝামাঝি সময়ে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেছেন পাঠান বীর ওসমান খাঁর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা। যিনি স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে সিলেটের মহাসংগ্রামে মুঘলবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে বীরের শ্লাঘনীয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। পানির সঙ্গে অপরিচিত মুঘল-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার মানসেই ওসমান তাঁদের হাওর অঞ্চলে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে প্রাণ বিসর্জন দেন। গর্বিত মুজতবাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাঁর প্রিয় বর্ষা ঋতুর জন্য—যে ঋতু পাঞ্জাবীদের হৃদকম্পের কারণ। "...যাঁরা বাংলাদেশ থেকে আসছেন, তাঁরাই বলছেন গেল সাড়ে দুই মাস ধরে সবচেয়ে মোক্ষম লড়াই দিয়েছে—সিলেটের লোক।...

ওসমান যুদ্ধে হারেন শীতকালে মার্চ মাসে। এবারে দেখি ঘন বরষায় তারা হাওরের কি সুযোগ নেয়।"[১৮]

এ' সময় আরো একটি লেখায় মুজতবা আলী মুক্তিকামী বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামী ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। অবাঙালির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, তাবৎ ষড়যন্ত্র-অপকৌশল নস্যাৎ করে বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ তাঁদের নিজস্ব পথ খুঁজে নিচ্ছিলেন। পরবর্তী

সময়ে তাঁদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙলার আপামর সাধারণ মানুষ। বাঙলা একাডেমী, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ প্রাণ কণ্ঠাগত করে বছরের পর বছর যে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে তা তুলনারহিত। বাঙলা একাডেমীর জন্মলগ্নে কিছু সংখ্যক ধর্মব্যবসায়ী তাঁদের পকেট ভারী করেছিলেন কলে-কৌশলে এবং 'এই মোল্লাদের অনেকেই এখন খানকে (টিক্কা, ইয়াহিয়া) সাহায্য করছেন—মীর জাফররূপে।"[১৯] এবং সর্ব শেষে কবিগুরুর ভাষায় তিনি আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন :

বাহুর দম্ভ, রাহুর মতো,
একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সুর্যকে
সে এক-গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে
মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও
রয় না কোন ক্ষত। [২০]

কিন্তু পর্যায়ক্রমে নানারকম দুঃসংবাদে আলী সাহেবের সুদৃঢ় মনোবলে চিড় ধরে। বিশেষ করে পাক-সেনাদের হাতে নিহত ভাগিনেয় ওয়ালির খবর এবং ঢাকা থেকে স্ত্রী-পুত্রদের সংবাদ নিয়মিত না পেয়ে তিনি মারাত্মক দুশ্চিন্তার মধ্যে কাল কাটাতে থাকেন। ৬ই জুন, ১৯৭১-এ পশ্চিম জার্মানির এক বান্ধবীকে লেখা পত্রে মুজতবার উদ্বেগ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে পশ্চিম জার্মান সরকারের প্রেরিত অর্থের জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। পাক-বাহিনীর বর্বরতার প্রতি ঘৃণা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অপরিসীম সহানুভুতি ও সমর্থনও বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য।

"... At long last I got news from a professor who walked all the way from Dacca. But this is 3 weeks old. Meanwhile the military regime is doing everything in its power to crush the freedom-movement in East Bengal. The mother,*Inspectress of Schools at Dacca is being pesteted to open all schools she has. But if girls refuse to attend what can she do? And the boys. If they want to go out and join the freedom-fighters, how can she stop them?...

P. S. Your Govt. has given us (for freedom-fighters) some money for which our heart has no words." (প-১৪৮)।

১৯৭১ সাল ছিলো সৈয়দ মুজতবা আলীর জীবনে সর্বাধিক সঙ্কটময় সময়। একটা আশঙ্কা আলী সাহেবের মনে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিলো যে, হানাদার বাহিনীর নির্মম হাত থেকে তাঁর পরিবারের কেউই পরিত্রাণ পাবে না। এবং এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলকও ছিলো না। এ-সময় তাঁর এক ভাগিনেয় আবু সয়ীদ মাহমুদ প্রাণের ভয়ে ঢাকা থেকে কোনোক্রমে সপরিবার লন্ডন চলে যান। আলী সাহেবের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত পত্র যোগাযোগ ছিলো। এ-সমস্ত পত্রে বিপর্যস্ত 'মুজতবা মানস' সুস্পষ্ট। জনাব মাহমুদের বক্তব্য :

"মামা (মুজতবা আলী) শুনেছিলেন যে, পাক-সেনারা ক্যাডেট কলেজের ছাত্রদের

---

*বেগম রাবেয়া আলী

নির্বিচারে ধর-পাকড় করছে এবং তাদের অনেককে নির্মমভাবে হত্যা করছে। মুজতবা আলী সাহেবের দুই ছেলেই রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ছাত্র ছিলো।...চরম দুরবস্থায় স্ত্রী-পুত্ররা শত্রুকবলিত এবং তিনি কোলকাতায় প্রবাস জীবন যাপন করছেন। চিঠিতে শুধু সন্তান-বাৎসল্য কিংবা সন্তানদের জন্যই উদ্বেগ প্রকাশ পায়নি। তাতে ছিল সার্বিকভাবে দেশের জন্যে ব্যাকুলতা। তিনি আবেগতাড়িত হয়ে লিখেছেন যে, আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমি দেশের জন্য কিছুই করতে পারছি না। যদি কোনোক্রমে 'মালদহ' দিয়ে রাজশাহী যেতে পারতাম—তবুও মনে হয় কিছু করতে পারতাম। বার্ধক্যের জন্যে কেউ আমাকে নিয়ে যেতে চায় না।" (সা-৬)।

দুঃসময়ে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে মুজতবা আলী যে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, '৭১-এর ২রা ডিসেম্বর, শ্রীদ্বারিকানাথ মিত্রকে লেখা পত্র তারই সাক্ষ্য :

"I have been making enquaries. The situation is like this. The small village situated just opposite Rajshahi town is called Katlamari very near which is a biggest town Islampur (SHEKHPARA). You can take a bus from Berhampore and reach ISLAMPUR in about two hours, ... I understand Lalgola and Lalgolahat are the hot centres of the guerrillas and although my point of crossing will be at Katlamari (কাতলামারী), the guerrillas at Lalgola area who must have valuable contacts on the other Pak banks of Padma, and must be knowing the pros & cons involved will naturally give me the valuable information ... sending of reliable messengers for instructions from my wife's relations as to what my course of action should be ... I have come to the conclusion, tentative though, that the best place for making my Head quarters would be either Behrampur or Murshidabad. I shall of course, go to Lalgola as early as possible after dumping my kit at my HQ, (either at Behrampur or Murshidabad) to find out the layout of things.

... Have you any contact at Berhampur Murshidabad area? Even Bhagabangola ... would do at a pinch. Apart from fixing up my HQ, please ponder the matter, consult your Chanakyas (চাণক্য) as to who should be the person or persons I am to meet that would give me sound advice, correct information and if necessary competent assistance, ...

...Whatever happens, I have to prepare myself in good time. I shall have to walk perhaps long distances, and ... I can walk eight miles without being really out of breath. I do not want my guide to think that a cripple has been dumped on him. Do you know while walking my mind went again and again to the boys?' (প-১৩২)

হতাশায় মোহ্যমান মুজতবা আলীর মনে আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে ওঠে, স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। প্রকৃতপক্ষে এ' সময় মানসিক দিক থেকে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় মুজতবার অনুরাগীরা মানসিক প্রশান্তির জন্যে তাঁকে একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করে দেন। শ্রীযুক্ত দ্বারিক মিত্র একটি ট্রানজিস্টার এবং তাঁর ব্যক্তিগত স্টেনোকে মুজতবা আলীর সাহায্যার্থে দিয়েছিলেন। আলোচ্য সময়ে মুজতবা আলী প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মিত্র বলেন :

"আলী সাহেব অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে... সারাক্ষণ বাঙলাদেশের ম্যাপ সামনে রেখে বসে থাকতেন। যেখানেই আক্রমণ হতো ... সেখান থেকে তাঁর ছেলেরা কতোটা নিরাপদ কিংবা বিপদগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা কতোটা তাই ভাবতেন। এবং রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটিয়েছেন। ... তিনি সারাক্ষণ নানাদেশ থেকে বাঙলাদেশের খবর শুনতেন। ...dictate করতেন এবং স্টেনো লিখে নিতেন। ... তাতে ছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রশংসা, জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তার জন্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ, পাকিস্তানী বর্বরতার প্রতি অন্তহীন ঘৃণা। সেই লেখাগুলো শেষ পর্যন্ত হারিয়ে যায়। অন্যথায় মুজতবা চরিত্রের একটা অনালোকিত দিকের সন্ধান তাঁর গুণগ্রাহীরা লাভ করতেন।" (সা-৪৫)।

এক সময় মুজতবা আলী সিদ্ধান্ত করেন, যেভাবেই হোক স্ত্রী-পুত্রদের ঢাকা থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনতেই হবে এবং এ' বিষয়ে তখন সিঙ্গাপুরে কর্মরত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ আলীকে অবহিত করে পত্র লেখেন "and one day phoned me to get my reaction to his plan ... Apparently, he had also written to another of his nephews, Abu Sayied Mahmud (Noni) who was then in London to help him to get the family out of Dacca.

It was during this crisis that a friend of my uncle in Calcutta offered to go all the way to Dacca and smuggle the family out. Uncle Mujtaba wrote to me about the plan and expressed his hope that it would work. The friend, if I remember correctly, was a kind of Hindu mystic who apparently knew how to travel in and out of Bangladesh."[২১]

এই 'Hindu Mystic' মুজতবা আলীর একান্ত স্নেহধন্য সাহিত্যিক 'অবধূত' এবং এঁরই "সহায়তায় জনৈক মাঝির মারফত পরিবার-পরিজনদের বেঁচে থাকার সংবাদ তিনি লাভ করেন।" (সা-৪৮)।

পরবর্তী সময়ে পশ্চিম জার্মানী প্রবাসী বোলপুরের আবুল হাসনাত (কালো)-এর মাধ্যমেও মুজতবা আলী তাঁর পরিবারের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। উল্লিখিত সময়ে মুজতবা-মানসের বেদনাবিধুর প্রতিরূপটি চমৎকার প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৭১-এ প্রকাশিত তাঁর মুসাফির গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে:

"এই দুর্দিনে আমার হৃদয়মনে নিত্যবর্তমান ফিরোজ ভজু, তাদের মা-জননী ও এদের বেদনার সাক্ষী আত্মীয়জনকে।"—স্নেহপ্রবণ পিতা, কৃতজ্ঞ স্বামী এবং সমব্যথী আত্মীয় হিসেবে মুজতবা অনন্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

১৯৭১ সালের ৩০শে জানুয়ারি থেকে ১৯৭২-এর ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত সৈয়দ মুজতবা আলী 'দেশ' পত্রিকায় 'পঞ্চতন্ত্র' কলামে নিয়মিত 'বিদেশে' ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন। 'বাঙলাদেশ' সম্পর্কে তাঁর 'কলাম' ছিল নিশ্চুপ। ব্যাপারটা তাঁর ভক্তপাঠকদের কাছে 'রহস্যময়' বলে মনে হয়েছে এবং কোলকাতার সাহিত্যিক মহলেও কিছুটা বিস্ময় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ২৭শে ডিসেম্বর, '৭১-এ 'দেশ'-এর সম্পাদককে লেখা জনৈক পাঠকের এতদসংক্রান্ত পত্র :

"...আমি সৈয়দ মুজতবা আলীর একজন একনিষ্ঠ পাঠক হিসাবে এই দুঃখটুকু জানাচ্ছি।

যখন দুই বাংলা তোলপার বাংলাদেশে ইয়াহিয়া, নিয়াজী, ভুট্টো, ইত্যাদির

কার্যকলাপে বাংগালী একটা নতুন য়িহুদী নিধনের আবর্তে। তখন কি করে এপার বাংলার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী আলী সাহেব এখনো "বিদেশে" নিয়ে পড়ে আছেন। তাঁর হিটলার জর্মন নাৎসী ইত্যাদি তো ৩০ বছরের ঘটনা। নতুন হিটলার কোম্পানীর দিক একটু দৃষ্টিপাত করলে আমরা ইতর জনেরা কিছু পেতাম।" (প-২০৭)

সে-সময় মুজতবার অন্তর্লোকে নিরন্তর যে ক্ষরণ হচ্ছিল দরদ দিয়ে তা' বোঝার চেষ্টা করেছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন। পাঠকের দাবী আলী সাহেব সহৃদয় সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচনা করতেন। কিন্তু সাহিত্যিক মহলের অনুদারতা তাঁকে বিদ্ধ করতো। দুঃখ এবং অক্ষমতা চেপে রাখা ছাড়া বিকল্প পথও তাঁর সম্মুখে ছিলো না। সে-সময় একটি পত্রে লিখেছিলেন, "At my age the least I can do for my family is not to increase dangers to which your auntie (রাবেয়া আলী) and your cousins (ফিরোজ-ভজু) are exposed."[২২] অপর চিঠিতে দৃঢ়তার সঙ্গে লিখেছেন, "I know, our liberation war will end in a victory, even if I do not write a line on the subject,"[২৩]

এই নাজুক পরিস্থিতিতেও মুজতবা আলী কোলকাতার দু-একটি পত্রিকায় বাঙলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন। এগুলো সাধারণত সিঙ্গাপুর থেকে সৈয়দ মোহাম্মদ আলী তাঁকে পাঠাতেন। সিঙ্গাপুর থেকে 'রফিক আনোয়ার' ছদ্মনামে মোহাম্মদ আলীর লেখা একটি সংবাদনিবন্ধ স্বয়ং মুজতবা আলী অনুবাদ করে কোলকাতার একটি পত্রিকায় উক্ত ছদ্মনামেই প্রকাশ করেন। এ থেকেও অনুভব করা যায় এমন একটি বিষয়—যা তাঁর সর্বানুভূতির সঙ্গে মিশ্রিত—নিয়ে লেখার অক্ষমতা তাঁর জন্যে কতোটা মর্মবিদারক ছিলো। বাঙলাদেশ রাহুমুক্ত হওয়ার পর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে আলী সাহেব মাত্র কয়েকটি ছত্রে তাঁর করুণ অসহায় অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন, "মেহেরবান সম্পাদক ... পাঠক, আজ যদি প্রাণ খুলে দুটি মনের কথা কই তবে অপরাধ নিয়োনি। সিকি শতাব্দী ধরে ট্যাঁ-ফুঁ-টি করার উপায় ছিল না। ওপার বাংলাতেও না। এপারে যে আমার শতাধিক প্রিয়ের চেয়ে প্রিয়তর জন রয়েছে।"[২৪]—এ'-বক্তব্যের পর দীর্ঘ আলোচনায় তৎকালীন মুজতবা-মানস বিশ্লেষণ অপ্রয়োজনীয়।

বাঙলাদেশের সংগ্রামী ছাত্রসমাজের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিলো অত্যন্ত গভীর। —"কোথায় সন্দ্বীপ, কোথায় বরিশালের অজ পাড়া গাঁ—ওসব জায়গা থেকে ছাত্ররা পড়াশুনা করতে আসে সদরে, চট্টগ্রাম, সিলেট ঢাকায়। তারাই একদিন ছড়িয়ে দিয়েছিল আপন আপন গ্রামে গ্রামে মুক্তি সংগ্রামের আহ্বান। ধন্য তারা, জয় হোক তাদের।"[২৫]

বাঙালির প্রতি মুজতবার দুর্বলতা ছিলো সর্বজন পরিচিত। শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রণী, মুক্ত-বুদ্ধির পূজারী বাঙালি সমাজ উপমহাদেশের অবাঙালির নিকট অনেক সময় অকারণেই ভীতিপ্রদ মনে হয়েছে। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তারা বাঙালির চরিত্র হননে তৎপর হয়ে উঠতো। মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে 'হিন্দু' নিধনের আচ্ছাদনে চলছিলো 'বাঙালীনিধনযজ্ঞ'। —"এদেশের 'হিন্দুকে খতম করে ইয়েহিয়া পেতেন ডবল সুখ—একাধারে হিন্দু এবং বাঙালী, দুই দুশমনের জন্য লাগতো মাত্র একটা বুলেটের খর্চা।"[২৬]

'৭১-এ কোলকাতায় আশ্রয় গ্রহণকারী কতিপয় বাঙলাদেশী রাজনীতিকের আচার-আচরণ ও জীবনধারণ পদ্ধতি অনেকের মতো আলী সাহেবেরও মর্মপীড়া, লজ্জা ও ক্ষোভের কারণ হয়েছিলো।

"In one of his letters, he gave me a graphic picture of a typical politician from Dacca, one whose clothes, manerism and flameboyance only caused embarrassment, instead of winning friends. "He dresses in expensive clothes, smokes foreign brand cigarettes and hums Tagore's Sonar Bangla very badly, tunelessly, perhaps because he learnt it only the other day, while crossing the border somewhere near Agartala," he said one of his letters."[২৭]

মুজতবা আলীকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখবার জন্যে একটি নার্সিং হোমে ভর্তির কথা আমরা আলোচনা করেছি। তাঁর দুশ্চিন্তা যে মনোবিকারজাত কিংবা নৈরাশ্যবাদীর অকারণ হতাশার বহিঃপ্রকাশ ছিলো না সে-কথাটা স্বাধীন বাঙলাদেশের রাজধানী থেকে ১৯৭২-এর ২৯শে জানুয়ারি, একটি চিঠিতে শ্রীসাগরময় ঘোষকে লিখেছেন। পত্রটির প্রতিটি ছত্রে বর্বর পাশবিক শক্তির প্রতি তাঁর অবিমিশ্র ঘৃণা এবং সুকোমল হৃদয়ের পরিচয় বিদ্যমান :

"আমি এখনো মোহাচ্ছন্ন। কলকাতায় বসে আমি যখন দুশ্চিন্তা করতুম তখন সবাই বলতো, এসব আপনার মনোবিকারজনিত নৈরাশ্যবাদীসুলভ উদ্ভট কল্পনাজাল। এখানে এসে প্রতিদিন আমার বউ, দুই ছেলে, দুই দাদা তাদের ছেলে—এবং মেয়ে—...এদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যা শুনছি তার থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মানুষের মনোবিকারজনিত. হোক আর সুস্থতাজনিতই হোক তার কল্পনাশক্তি কী অকল্পনীয় পঙ্গু—বন্ধ, বন্ধ। "বন্ধ আছে এই জীবনের অন্ধকূপে।..."

মৌলবীবাজার টাউনে বড়দা বাস করতেন। নাপাকরা দু'জন লোককে—যাকে বলে public execution-এ গুলি করে মারে। শহরের সব কিশোর যুবককে বাধ্য করা হয়, সে মৃত্যুদণ্ড-তামিলী স্বচক্ষে দেখতে।...

ঐ দুই হতভাগ্যের একজনের বাপ নাকি নাপাকদের সামনের ভূমিতে লুটোপুটি গড়াগড়ি দিতে দিতে হাউ হাউ করে কেঁদে কেঁদে চেঁচায়, "আমাকেও গুলি করো। আমাকেও গুলি করে মেরে ফেলো। ঐ আমার এক ছেলে। ও মরে গেলে আমি বাঁচবো কি করতে।"...

কোন্ মূর্খ বলে পিতৃভক্তি অবশ্য কর্তব্য পুণ্যের আকর।

ছেলেটি বিলেতে কলকারখানায় গতর খাটিয়ে বাপমাকে পুষতো। সেখানে ভূয়ো খবর পায় তার বাপকে নাপাকরা গুলি করে মেরেছে। ঘটি-বাটি বিক্রি করে প্লেনের টিকিট কেটে ঢাকায় নামে। সেখান থেকে বাপের সন্ধানে মৌলবীবাজার যায়। ওদিকে 'অল্‌বদরের' এক সিলেটী মুসলমান নাপাক্‌দের মিথ্যে লাগায়, লন্ডনে সিলেটীরা ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে যে প্রসেশন করেছিল ঐ ছেলেটি তার মধ্যে ছিল।

... সিলেটে বসে ঐ 'অল্‌বদরের' জারজ শূকর জানলো কি করে, ঐ পিতৃভক্ত সন্তানটি সে-প্রতিবাদ-মিছিলে ছিল? উত্তর বা নীতি সরল :—পিতৃভক্তি সর্বথা বর্জনীয়।

... আমার নিকটতম আত্মজন আত্মীয় ... সুবোশাম আমাকে দেখাতে আসছে যে তারা এখনো বেঁচে আছে, দেখতে আসছে যে আমিও আবার তাদের মাঝখানে! এক ভাগ্নেকে এপ্রিল মাসে নাপাকরা চাটগাঁয়ে গুলি করে মারে। কিন্তু আরেক ভাগ্নে ৭৫০ জন মুক্তিফৌজ জোয়ানের ও অপিসারের commander ছিল। তার বাপকে—বয়স ৭২—পুরো ৪৮ ঘণ্টা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল আর বেধড়ক মেরেছে। শেষটায় আমার বোন

ওদের কমান্ডারের সঙ্গে নিজে গাঁয়ের ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে (জমিদার বাড়ির গিন্নিমাকে রায়তরা কখনো এ অবস্থায় দেখেনি) দেখা করে স্বামীর নিষ্কৃতি লভে।" (প-১০৪)।

বাঙলাদেশের ওপর শুধুমাত্র ন' মাসের অত্যাচারই নয়, রেখে গেছে আরো বহুতর বিভীষিকা। শ্রীযুক্তা অর্চনা মিত্রকে ২রা মার্চ, '৭২-এ লেখা পত্রাংশ :

"একটা জিনিস আমাকে বড্ড বিচলিত করেছে। ধর্ষণের ফলে হাজার হাজার কুমারী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। এদের অনেকের চতুর্দশ কুলে কেউ নেই। সমাজেও এরা স্থান পাবেনা...—আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও। এই যে তার সন্তানটি হতে যাচ্ছে তার প্রতি এর অনুভূতিটা মিশ্র। একদিকে কোন্ পশুর চেয়ে অধম বর্বর পাঠানের সন্তান এটা, অন্যদিকে ত্রিসংসারে ঐ তার একমাত্র সম্বল। এবং অনেক ক্ষেত্রে কি আমরা দেখিনি যে বিবাহিতা রমণীর আইনতঃ জাত সন্তান বর্বর পশুর মতো সমাজের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে—তবু মা তাকে ছাড়তে পারে না!"[২৮]

সদ্য স্বাধীন দেশে জিনিসপত্রের ক্রমবর্ধমান অগ্নি মূল্যও তাঁকে বিচলিত করেছিলো।

একাধিকবার আমাদের আলোচনায় এসেছে—দু'শো বছরের পরাধীনতার গ্লানি মুজতবা আলীকে বৃটিশের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিলো। ফলে সরকারি স্কুল বর্জন করেছেন, কখনো ইংরেজের অধীন চাকুরি গ্রহণের কথা ভাবতেই পারেননি এবং যে-কোনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেই তিনি মনুষ্যত্ব তথা মানবসভ্যতার নিকৃষ্টতম শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে কামনা করেছেন—"আমাদের যেন রাজ্য লোভ না হয়। ... পরাধীনতার বেদনা আমরা জানি। আমরা যেন কাউকে পরাধীন না করি।"[২৯] মুজতবার সেই স্বাধীনতাকামী চিত্তলোক রাহুমুক্ত পূর্ব পাকিস্তানের বক্ষে স্বাধীন বাঙলাদেশের অভ্যুদয়ে কি আনন্দেই না স্পন্দিত হয়েছিলো! স্ত্রী-পুত্রদের লেখা একটি পত্রে আমরা আলী সাহেবের হৃদস্পন্দন উপলব্ধির চেষ্টা করবো।

Dec. 28th, '71.

My dear Firoz-Bhoju,

My dearest Bou,

No one can say anything with any certainty these days. Nevertheless I have succeed with the help of one of the best friend of mine (her brother, my very dear friend Pochu Sen was killed by Yahya's satans.) a ticket by Indian airways for Monday 3rd Jan 1972. The plane arrives at Tejgaon airport at about noon, as there is terrible scarcity of petrol at Dacca do not bother to get a car for me. We shall merrilly get into cycle rickshaws sing Hippi songs & expect the cycle tubes to burst any moment, But dear F. B. do not bring Mom along. She is not keeping good health & may find it hard to foot it out all the way home.

I feel so happy that you all are safe & sound that, really do not know what to write." (প-২০৮)।

অবশ্য অনিবার্য কারণে মুজতবা আলী তিন তারিখে ঢাকা আসতে পারেননি, এসেছেন ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭২-এ।

তথ্য-নির্দেশ

১। সৈয়দ আলী আহসান : সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে, বই, অক্টোবর, ১৯৮১,পৃ. ৪।
২। মুসাফির, পৃ. ১১২-১৩।
৩। মণি, দ্বন্দ্বমধুর, পৃ. ৭৯।
৪। ঐ, পৃ. ৮০।
৫। শহ্‌র-ইয়ার, পৃ. ৪৬-৪৭।
৬। বিদেশে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭।
৭। ঐ, পৃ. ২১১।
৮। ঐ, পৃ. ২০৭-০৮
৯। সৈয়দ মুজতবা আলী : 'Love and Friendship', সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ.২০১-০২।
১০। সৈয়দ মহবুব আলী : কাছের মানুষ আলী ভ্রাতৃত্রয়, শাশ্বত, মৌলবীবাজার মহকুমা সমিতি স্মরণিকা, ১৯৮১।
১১। সাইদা খানম : স্মৃতির সোনালী দিগন্তে, বেগম, ৩১ আগস্ট, ১৯৭৫, পৃ. ১১।
১২। ঐ।
১৩। পুত্রদের নিকট লিখিত পত্রাবলী, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৯২–৯৩।
১৪। দিনলিপি, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪।
১৫। ঐ, পৃ. ৩৫২।
১৬। রায়পিথৌরার কলমে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড. পৃ. ২৮৩।
১৭। সৈয়দ মুজতবা আলী : নিবেদন, ময়ূরকণ্ঠী।
১৮। হাওর : সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯।
১৯। চতুরঙ্গ : ঐ, পৃ. ৩২৮।
২০। ঐ, পৃ. ৩২৯।
২১। Syed Mohammad Ali : Syed Mujtaba Ali পৃ. ৫-৬।
২২। ঐ, পৃ. ২।
২৩। ঐ, পৃ. ৩।
২৪। পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়, পৃ. ১৯।
২৫। ঐ, পৃ. ১০৭।
২৬। ঐ, পৃ. ১৩৬।
২৭। Syed Mohammad Ali : Syed Mujtaba Ali পৃ. ৪।
২৮। শ্রীমতী অর্চনা মিত্রকে লিখিত পত্র-১, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪২৩।
২৯। জলে-ভাঙায়, পৃ. ৫৩।

অধ্যায় : আট

০১.

পারিবারিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে মুজতবা আলীর একটা গর্ববোধ সব সময়ই ছিলো। এবং এ-বিষয়ে তিনি ছিলেন যথেষ্ট সোচ্চার। নিজেকে নিয়ে রঙ্গরস করা আলী সাহেবের রসসৃষ্টির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাঁর সংলাপ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং রসের সমন্বয়ে ঝলমলিয়ে উঠতো। তিনি নিজেকে 'সৈয়দ' অর্থাৎ হযরত মুহম্মদের বংশধর হিসেবে চিহ্নিত করায় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর সকৌতুক উক্তির জবাবে বলেছিলেন, "ক্যান মশায়, আপনারা যদি চন্দ্রবংশ, সূর্যবংশ হতে পারেন—অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যের পুত্র হতে পারেন তবে আমার claim তো অনেক modest. আমি একজন মানুষ মাত্র পূর্ব-পুরুষ হিসেবে চাইছি।"[১] অন্যত্র পারিবারিক পরিচয় দান প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"বস্তুত, পরিবার আমাদের খানদানী। আমাদের পূর্বপুরুষ শাহ আহমদের ... দরগা এখনো তরপ পরগণাতে আমাদের ভদ্রাসনে বিরাজিত-... তারই অল্প দূরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মাতুলালয়—মাতা শচীদেবীর জন্ম সেখানেই। আমাদের বংশ 'পীরের বংশ'—এঁরা কিন্তু যজমানগৃহে অন্ন পর্যন্ত গ্রহণ করেন না। আমার পিতামহ, মাতামহ, আমার অগ্রজদ্বয় সুপণ্ডিত। আমার অগ্রজ প্রায় কুড়ি বৎসর পরিশ্রম করে সম্প্রতি 'চর্যাপদে'র একখানি নুতন টীকা রচনা করেছেন। আমাদের কনিষ্ঠা ভগ্নীর ফকীরী, মারিফতী গীত ঢাকা বেতারে শুনতে পাবেন।

আমি এই গোষ্ঠীর একমাত্র ব্ল্যাকশীপ—কালা ম্যাড়া"[২]

মুজতবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় গুণী, কিন্তু তিনিই যে দোষে-গুণে পরিবারের কৌস্তুভ মণি এবং তাঁর ঔজ্জ্বল্যে যে অন্যদের অস্তিত্ব প্রায় লীন এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। বস্তুতঃ আলী সাহেব তাঁর পরিবারের লোকজনদের তুলে ধরবার কৌশল হিসেবেই নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করে বর্ণনা করেছেন। পরিবারের সদস্যদের প্রতি অন্যদের সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম ও কৌতূহল জাগ্রত করার একটা সচেতন প্রয়াস তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। এ-ক্ষেত্রে একটি উদাহরণই যথেষ্ট। স্বাধীন বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর 'দেশ' পত্রিকার 'পঞ্চতন্ত্র' কলামে 'উভয় বাংলা' ধারাবাহিক রচনার 'আধুনিক গদ্য কবিতা' শীর্ষক আলোচনায় মুজতবা আলী বন্ধু ও বয়োজ্যেষ্ঠ কবি আবুল হোসেন এবং উভয় বাঙলার জনপ্রিয় কবি শামসুর রাহমান সম্বন্ধে সামান্য আলোকসম্পাত করে তৃতীয় জনের কৃতি-কৃতিত্ব সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছেন। কিন্তু বাঙলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে এবং গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর "অবদান" কোনক্রমেই উল্লেখ্য নয়।

তাবৎ কৃতী আধুনিক কবিকুলকে পাশ কাটিয়ে মুজতবা যাঁকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন—তিনি আলী সাহেবের ভাগিনেয়ী। সবকিছু ছাপিয়ে সম্পর্কটাই গুণের বিচারে প্রাধান্য পেয়েছে। এই মহৎ মনোবৃত্তি স্বাভাবিক মানের মানুষের ভূষণ হলেও মুজতবা আলীর মতো ব্যক্তিদের নিকট থেকে সাধারণজন পরিমিতি বোধই প্রত্যাশা করে। অবশ্য অগ্রজদ্বয় কিংবা পরিবার-পরিজন তথা আত্মীয়স্বজনের প্রতি তাঁর যে দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা' অতি শ্রদ্ধেয়, শ্লাঘার বস্তু এবং এস্থলে সহৃদয় মুজতবার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত না হয়ে পারে না। তাঁর শিশুসুলভ সরলতা শুধু আপন জন নয়, দূরের মানুষকেও তাঁর কাছে আকর্ষণ করেছে—আপন করে নিয়েছে। এদিক থেকে আলী সাহেব একটি ব্যতিক্রমী অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর মাধ্যমাগ্রজের রচিত 'আমাদের কালের কথা' প্রকাশিত হলে তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে লেখেন :

"Mr. Sagarmoy Ghosh is extremely keen on publishng a review of your autobiography. So, please, could you send him directly a copy of your book... and another copy to me?...Meanwhile, your book appears to have reached here, and one ইন্দ্রমিত্র who has written an excellent biography of Vidyasagar, has extensively quoted you, with the proper references, the name of the book, the author etc. ইন্দ্রমিত্র is also a great admirer of yours." (প-১৯০)। মুজতবা আলী যেমন তাঁর সহোদরদের কৃতিত্বকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তেমনি তাঁদের প্রশংসনীয় অবদানের উল্লেখ করে অগ্রজদেরও উৎসাহিত করেছেন।

আলী সাহেব শ্রীযুক্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রচিত 'আত্মকথা'র সমালোচনা লেখার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। সে-সঙ্গে সত্যবাদিতা থেকে শুরু করে দাদার যাবতীয় গুণাবলীর ফিরিস্তি দিয়ে যে-সব তথ্য পরিবেশন করেছেন, তাতে অগ্রজের প্রতি শুধু ভক্তিশ্রদ্ধাই নয়, সে-সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের সুখ-দুঃখ এবং পারিবারিক মাধুর্যের একটা মোহন রূপও উদ্ভাসিত।

"এই বড়দাটি আমার ... বড় সরল সদাশিব প্রকৃতি।... তিনি খুব একটা স্বেচ্ছায় এ-বই লেখেননি। তাঁর গাঁইয়া কুচুটে বউ তাঁকে হুনো দিয়েছে ... " আপনার দুই ছোট ভাই, এ্যাসা কিয়া, ঐসা কিয়া, আর আপনি ছোঃ।"...ভাবী জানেন না, দাদা চিরটাকাল আমাদের মধ্যে—স্কুল কলেজেও, সর্বশ্রেষ্ঠ স্পর্শকাতরতা দিয়ে নিরেস পুস্তকেও সদগুণ আবিষ্কার করতে পারতো। এম. এ. পাশের প্রাক্কালে বাবা পেনসন নিলেন, দাদাকে বাধ্য হয়ে চাকরি নিয়ে ছোট দুই ভাইকে খর্চা পাঠাতে হত, পরপর চারটে বোনের বিয়ে সামলানো।...

আমার বউকে যা স্নেহ করে সে, ভাই, অবর্ণনীয়। হয়তো ভাবে, বাউণ্ডুলে ছোট ভাইটা তাকে যথেষ্ট সঙ্গ দেয় না। বেড়াতে বেরিয়ে ক্ষিধে পেলে...কাছে নিজের বাড়ি না গিয়ে, চেল্লাচেল্লী করতে করতে ঢুকবে বউয়ের ড্রইং রুমে।...

আমি থাকলে আমাকে খামোখা দুটো ধমক দেবে, আমি আনমনা মনে বেখেয়ালে জবাবে তিনটে ধমক না দিলে হতাশ হবে,...অত্যুত্তম ইংরিজি জানে বলে ভাইপো দুটোর ইংরেজি চেক করবে চা খেতে খেতে।" ঊনসত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আলী সাহেব অগ্রজের মাহাত্ম্য বর্ণনার সময় যেন একজন মুগ্ধ সরল কিশোরে রূপান্তরিত। তাঁর মতো উঁচু মানের সম্মানিত লেখক পত্রশেষে সবিনয় অনুরোধ করেছেন, "Please, কিন্তু তোমাকে influence করতে চাইনে,—বড্ড বেশী, যা ভালো বোঝো তাই লিখো।" (প-১৫২)।

মুজতবা আলীর ভাইবোনদের মধ্যে একটা সহজ সম্পর্ক বরাবর ছিলো। কোন রকম সংকোচ অচলায়তন হয়ে সেই সম্পর্কে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। এর মূলে মুজতবার স্নেহময়ী জননীর অবদান সর্বাধিক। মাতাকে আশ্রয় করেই ছিলো তাঁদের মধুচক্র। মায়ের প্রভাব মুজতবার রচনার সর্বত্র করুণ-কোমল ফল্গুধারায় প্রবাহিত। ঈদ-উপলক্ষে কর্মব্যস্ত সাধারণ বিত্তের গৃহিণীর মধুর রূপটি সৈয়দ মোস্তফা আলীর রচনায় সরসতা এনেছে। ৩

পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে সাহিত্যচর্চা, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদির প্রতিযোগিতা সিকন্দর আলী সাহেবের সন্তানদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো।

ঘর-সংসারের হিসেবপত্র রাখার দায়িত্ব ছিল মুজতবার সহোদরা সৈয়দা হিফজুন্নেসা খানমের ওপর। তাই দাদারা তাঁকে 'মীর মুনশী' বলে সম্বোধন করতেন। একবার মুজতবা কিছুদিন বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে গেলেন। মাতা ও ভগ্নীরা আনারসের মোরব্বা ও অন্যান্য মিষ্টান্ন বাক্সে ভরে দেন। তিনি সম্ভবতঃ কিছুদিন পর বাক্স খুলে দেখেন মোরব্বা ও অন্যান্য মিষ্টি পিঁপড়া দ্বারা আক্রান্ত। তখন আলী সাহেব রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্যারডি করে পত্র লেখেন :

ধন্য তোমারে হে মীর মুনশী
ধন্য তোমারে বহু বহুবার
লও ফিরে তব চিনির বরফি
লও ফিরে তব আনারস-আচার।
সেদিন প্রথম পেটের ক্ষুধায়
জ্বালাতন হয়ে মরিয়া গিয়া
খাইবার তরে খুলিনু বাক্স
তারপর দেখি হয়েছে 'কেয়া'
পিঙ্গল বরণ পিঁপড়ার সারি...ইত্যাদি। (সা-১)।

মুজতবা আলীর রসে টৈটম্বুর চিঠিপত্রগুলো ভাইবোন ও ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের আলেখ্য। ১৪ই জানুয়ারি, '৫২-তে অনুজাকে লিখছেন :

"তোমার ছোটভাবী (রাবেয়া আলী) চিঠি দিতে কার্পণ্য করেন না তাহার কারণ জলব্বৎত্তরলম্। তুমি ননদিনী বাঘিনী—তুমি বাঁকিয়া বসিলে কত না কুরুক্ষেত্র বাধাইতে পারো, আমার কানে কত রকমের ফিসফাস করিয়া কত না লঙ্কাকাণ্ড জ্বালাইতে পারো।" (প-১৬১)। নির্মল রসিকতার ক্ষেত্রে সম্পর্ক বা বয়স কখনো বাধা হয়নি। সহোদরাকে লিখছেন, "তোমার ভাবী বললেন, তুমি খুব সম্ভব রংপুরে। আশা করি তামাকের অভ্যাস করেছ। রংপুরে থেকে ও রকম একটা উম্‌দা চীজের ইস্তিমাল না করা মক্‌রুহ।" (প-১৬৫)। রংপুর তামাকের জন্যে প্রসিদ্ধ। বোনদের সান্নিধ্য লাভের জন্যে তিনি ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। নানা কারণে তাঁর পক্ষে সবসময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আসা সম্ভব হতো না। তাই তিনি তাঁদের প্রায়ই আমন্ত্রণ জানাতেন তাঁর ওখানে গিয়ে কিছুদিন কাটানোর জন্য। জনৈকা কনিষ্ঠার উদ্দেশে পত্র :

"তোমাকে রাবেয়া ঢাকাতে এরোপ্লেনে তুলে দেবে। দমদমাতে পঞ্চাশ মিনিট পরে নামতেই দেখবে আমি সামনে দাঁড়িয়ে। এতে কণামাত্র অসুবিধা নাই।

আমিও আর বেশীদিন বাঁচবো না। কাজেই এই বেলা এলে তো এলে। ভায়ে বোনে কিছুদিন পুরনো দিনের স্মরণ করবো।" এ' সঙ্গে তিনি একটি মূল্যবান তত্ত্বকথাও

বলেছেন, "সংসারের ঝামেলা থেকে নিজেকে কিছুদিনের জন্য মুক্ত করে যদি এখানে না আসতে পারো, তবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কোনো মুক্তির শান্তি পাবে না। এবাদৎ করার চেয়েও নিজকে নানা পাশ থেকে মুক্ত করার চেষ্টার বেশী প্রয়োজন। একেই বলে 'মরার আগে মরতে পারা';—আর সেটা না থাকলে, মৃত্যু যখন আসবে তখন ভয় পাবে। আমি তো ওপারে যাবার জন্য তৈরী।" (প-১৬৪)।

সদ্যপ্রাপ্ত 'টাক'-এর জন্যে মুজতবা আলীকে সনাক্ত করতে ভগ্নীকে বিশেষ বেগপেতে হবে না। এবং এ-প্রসঙ্গে তিনি কৈশোরের একটি মধুর স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। এ বোনটি তখন সিলেটের কাজী বাড়ীর বালিকা বধূ।

"বহু বহু বৎসর পূর্বে একবার আমার কাজী বাড়ী থাকাকালীন তোমার টাইফয়েড হয়। কয়েকদিন পরেই তুমি অচৈতন্য হইয়া যাও। তখন তোমাদের বাড়ীতে লোকজন গম গম করিত। তাহারা সবাই তোমাকে ভালোবাসিত। আপাজানির প্রাণপণ ডাকাতে যখন তুমি সাড়া দিলে না তখন বাড়িশুদ্ধ লোক একে একে তোমাকে ডাকিল। ...শেষটায় আপাজানি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।...আমি আসিয়া কানের কাছে ডাকিতেই তুমি রাঙা-জবার মত দুই চোখ পুরাপুরি খুলিয়া-...জিজ্ঞাসা করিলে...'ভাত খেয়েছো ?' তারপর আবার চক্ষু বন্ধ।

...তখন যখন অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় চিনিয়াছিলে এইবারে এখন দমদমায় নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবে।" (প-১৬৬)।

দেশের বাইরে অবস্থান করলেও পিতা-মাতা ও ভাইবোনদের মুজতবা কখনো বিস্মৃত হননি। এবং কিসে তাদের আগ্রহ অথবা চিত্তবিনোদন হতে পারে সে-বিষয়েও ছিলেন সতর্ক সচেতন। অবসরপ্রাপ্ত সিকন্দর আলী সাহেব মৌলবীবাজার শহরে শেষজীবন অতিবাহিত করেন। সেখানে তখন রিকসার প্রচলন ছিলো না। মুজতবা পিতার জন্যে কোলকাতা থেকে মানুষে টানা রিকসা ক্রয় করে পাঠিয়েছিলেন। (সা-৩)। '৬৯-এর ১লা অক্টোবর, তাঁর আত্মীয় ও বন্ধু আমীনুর রশীদ চৌধুরীকে অনুরোধ করছেন, "If you should meet my sister of Sheikhghat, Quazi Bari, do please, give her some of your rose cuttings," (প-১১৬)। কোন একটি পত্রিকায় ভগ্নিপতির লেখা পড়ে কী উচ্ছ্বাসই না প্রকাশ করেছেন,—"এখানে ফিরে এসে...দেখি দুলা মিয়ার লেখা প্রবন্ধটি। অপূর্ব, অপূর্ব সুন্দর লেখাটি।...দুলা মিয়ার ভাষাটি বড় সুন্দর। আর বিনয়ের সঙ্গে লেখা।... বড় ভালো লেগেছে।" (প-১৫৯)।

বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য ও খ্যাতি কখনো মুজতবা আলী ও তাঁর আত্মজনদের মধ্যে সঙ্কোচের ব্যবধান সৃষ্টি করেনি। তাঁর আচার-আচরণ কিংবা চিঠিপত্রে অতি সাধারণ আটপৌরে ঘরোয়া রূপটি ধরা পড়ে। স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকা থেকে বোনকে লিখছেন— "দুলামিয়াকে সালাম দিবে। তোমার ভাবী আগের চেয়ে কিছুটা ভালো। কবীরের* পরীক্ষা এই মাসের শেষের দিকে। ফিরোজ** য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হইয়াছে। তোমার ভাবী গতকাল তোমার কার্ড পাইয়াছেন। দুয়া জানিবা।" (প১৬০)।—এসব চিঠিতে সাহিত্যিক মুজতবা আলী অনুপস্থিত, ভাষায় নেই সৈয়দী ঢঙ ও মেজাজ। এখানে

* আলী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র।

**জ্যেষ্ঠ পুত্র।

স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিম চেহারায় বোনের পাশে স্নেহ-মমতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন চিরকালের বাঙালি সহোদর।

বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে কনিষ্ঠের একটা দূরত্ব বজায় রাখার রেওয়াজ তখন খুবই প্রচলিত। মুজতবা আলী এ' ক্ষেত্রেও ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি ছোটদের সঙ্গে তাদেরই একজন হয়ে অবলীলায় মিশে যেতেন এবং অতঃপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প। ছোটরাও তাঁকে ঘিরে থাকতো। তাদের সঙ্গে সরস ঠাট্টা-তামাশাতে তিনি ভোগ করতেন বিমলানন্দ। ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদের সঙ্গেও গড়ে নিয়েছিলেন একটা মনোরম রঙ্গরসের সম্পর্ক। নোতুন 'স্যুট' সওগাত পেয়ে ভাগিনেয়র প্রতি উৎফুল্লচিত্ত মুজতবা :

"This time you have been literally flooded me with, Heaven knows, what not. Your Mami was mightily pleased with the suit. I looked quite young said she." (প-১৭০)।

সরস বাক্যালাপে রসের জোগান দিয়ে সম্পর্কে ও বয়সে কনিষ্ঠদেরও আনন্দদানে কস্মিনকালেও মুজতবা আলী কার্পণ্য করেননি। "কখনো কখনো মামার (মুজতবার) জন্য 'পূর্বাণী' হোটেল থেকে কেক কিনে আনতাম। তিনি একদিন কেকের দাম জিজ্ঞেস করলেন এবং দাম শুনে বললেন—"হোটেলের নাম 'পূর্বাণী' কে দিয়েছে ? এটির নাম হওয়া উচিত ছিল 'কোরবানী'। কেননা ক্রেতার জান কোরবান হয়ে যাচ্ছে এখানে কেনাকাটা করে।" (সা-৫)।

পৌত্র-পৌত্রী বা দৌহিত্র-দৌহিত্রী সম্পর্কিত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গেও তাঁর মধুর সম্পর্ক। রসালাপ-খোশগল্পের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নানাবিধ আবদারও তাঁকে রক্ষা করতে হতো। আলী সাহেবের অজ্ঞাতে তাঁর এক অকালপ্রয়াত পৌত্র একটি চুট্‌কি টেপ্ করে রাখে। তিনি বলে যাচ্ছিলেন, একবার জনৈকা মহিলা তাঁকে শুধোন Responsibility কাকে বলে ? তাঁর উত্তর : "ধরুন, আপনি পাতলুন পরিধান করেন। যদি কোনো কারণে পাতলুনের সব কটা বোতাম ছিঁড়ে যায়, শুধু একটি মাত্র বোতাম অবশিষ্ট থাকে, তবে পাতলুনটি ধরে রাখার জন্য ঐ বোতামের ওপর যে দায়িত্ব পড়ে তাকেই Responsibility বলে।" কতো সহজবোধ্য ভাষা ও পদ্ধতিতে Responsibility -র সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন!

স্নেহভাজনদের 'অটোগ্রাফ' খাতায় মুজতবা আলী গদ্যে-পদ্যে মনের কথা বলেছেন—আশীর্বাদ জানিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা আধুনিকতার ডামাডোলে এক সময় তাঁর লেখা লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যাবে। তবু মনে একটি ক্ষীণ আশার প্রদীপ মিট্ মিট্ জ্বলছে, আধুনিকেরা তাঁকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করলেও, শত ব্যস্ততায় কেউ তাঁর দিকে ভ্রূক্ষেপ করার অবকাশ না পেলেও, স্নেহভাজনদের কেউ না কেউ তাঁর লেখা পড়বে, আনন্দিত হবে, অনুপ্রাণিত হবে। মৃত্যুচিন্তা যখন ক্রমশঃ তাঁকে গ্রাস করছে এবং প্রতিকূল পরিবেশের গঞ্জনায় সাহিত্য-সাধনাকে নিষ্ফল বিবেচনা করে হতাশাচ্ছন্ন, তখন কল্পনায় তাঁরই এক ভাগিনেয়ীকে নিবিষ্টচিত্তে আপন রচনা পাঠরতা দেখে যেন এক মুহূর্তে আলী সাহেবের সমস্ত গ্লানি দুঃখ কেটে যায়। মুজতবা আলীর ডাইরিতে প্রাপ্ত অপ্রকাশিত কবিতা 'সালমা* পড়িছে মোর লেখা এক মনে'র অংশবিশেষ :

---

* সালমা চৌধুরী

ওপারে যাইব আমি বসেছি খেয়াতে
হঠাৎ খেয়াল গেল তাকাতে পশ্চাতে
দিগন্ত খুঁজিয়া হেরি নাহি তো মানিক
খসরু বা মুক্তা মণি, খুঁজিয়া দিগ্বিদিক
কেহ নাই কেহ নাই। যে যার ধান্ধায়
মত্ত। খবর বিলায় কেহ, কেহ চায়
রাজস্ব উশুল করে। কেউ উচ্চাসনে
বসিয়া বিলোয় কড়ি কাঁড়ি কাঁড়ি
অকস্মাৎ কিবা দেখি ঐ তো গোপনে
সালমা পড়িছে মোর লেখা একমনে।[৪]

দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মুজতবা আলীর মমতা-মিশ্রিত ভালোবাসা এবং কর্তব্যবোধ ছিলো অপরিসীম। মনুষ্যত্বের অবমাননা যাতে না হয়, সে বিষয়ে ছিলেন সদাসচেতন। সীমিত আয়ের মধ্যেও দুস্থ আত্মীয়দের প্রতি তাঁর সাহায্যের দরাজ হস্ত ছিলো প্রসারিত। শুধু অর্থ দিয়ে নয়, অন্তর দিয়ে অপরের দুঃখ অপনোদনের আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। বাড়ি এলে আত্মীয়-স্বজনের নাম-ঠিকানা লিখে নিতেন। তাঁরই পরামর্শে মুজতবা সাহেবদের পরিবারে 'ঈদ-পুনর্মিলনী'র প্রচলন হয়—যাতে বৎসরে অন্ততঃ একবার শত ব্যস্ততার মধ্যেও একত্রিত হয়ে আত্মীয় স্বজন নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করতে পারেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর মাতার স্পর্শকাতর মনটি পেয়েছিলেন। এই স্পর্শকাতরতা আজীবন তাঁর অন্তর্লোক সিক্ত রেখেছে। প্রচুর নোনাজল মোচন করেছেন। সৈয়দা জেবুন্নেসা খাতুন এক সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন যে, মুজতবা আলী যখন কৈশোরে পদার্পণ করেন, তখন সম্ভবতঃ চা-বাগানের কুলিদের একটি বছর তিনেকের রোগা-পটকা মেয়ে সর্বাঙ্গে ঘা নিয়ে তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেবা-শুশ্রূষায় অপারগ হয়ে মুজতবা-জননী তাকে বিদায় দেন। এতে মুজতবা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কিছুদিন পূর্বে প্রায় একই বয়সী তাঁর একটি ভাই কালাজ্বরে মৃত্যু বরণ করে। সেই শোক মুজতবা কখনো ভুলতে পারেননি। সম্ভবতঃ অনাথ বালিকাটিকে আশ্রয় করে কিশোর হৃদয়ে জাগ্রত ভ্রাতৃবাৎসল্য তাঁকে কাতর করেছিলো। পুত্রের দুর্বলতা অনুধাবন করে মাতা পুনর্বার অনাথাকে সানন্দ আশ্রয় দিয়ে সেবাযত্নে তাকে সুস্থ করে তোলেন। (সা-৩ক)। মুজতবা-মানসে অকালপ্রয়াত কনিষ্ঠের বেদনাময় স্মৃতি :

"আমার যখন বয়স বছর চৌদ্দটাক তখন আমার ছোট ভাই দু' বছর বয়সে ওপারে চলে যায়। কালাজ্বরে।...

ঐ দুই বছরের ভাইটি কিন্তু আমাকে চিনতো সবচেয়ে বেশি—কি করে বলতে পারবো না। আমাকে দেখা মাত্রই তার রোগজীর্ণ শুকনো মুখে ফুটে উঠতো ম্লান হাসি।

সে হাসি একদিন আর রইল না। আমাকে সে ডরাতে আরম্ভ করলো। আমাকে দেখলেই মাকে সে আঁকড়ে ধরে রইত। আমার কোলে আসতে চাইতো না। আমার দোষ, আমি কবরেজের আদেশমত তার নাক টিপে, তাকে জোর করে তেতো ওষুধ খাইয়েছিলুম।

ঐ ভয় নিয়েই সে ওপারে চলে যায়।

তার সেই ভীত মুখের ছবি আমি বয়ে বেড়াচ্ছি, বাকি জীবন ধরে।"[৫] 'জলে-ডাঙায়'

গ্রন্থেও মুজতবা আলী অশ্রুজলে এই ভাইটির স্মৃতি তর্পণ করেছেন :

"ঐ দুবছর বয়সে সে আমার সাইকেলের রডে বসে হ্যান্ডেল আঁকড়ে ধরে থাকত আর আমি বাড়ির লনে পাক লাগাতুম। মাঝে মাঝে সে খল-খল করে হেসে উঠত আর মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে খুশী হয়ে আমাদের দিকে তাকাতেন। কিন্তু মাঝে মাঝে বলতেন, 'থাক, হয়েছে। এখন ওকে তুই নাবিয়ে দে।'

...ভগবানে আমার অবিচল বিশ্বাস। তাই আমি জানি, আমি যখন মরণের সিংহদ্বার পার হব তখন দেখব, বাবা, ঠাকুরদা ... আরো কত শত ঊর্ধ্ব-পুরুষ সৌম্যবদনে এগিয়ে আসছেন, আমাকে তাঁদের মাঝখানে বরণ করে নেবার জন্য। এবং জানি, জানি, নিশ্চয় জানি, তাঁদের সক্কলের সামনে দাঁড়িয়ে, আমার মা আমার ছোট ভাইকে হাসিমুখে কোলে নিয়ে।...

আমি যখন সে-লোকে যাব তখন ভগবান শুধাবেন, 'তুমি কি চাও?' আমি তৎক্ষণাৎ বলব, 'একখানা বাইসিকেল।' পাওয়া মাত্রই তাতে ভাইকে রডে চড়িয়ে স্বর্গের লনে চক্কর লাগাব। সে খল-খল করে হাসবে। মা দেখবে, কিন্তু কক্‌খনো বলবে না, 'থাক, হয়েছে। এখন ওকে তুই নামিয়ে দে।' "[৬]

বিদেশে-বিভুঁইয়ে কতো ভাবেই না মুজতবা স্মরণ করেছেন তাঁর মা-বোনদের। যে-সব বিদেশী চরিত্র তাঁর মানসে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে তাদের মধ্যেও ছায়া ফেলেছে তাঁর আত্মজন। দশ বছরের জার্মান মেয়ে লটে মুজতবাকে আকর্ষণ করেছিলো। কারণ,—'লটের ছিল...দাঁড় কাকের মতো মিশমিশে কালো এক মাথা চুল। ঠিক আমার মা-বোনদের চুলের মতো। ওর চুলের দিকে তাকালেই আমার মা-বোনদের কথা, দেশের কথা মনে পড়তো। আর লটে ছিল আমার বোনদের মতো সত্যই বড় লাজুক।"[৭] মুজতবা গোডেসবের্গে থাকাকালীন প্রতি বৃহস্পতি/শুক্রবার রাত দুপুরে ইন্ডিয়ার জন্য সর্বশেষ মেল ছেড়ে যেতো। প্রতিমাসে চিঠি না পেলে মায়ের দুর্ভাবনার অন্ত থাকতো না। তাই মুজতবাকে রাত নটার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হতো চিঠি ডাকে ফেলার জন্যে। প্রতিবেশী বালিকা লটের কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে মুজতবা বলেন, "তোমার রাজকন্যা যেরকম বনের ভিতর কাঠুরের কুটিরে ছোট-জানলার পাশে বসে তার মায়ের কথা ভাবতো, আমার মায়ের মনও তেমনি আমার দিকে উধাও হয়ে চলে আসে।...সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে সেই সুদূর ইন্ডিয়ায় মা বসে আছে এই চিঠির প্রতীক্ষায়। শেষ ক্লিয়ারেন্‌স্ মিস করলে ইন্ডিয়ান মেলও মিস। মাকে নেক্‌স্‌ট্ চিঠির জন্যে প্রহর গুনতে হবে আরো পুরো সাতটি দিন।"[৮]

ললাটলিখন তাঁকে প্রবাসী করলেও পিতৃভূমি অনিকেত মুজতবাকে বারংবার আহ্বান জানিয়েছে এবং এই আহ্বান তাঁর অন্তর্লোকে নিত্য ধ্বনিত। বৈরী পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে তিনি 'দুই ব্যাটাকে তাদের বাপ পিতেম'র ভিটে দেখাতে সিলেট নিয়ে যান ১৯৬৮-তে।[৯] আপনজনদের সঙ্গ পেলে তাঁর দুঃখ উপশম হয় এবং অগ্রজদ্বয়ের সঙ্গে দিনের পর দিন পরমানন্দে কাটাতে পারেন। মুজতবার মধ্যমাগ্রজ অনেকটা তাঁর অতি শ্রদ্ধেয় (স্বর্গীয়) রাজশেখর বসুর মতোই। আলী সাহেব "বকবক করলে শুধু যে শোনেন তাই নয়, চোখ দিয়েও উৎসাহও দেন।"[১০]

মুজতবা আলীর অসংখ্য রচনায় হাস্যরসের আবরণ ছিন্ন হয়ে তাঁর দুঃখকাতর কোমলবিধুর হৃদয়লোক উদ্ভাসিত। তাঁর সৃষ্ট এবং আবিষ্কৃত সার্থক চরিত্রগুলোর মধ্যেও

ট্রাজিডির অঙ্কুর সুপ্রোথিত। আড্ডার রাজাধিরাজের রচনায় তাঁর অন্যতম সাহিত্যগুরু করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের 'নোনাজলের'ই প্রাধান্য। মুজতবা মানসে দুঃখবোধ নিরবলম্ব নয়। জীবনে বহু দুঃখ প্রত্যক্ষ করেছেন। একাধিকবার প্রিয়বিচ্ছেদের সম্মুখীন হয়ে চৈতন্যলোক বিবশ হয়েছে। সহোদরার মৃত্যু, অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়া ভাবীর ইন্তেকাল, স্নেহের পুত্তলি ভ্রাতুষ্পুত্রীর সপরিবার সলিল-সমাধি, কিশোর বয়সে খেলার সঙ্গী দু' বছরের ভাইটির অকালপ্রয়াণ ও দেশে-বিদেশে অসংখ্য আপনজনের প্রত্যক্ষদৃষ্ট মৃত্যুযন্ত্রণা মুজতবা আলীকেও দুঃখকাতর করে তুলেছিলো এবং তাঁর রচনার পরতে পরতে একটি শোকাহত হৃদয়ের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা অনুরণিত হয়ে পাঠকচিত্তও অশ্রুসজল করে তোলে। আপন সংবেদনশীল হৃদয়ের প্রতিফলনই তাঁর রচনাবলী। ফলে মুজতবা আলীর অধিকাংশ লেখাই বেদনাবিধুর জীবনকাহিনী।

দীর্ঘদিন প্রবাসজীবন কাটিয়ে এবং বহু ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম বিদগ্ধজন হয়েও নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষার প্রতি মুজতবার নাড়ীর টানে কখনো ভাটা পড়েনি। তিনি যখনই সিলেটে এসেছেন এবং সিলেটী পরিবৃত অবস্থায় অনবরত বিশুদ্ধ আঞ্চলিক ভাষাতেই কথা বলতেন। এ' প্রসঙ্গে জনাব আবু সয়ীদ মাহমুদ বলেন :

"এমনকি বাইরে থাকার ফলে কিংবা চর্চার অভাবে আমরা যে-সমস্ত সিলেটী শব্দ বিস্মৃত হয়েছি মামা (মুজতবা আলী) সেগুলো ঠিক মনে রাখতেন এবং যথাসময়ে যথাস্থানে তা ব্যবহার করে আমাদের চমকে দিতেন। শুধু তাই নয়, সিলেটী ভাষা ব্যবহার করে তিনি শ্লাঘা ও তৃপ্তি বোধ করতেন। তাঁর অভিমত ছিল, যিনি আঞ্চলিক তথা মাতৃভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ তিনি কেমন করে বিদেশী ভাষা শিখবেন ? তাঁর ভাষা-প্রীতির তথা দেশপ্রেমের পরিচয় কোথায় ?" (সা-৬)। তাঁর এই নিখাদ ভাষাপ্রেমের জন্যেই সংস্কৃতি চর্চার লীলানিকেতন শান্তিনিকেতনের বিপুল জনসমাবেশে সিলেটী বন্ধুকে আবিষ্কার করে পারিপার্শ্বিকতাকে হাওয়ায় বিলীন করে সোল্লাসে হুঙ্কার ছাড়েন,—"কই দেশের বাই শুকুর মামুদ, কুন বালা ইথান আইলায় ?" শান্তিনিকেতনের গণসমাবেশে দাঁড়িয়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ বিনিময়ে যথেষ্ট সংকোচের কারণ ছিলো। এবং তাঁর সাধু ভাষার প্রত্যুত্তরে আলী সাহেব পুনর্বার হাঁকলেন, "ধারে আও মে ছমু" এবং অতঃপর পরিবৃত জনতার সকৌতুক বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিশুদ্ধ সিলেটীতে অনর্গল দেশের-দশের কুশলাদি সাগ্রহে নিয়েছিলেন।[১১]

০২.

রসস্রষ্টা সৈয়দ মুজতবা আলীর চেয়ে ব্যক্তি মুজতবা, মানুষ মুজতবা আলী ছিলেন অধিকতর আকর্ষণীয়। প্রাণপ্রাচুর্যে সমৃদ্ধমান এই হিরন্ময় পুরুষ যে অপার সহানুভূতি ও সমবেদনা নিয়ে বাঙালি জাতির প্রতি তাকিয়েছিলেন, তাই ক্রমে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়ে সর্বশেষে বাঙলার ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যেই সংহত রূপ ধারণ করেছে। এই বিশ্বনাগরিক যখন অতিপরিচিত পরিবেশে আস্তানা পাতেন তখন তাঁর ঘরোয়া রূপ অতি মধুর, কোমল এবং তিনি তখন অনেক বেশি হৃদয়ের কাছাকাছি। আলী সাহেবের একটি ব্যক্তিগত

পরিমণ্ডল ছিলো। সেখানে স্থান লাভের একমাত্র মাপকাঠি হৃদয়ের সম্পর্ক, ব্যক্তিগত পরিচিতি তথা ঘনিষ্ঠতা। পাণ্ডিত্য, সামাজিক বা কর্মজীবনের পদমর্যাদা ধর্তব্যের মধ্যেই ছিলো না। আলী সাহেবের আড্ডায় শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পদস্থ ব্যক্তির পাশাপাশি প্রায় গাদাগাদি হয়ে পরম নির্ভয়ে তথাকথিত অর্ধশিক্ষিত সংবাদপত্রের হকার, প্রতিবেশী খেদমৎগার, স্বল্পবেতনের কেরানী মায় জীবনযুদ্ধে পরাস্ত বেকার তক্ পরম তৃপ্তিতে সঙ্গসুখ ভোগ করে, অমৃতবচন পান করে বীতশ্রদ্ধ জীবনেও মাধুর্যের আস্বাদ পায়, অনাদৃত জীবনে কিছুটা সম্ভ্রমবোধ জাগে।

অনুজপ্রতিমদের প্রতি মুজতবা আলীর স্নেহ-ভালোবাসার পরিচয় তাঁর রচনা এবং একান্ত ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে ছড়ানো—সেই সঙ্গে অভিমান এবং তাঁর স্বরূপও হৃদয়গ্রাহী। জনৈক প্রীতিভাজনের বিয়েতে অনিমন্ত্রিত মুজতবা সুদূর কটক থেকে কি অভিনব ক্ষোভই না প্রকাশ করেছেন!

"গণেশটা rascal. আমাকে একটা Personal চিঠি লিখে invitation করলো না। আমি নিশ্চয়ই তার বিয়েতে কলকাতা যেতুম—রাস্কেলটাকে বলো I shall never forgive him unless he comes with his wife to Cuttack & stay with me for a week."(প-১)।

একে তো দিকপাল লেখক, তদুপরি জমজমাট মজলিশ—অধিকাংশ সময় 'সোমরস' সহযোগে, সর্বোপরি জ্ঞানরাজ্যের বিচিত্র সব সওয়ালের অন্বেষণ তথা অধ্যয়ন—এরপরও নিয়মিত প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অনুগত ও বন্ধুজনের কাছে অকৃপণভাবে পত্র লিখন—এমন উদাহরণ মুজতবা আলীকে হিসেবের বাইরে রাখলে—বড় বিরল। অকৃত্রিমভাবে আপনজনদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদের সঙ্গসুখে গোষ্ঠীসুখ উপভোগ করার জন্যে। সে-সব চিঠি-চাপাটির মধ্যেও সাহিত্যিক মুজতবার চেয়ে ব্যক্তি মুজতবাই সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছেন। লেখকের কৃত্রিম রচনা নয়, আত্মিক সূত্রে গ্রথিত জনের কাছে সাদামাঠা আটপৌরে চিঠি। তাই ব্যক্তি মুজতবার মুল্যায়নে চিঠিগুলোর মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। আর এ-সব পত্রে রয়েছে দেদার প্রবাদ-প্রবচন-গ্রাম্যছড়া-মেয়েলী বচনের যুৎসই ব্যবহার। কখনো স্বরচিত পদাবলী।

অনেকে কথা দিয়েও নানা কারণে সময়মতো আলী সাহেবের কাছে যেতে পারতেন না। এমনি একজনের উদ্দেশে পত্র :

"...এ–রকম চিঠি বার পাঁচেক পেয়েছি।...তাতে লেখা থাকে 'আমি অমুক দিন আসছি' এবং তারপর

আজ মাথা বিষ
কাল পেটে টনটন
পরশ্য মায়ের পীড়া
কোথাও গমন—" (প-২০)।

সৈয়দ মুজতবা আলীর অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ বন্ধুবাৎসল্যের প্রমাণ হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ১৯৪৬ সনে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার পর পরই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বন্ধুকে চিকিৎসার্থে দক্ষিণ ভারতের মদনাপল্লী স্বাস্থ্যনিবাসে নিয়ে যান। যক্ষ্মানিরোধক কার্যকর প্রতিষেধক তখনো অনাবিষ্কৃত। এবং বিপদের সমূহ আশঙ্কা জেনেও তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে বন্ধুর শুশ্রূষায় এগিয়ে এসেছিলেন। 'আনন্দবাজারে' সপ্তাহে দু'বার 'কলাম' লেখার জন্যে মুজতবা তখন

চুক্তিবদ্ধ। কিন্তু বন্ধুত্বের বন্ধন অতি তুচ্ছ আর্থিক শর্ত কিংবা প্রাণের আশঙ্কার বহু ঊর্ধ্বে, আলী সাহেব বারবার তার নিদর্শন স্থাপন করেছেন। ১৯৫৯-এর দিকে যে-কোনো কারণেই হোক শ্রীযুক্তা গৌরী আইউবের সঙ্গে আলী সাহেবের সম্পর্কে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হয়। বেগম আইউবের প্রচণ্ড অভিমানও তাঁর অজ্ঞাত ছিলো না। এ-সময় শান্তিনিকেতন থেকে বন্ধুর অসুস্থতার সংবাদ এবং পারিবারিক নানা ঝামেলার কথা শুনে মুজতবা আলী রীতিমতো বিচলিত বোধ করেন। তখন তাঁর চাকরিও নেই। লিখে উপার্জন করলেও অনটন বিশ্বস্ত বন্ধুর মতোই নিত্য সঙ্গী। জনৈক অনুগত ভক্তকে লেখা তখনকার এক পত্রে মুজতবার হৃদয়ের ঔদার্য সীমাহীন আকাশের উদারতা নিয়ে ধরা পড়েছে :

"আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু আইয়ুব সাহেব অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁর স্ত্রী গৌরী দেবী আছেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁকে সাহায্য করার জন্য লোক নেই। তাঁকেই ছুটাছুটি করে ওষুধপত্র ডাক্তার-বদ্যি করতে হয়, আবার সেবাশুশ্রূষা, রান্নাবান্নার তদারকি ও বাচ্চা সামলাতে হয়। তিনি অভিমানী, মরে গেলেও পরের সাহায্য চান না।

তুমি পত্রপাঠ 5 Pearl Road-এ যাবে।...এবং যতদূর diplomatically পারো, insist করবে তোমার services. (এ বাবদে তোমার ঐ সময়ের জন্য মাইনে, অন্যসব খরচা দরকার হলে, অর্থাৎ তুমিই (judge,) সব আমি দেব, যাতে করে তুমি সর্ব ঝামেলা থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে গৌরীর সেবা—অর্থাৎ আইয়ূবের—করতে পারো। এতো কোনো লজ্জা অভিমানের কথা নয়।...

গৌরী তোমাকে তাড়িয়ে দিলেও সেখানে রোজ নিচের তলায় গিয়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে—যেন চাকরির ওমেদারীতে ধন্না দিচ্ছ।" (প-৩৪)।

মুজতবা আলী বিত্তবান হতে পারতেন কিন্তু বিত্তবান ছিলেন না—কথাপ্রসঙ্গে উক্তিটি একাধিকবার করেছি। 'ত্রিবেণী' থেকে প্রকাশিত কোনো একটি গ্রন্থের জন্যে প্রথম কিস্তির পাঁচশত টাকার একটি চেক শ্রীকানাইলাল সরকার তাঁকে দিলে আলী সাহেব চেকটি শ্রীযুক্ত সরকারের নামে endorse করে বললেন, "তোমার বিয়েতে আমি তো কিছু দিতে পারিনি। এ টাকাটা আমার হয়ে অমলাকে* দেবে।...সে সময়ে ৫০০ টাকার মূল্য তাঁর কাছে অনেক। আমার কোনো অনুরোধ-উপরোধ কাজে এল না। টাকাটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও গ্রহণ করতে হলো।" (সা-২৭)।

মুজতবা আলী তখন খ্যাতির শীর্ষে। বন্ধুকন্যা ও স্নেহের পাত্রী পূরবী দত্ত (গুহ) ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপিকা। কলেজের সহকর্মী ও ছাত্রীরা শ্রীমতী পূরবীকে পাকড়াও করলেন, যে-ভাবেই হোক আলী সাহেবকে কলেজে আনতেই হবে। সভা-সমিতিতে যোগদানে মুজতবার প্রচণ্ড অনীহার কথা জেনেও একান্ত নিরুপায় পূরবী পিতৃব্যপ্রতিম আলী সাহেবকে সকলের আত্যন্তিক আগ্রহের দোহাই দিয়ে সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ জানালেন ভাগলপুর কলেজে। "এবং...শুধুমাত্র মেয়ের মুখরক্ষার জন্য তিনি ভাগলপুরে গেলেন।...আরো আশ্চর্যের বিষয়, যেহেতু আমার মেয়ের আমন্ত্রণে গিয়েছেন সে-জন্যে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর ভাড়া (যা অন্যান্য সাহিত্যিকরা এ ধরনের অনুষ্ঠানে নিয়ে থাকেন) পর্যন্ত মুজতবা নেননি। এ থেকেই বন্ধুবাৎসল্য এবং সন্তানদের প্রতি তাঁর স্নেহ কতো গভীর ও অকৃত্রিম ছিলো তা' সহজেই অনুমান করা যায়।" (সা-২৯)।

* শ্রীমতী অমলা সরকার, কানাইলাল সরকারের স্ত্রী।

শান্তিনিকেতনে বসবাসকালে মুজতবার বিশিষ্ট বন্ধু শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললে আলী সাহেব প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় নিয়মিত সাইকেলে চড়ে তাঁর বাড়ি যেতেন। দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা পড়ে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যের সরল আলোচনা করে বন্ধুর চিত্তবিনোদনের প্রয়াস পেতেন। আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য : "There was n't a limitation of topics & subjects.... Dr. Ali came out with similar quotation in German, French, Sanskrit, Bengali, Arabic, Persian, Urdu. Such a memory & understanding I have not come across again." এবং মুজতবা আলীর অস্থিরতার চমৎকার চিত্র দিয়েছেন একটি মাত্র পংক্তিতে "While reading he would go out to check if the bycycle is still there & it was always there." (প-২১৬)।

১৯৫৬ সালে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনাও হচ্ছে না। দারুণ মানসিক চাঞ্চল্যের মধ্যে চাকুরী ত্যাগের কথা ভাবছেন। এমনি অবস্থায়ও আলী সাহেবের বন্ধুবাৎসল্যের মোহন রূপের পরিচয় পাই। বন্ধুপুত্রের নিয়মিত খবর লাভের জন্যে দিল্লী থেকে লিখছেন, "মাঝে মাঝে অঞ্জনের খবর দিয়ো। সে চিঠি লেখাতে বড় গাফিল। তার বাপ বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়।" (প-১৭খ)। উল্লিখিত 'অঞ্জন' মুজতবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিশ্বভারতীর সহপাঠী বাচুভাই শুক্লার পুত্র এবং বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ছিলেন।

অবর্ণনীয় অর্থসংকটেও মুজতবা আলী বিবেক ও আত্মমর্যাদার অবমাননা করেননি। প্রকাশকরা নানাভাবে তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন। একবার জনৈক প্রকাশক-তনয় পুরনো মনোমালিন্য মিটিয়ে নোতুন কোনো ফিকিরে আলী সাহেবের সম্মুখে নির্লজ্জভাবে পিতৃনিন্দা শুরু করলে তিনি বললেন :

"দেখো আমি মাতাল, আমার মুখ খারাপ, আমার বহু দোষ আছে, কিন্তু আমি এখনও এত নিচে নামিনি যে কয়েক হাজার টাকার জন্যে ছেলের মুখে বাপের নিন্দে শুনে আনন্দ পাবো এবং তাকে আস্কারা দেবো। তুমি বাপু বাড়ী যাও, আমি বরং তোমার বাপের সঙ্গেই বোঝাপড়া করবো।" [১২] সৈয়দ সাহেবের এই এক রূপ। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার সঙ্গে সর্বদাই সহাবস্থান করেছে বিনয়, সৌজন্যবোধ ও নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্য-মনুষ্যত্বের সাধনাই ছিল যাঁর চরম লক্ষ্য। 'দেশে-বিদেশে' পাঠ করে বিমুগ্ধ এক নবীন যুবকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার উত্তরে ১৯৫৩ সালে লিখিত তাঁর পত্র : "শিষ্য হিসেবে সর্বস্ব যদি দিতে চাও তবে সত্যকার গুণীর সন্ধান করো, যিনি তোমাকে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে মানুষের চরম কাম্য দিতে পারেন।" (প-৩১)।

সজ্জন এবং সহৃদয় বন্ধু হিসেবে মুজতবা অনন্য। বন্ধুবাৎসল্য তাঁর চরিত্রের একটা মাধুর্যময় দিক। বন্ধুর কৃতিত্বে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন এবং তাঁর প্রেরণাও অনেককে স্ব-মূল্য সম্পর্কে সচেতন ও প্রত্যয়ী করেছে। তিনি ছিলেন নবীন লেখকদের গুণগ্রাহী, পৃষ্ঠপোষক এবং গুরু। অকৃত্রিম স্নেহে স্ফুটনোন্মুখ কলিকাগুলো সযত্নে তুলে ধরে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাদের বিকশিত রূপ-মাধুর্য সৌরভ উপভোগ করে পরমানন্দ লাভ করতেন। তাঁর অযাচিত স্নেহ-উপদেশ বহু অজ্ঞাত নবীন লেখকের অনুপ্রেরণা হয়ে তাদের পথ-নির্দেশ করেছে। বর্তমান কালের খ্যাতিমান লেখকদের মধ্যে শঙ্কর, গৌরকিশোর ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ অতিশয় শ্রদ্ধা ও শ্লাঘার সঙ্গে তাঁদের সাহিত্যজীবনে মুজতবা আলীর অভিভাবকত্ব সবিনয় স্বীকার করেছেন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এদের লেখা আলী

সাহেবের দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে অনেক সময় ডাকযোগে তাঁদের হাতে পৌঁছতো। প্রতিশ্রুতিমান নবাগত সাহিত্যিকদের প্রতি মুজতবার স্নেহের ফল্গুধারা কখনো কোনো অবস্থাতেই নিরুদ্ধ হয়নি। স্বয়ং গৌরকিশোর ঘোষ লিখেছেন, "... 'দেশেবিদেশে' পড়েই আমি লিখতে শিখি, এ কথায় অত্যুক্তি নেই।" 'ফা-হিয়েন' ছদ্মনামে শ্রীযুত গৌরকিশোর যখন 'সত্যযুগ'-এ ধারাবাহিকভাবে 'এই কলকাতায়' লিখছিলেন তখন লেখাটির ভাষা ও শৈলী দেখে অনেকেরই মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল ছদ্মনামটির অন্তরালে মুজতবা আলী আত্মগোপন করেননি তো ? এই জিজ্ঞাসা আলী সাহেবের কনিষ্ঠা সৈয়দা নজিবুননেসা খাতুনের মনেও ছিলো। তাঁর সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে মুজতবা লেখেন, "এই কলকাতায়" আমার লেখা নয়। আমার প্রিয় শিষ্য গৌরের লেখা। সে আমার লেখার অনুকরণ করে। কিন্তু তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও আপন জেহ্‌ন্ আছে।" (প-১৬১)। অধুনা একটি কথা খুবই চালু হয়েছে—'Professional jealousy' এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় শিল্পী-সাহিত্যিকরাও এর আওতামুক্ত নন। মুজতবা আলী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শঙ্করের লেখা সংশোধন করে দিয়ে বিস্মিত কৃতজ্ঞ তরুণ লেখককে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন, "আমরা যে যুগে মানুষ হয়েছিলাম, সে-যুগে সাহিত্য ছিল ভদ্দর লোকদের নেশা—পরস্পরের লেখা সম্বন্ধে তখন মন খুলে প্রশংসা এবং সমালোচনা দু-ই করা যেতো। এখন যুগ পাল্টেছে। সাহিত্যের প্রধান অংশ এখন পাট তেল কয়লার মতো ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কারুর প্রশংসা করতে চায় না; আর সামালোচনা করলে ভাবে আমার ব্যবসা নষ্ট করছে।"[১৩]

অসূয়ামুক্ত স্নেহপ্রবণ তরুণের পৃষ্ঠপোষক আলী সাহেব সম্ভাবনাময় নোতুন সাহিত্যিককে বরণ করবার জন্যে কতোটা উদগ্রীব হয়ে থাকতেন তার প্রমাণ রয়েছে ২০শে মে, ১৯৫২ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায়। তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে গৌরবকিশোরকে স্বাগত জানিয়ে লেখেন :

"শ্রীমান গৌরকিশোর ঘোষের লেখা দিল্লীতে এরই মধ্যে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কয়েকজন গুণীও আমাকে শ্রীমান গৌর হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলেন, সে কথা জিজ্ঞেস করলেন।

বাস্তবিক এ রকম স্বচ্ছ চটুল ভাষা, এত বড় শব্দভাণ্ডার, ইডিয়মের ছড়াছড়ি অতি অল্প লেখকের রচনাতে চোখে পড়ে। তার উপর এই অল্প বয়সের ভিতরই শ্রীমান গৌর পোড় খেয়েছেন বিস্তর এবং মারের মধ্যিখানেও লক্ষ্য করেছেন দজ্জালরা সব 'খ্যাংরা-গোঁফো' না 'গামছা-কাঁধে'। আর সব চেয়ে বড় কথা শ্রীমান গৌরের দিলখানা ইয়া বিরাট গড়ের মাঠমাফিক। দরদে ভর্তি। খালাসী কন্ডকটর সবই শ্রীমানের ইয়ারদোস্ত ভাইবের -দর। নবদ্বীপের গৌরাঙ্গের মত গৌর সবাইকে কোল দিবার জন্য হামেহাল তৈরী।

শ্রীমান গৌরের লেখাতে এখনো মক্‌স্ চলছে। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি ঘামের ফোঁটায় আমাদের কুমীর দেখিয়ে ছেড়েছেন। আরো কত কেরামতি দেখাবেন তা মুশকিল-আসানই মালুম।"[১৪]

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মুজতবা আলী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন এবং প্রয়োজনে মতামত প্রকাশ করে সম্পাদক অথবা অপরিচিত হলেও লেখককে পত্র লিখে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। একেবারে আনকোরা লেখকের জন্যেও তাঁর দ্বার ছিলোঅবারিত। অনেক সময় একটি ছদ্ম গাম্ভীর্যের আবরণে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা

ছিলো। কিন্তু একবার তাঁর আড্ডায় সামিল হয়ে সামান্য দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হলে সমস্ত বাধাবিপত্তির কৃত্রিম দেয়াল মুহূর্তে ধসে যেতো। সম্পুর্কের দূরত্বও হয়ে যেতো বিলীন। '৫২ সালে সাগরময় ঘোষকে একটি লেখা পাঠিয়ে অনুরোধ করেন : "সঙ্গের লেখাটি পড়ে দেখো। আমার তো মনে হয় ভালোই হয়েছে।

ভদ্রলোক মেলা research করেছেন... এবং খুব শিগগীরই কলকাতা transfer হবেন। ওঁর style improve করলে তুমি একজন regular contributor পেয়ে যাবে।" (প-৬৩)। সাগ্রহে সম্ভাবনাময় 'কলমে'র সন্ধান দিয়ে সেদিকে সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। জুলাই, ১৯৬০-এ শ্রীযুত ঘোষকে লেখা এমন একটি পত্র :

"Govt. Place East থেকে ক্যাথলিকরা একটা চটি মাসিক—সেলাইবিহীন—বের করে। তাতে ফাদার ফালোঁ, ফাদার দ্যতিয়েনের লেখা থাকে। দেখেছ ?" (প-৭৮)। আর মনের মতো লেখা প্রকাশ হলে তো কথাই নেই—যেন আনন্দে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতেন। সপ্রশংস অভিনন্দনে সম্পাদক লেখককে-অভিষিক্ত করতে কোনো রকম কুণ্ঠা ছিলো না। ১৯৫৬ সালে সাগরময় ঘোষকে লিখছেন, "তোমার সাহিত্য সংখ্যা অতিশয় সুন্দর হয়েছে। বিষ্ণু দের অনুবাদমূলক প্রবন্ধটি অতুলনীয়। এত ভালো অনুবাদ আমি আগে কখনো দেখিনি। আর আবু সঈদের প্রবন্ধের তো কথাই নেই। সরোজবাবুর লেখাটিও উৎকৃষ্ট।" (প-৭১)।

নবীনদের উৎসাহ দান করতে গিয়ে কোনো রকম অহংবোধ প্রকাশ করেননি। এ ধরনের পত্র বা লেখায় মুজতবার চারিত্রিক মধুরিমা ও মহত্ত্বই প্রকাশিত। সন্তানের সাফল্যে গর্বিত পিতার মতোই তিনি সকৌতুক তাঁদের অভিনন্দিত করেছেন। কখনো হাল্‌কা রসিকতায় চিঠিপত্রগুলোও হয়েছে রমণীয়। ২রা এপ্রিল, ১৯৭৩-এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশে পত্র :

Shankar, Samaresh & Sunil are the three shining stars now, ...of course Gurudev also knew of your coming, as the sages from the East knew of the nativity of Christ & composed গাঙ্গুলি মোর শৈবালের দল but due to sheer jealousy the Visvabharati tries to efface you by printing it as গান গুলি মোর শৈবালের দল!" (প-১৫২)।
ঢাকা থেকে পরবর্তী একটি চিঠিতে কী আকুতিই না প্রকাশিত :

"আপনার লেখাটি পড়ে মনে হল, হয় আপনার কলমের খোলতাই আপনার উপন্যাসের চেয়ে রচনাতে বেশী, নয় অনুমান করতে হবে, আপনি উপন্যাস লেখো* হড়বড়িয়ে সাত তাড়াতাড়ি, "দেশের"** হুনো খেয়ে,.... যদিস্যাৎ তাই হয়, দাদা, অপরাধ নিয়ো নি। আমি litterateur নই; আমি আমার হাবিজাবি নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু আমি মৃত্যুর পূর্বে আপনাকে (এবং আরো দু'তিন জনকে) দেখতে চাই, এমন ভাষা এমন শৈলীতে এমন উত্তম উত্তম সযত্নে নির্বাচিত বিষয়-বস্তু প্রকাশ করেছ যে আমার মত সর্ব শৈলীতে একসপেরিমেন্ট করতে গিয়ে না pass "লেখক" ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় দোলাতে দোলাতে বলতে পারি, "আহা-হা-হা, খাসা মাল

*"আপনি করো" 'আপনি বলো'-জাতীয় বাক্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ব্যবহার করতেন। মুজতবা তাঁদেরই অনুকরণ করেছেন।

**সাপ্তাহিক দেশ।

ছেড়েছো দাদা।" একদম নিটোল অব্রণ, অপাপবিদ্ধ ছ-র্-র্-র্ করে যেন এক মুঠো মুক্তা ছড়িয়ে দিলে চতুর্দিকে। এক একটা করে তুলবো, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখবো।" (প-১৫৪)।

রসিকতা কতো উঁচুস্তরের হয়ে বিমলানন্দ দানে সমর্থ চিঠিতে তারও প্রমাণ মেলে। ১৯৫৪ সালে কটক থেকে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে লিখছেন, "তোমার বাজে বাজে কবিতার মাঝখানে কবি সম্মেলনে যে কবিতাটি প্রথম পড়েছিলে সেইটে আমার বড় ভালো লেগেছে। Reception খারাপ ছিল। তাই ভালো করে বুঝতে না পেরে বোধ হয় ভালো লেগেছে।

কবিতাটি আমাকে পাঠালে বড় খুশী হই।" (প-১৫৭)।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ সান্যালের 'সত্যকাম' প্রকাশিত হলে মুজতবা আলী তাঁকে অভিনন্দিত করে এক সুদীর্ঘ পত্রে লেখেন :

"...আপনি এ-পুস্তক লিখে বাঙালী হিন্দুর চোখে জ্ঞানাঞ্জন লাগাবার চেষ্টা করেছেন।...এখনো যে দেশে বারেন্দ্র রাঢ়ী-বৈদিকে সহজে বিয়ে হয় না, পূর্ববঙ্গের শরণাগত গুহ রাঢ়ী ঘোষ-বোস দ্বারা কুলীন বলে স্বীকৃত হয় না, কায়েত মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বামুন বাড়ী গেলে—এবং এ ব্যাট্যাদের তিন পুরুষের কেউ সন্ধ্যাহ্নিক করেনি কিঞ্চি এ-পুরুষ পঞ্চমকারে আকণ্ঠ নিমগ্ন—খড়ম পেটা হওয়ার সম্ভাবনা,...সে দেশে সত্যকামের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রতি ধর্মভীরু দ্বিজের কর্তব্য। আপনি সেই কর্মটি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।

আপনার গল্পের প্লটটি যদ্যপি উপনিষদ থেকে নেওয়া তথাপি ইটিকে সম্পূর্ণ অভিনব না বললে পাপ হবে। Very dexterously managed.

আপনার গল্প বলার ধরনটি চমৎকার। আপনি excellent raconteur."[১৫]

সম্পাদনার নামে কেউ কেউ লেখায় যে-সমস্ত অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করে লেখকদের মানসিক পীড়নে জর্জরিত করেন তার বিরুদ্ধে মুজতবা আলী ছিলেন সরব। এ' শ্রেণীর সম্পাদক আপন অহংবোধ দ্বারা চালিত হয়ে এবং মূর্খতা অপ্রকাশ রাখবার প্রাণপণ প্রচেষ্টায় লেখকদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলেন। এই গোষ্ঠীর এক সম্পাদক প্রসঙ্গে উষ্মা প্রকাশ করে শ্রীযুক্তা গৌরী আইউবকে লিখেছেন :

"...যে-সব লোক লেখক হিসেবে সমূচহ ফেল-মেরেছে তারা editor হিসেবে most dangerous, যত্রতত্র কলম চালায়, বিদ্যে ফলায়।...নন্দলাল, অবনবাবু কেউই তার (জনৈক সম্পাদকের) 'মেরামতী' থেকে নিষ্কৃতি পাননি। Poor বিনোদ। বেচারী artist মানুষ, 'উপরুল্লিখিত' না 'উপরোক্ত' না কি যেন একটা লিখেছিল। বাপরে বাপ! সে কী বুলিইং! বিনোদ আমায় শুধোয়, ঠিক ঠিক কি বানান মনে থাকে না, ভাই, একটা কল বাৎলে দাও তো। Background শুনে মহাবিরক্ত হয়ে বললুম, 'যা খুশী লেখ!... হরিবাবুর মত পেডান্ট তাঁর অভিধানে 'উপরোক্ত' দিয়েছেন, 'ভুল' বলেননি শুধু ব্র্যাকেটে দিয়েছেন 'উপর্যুক্ত' সাধু। তুমি, বাপু, ওসব দুশ্চিন্তা করো না; নইলে লেখার flow আটকে যাবে।" (প-১৪১)। এ' গোত্রের এক সম্পাদকের প্রতি মুজতবা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। বিশেষ সংখ্যায় তাঁর লেখা চাইলে তিনি জানান, "...আমি রাজশেখরবাবু সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক প্রবন্ধ লিখব। তখন ঐ বিশেষ সংখ্যার সম্পাদক ছিল কে যেন এক গাড়লস্য গাড়ল। উত্তরে লিখলে, আমরা জীবিত কোনো লেখক সম্বন্ধে আলোচনা

করিনে;...আমি তো রেগে টং। আমি ব্যাটাকে তখন হাতের কাছে পেলে তার গোঁপ ধরে কোদাল দিয়ে মুণ্ডু চাঁচতুম...।

কী অদ্ভুত 'যুক্তি'। তাহলে প্রথম রবিবাবুকে—যদি আমি তাঁর জীবিতাবস্থায় তাঁর সম্বন্ধে লিখতে চাই—ডাণ্ডশ মেরে ঘায়েল করে তবে তাঁর সম্বন্ধে লিখতে পারবো!

...ঐ শ্বশুর-নন্দন... যতদিন সম্পাদক ছিল ততদিন ওদের চিঠির উত্তর পর্যন্ত দিইনি।"[১৬] ঘটনাটি সাগরময় ঘোষের শ্রুতিতে এলে তিনি আলী সাহেবকে উক্ত প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেন এবং রাজশেখর বসুর যে দু'-একটি বই তাঁর ছিলো না সেগুলো সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন। শ্রীমতী গৌরীর উল্লিখিত পত্রটির শেষাংশ: "কিন্তু, ব্রাদার, 20th August এর 'দেশে' একটি Remarkable চিঠি পড়লাম। পৃ. ২৯৩ থেকে ২৯৭। কিরণকুমার রায় লোকটি কে ? অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি।" (প-১৪১)।

শ্রীনীরদ চৌধুরী 'দেশ' পত্রিকায় ভারতীয় পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধে ভারতীয়দের মুসলিম ঐতিহ্যানুগ পোষাক পরিধানের বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। মুজতবা-উল্লিখিত সুদীর্ঘ পত্রে শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায় ভারতীয় ইতিহাস ও গৌরবময় ঐতিহ্যের সুবিন্যস্ত পর্যালোচনা করে নীরদ চৌধুরীর ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর ব্যক্তিক অভিমত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে প্রতিপন্ন করেন যে, ভারতীয় সাজ-পোষাকে শ্লাঘনীয় দেশজ ঐতিহ্যই অনুসৃত হচ্ছে। তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধিজাত বিচার-বিশ্লেষণ আলী সাহেবের মনঃপূত হয়েছিলো। তাঁর রোজনামচার পাতায় বহুবিধ বচন, আপ্তবাক্য, ঋষিবাণী এবং মনের কথা লিপিবদ্ধ করতেন। সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয় বা বক্তব্য তাতে নেই–প্রতিভাত হয় মুজতবার অবিন্যস্ত বহুবিধ জিজ্ঞাসু মন। সে-সঙ্গে নির্মল রসিকতায়ও নির্কুণ্ঠ। নীরদ চৌধুরীর বক্তব্যে বিক্ষুব্ধ আলী সাহেবের সরস রসিকতা তাঁর ডাইরিতে লিপিবদ্ধ :

"আজকের দেশ পত্রিকায় নীরদ চৌধুরী মুসলমানী dress হিন্দুরা কেন পরে সেই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এক জায়গায় লিখেছেন, মুসলমানের কাছে নারী 'ভোগের' বস্তু।

কোনো কোনো ধর্মে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে তার সঙ্গে জ্যান্ত পোড়ানো হয়। বোধ হয় পরলোকে সহধর্মিণীর অভাব পূর্ণ করার জন্য। রাজরাজড়ারা, কী হিন্দু কী মুসলমান সব দেশেই হারেম পুষতেন। একমাত্র বাঙলা দেশেই অতি গরীব কুলীনও গণ্ডাদশেক বিয়ে করতে পারতো। বিদ্যেসাগরের হিসেবে এক মানুষের বোধ হয় শ' আষ্টেক বউ ছিল। নিশ্চয়ই ত্যাগের জন্য।"[১৭]

দলাদলি এ'দেশে রীতিমতো একটা প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সর্বস্তরে শিকড় প্রোথিত করতে সমর্থ হয়েছে। শিল্পী-সাহিত্যিক কিংবা বুদ্ধি ফেরিওয়ালা সম্প্রদায়ও সমাজ বা দেশ-বহির্ভূত কোনো সত্তা নন। কাজেই এ'হেন প্রতিষ্ঠানটি সবল সতেজ রাখতে এঁদের একাংশের চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। এর বিষময় পরিণতি নাকের জলে চোখের জলে আলী সাহেবও ভোগ করেছেন। পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ফায়দা হাসিলই এদের উদ্দেশ্য। কখনো নিছক দুষ্টবুদ্ধিরশতঃই এরা দলাদলি করে থাকেন। এমনি একটি পূতিগন্ধময় পরিস্থিতিতে মুজতবা আলী সাগরময় ঘোষকে আশ্বস্ত করেন :

"তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারো। তোমার বিরোধী দল তোমার অনিষ্ট করতে

পারবে না। কারণ ফার্সীতে আছে 'শত্রু কি করতে পারে, যদি মিত্র প্রসন্ন থাকেন!' 'দুশ্‌মন্ চি কুনদ্ আগর মেহেরবান বাশদ্ দোস্ত!'

...তোমার বিরুদ্ধে আমার কাছে কেউ লাগায়নি। ভবিষ্যতে লাগাবেও না। কারণ আমাকে লোকে ডরায়। আমার tongue sharp.

শ্রীমান কানাই আমার উপর অপ্রসন্ন। ঐ বিরোধী দলের দুটি মৎলব : তোমাকে কানাইকে মিত্রহীন করা—আমার বিরুদ্ধে লাগিয়ে। আমাকে মিত্রহীন করা তোমাদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে। দ্বিতীয়টাতে ওরা সফল হবে না।" (প-৯৩)।

শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে সদ্য পিতৃহারা সুহৃদকে সান্ত্বনা দান করতে গিয়ে মুজতবা আলী 'অথর্ববেদ' থেকে অনুবাদিত যে বচন উদ্ধৃত করেছেন তাতেও বাঙালির পারিবারিক জীবনের মধুর দিকটির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।—

এ গৃহে শান্তি করুক বিরাজ মন্ত্রবচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা যাক দূরে চ'লে;
পুত্রে পুত্রে মাতা দুহিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী-পতির মধুর মিলন হোক আরো সুমধুর;
ভা'য়ে ভা'য়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা' হোক আজি অবসান,
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান;
জনে জনে যেন কর্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান। [১৮]

—বাঙালির এই গৃহজীবনের প্রতি মুজতবার ছিলো অপরিসীম শ্রদ্ধা ও দুর্বলতা।

সাধারণ মানুষের ধারণা শিল্পী-সাহিত্যিকবৃন্দ আত্মভোলাই হয়ে থাকেন, কোনোদিকে তেমন দৃষ্টি নেই। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। সৈয়দ মুজতবা আলী প্রাণপণে আশ্রিতজনের কল্যাণপ্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। চাকুরি তথা জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা কিংবা তার তদ্বির করেছেন। অসুস্থজনদের চিঠি দিয়ে পরিচিত চিকিৎসককে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছেন, যেন তারা সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হয়। এমন কি 'ভুবন ডাঙার' কারো জন্য কলকাতা থেকে ঢেঁকিকলের (husking machine) লাইসেন্স বা পারমিটের জন্যেও চেষ্টা করছেন। প্রিয়জনের অতি সামান্য কৃতিত্বেও তিনি উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। 'জীবন-বিচিত্রা'য় সোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একটি লেখা পড়ে জানান, "প্রাইজটা পেলে না বলে দুঃখ হয়। আমি একবার পেয়েছিলুম—নিশ্চয়ই নামের জোরে। তুমি যে পেলে না, তার অন্যতম কারণ তুমি গজা, আমি, আমাদের class কে hit করেছ বলে। যে ভণ্ডামির কথা দেখাতে চেয়েছ, সে ভণ্ডামি আমরা সবাই হরবকৎ করছি। অবশ্য সকলেরই বিশ্বাস, 'আমি? আমি ও রকম না' "(প-৪৩)।

ব্যস্ততা কিংবা জমজমাট আড্ডায় মত্ত থেকেও অধ্যয়নে ও পত্রলিখনে আলী সাহেব কখনো আলস্য করেননি। মনে হয় শুভানুধ্যায়ীদের জন্য বেশকিছুটা সময় তিনি নির্দিষ্ট করে রাখতেন। হিসেবীদের হিসেবে যা একান্তই ফালতু খরচ—অপব্যয়। দৈনিক পত্রিকার একটি দুর্ঘটনার সংবাদও তাঁর কৌতুকের বিষয় হতে পারে। পোস্ট কার্ডের পৃষ্ঠায় 'আনন্দবাজার পত্রিকার' (১০.৭.৬৬) সংবাদটুকু জেরক্স্ করে আলী সাহেব সোমেন চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন—

"শনিবার ৩টি বালক সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পায়। এদিন বিকালে একটা চলন্ত লরি টালিগঞ্জ সারকুলার রোড ধরে যাবার সময় পাশের এক নালার মধ্যে পড়ে যায়। তিনটি বালক তার তলায় চাপা পড়ে আটকে যায়।

সংবাদ পেয়ে দমকল ছুটে যায় এবং... তাদের মধ্যে দুজনকে, অমিত সেনগুপ্ত ও সোমেন চ্যাটারজিকে আহত অবস্থায় বাঙ্গুর হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

> তুমি বালক নও; তাই উদ্বেগটাও সহ্যাতীত নয়।" (প-৪৬)।

পুনরায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্যারডি করে অভিনব 'মেঘদূত'-এর মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানান স্নেহধন্য সাগরময়কে সুদূর রাজশাহীতে :

" 'সাগর'-প্রেমে সিনান করি, শিথিল এলো-চুলে
না, না, না, না, গো, টেকো মাথাটি তুলে
বসিয়া আছি, হেথায় আমি, 'সাগর' হতে দূরে
ভরসা মনে, সাগর মম, স্মরিয়া বন্ধুরে—
বাষ্প হয়ে, আকাশে উড়ে, মেঘের রূপ ধরি'
ঝরিবে হেথা, কাঁপিবে মম, হিয়াটি থরথরি।
উত্তরমেঘ,
নব মেঘদূত,
বর্ষামধ্যে রবি-তিরোধান দিবস।" (প-৯৫)।

আপাতঃদৃষ্টিতে একটা কৃত্রিম আবরণে নিজেকে অন্তরাল করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালালেও সামান্যতম আন্দোলনে শুক্তির মধ্যেকার আত্মগোপনকারী মুক্তোর ন্যায় মুজতবা আলীর সংবেদনশীল অশ্রুসিক্তদৃষ্টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ৫ নং পার্ল রোডে তাঁর পরিচিত জনদের একজন 'কচি'—মানসিক রোগগ্রস্ত বলে নির্বান্ধব। মজলিশের বিপুল ভক্ত শুভানুধ্যায়ীদের হট্টরোল 'কচি'র প্রতি তাঁর স্নেহ-কর্তব্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরঞ্চ বিস্ময় জাগে যখন রাজশাহী থেকে 'জরুরি' বিবেচনায় পত্রে এই ভারসাম্যহীন ব্যক্তির জন্যে তাঁর স্নেহ-মমতা অজস্র ধারায় ঝরে পড়ে :

"ভাই খান,*

...একটা অত্যন্ত জরুরী কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম।... আমি পাকিস্তান আসছি শুনে কচি আমার ঘরে এসে অতিশয় বিষণ্ন বদনে শুধোয় "আপনি নাকি পাকিস্তান যাচ্ছেন ?" আমি তাড়াতাড়ি বললুম, "কিন্তু তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না। তোমার আমার common friend খান সাহেব, লাড্ডু, সোমেন ইত্যাদি নিত্য তোমার দেখ-ভাল করবে।" বেচারী বোধ হয় খুব বেশী সান্ত্বনা পায়নি। কারণ তার চেয়েও বেশি মনমরা হয়ে মাথা নীচু করে অতি ধীর পায়ে আপন ঘরে চলে গেল। ওর সেই মুখ ধীরে ধীরে চলে যাওয়া আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তুমি ভাই তাকে ভালবাস; তার খবর নেবে জানি। নীলিমাকেও বোলো।" (প-১২৩)।

অনেকের স্নেহের দাবীও প্রসন্নচিত্তে পূরণ করেছেন। মুজতবা আলীর পুত্রস্থানীয় ডাঃ দিলীপ বসু একটি হিন্দী দেহাতী ছড়ার তিনটি ছত্র তুলে দিয়ে চতুর্থ ছত্রটি পূরণ করে

---

*পশুপতি খান।

দে'য়ার আবদার জানিয়ে পত্র লেখেন। পংক্তিত্রয় নিম্নরূপ :

"নিদ্ না মানে টুটী খাট,
পিয়াস না মানে ধোবী ঘাট,
ভুখা না মানে বাসী ভাত।"

প্রত্যুত্তরে আলী সাহেব একাধিক পাদপূরণ পাঠিয়ে লেখেন,

" 'ভূখা ন্ মানে বাসী ভাত
প্রেম ন্ মানে আধী রাত—অর্ধ রাত্রি
প্রেম ন্ মানে আঁধী রাত—অন্ধকার
প্রেম ন্ মানে জাতিপাত। জাতিপাতি
প্রেম ন্ মানে ঢেড়ী জাত। ঢেড়্= ডোম
প্রেম ন্ মানে ভালী বাত।' ভালীবাৎ= সদুপদেশ

কিন্তু সব চেয়ে ভালো

দিলীপ ন্ মানে বাপ কী বাত্।" (প-১৫৫খ)।

মুজতবা প্রেরিত শেষোক্ত ছত্রটির সামান্য পটভূমি রয়েছে। চিত্র পরিচালক দেবকী বসুর ইচ্ছে ছিল পুত্র বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি ও ট্রেনিং লাভ করুক। এ নিয়ে পিতাপুত্রে সামান্য মনান্তর হওয়ায় দিলীপ বসু অভিমানবশতঃ আলী সাহেবের নিকট কটকে চলে যান। শেষ পংক্তিতে মুজতবা সেদিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

মুজতবা আলীর নিত্য-ইয়ারদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিত্তবান, গাড়ি-বাড়ির মালিক। এরা তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হতেন এবং আলী সাহেবও এদের যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছেন। এরাই ছিলেন তাঁর 'গেলাসের' প্রধান ইয়ার-দোস্ত—'বোতল-বন্ধু'। আবার অনেকে আলী সাহেবের মাথায় হাত বুলিয়ে ফুর্তি-ফার্তি করে যেতেন। এদের বাইরে কিছু ছিলেন নিঃস্বার্থ ভক্ত, সেবক ও গুণগ্রাহী—যাঁরা আলী সাহেবের প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর লেখায় আত্মার প্রশান্তি খুঁজে পেতেন। তাদের সহযোগিতার হস্ত মুজতবার প্রতি ছিল সদাপ্রসারিত। এঁদের বেশির ভাগই নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। আলী সাহেবের স্নেহ-বাৎসল্য ও সহানুভূতি এঁদের প্রতিই ছিল সমধিক। এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সম্পর্ককে তিনি কখনো কলুষিত করেন নি। এঁদের অনেকে সময় মতো তাঁর কাছে উপস্থিত হতে পারতেন না বলে মুজতবা তাঁদের ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু যখন অবহিত হলেন ঘড়ির অভাবেই এমনটি ঘটছে, তখন সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাঁদের সেই অভাব পূরণ করেছেন বিদেশী ঘড়ি সওগাত দিয়ে। একদিন মুজতবা আলী সোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে "প্রশ্ন করলেন, 'তোর মা'র তো বয়েস হয়েছে, সময় কাটে কী করে ? আমি বললুম, 'ওই একরকম করে কাটে আর কি।'

উনি শুয়েছিলেন। উঠে ওনার অন্যতম প্রিয় ট্রানজিস্টারটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা মাকে দিয়ে বলবি গান-বাজনা, ধর্মালোচনা , যাত্রা-থিয়েটার সব শুনতে। দেখবি সময় কেটে যাবে।'

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মা আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন।" (সা-৪৪)।

ডঃ আলী শেষবারের মতো যেবার জার্মানি যাচ্ছেন, তখন অনেকেই তাঁকে শুভ বিদায় জানানোর জন্যে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত। সেখান থেকে যাবেন দমদম

এয়ারপোর্টে। অন্যদের নিয়ে আলী সাহেব যখন গাড়ীতে উঠেছেন, এমন সময় তাঁর এক ভক্ত এবং অতিশয় ঘনিষ্ঠজন সেখানে এলেন। ভদ্রলোক সামান্য চাকুরে। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে কেউ সেখানে ছিলেন না। কোনো গাড়ীতে উঠবার জন্যে কোনোরকম আমন্ত্রণ না পেয়ে তিনি সসংকোচে দাঁড়িয়েছিলেন। আলী সাহেবের দৃষ্টি পড়তেই সাদর সস্নেহ তাঁকে ডেকে নিয়ে নিজের পাশে বসালেন।

অপর একটি ঘটনা। আলী সাহেব সস্ত্রীক কোলকাতায় তাঁর এক বিত্তবান গুণগ্রাহীর বাড়িতে অতিথি হয়েছেন। ডাঃ দিলীপ বসু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন সেখানে সকলেই খুব ব্যস্ত এবং মহা আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাঁদের সেদিনের মহামান্য অতিথি জার্মান কনস্যুলেটের প্রধানকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে। ডাঃ বসু না জেনেই গিয়েছিলেন এবং তখনকার মতো সে-বাড়িতে তাঁর উপস্থিতি বাঞ্ছিতও ছিলো না। তিনি যখন অলক্ষ্যে ফিরে আসছিলেন তখন "মুজতবা আলী ডেকে বললেন, 'কি রে চলে যাচ্ছিস ? তোর চাচীর সঙ্গে দেখা করবিনে ?' অতঃপর তিনি আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।" (সা-৪৯)। রাজপ্রতিনিধি কিংবা রাজপদ নয়, হৃদয়ের উষ্ণ সম্পর্কটাকেই আলী সাহেব সর্বদা প্রাধান্য দিয়েছেন।

অনেক সময় মুজতবা আলীর অস্বাভাবিক ব্যবহারে অনেকের ক্ষোভের কারণ ঘটেছে; ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। কখনো এ' ধরনের পরিস্থিতি তিনি স্বয়ং সৃষ্টি করতেন। কিন্তু সেটা ছিলো একান্তই তাৎক্ষণিক ব্যাপার। কোনোক্রমে কণ্টকাকীর্ণ বাহ্যিক আবরণটুকু ভেদ করতে পারলে তাঁর পেলব-কোমল হৃদকমলটির সন্ধান পেতে বিলম্ব হতো না। ১৯৬১ সালে বর্ধমানরাজ কলেজে হজরত মুহম্মদের জন্মদিবস উপলক্ষে সৈয়দ মুজতবা আলীকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে জনাকয়েক ছাত্র-প্রতিনিধি শান্তিনিকেতনের গুরুপল্লীতে তাঁর নিবাসে গেলে তিনি তাদের সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন। এতে তরুণরা অপমানিত বোধ করে ফিরে আসে। কিন্তু প্রত্যাবর্তন করে সবিস্ময় দেখে কলেজ ইউনিয়নের সহসভাপতির নামে আলী সাহেবের একটি পত্র এবং সেই সঙ্গে 'নবী-দিবস' উপলক্ষে তাঁর আশীর্বাণী। পত্রটিতে বিরূপ আচরণের কারণ এবং তজ্জন্য মার্জনা প্রার্থনা করে নিম্নোক্ত বাণীটি প্রেরণ করেন।

"শান্তিনিকেতন
৭ই রবী-উস্-সানী,
১৩৮১

ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্বধর্মের সমন্বয়স্থল। এ দেশের তিনটি আপন ধর্ম আছে: হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। পৃথিবীর বাকি চারটি ধর্মও এদেশে এসে সম্মানিত হয়েছে: ইহুদী, খৃষ্টধর্ম, ইসলাম ও জরথুস্ত্রী ধর্ম। ভারতবর্ষ কিন্তু আপন এবং বহিরাগত ধর্মকে সম্মানের একাসনেই বসিয়েছে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সশ্রদ্ধ নমস্কারে স্মরণ করি,তিনি বারবার সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অপিচ প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য আপন ধর্মের রত্নরাজি সর্বজন সম্মুখে উদ্ঘাটন করা। ধর্ম হিসাবে ইসলামের স্থান সর্বজন সুবিদিত। সঙ্গে সঙ্গে হজরৎ মুহম্মদ—তাঁর আশা-নিরাশার সংঘাত, তাঁর আদর্শবাদ নিয়ে আমরা যতই আলোচনা করবো, ততই জীবন-সংগ্রামে সম্মুখীন হবার উপযুক্ত শক্তি সামর্থ্য পাবো।" (প-২১৯)।

আশীর্বাণীর ভাব-ভাষা শব্দচয়নে সর্ব সংস্কারমুক্ত মানবকল্যাণকামী মুজতবা-মানস সমুজ্জ্বল। সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম-প্রবর্তকের মহান জীবনাদর্শের মহতী রূপটি—যা যে-কোনো সম্প্রদায়ের নির্জিত মানুষের জীবনে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে তার প্রতিই তিনি ইঙ্গিত করেছেন—কোনো রকম আচরণের উল্লেখ না করে।

০৩.

ব্যক্তি মুজতবাকে অন্তরঙ্গভাবে জানতে হলে অতি সাধারণ মানুষ—দৈনন্দিন কাজকর্মে যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাদের সঙ্গে আলী সাহেবের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে সাগর, জামিল, কাট্টু, মজন, তাহের সাহেব কিংবা অনিল দাস সৈয়দ মুজতবা আলীর খুবই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। সামাজিক অবস্থানের কথা বিস্মৃত হয়ে কৌতুক-তামাশা, মান-অভিমানে আলী সাহেব এদের সুহৃদে পরিণত হয়েছিলেন। ফলে তাঁদের মধ্যে ঠাট্টা-মস্করা চলতেও কোনো বাধা ছিলো না। বগুড়া কলেজের প্রবীণ বেয়ারা সাগর তো ছিল অধ্যক্ষ আলী সাহেবেরই ছায়া। সাগরকে মুজতবা স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং সাগরও তাঁকে শুধু ভক্তি-শ্রদ্ধা নয়, ভালোবাসতো। "মুজতবা আলী অনেক সময় বলতেন, 'সাগর আমার সিগারেট চুরি করে। আমিও সুযোগ পেলে তার দিয়াশলাই মেরে দিই।' সাগরের মুখে শুনেছি, মুজতবা প্রসঙ্গে বলছে, 'হুজুর মনস (মানুষ) না, দেওতা আছে।' তেমনি তাহের সাহেব সম্পর্কেও বলা যায়। তিনি নিজস্ব রেস্তোরাঁ চালাতেন। মুজতবা আলীর দ্বিপ্রাহরিক ভোজন তাঁরই তত্ত্বাবধানে হতো।... অধ্যক্ষ সাহেব আহার করতেন কলেজেই। আর আশ্চর্যের বিষয়, তাহের সাহেব নিজ হাতে মাছের কাঁটা বেছে দিচ্ছেন। আলী সাহেব খাচ্ছেন। ঘর-সংসারের খবর নিচ্ছেন। হালকা রসিকতাও চলছে। কে বলবে ইনিই ডঃ আলী ?" (সা-২০)। মুজতবা আলী মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখেছেন—মনুষ্যত্বই তাঁর বিচারের একমাত্র মানদণ্ড। অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে চেয়েছেন। যাদের সঙ্গে মিশতেন নিজেকে ঠিক সেই স্তরেই নামিয়ে আনতেন। ফলে সংকোচের ব্যবধান সহজেই হতো অন্তর্হিত।

শেখ দিল্‌জান (কাট্টু) প্রায় সাত-আট বৎসর মুজতবা আলীর গৃহপরিচারকের দায়িত্ব পালন করেন। আলী সাহেব ওর (কাট্টু) নামকরণের তাৎপর্য ও সার্থকতা ব্যাখ্যা করেছেন— "(১) সে আমার মুর্গী কাটে, (২) মাছ কাটে, (৩) পকেট কাটে, (৪) দরকার হলে মনিবের হুকুমে লোকের মাথাও কেটে আনতে পারে। কাট্টু জাতে পাঠান। মুঘল আমলে ওর পূর্ব পুরুষরা পদাতিক ফৌজ হিসেবে এদেশে এসেছিল।"[১৯] কাট্টুর হাতে যখন 'সংসার' ছিলো তখন ব্যাঙ্কের টাকা তোলা থেকে বাজার করা অবধি সবই তাকেই করতে হয়েছে। পরিচর্যা করতে হতো দু' জনের—আলী সাহেব ও তাঁর প্রিয় 'মাস্টার'-এর। দশদিন বয়স থেকে কুকুর ছানাটির সেবা-শুশ্রূষা করেছেন বলে এটি তাঁর 'মাস্টার'—যার এক বেলার জন্য বরাদ্দ ছিল আধ সের দুধ, অপর বেলার জন্য মাংস। আলী সাহেব বোলপুরে কাট্টুকে বাড়ী করবার পরামর্শ দিয়ে আর্থিক সাহায্য দানের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। (সা-৫৩)। মোঃ জামিল কিছুদিন আলী সাহেববের বাড়ীর কাজকর্ম

করেছেন। ডঃ আলী তাঁকে নিয়মিত বখ্‌শিশ্‌, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দান করতেন। বাইরে কোথাও যাওয়ার সময় বাক্‌স খুলে বলতেন পছন্দমতো জিনিস তুলে নিতে। অবশ্য "মুজতবা আলীর জিনিস-পত্রের এবং টাকা-পয়সার কোনো হিসাব থাকতো না। ফলে প্রায় সময়ই তাঁর জিনিসপত্র এবং টাকাপয়সা চুরি হতো। আসলে সাহেবের...এ' সমস্ত কাজ করতেন—সাহেবের ভালো-মানুষীর সুযোগ নিয়ে।"(সা-৫৪)।

পরিবার-বিচ্ছিন্ন প্রবাসজীবনে বস্তুতঃ এঁরাই ছিলেন মুজতবা আলীর যথার্থ পরিজন। এঁদের দুঃখ-দৈন্য এবং ঘরসংসারের যাবতীয় সংবাদ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সচেতন এবং অবহিত। অসুস্থতার মধ্যেও ১৯৭৩-এর আগস্টে ঢাকা থেকে কোলকাতার প্রকাশকদের অনুরোধ করে চিঠি লিখছেন যেন মজনকে অনতিবিলম্বে টাকা পাঠায়, অন্যথায় তার অসুবিধে হবে। বোলপুরের পত্রিকার এজেন্ট শ্রীঅনিল দাস। তাঁর অসুস্থতার সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করে পত্র লেখায় ১১ই জানুয়ারি, '৭৪-এ গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রত্যুত্তর দেন। জীবনী-শক্তি ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছে। লেখার ক্ষমতা নেই। ওপারের ডাক শুনেছেন আরো আগে। সেই অবস্থায়ও কী গভীর মমতা জড়ানো অনুরোধ—'মাঝে মাঝে আমাদের খবর নিতে ভুলো না।' অতঃপর জানতে চেয়েছেন, 'তোমার আটার কল কেমন চলছে?' (প-২৬৮)। শ্রীঅনিল দাস ঢাকা গিয়ে অসুস্থ আলী সাহেবকে দেখার বাসনা প্রকাশ করায় মহাপ্রয়াণের মাত্র দু' সপ্তাহ আগে সকৃতজ্ঞচিত্তে ৩০শে জানুয়ারি, ৭৪-এ তাঁকে বকলমে লিখছেন, "তোমার এখানে আসার জন্য কি কি বাধাবিঘ্ন আছে জানালে আশা করি আমি তার সল্‌ভ্‌ করতে পারব। ভিসার জন্য রিকমেন্ড করার দরকার হলে আমাকে জানিও। খুব তাড়াতাড়ি আমাকে চিঠি ডিকটেট করতে হলো। কারণ ধীরে ধীরে এবং সুন্দর করে ডিকটেট করতে যে ফূর্তির দরকার বর্তমানে তা আমার নেই।" (প-২৬৯)।

'রিকমেন্ড' করার সময় তাঁর জীবনে আর আসেনি। মুজতবার বুকভরা ভালোবাসার কথা তাঁর স্নেহভাজনরাও বিস্মৃত হননি। অনিল দাসের হৃদয়ার্তি তাঁর স্মৃতিচারণে পরিব্যক্ত :

"(ঘটনাচক্রে) শান্তিনিকেতনের 'সৈয়দদা'... আমারও 'সৈয়দদা' হয়ে গেলেন।

...আমরা সাহিত্যরসিক পণ্ডিত নই—কিন্তু তার জন্যে সৈয়দদা আমাদের অবজ্ঞা করতেন না।...

ওই চিঠির (মুজতবা আলীর ৩০.১.৭৪-এর পত্র) উত্তর লেখার আগেই পেলাম তাঁর মৃত্যুর খবর। ঢাকা গিয়ে তাঁকে শেষবারের মতো দেখে আসার সাধ আমার অপূর্ণ থেকে গেল। এখন ওই চিঠিগুলিই সৈয়দদার স্নেহের স্মৃতি হিসেবে আমি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার মত সামান্য ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে যে স্নেহ ও আশীর্বাদ পেয়েছি তা আমার সারা জীবনের পাথেয় স্বরূপ।"[২০]

'অতি ভোরবেলা ঘুম জড়ানো চোখে' অবধূতের পাঠানো মাছের 'সওগাত' পেয়ে মুজতবা আলী পরমানন্দিত। কিন্তু 'বাহক লোকটিকে কোনো প্রকারের খাতির যত্ন করতে' পারেননি বলে তাঁর কষ্টেরও অন্ত নেই। তাই অবধূতের প্রতি অনুরোধ : "আপনি যদি কোনো কৌশলে তাকে বোঝান তবে আমার শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হবে।"[২১]

সাধারণ প্রুফ রিডারের কাছে যখন নিজের দুর্বলতা বা অক্ষমতা জানিয়ে পত্র লেখেন, তখন মনেই হয় না কতো বড় পাণ্ডিত্যের আধার এই হৃদয়বান ব্যক্তিটি।

"শ্রীযুত প্রুফরীডার মহাশয়,

বার্ধক্যবশত প্রায়ই কোনো অক্ষর লিখতে ভুলে যাই; যেমন 'মানব' লিখতে গিয়ে 'মান' লিখে ফেলি। ঐ একই কারণে সর্বজনসম্মত সংস্কৃত শব্দের বানানেও ভুল হয়। দয়া করে এগুলো... কোনো সংস্কৃতজ্ঞজনকে দেখিয়ে মেরামৎ করিয়ে নিলে বাধিত হই।" (প-১৮৭)।

সজ্জন মুজতবা আলীর সৌজন্য তাঁর চরিত্রের আরেকটি গৌরবোজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আত্মীয় কিংবা যাঁদের তিনি গুরুজনতুল্য বিবেচনা করতেন, তাঁদের প্রতি যে শিষ্টাচার দেখিয়েছেন দৃষ্টান্ত হিসেবে তা' উল্লেখযোগ্য।

সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবের বয়স যখন ৬১ বৎসর তখন তাঁর দু' বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তাঁর মধ্যমাগ্রজের বন্ধু সিলেট সরকারি স্কুলের জনৈক প্রাক্তন ছাত্র আত্মপরিচয় দিয়ে পুরনো দিনের সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে 'পঞ্চতন্ত্রের' কোনো বিশেষ লেখা সম্পর্কে আলী সাহেবের কাছে কিছু জানতে চেয়ে প্রৌঢ়ের শিষ্টাচারসম্মত একটি পত্র লিখেছিলেন। প্রত্যুত্তরে ডঃ আলী পত্রলেখককে অগ্রজের সম্মান দিয়ে যে চিঠি লেখেন, তাতে খ্যাতিমান লেখককে আর খু'জে পাওয়া যায় না। সেখানে যে অবয়ব আমাদের দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে সে মফস্বল স্কুলের ওপরের শ্রেণীর কোনো বিদ্যার্থীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যার নাম 'সিতু'। বাল্যকৈশোরের স্মরণে সে কি বিনয়, সোহাগ, আন্তরিকতা! বহুদিন পর পরমাত্মীয়ের সন্ধান পেয়ে যেন আনন্দের প্রকাশ। চিঠির স্বল্পায়তনে সে কী ব্যাকুলতা।

" 'পঞ্চতন্ত্র' five days wonder, ওর স্থায়ী মূল্য নেই। এবং সেই হাল্কা শৈলী ছেড়ে কদাচ কখনো সিরিয়াস বিষয় নিয়ে আলোচনা করি অমনি পাঠককুল কড়া চিঠি লেখেন। আমি ভাঁড়—ওদের মতে—আমি আবার 'জ্যাঠামো' করতে যাই কেন ? আপনি কিন্তু প্রাচীন দিনের আত্মীয়তার স্মরণে দয়া রাখবেন।

আপনার আশীর্বাদ মাথা পেতে নিলুম।

খাকসার
সিতু"

পত্রশেষে 'পুনশ্চ' লিখে অনুরোধ করেছেন,

"দয়া করে 'জনাব', 'সায়েব', 'ভবদীয়' লিখবেন না। আমাকে আগেরই মত দেখবেন।" ২২

মুজতবার মৃত্যুর পর উল্লিখিত পত্রটির প্রাপক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী বিশেষ করে 'সুজন সৈয়দ'-এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই পত্রটি 'দেশ'-এ প্রকাশের জন্যে পাঠিয়েছিলেন এবং তৎসঙ্গে তাঁর লেখা একটি চিঠি দিয়েছিলেন :

"এই লেখক (মনোরঞ্জন চৌধুরী) সাহিত্য ক্ষেত্রে হীন, বয়সে প্রবীণ—মুজতবা আলীর জন্ম তারিখ হিসাবে পূর্ণ দুই বৎসরের বড়।...

একটি অমায়িক ভদ্র সুজন চিরশিশু মনের প্রকাশ বলেই তাঁর (মুজতবা) পত্রটি ছাপতে দেওয়া। আমার পত্রে একটুখানি ব্যক্তিগত উল্লেখও ছিল। ওঁর মধ্যমাগ্রজ স্বনামধন্য সৈয়দ মুর্তাজা আলী স্কুলে আমার পরবর্তী শ্রেণীতে বরাবর উচ্চ স্থানাধিকারী ছাত্র ছিলেন ... স্কুল জীবনের পরে মুজতবা আলীর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি, আমার স্মৃতিতে তার ঢলঢলে কিশোর মুখখানিরই আবছা আদল আনতে পারি।...

সিলেটে এই অতি ভদ্র সৈয়দ পরিবার শুধু ঐতিহ্যেই সম্ভ্রান্ত ছিলেন না, প্রত্যেকের

আচরণ ব্যবহারে তা প্রকট ছিল। পিতা সৈয়দ সিকন্দর আলী সাহেবের মুখে একটি চিরবিরাজমান স্নেহশীল হাস্যরেখার সাথে ধর্ম প্রাণের সৌম্য ভাবের দীপ্তি দর্শকমাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত।... বর্ষীয়ান সৈয়দের পত্রে আমার সঙ্গে প্রায় অর্ধশতাব্দীর পূর্বেকার ক্ষীণ পরিচয়ের অন্তরালে তার অপরিসীম সৌজন্য ও ভদ্রতার যে আলেখ্য, পরিণত বয়সেও একটুখানি স্নেহের পরশ আকাঙ্ক্ষার আভাষ, তার প্রকাশই এই লেখার প্রেরণা।'[২৩]

সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ অম্বিকা মজুমদার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানিতে অকাল মৃত্যুবরণ করেন। সৈয়দ মুজতবা আলী 'মুসাফির' গ্রন্থে এ' প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জার্মান ভাষায় রচিত তাঁর সঙ্গীতবিষয়ক থিসিসটিকে অমূল্য রচনা হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর লেখা পাঠ করে অম্বিকাবাবুর বয়োবৃদ্ধ পিতা চারুচন্দ্র মজুমদার আলী সাহেবকে একটি পত্র লেখেন। সম্ভবতঃ তাতে পুত্রের জীবিত থাকার একটা ক্ষীণ আশা পরোক্ষে ছিলো। শোকাহত পিতাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

"আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে সব মানুষই কাতরতা অনুভব করে। বিশেষত পিতার পক্ষে বয়স্ক পুত্র সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা জীবনের কঠিনতম পীড়ার অন্যতম। সেখানে সান্ত্বনা জানাইবার মত অভিজ্ঞতা আমার নাই।"

সম্ভবতঃ চারুচন্দ্রবাবু মুজতবার মতো সাহিত্যিককে পত্র লিখতে গিয়ে কিছুটা আড়ষ্ট হয়েছিলেন এবং ভাষা বাবদে তাঁর দুর্বলতাও উল্লেখ করেছিলেন। চারুবাবুর কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত গুণদা মজুমদারের সঙ্গে আলী সাহেবের প্রীতির সম্পর্ক ছিলো। সেই সম্পর্কের স্মরণে মুজতবা লিখেছেন,

"শ্রীমান গুণদা আমাকে 'দাদা' সম্বোধন করে। আপনি আমার পিতৃতুল্য। আপনার ভাষা কিরূপ হইল তাহা লক্ষ্য করিবার মত মূর্খ আমি নই। তবে নিবেদন, উপস্থিত সাধু, চলতি, অচলতি এত ভাষা লেখা হইতেছে যে তাহাতে প্রাচীন জনের পক্ষে ইহাদের সকলকে আপন আপন গণ্ডিতে রক্ষা করা সুকঠিন কর্ম। আমরাই সব সময় পারিয়া উঠি না।"

অতঃপর অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি, "এই তাণ্ডব নৃত্যের জন্য হয়তো আমিও দায়ী।" সর্বশেষে বাঙালী পুত্রের মতোই গুরুজনের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন অত্যন্ত ঘরোয়া ভাষায় :

"আমি শীঘ্রই ঢাকা যাইতেছি। মঙ্গলমত যেন ফিরিতে পারি—তাহার জন্য প্রার্থনা করিবেন। আপনি আমার শত শত সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিবেন।" (প-২৫৮)

গুণীজনের সুলিখিত রচনা পড়ে তিনি শুধু অপার আনন্দই বোধ করতেন না—পত্রে তাঁদের সাধুবাদ জানাতেও তাঁর কোনো রকম কুণ্ঠা ছিল না এবং কোনো বক্তব্য অস্পষ্ট কিংবা অনুপস্থিত থাকলে সবিনয় তা জানতে আগ্রহান্বিত হতেন। ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের 'অন্ত্যানুপ্রাস' প্রসঙ্গে একটি লেখা 'কথাসাহিত্য'-এ পড়ে তিনি প্রাবন্ধিককে লেখেন :

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অন্ত্যানুপ্রাস সম্বন্ধে আপনার প্রবন্ধটি পড়ে বড়ই উপকৃত হয়েছি। অধমের আন্তরিক সাধুবাদ জানবেন।

আর্যগোষ্ঠীর কোনো ভাষাতেই বোধ হয় অন্ত্যানুপ্রাস ছিল না। ফরাসী ইতালীয় প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ভাষাতে প্রথম মিল পাওয়া যায়। আপনার কথা ঠিক।

কিন্তু প্রশ্ন, শঙ্করের নামে প্রচলিত মোহমুদ্গারে যে অতি চমৎকার মিল (কেবলমাত্র শেষাক্ষর নয়, উপান্তস্বরও একরূপ) আছে, তার উল্লেখ করলেন না কেন? শঙ্কারাচার্য তো খুব সম্ভব অষ্টম শতাব্দীর।

...আমার মনে আরেকটি প্রশ্নের উদয় হয়। 'চন্ডীদাস কহে', 'বিদ্যাপতি কহত' অর্থাৎ ভনিতা নামক রেওয়াজটি কবে শুরু হল ? সেটি আলোচনা করলে বড় উপকৃত হই।

পুনরায় কৃতজ্ঞতা জানাই।"[২৪]

বাঙলা সাহিত্যে সৈয়দ মুজতবা আলীর স্থান যখন সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে, সে-সময় তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'পঞ্চতন্ত্র' (দ্বিতীয় পর্ব)-এর সমালোচনা প্রকাশিত হলে সমালোচক মহোদয়কে হার্দিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সোৎসাহে লেখেন, "এ-রকম নির্জলা প্রশংসা আমি জীবনে কখনো শুনিনি। সেটিকে আমি শুঁকছি, মাখছি, এমন কি চাটতেও পারি; কিন্তু গিলবো না। ঠাকুরের মানা।" অতঃপর সমালোচকের উৎকৃষ্ট রচনাশৈলীর প্রশংসা করে অনুরোধ করছেন, "ভগবানের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আমার লেখা যেন ভালোর দিকে এগোয়।" (প-১০০)। এ' অনুরোধের কাল ১৯৬৬ সন এবং আলী সাহেবের পক্ষেই তা' সম্ভব—যিনি পাণ্ডিত্যের অভিমানে কখনো নিজের দুর্বলতাকে কোনোরকম আবরণ বা গুণ্ঠন পরাতে চাননি। সহৃদয় সুযৌক্তিক সমালোচনাকে তিনি বরাবরই স্বাস্থ্যকর বিবেচনা করেছেন এবং সাদরে সৃষ্টিশীল সমালোচনাকে বরণ করতে ছিলেন সদা আগ্রহী। ১৯৫৩ সালে ডঃ আলী তাঁর এক গুণগ্রাহীর পত্রোত্তরে লেখেন, "আমার লেখা যখন আপনার পছন্দ হয় তখন সে-লেখার দোষত্রুটি দেখিয়ে তাকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করার চেষ্টা দরদীর কর্ম। আপনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানবেন।" (প-২৩০)।

আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গেই মুজতবা আলী গুণীজনদের রচনার রসাস্বাদ করতেন। আর যেভাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। শশিশেখর বসুর 'যা দেখেছি যা শুনেছি' পড়ে তাঁর 'নিজের লেখার প্রতি ঘৃণা ধরে।' আক্ষেপ করেন, "এ লোকটা অত দেরীতে কলম না ধরে যদি যৌবনে আরম্ভ করতো তবে আর সবাইকে কানা করে দিত।"[২৫] তাঁর বিবেচনায় রাজশেখর বসু 'এত বেশী চমৎকার লেখেন, যে, আমরা চমৎকৃত হয়েও চমৎকৃত হইনে। তিনি আমাদের অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছেন।'[২৬] তিনি "চোঁ করে এক চুমুকে ... এক নিঃশ্বাসে" পরশুরামের কবিতা পড়েন। তাঁর কবিতায় মুজতবা আবিষ্কার করেন 'মাইকেলের গাম্ভীর্য এবং রবীন্দ্রনাথের মাধুর্যের পিছনে অতি গোপন পরশুরামের দুষ্টু হাসি।'[২৭] শ্রদ্ধেয় এই সাহিত্যিককে ডঃ আলী যথেষ্ট সমীহ করেন, ভয় পান। কারণ "তাঁর (রাজশেখর বসুর) কাছে তো আমি কিছুই গোপন রাখতে পারবো না। তিনি ধরে ফেলবেন আমার দম্ভ, আমার আত্মস্তুতি প্রচেষ্টা, আরো সাতান্ন রকমের মানসিক এবং চরিত্রগত দুর্বলতা এবং ব্যাধি যা আমার আছে। ...ভণ্ডামি জিনিসটা তিনি আদপেই বরদাস্ত করতে পারেন না।"[২৮] "...কোনো জিনিস যদি রাজশেখর সত্যই ঘেন্না ... করে থাকেন তবে সেটা ঐ বুজরুকি। Be simple, be honest, কি ভয় ? যা আছে তা স্বীকার করতে লজ্জা কি ? For Heaven's sake ...do not pretend! এই তো রাজশেখরের message."[২৯] —পরশুরামের এই বাণী মুজতবা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভণ্ড নন। তবে 'বড়ফাট্টাই করার লোভ একেবারে কখনো হয় না। —সে-কথা অস্বীকার করেননি। সে সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "কিন্তু সেটা রসিয়ে বলতে পারি বলে কেউ বড় গায়ে মাখে না। পাছে অপরিচিত লোক misunderstand করে তাই আমি কারো সঙ্গে দেখা করিনে, পারতপক্ষে কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দি না, মিটিঙে পার্টি পরবে যাই না অতিশয় নিতান্ত unavoidable না হলে।"[৩০]

মুজতবা আলীর বহুদিনের বাসনা রাজশেখর বসুকে একটি গ্রন্থ উৎসর্গ করার। কিন্তু তাঁর কোনো পুস্তকই রাজশেখর বাবুকে উৎসর্গ করার উপযোগী মনে না হওয়ায় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। 'শব্‌নম্' বন্ধুদের প্রশংসা লাভ করায় মুজতবা মনে করলেন বইটি রাজশেখর বাবুকে উৎসর্গ করা যেতে পারে এবং ভীরুচিত্তের শঙ্কা-সংশয় নিয়ে আলী সাহেব তাঁর স্নেহধন্য রাজশেখর বাবুর দৌহিত্র শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লিখলেন, "তোমার দাদুকে একটু বাজিয়ে নিয়ো তো, আমি তাঁকে একখানা বই উৎসর্গ করতে চাই। তাঁর অনুমতি আছে কি না ? টাপেটোপে ঠারে-ঠোরে শুধিয়ো। বেশ খুশী মনে যখন থাকেন।"[৩১] 'গুণমুগ্ধ' মুজতবা জন্মদিন উপলক্ষে রাজশেখর বসুকে 'ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন' করে আশা ব্যক্ত করেন, "আপনি বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করুন, আমাদের আনন্দ বর্ধন করুন। আপনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ, আপনি শতায়ু হোন, সহস্রায়ু হোন।"[৩২] প্রত্যুত্তরে প্রীতিভাজন আলীকে 'একান্ত অনুরক্ত' রাজশেখর বসুর পত্র:

"দৃষ্টি অতি ক্ষীণ, সেজন্যে পড়া খুব কমাতে হয়েছে, কিন্তু আপনার রচনা পেলে চক্ষু পীড়ন করেও পড়ি। আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা বিচিত্র ভাষায় আপনি আরও লিখুন, এই প্রার্থনা করি।"[৩৩] এই অগ্রজ সাহিত্যিকের মৃত্যুতে মুজতবা আলীর 'হঠাৎ যেন চোখের সামনে একটা বিরাট সমুদ্র শুকিয়ে গেল।' তাঁর মনোপীড়ন 'এখন... অর্বাচীনদের রাজত্বে বাস করতে হবে।' বিশ্বসাহিত্য সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিফহাল আলী সাহেব নিঃসংশয় "রাজশেখর বাবু (বিশ্বের) যে কোনো সাহিত্যে পদার্পণ করলে সে সাহিত্য ধন্য হত।"[৩৪]

'শব্‌নম্' উপন্যাসের উৎসর্গপত্রটি মুজতবা আলীর চরম হতাশা, ক্ষোভ ও বেদনার প্রকাশ:

"সাহিত্যাচার্য পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজশেখর বসুকে একখানা পুস্তক উৎসর্গ করিবার বাসনা আমি বহুকাল ধরিয়া মনে মনে পোষণ করিয়াছি, কিন্তু স্বরচনার মূল্য সম্বন্ধে সর্বদাই সন্দিহান থাকি বলিয়া সাহস সঞ্চয় করিতে পারি নাই। গত পৌষে তাঁহার শরীর অকস্মাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়াতে সর্ব শঙ্কা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া তাঁহার দৌহিত্রের মাধ্যমে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করি। রাজশেখর সহৃদয় সজ্জন ছিলেন—তাঁহার সদয় অনুমতি লাভ করিয়া অকিঞ্চন কৃতকৃতার্থ হয়।

আজ আমার ক্ষোভ অপরিসীম যে স্বহস্তে তাঁহার চরণকমলে পুস্তকখানি নিবেদন করিতে পারিলাম না।"

শান্তিনিকেতনের পরিবেষ্টনীতে সৃষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে মুজতবা আলীর বিবেচনায়—প্রমথনাথ বিশী শ্রেষ্ঠ। সমবয়সী লেখকদের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা প্রীতির অভাব ছিলো না। শিবরাম চক্রবর্তী, জরাসন্ধ, সতীনাথ ভাদুড়ী, পরিমল গোস্বামী এঁদের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আলী সাহেব নানাস্থানে করেছেন। প্রকাশকের 'অজানতে' জরাসন্ধের বই 'চুরি করে এনে পড়ে পরমানন্দে লেখককে জানিয়ে দেন যে, তাঁর রচনা 'limpid, sparkling, flows like oil from bottle.' আশীর্বাদ করেন, "আপনি "জনপ্রিয়" থাকুন। বিদগ্ধজনের জন্য মেলা উত্তম লেখক যথা: কালিদাস, দান্তে রয়েছেন। আমি বিদগ্ধ নই। আমি ... আপনার ভাষা ও শৈলী (language & style)

অর্থাৎ form, বিষয়বস্তু (content) দুইই বড্ড ভালোবাসি। তদুপরি আপনি a great raconteur= recounter."৩৫

মুজতবা আলীর অভিমত, ক্ষণজন্মা লেখক সতীনাথ ভাদুড়ী ছিলেন 'writer's writer'— জীবনের সঙ্গে অন্বিত এই লেখক "গ্রামের পঙ্কজকে যেমন চিনতেন তার তলার পঙ্কটির দুর্গন্ধ সম্বন্ধেও তিনি বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন।" ৩৬

শিক্ষাগুরুদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তাঁদের প্রতি সৈয়দ মুজতবা আলীর সশ্রদ্ধ ভক্তি আশ্রম যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গুরুর প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধা তাঁকে ব্যথিত করতো। একটি ঘটনা মুজতবার মর্মান্তিক বেদনার কারণ হয়েছিলো। আচার্য তেজেশচন্দ্র সেন দেহরক্ষা করলে আলী সাহেব তাঁর সম্পর্কে একটি নিবন্ধ আনন্দবাজার পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু লেখাটি প্রত্যাখ্যাত হয়। এতে ক্ষুব্ধ মুজতবা ৫ই আগস্ট, ১৯৬০-এ সাগরময় ঘোষকে লেখেন:

"(১) তেজেশবাবু সম্বন্ধে আমি লিখেছিলুম, কারণ আমি জানতুম, এ সংসারে কৃতজ্ঞতার অভাব। আর কেউ লিখবে না।

(২) আনন্দবাজারে পাঠিয়েছিলুম, কারণ আমার যতদূর জানা, তেজেশবাবু সেই যুগে আনন্দবাজারে লিখেছেন যখন ঐ পত্রিকা কেউ চিনত না...পরে তার পাখনা গজালো, বড় ২ লেখকরা জুটলেন। আজ তাঁর মৃত্যুতে. তাঁকে স্মরণ করার মত ভদ্রতা আনন্দবাজারের নেই। আমি সেটা কল্পনা করতে পারিনি যদিও আমি তাঁর ছাত্র নই।

(৩) এখন আমি আমার বন্ধুদের circular লিখে জানাবো ভাবছি, আমি মরে গেলে তাদের কেউ যেন আনন্দবাজারে আমার সম্বন্ধে লেখা পাঠিয়ে লাঞ্ছিত না হয়। কারণ আজ না হয় আনন্দবাজার আমার কদর করেন। By the time I die, আমার লেখা তো ঝুলে পড়তে পারে। কেন তখন সে হেনস্তা ? পরলোকে আমার লেখকাত্মাকে কেন খামখা ব্যথা দেওয়া ?

(৪) আজ পর্যন্ত যখনই লিখেছি তোমাকেই (সাগরময়কে) সর্বপ্রথম স্মরণ করেছি।...

অতএব অনুরোধ, আমি মরে গেলে, তুমি লিখবে, 'সৈয়দদার আত্মসম্মান জ্ঞান বড্ড বেশী pathologically টনটনে ছিল। তাই আমাকে বলে গিয়েছেন লিখতে, তার পরলোকগমন সম্বন্ধে কেউ আপসা-আপসি করুক তিনি সেটা পছন্দ করেন না। আমাকে (অর্থাৎ সাগরকে) বলেছেন, তুমি লিখবে, 'সৈয়দদার মৃত্যুতে আমি (আমরা না) দুঃখিত'।

সম্ভব হলে সেটা বিজ্ঞাপনরূপে (অর্থাৎ যেখানে কুঁচ তেল, একশিরার বিজ্ঞাপন থাকে) ছাপিয়ো—আপন পয়সা দিয়ে। সর্বশেষে যেন স্পষ্টাক্ষরে A থাকে।" (প-৮০)।

বন্ধুজন সান্নিধ্যে বিরাজমান মুজতবা আলী অনন্য, অসাধারণ। বন্ধুপ্রীতিতে উচ্ছল 'সৈয়দদা'র একটি চিত্র দিয়েছেন গৌরকিশোর ঘোষ।

"কোন প্রিয় জিনিস তিনি (ডঃ আলী) যখন দেখতে চাইতেন, দেখাতে চাইতেন কোন প্রিয়জনকে তখন তিনিই আবার অন্য মানুষ। সৈয়দদা তখন দিল্লিতে... আকাশবাণীর এক বড় চাকরিতে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দিল্লি গিয়ে হাজির হলেন। সৈয়দদা সাতদিন অফিস পালিয়ে নীরেন্দ্রনাথকে দিল্লি দেখালেন। ভাবছেন ঐ

সাতদিনে... তামাম দিল্লি দেখা হয়ে গেল! তা হলে আর সৈয়দদা কেন ? ঐ সাতদিনে ওঁরা মাত্র হুমায়ুনের সমাধিটি দেখে উঠতে পেরেছিলেন। এই সাতদিন হরবখত তাঁর এ বগলে ছিল গাবদাগোবদা ফারগুসনের লেখা পুরাকীর্তির প্রামাণ্য এক কেতাব এবং অন্য বগলে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ঐ যাত্রায় নীরেন্দ্রনাথকে তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরতে হয়েছিল, তাই দিল্লির বাকী জায়গাগুলি তাঁর আর দেখা হয়ে ওঠেনি।" ৩৭

তীক্ষ্ণ মর্যাদাবোধ এবং বিরাট ব্যক্তিত্বের জন্যে দীর্ঘদিন বিশেষ কোনো চাকুরিতে আলী সাহেব টিকে থাকতে পারেননি। উপরওয়ালাদের প্রতি তাঁর মন বিরূপ থাকলেও অধস্তনরা তাঁর স্নেহ-প্রীতি-সহানুভূতি থেকে কখনো বঞ্চিত ছিলেন না। ছুটির পর এক কেরানীকে কর্মরত দেখে অনুসন্ধিৎসু আলী সাহেব তাঁর বক্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বলেছিলেন, "আপনার কাজ আপনাকে আপিস টাইমের মধ্যেই করে ফেলতে হবে। বাড়তি কাজ হলে বাড়তি লোক চাইবেন। নিজের কাজ যদি আপিস ছুটির মধ্যে না সারতে পারেন তো আপনি ইনএফিসিয়েন্ট। যান, বাড়ি চলে যান। ছুটির পর যদি আর কখনো আপনাকে কাজ করতে দেখি তো ইউ উইল বি ইন ট্রাবল।" কর্তার এহেন অস্বাভাবিক আচরণে কেরানীজীবনে বীতশ্রদ্ধ পরজন্মে বিশ্বাসী জনৈক নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্তানের একান্ত কামনা, "এ-জন্মে কেরানীগিরি করে পেটের ভাত যোগাড় করছি, কেরানীগিরির উপর ঘেন্না ধরে গেছে, কিন্তু উপায় কী। তবু, কসম খেয়ে বলছি, আলী সাহেবের মতো উপরওয়ালা যদি পাই তো পরজন্মেও আমি কেরানীগিরি করতে রাজি আছি।"৩৮

কাঠিন্যের অন্তরালে রসানুভূতি ও তাঁর চিত্তের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোর স্পন্দন শোনা যেতো। হৃদয়াবেগ, আত্মসচেতনতার অনুরণন, মর্যাদাবোধ এবং স্বাদেশিক চেতনা শুধু তাঁর রচনায় নয়, কথা ও আচরণেও ছিলো সুস্পষ্ট। বহুভাষাবিদ, কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন একমাত্র মাতৃভাষাতেই মানুষ নিজেকে সুচারুভাবে মেলে ধরতে পারে। তাই মাতৃভাষার সেবাতেই মুজতবা ছিলেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। শান্তিনিকেতনে দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণীর সংস্পর্শে এসে যে মহাসত্য উপলব্ধি করেছিলেন—অন্তরঙ্গতাই পারস্পরিক বন্ধনের যোগসূত্র এবং হৃদয়ই হৃদয়ের সন্ধান দেয়। এই বোধজাত ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতা হয়েছিলো তাঁর হৃদয়ের ঐশ্বর্য—যে ঐশ্বর্যালোকে স্নাত হয়ে বহুজন জীবন ধন্য মেনেছেন। আমরা জানি সামাজিক নিয়মকানুনের গণ্ডীতে মুজতবার জীবন নিয়ন্ত্রিত ছিলো না। ফলে বৈরী পরিবেশ তাঁকে একাধিকবার মানসিক নির্যাতন দিয়েছে। কিন্তু প্রতিবাদ করেননি। মানতেন বিষ্ঠা নিক্ষেপে পঙ্কের প্রতিশোধ হয় না। কখনো কখনো বড় বিচলিত বোধ করতেন। ডাইরির এক স্থানে লিখেছেন—"এরা প্রত্যহই আমাকে একটা না একটা খোঁচা দিচ্ছেই—বড় খোঁচার ভূমিকাস্বরূপ (শুনেছি বড়র আক্রমণ তেমন দুঃসহ নয়) এই সব ছোট ছোটর উপদ্রব যেমন—যা হোক এরও তো অবসান আছে এবং তারও খুব বেশী দেরী নেই।"৩৯ কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। দোষ-ত্রুটি-সমেত আলী সাহেব ছিলেন সাধারণের মনের মানুষ। ভক্তজনের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, আড্ডার রাজাধিরাজ-সুলভ মর্যাদা শেষাবধি তিনি লাভ করেছেন। জনৈক ভক্ত তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখার বাসনা প্রকাশ করায় প্রচারবিমুখ আলী সাহেব "মারমুখো হলেন! বললেন—কখনো যদি আমার বিষয়ে একটি কথাও লেখো, আমি তোমাকে পাথর ছুঁড়ে মারব।

হয়তো আলী সাহেবের পাথরের লোভেই এই লেখাটা শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে পারলাম। এমনিতে তো না খেয়ে কিংবা আমাশায় ভুগে মারা যাব, নরকস্থ হব, কিন্তু আলী সাহেবের হাতের পাথরে মরতে পারলে আমার স্বর্গলাভ অনিবার্য। আলী সাহেব কথার খেলাপ করবেন না, আমাকে পাথর ছুঁড়ে মারুন, আমার আত্মা স্বর্গের দিকে চলে যাক, আমার লাশ অন্তত কিছুক্ষণ আপনার পায়ের কাছে পড়ে থাক।" ৪০

০৪.

সৈয়দ মুজতবা আলীর মধ্যে একটা চিরশিশু মন ছিলো—সামান্য আন্দোলনে যে জেগে উঠতো। আনন্দ-আহ্লাদে, শোকে-অভিমানে সে শিশুটির প্রকাশ প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। যেমন অল্পতেই উচ্ছ্বাস, তেমনি মান-অভিমান। তবে আনন্দের ফোয়ারাটা ছড়িয়ে পড়বার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতো— সামান্য আনুকূল্যেই পাহাড়ী ঝর্ণার মতো উছলে পড়তো চতুর্দিকে।

বন্ধু আবু সঈদ আইয়ুবের বিয়ের সংবাদে নব-বরবধূকে উৎফুল্ল আলী সাহেবের অভিনন্দন পত্র—একই পাতার উভয় পৃষ্ঠায় :

(১)

"সায়েব,

আমি এত আনন্দিত হয়েছি যে গত দশ মিনিট ধরে চিন্তা করেও ঠিক করতে পারছিনে, কি লিখব। ... শুধু বলতে ইচ্ছে করছে কী আনন্দ, কী আনন্দ। বহুকাল পরে এই একটা নির্জলা সুসংবাদ কানে এল, আর জান্‌টা ত-র্‌-র্‌-র্‌—হয়ে গেল। দীর্ঘজীবী হও, শতম্‌ জীব, সহস্রম্‌ জীব।... হায় দশানন নই, নইলে বিশ হাত তুলে আশীর্বাদ করতুম।

অতি উত্তম করেছ বৎস। সুখে থাকো, আনন্দে থাকো!" (প-১৪০ক)।

(২)

'গৌরী, (ছোট বউ),

আমার বন্ধুকে তুমি বিয়ে করাতে আমি ভারী—ভারী খুশী হয়েছি। ...ভরা-ডুবি করলে কোথায় ? দমকা বাতাসের জোর ধাক্কায় চড়ায়-আটকা নৌকার পালে প্রাণ সঞ্চার করলে। এখন ত র ত র করে এগিয়ে যাবে ঐ ঐ কত দূ ্ ্ রে! আর-সবাই ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকবে। ওঃ, কী আনন্দ।" (প-১৪০খ)।

বৃদ্ধ বয়সেও এই 'শিশুটির' বায়নাক্কার অন্ত ছিলো না। ধকল পোহাতে হতো তাঁর গুণগ্রাহীদেরই। এবং এই প্রতিভার প্রতি তাঁদের সহানুভূতির কখনো ঘাটতি হয়নি। হয়তো ভোজনে বসেছেন। খানিকটে খেয়ে বললেন, "প্লেট থেকে ভাত তুলে গরম করে এনে দাও। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।" অন্য ভাত দিলে চলবে না। ঐ এঁটোই গরম করে দিতে হবে। বোলপুর থাকাকালে এ' ধরনের ছেলেমানুষী কিংবা অস্থিরচিত্ততার পরিচয় তিনি হর-হামেশা দিয়েছেন। (মরহুম) আবদুল মওদুদ (গোলাপ) এতদ্‌সংক্রান্ত কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। একবার আলী সাহেব একটি মোরগ কিনে "আমার (গোলাপের) মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন রোস্ট করতে। রোস্ট হলে অর্ধেকটা আমাদের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

মজার ব্যাপার বাকী অর্ধেক রোস্টের সামান্যই তিনি তখন খেয়েছিলেন। শীতের রাত দশটায় হঠাৎ মাকে হুকুম করলেন, রোস্টের অংশ থেকে কাটলেট তৈরী করে দিতে। মা কোনক্রমে হুকুম তামিল করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি কাটলেট না খেয়ে হঠাৎ বললেন, 'আমার শরীর ভালো নেই, আমি কলকাতা চললুম।' এবং অতরাতে ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে কলকাতা রওয়ানা হলেন। পরদিন তাঁর ভৃত্য 'কাট্টু' এসে দেখে মনিব লা-পাত্তা। তখন সে আলী সাহেবের বস্ত্রাদি নিয়ে প্রভুর সন্ধানে কলকাতা যাত্রা করে। এবং আলী সাহেব দিনসাতেক পর বোলপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।" (সা-৫৫)।

ইনিই আবার তাঁর প্রিয় 'মাস্টার'কে মদ্যপান করিয়ে চতুষ্পদের মাতলামী দর্শনে আনন্দে আত্মহারা। স্নেহের পাত্রের বিয়ের সুসন্দেশে উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে অভয় দান করেন। হয়তো পারিবারিক কোনো সমস্যার আশঙ্কা ভাবী-বরের পত্রে ছিলো। কিন্তু যার অভিভাবকের আসনে স্বয়ং মুজতবা আলী—তার কি শঙ্কা? অবশ্য হবু বরকে পারিবারিক কিছু অনুশাসনও মানতে হবে বৈকি এবং বরের নির্দেশও মান্য। তাই আলী সাহেব ডাঃ দিলীপ বসুকে আশীর্বাদ করে লিখেছেন :

"ফার্সীতে বলে نوشه–অর্থাৎ 'নবীন রাজা'। সে রাজার হুকুম মানতে হয়—তিন দিন।

সব ঠিক হয়ে যাবে। বাড়ির বড় ছেলের বিয়েতে আকছারই এটা-ওটা গুবলেট হয়। ঘাবড়াসনি। আর আমি যখন আসছি, তখন আর ভাবনা কি ? রাণী এলিজাবেৎ এলেও ভাবনা নেই। দু' চক্কর লেচে লোব।" (প-১৫৬)।

মুজতবা আলী তাঁর এক প্রাক্তন কৃতী ছাত্রকে সকৌতুক লেখেন, "খামে যে ঠিকানা লিখলুম সেটা কি পাকা ? না, ভাড়া বকেয়া রেখে ঘন ঘন বাড়ি বদলাও ? ঢাকাতে বাড়িওলা যে রকম মারাত্মক ভাড়া নেয়, তাতে এ পন্থা fair enough. তার লোকসান হবে না, এমন কি শেষতক্ তার বে-ইনসাফী মুনাফা থেকে যাবে!" (প-২২০)

তাঁকে উৎসর্গিত বই পেয়ে উচ্ছ্বাস যেন আর বাধ মানে না। সানন্দে কলম নিয়ে বসেন :

"ভাই সিব্রামদা,

তোমার উচ্ছগ্‌গো করা বই পেয়ে ভারী খুশী হয়েছি, গৌরব অনুভব করছি। এবারে বোধ হয় ফিরোজ ... স্বীকার করবে, আমিও লেখক বটি।"[৪১]

রসিকতার মাধ্যমে সর্ববয়সের লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল মুজতবা আলীর। তাঁর সঙ্গে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মিত্রের প্রথম পরিচয়টা বেশ উপভোগ্য। কোথাও নিমন্ত্রিত দ্বারিকবাবু কিছুটা বিলম্বে সেখানে পৌছে দেখেন "একদল সুন্দরী জনৈক সৌম্যদর্শন প্রৌঢ়কে ঘিরে আনন্দ উল্লাসে মত্ত। স্বাভাবিক কারণেই সেদিকে আমার (দ্বারিকবাবুর) দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তাকাতেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওপরের তাপমাত্রা কত?' প্রশ্ন শুনে আমি প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলুম। পরে রসিকতাটা বুঝতে পেরে হেসে বললুম, 'বেশ ঠাণ্ডা'। এবং আমিও রসিকতাটা অন্যদের সঙ্গে উপভোগ করেছিলুম। এখানে বলা প্রয়োজন, আমার উচ্চতা ছ' ফুট চার ইঞ্চি। এবং প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণের হেতু আমার উচ্চতা। ইনিই ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী।

... দুপুরের নিমন্ত্রণে গিয়ে রাত বারোটা পর্যন্ত আলী সাহেবের অসাধারণ

পাণ্ডিত্যপূর্ণ কিন্তু মনোগ্রাহী রসজ্ঞ আলোচনা শুনে বিস্মিত হই।... এবং প্রথম দর্শনেই এই পণ্ডিত রসিকজনের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে উঠি।" (সা-৪৫)— জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আলী সাহেবের সঙ্গে তাঁর স্নেহের সম্পর্ক অটুট ছিল। ডঃ আলী 'হিটলার' গ্রন্থটি শ্রীযুক্ত মিত্র ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী অর্চনা মিত্রকে উৎসর্গ করেন।

যৌন ও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ এম. এ. ওয়ালী সৈয়দ মুজতবা আলীর শেষ জীবনে তাঁর ঘনিষ্ঠতা লাভ করেছিলেন। আলী সাহেব মাঝে-মধ্যে চর্মরোগে আক্রান্ত হতেন এবং ডাঃ ওয়ালীর চিকিৎসাধীনে নিরাময়ও লাভ করেছেন। তিনি ঢাকা থেকে 'Skin Diseases' বইটি এনে ডাঃ ওয়ালীকে প্রদান করেন এবং তাতে স্বহস্তে লেখেন :

"পীরানী ঘেটুবীবীর*১ মুতওয়াল্লী সর্ব চর্মরোগের হেকিম উল্-হুকামা*২, তবীব উল্ আতিব্বা*৩, ওস্তাদ-ই ওস্তাদ্হঃ*৪, অদ্-দক্-তোর, অস্-সঈদ*৫

ওয়ালীর করকমলে,

যিনি আমার যাবতীয় চর্মরোগ প্রশমিত, বিকল্পে বিলুপ্ত করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন, কিন্তু

পাড়াতে ফিরিনু যবে শুনি ফিসফিস।
গনোরিয়া সারে নাই, আর সিফিলিস ॥"

মুজতবা আলী প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেন। ১৯৫২-৫৩-এর দিকে আলী সাহেব তাঁকে নিয়ে অসময়ে দিল্লীর একটি অভিজাত রেস্তোরাঁয় গিয়ে সামান্য চা কিংবা কফির অর্ডার দিলেন। 'বয়'রা অনেকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বেশ বিলম্বে তা' পরিবেশন করলো। 'বিল' মাত্র এক টাকার মতো হয়েছিলো। আলী সাহেব 'বেয়ারা'র হাতে দশ টাকার একটি নোট ধরিয়ে দিয়ে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন চোখে তাদের বিস্ময়। এক টাকার পানীয় পরিবেশনের বিনিময়ে দশ টাকা বখ্শিশ্! এ যে অকল্পনীয়। পরদিন আবার তিনি সেই হোটেলে প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ বেলা তিনটে নাগাদ গিয়ে প্রচুর খাবারের অর্ডার দিলেন। বেয়ারাদের আনন্দ দেখে কে এবং আদর-যত্নেরও পরিসীমা রইলো না। "বিল পরিশোধের সময় সৈয়দদা এবারও বখ্শিশ্ দিলেন, তবে চার আনা অর্থাৎ একটি মাত্র সিকি! এবারও বেয়ারাদের দৃষ্টিতে বিস্ময়। সৈয়দদা বললেন 'আজকের যে বখ্শিশ্ সেটা গতকালের জন্য; আর গতকাল যে বখ্শিশ্ দিয়েছি সেটা আজকের জন্য।' —এই হলেন সৈয়দদা।" (সা-৩০)।

ঘটনাটি তুরস্কের কিংবদন্তীর নায়ক নসরুদ্দীন খোজাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। খোজা সম্পর্কে আলী সাহেব যথেষ্ট ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে নিবন্ধও রচনা করেছেন। তুরস্কের 'হামাম' বিশ্ববিশ্রুত। নসরুদ্দীন হামামে গেছেন গোসল করতে। তাঁর পরিধেয় অতি সাধারণ বস্ত্র পরিচারকদের সম্ভ্রম আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। ফলে তিনি প্রাপ্য খাতির-যত্ন পেলেন না। হামাম থেকে বেরুবার সময় নসরুদ্দীন পরিচারকদের বখ্শিশ্ দিলেন এক একটি সুবর্ণ মুদ্রা। তাদের আক্ষেপের সীমা নেই। সঠিক সেবাযত্ন করলে এই মহানুভবের নিকট থেকে

---

*১ চর্মরোগের দেবী, তার মুতওয়াল্লী ডাঃ ওয়ালী।

*২ Doctor of doctor's

*৩ Doctor of Medicine

*৪ গুরুর গুরু।

*৫ হৃদয়বান ডাক্তার।

না জানি আরো কতো ইনাম পাওয়া যেতো। "পরদিন নসরুদ্দীন আবার এলেন। সে দিন দু' জন চাকরই তাঁকে দারুন খাতির যত্ন করল। নতুন দামী সাবান, চমৎকার তোয়ালে, নবাবী দলাইমলাই আর মুখে সারাক্ষণ হুজুর হুজুর।

হামাম থেকে বেরোনোর সময়ে নসরুদ্দীন প্রত্যেক চাকরকে বকশিশ দিলেন একটি তামার পয়সা। বললেন—কাল সোনার মোহর দিয়েছি আজ এখানে আসব বলে। আজ তামার পয়সা দিচ্ছি আর কোনোদিন এখানে আসব না বলে।"[৪২]

সৈয়দ মুজতবা আলী প্রায়ই মজার মজার চুট্‌কি শোনাতেন এবং সেগুলোকে অনেক সময় 'ঘটনা' হিসেবেও চিহ্নিত করেছেন। কিছু চুট্‌কি বেশ অর্থপূর্ণ। তিনি "তখন বরোদার একটি কলেজে অধ্যাপনায় রত। কলেজ থেকে ফিরে দেখেন বসবার ঘরে তাঁর চেয়ারে একটা বুড়ো বাঁদর বসে আছে। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে এবং সামনে আরো কয়েকটি বাঁদর বসে!" (সা-৫২)। তবে কি শিক্ষাঙ্গনে 'বাঁদরের রাজত্ব' নোতুন নয়! আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, আলী সাহেবের রসিকতা নিছক ভাঁড়ামো নয় এবং লোক হাসানোও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো না। তাতে আছে বাচ্যার্থের অতিরিক্ত একটা ব্যঞ্জনা—যা আমাদের চারিত্রিক দুর্বলতাকে, যাবতীয় সংস্কার-সীমাবদ্ধতাকে স্নেহ-পরিহাসে অনাবৃত করে দেয়। কাঁটার বিষটা প্রচ্ছন্ন থাকে বলে কেউ আহত বোধ করেন না। বরঞ্চ প্রথম দফায় হেসে নেন। অতঃপর হুঁশে এলে উপলব্ধি করেন—জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে এবং কি বোকাটাই না আলী সাহেব তাঁদের বানিয়েছেন! বন্ধু রাধাপ্রসাদ গুপ্ত সাপ্তাহিক 'Republic'-এ 'দেশে-বিদেশে'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সঙ্গে সঙ্গে আলী সাহেব তাঁকে আরেক কপি বই পাঠিয়ে দেন। তাতে লিখেছিলেন : "তুমি আমার বইয়ের যে রকম বেশরম প্রশংসা করেছ, তাতে মনে হয় তুমি বইটা ভালো করে পড়নি। তাই এ' বইটা পাঠালাম।"

পারতপক্ষে কাউকে আঘাত করার মানসিকতা মুজতবা আলীর ছিলো না। চরিত্রহীনতাকে চিহ্নিত করতে তিনি যে ভাষা ও শৈলী ব্যবহার করতেন, তা' অনবদ্য। আক্রান্ত ব্যক্তিকেও স্মিতহাস্যে চিন্তাভাবনা করতে হতো—ক্রুদ্ধ হবেন কি না! সাগরময় ঘোষকে লেখা একটি পত্রের শেষাংশে আলী সাহেবের সংযোজন :

"কবি বিকাশ দাসকে সঙ্গের কাগজখানা পাঠিয়ে দিয়ো। ধন্য সেই কবি, যার লেখা থেকে তার জীবিতাবস্থায়ই বিদেশী পর্যন্ত চুরি করে!" (প-৭৯)।

'শনিবারের চিঠি' মুজতবা আলীকে impotent বলায় তাঁর মনে পড়ে : "Von Platter নামক জনৈক লেখক একবার Heine-কে আক্রমণ করেন।" উত্তরে Heine লেখেন—

It is good so, that Von Platter is an open enemy of mine in front of me. I would be genuinely alarmed if I were to know that he is a friend of mine behind my back."[৪৩]

কর্মসূত্রে মুজতবা আলী দিল্লীতে বাসা পেয়েছিলেন Constitution House-এ। পার্লামেন্টের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ অধিবেশনের সময় এখানে বাস করেন। আলী সাহেব একটা মহাধাঁধায় পড়েছিলেন এঁদের নিয়ে। "এঁরা M.P.; কেউ বলে মহাপুরুষ, কেউ বলে 'মহাপাপী', কেউ বা বলে মহাপাষণ্ড। খোদায় মালুম কোনটা ঠিক।" [৪৪]

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ মুজতবা আলী সাহেবকে শ্মশানের ধারে বাড়ী বরাদ্দ করেছিলেন। শ্মশানভীতির ফলে সে-বাড়িতে কেউ বাস করতে চাইতেন না। আলী

সাহেব গিয়েছিলেন এবং বাড়ির সামনের রাস্তাটির একটি যুৎসই নামকরণও করেছিলেন—'মহানির্বাণ সড়ক'! শ্মশান কিংবা গোরস্তান সাধারণত মানুষের মনে একটা বৈরাগ্যের আমেজ নিয়ে আসে। কিন্তু মুজতবার কণ্ঠস্বর ভিন্ন :

"শ্মশানের পাশে বাস করার একটা সুবিধে, মৃত্যুকে ভোলবার উপায় নেই। ওখানে যাবার একটি মাত্র রাস্তা। তাই শহরের তাবৎ মৃতই আমার বাড়ীর সামনে দিয়ে যায়। দশ হাতের ব্যবধান। বিশও হতে পারে। নিস্তব্ধ নিঝ্ঝুম রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙে শব্দ শুনে, বোল হরি হরিবোল।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে যখন রজনী নিদ্রাহীন তখন, মনে হচ্ছে, মড়া গেছে কম। এখন বর্ষাতে যেন বেশী।

আজ বোধ হয় মারওয়াড়ি গেল। কারণ এরা ক্রমাগত কোরাসে বলে যাচ্ছিল রাম নাম সত্য হ্যায়—শুদ্ধ উচ্চারণে। আর মাঝে ২ বোল হরি হরিবোল। বোধ হয় কিছু বাঙালীও দলে আছে।"[৪৫]

যাতে কোনোক্রমে তাঁকে লেখা চিঠি খোয়া না যায় সে-জন্যে আলী সাহেব পত্র প্রেরকদের সদুপদেশ দেন, "ঠিকানা সমূচহ্ বাঙলায় লিখবে। হেথাকার ডাকঘর ইংরিজি আমার চেয়ে অল্প বেশী জানে মাত্র।" (প-১৪১)।

নানারকম কষ্ট-যন্ত্রণায় তাঁর দিন কাটে। কাজের লোক নেই, রান্নার লোক নেই। আর এই মহাবিপদের সময় "বড়ী আপা (বেগম ডাঃ গণী) অকস্মাৎ লিখলে, এখানে (নিচাপট্টিতে) আসবে। আমার বাথরুম নেই, বারান্দায় স্নান করি; বাবুর্চি নেই, হোটেলের ছাইভস্ম খাই। যখন শান্তিনিকেতনের উম্‌দা উম্‌দা বাড়িতে থাকতুম তখন শাহ্ জাদীর . . . জৈবনকাল; কলকাতায় উর্বশীপারা দাবড়ে বেড়াচ্ছে-. . . আর এখন লিটারিলি 'ভোজনং যত্রতত্র . . .; শয়নংহট্ট মন্দিরে' . . . এখন বীবী আসবেন হেথায়! তদুপরি ১০৪-এর গেণ্ডেরী খেলছি নিত্যি নিত্যি . . . কালবোশেখী আসে ধুলোয় ধুলোময়।" বিরূপ পারিপার্শ্বিকতা, প্রকৃতির অসহিষ্ণু আচরণ, তদুপরি সরকারী শত্রুতা—"ভারত সরকার আমার পিছনে একটি . . . লম্পট রমণী লাগিয়েছেন—সে আকছারই সাঁঝের ঝোঁকে আমার দিকে বার কয়েক চোখ মেরে আঁধারে মিলিয়ে যায়—আমি State Electricity Board-এর বিজলি বাতির ছেনালির কথা বলছি। কতবার যে রাত তেরোটায় পাখা বন্ধ করে দিয়ে বাকি রাত জাগিয়ে রাখে—তার ব্যত্যয়টার হিসেব রাখা ঢের সোজা!" (প-১৪২)

প্রবাসজীবনে মুজতবার ছোট্ট সংসারে স্থায়ী সদস্য দু' জন—'মাস্টার' এবং মুজতবা স্বয়ং। অস্থায়ী সদস্যের মধ্যে বাবুর্চি, কাজের অন্য লোক—যারা কখনো আসে কখনো যায়। বর্ষণমুখর রাতে আপন সংসারের বর্ণনায় আলী সাহেব লিখেছেন, "আমার অবস্থা ফুল্লরার মত। একখানা ছোট ঘরে বাস। বাথরুমের প্রয়োজনীয় জিনিস, ডাইনিং টেবিল ও তার উপরকার ছুরিকাঁটা, বোতল শিশি সব হয়ে যায় একাকার বৃষ্টির ছাঁটে।....

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমঝিম বাদর বরিষে
পালঙ্কে শয়ন রঙে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিদ্রা যাই মনের হরিষে।

কিন্তু ঐ যে দুটি টুথ পাউডারের কৌটো আর কাসুন্দী আচারের বোতল— ওদের জন্য দুর্ভাবনা। রিমঝিম উপভোগ করার মত শান্ত আরাম কোথায়।”[৪৬]

পত্রে সিলেটের বন্ধুর প্রতি অনুরোধ :

"Please remember me to all, which may be pain in the neck for them."(প-১৪৫)

রন্ধনশাস্ত্রে মুজতবা আলীর অসাধারণ নৈপুণ্যের সংবাদ সর্বজন বিদিত। চিঠিপত্রের মাধ্যমেও নানাবিধ পাক-প্রণালীর তথ্য পরিবেশনে তিনি ছিলেন তৎপর। 'অবধূত' তাঁর 'গুরুজী' সৈয়দ মুজতবা আলীকে 'দশাসই' কিছু কই মাছ ভেট্ পাঠিয়েছিলেন। কারণ 'জ্যান্ত কই খায় না বলেই দেশের লোকগুলো হুশ হুশ করে মরে যাচ্ছে।' কৃতজ্ঞ আলী সাহেব কই মাছের একটি গুহ্য 'নুস্খা' বা পাক-প্রণালী 'তাঁর মুমূর্ষু চেলা' অবধূতের নিকট ফাঁস করে দেন। মুজতবা আলী রচনাবলীতে এই অপূর্ব রসনালোভন বস্তুটির স্থান হয়নি বলে আমরা কথঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তাকারে তা' উদ্ধৃত করছি।

“এর ফরাসী নাম “হাতী আলা (a la) কই”।

পাঁচটা কিংবা সাতটা প্রমাণ সাইজের হাতী নেবেন... ও সাতটি পাতি কই নেবেন। প্রমাণ সাইজের হাঁড়িতে ভেজাল দালদা ঠাণ্ডা অবস্থায় আগুনে চাপাবেন। দেখবেন যেন দালদা না গলে। তারপর একটি কই, তার উপর একটি হাতী ফের একটা কই, ফের একটা হাতী চাপিয়ে যাবেন। হাতীগুলো আগে নরম হয়ে যাবে, তাই সাবধান যেন কইগুলোও সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়। নইলে সর্বস্ব বরবাদ হয়ে যাবে। সর্বশেষ হাতীটি নারকোল কোরার মত করে উপরে ছড়িয়ে দেবেন। গরম মশলা তিন কাচ্চা, নুন দিলে দিতে পারেন না দিলে নেই। হাতীর ল্যাজগুলো আলাদা করে ব্যাসন দিয়ে মাখিয়ে সক্কলের উপরে সাজাবেন, সঙ্গে কই মাছের জিভগুলো (এগুলো Ox tongue এর মত অতি সুস্বাদু)। আগের রাত্রে রান্না করে পরের দিন বাসি serve করবেন।

... আপনার পাঠানো কই না পাওয়া পর্যন্ত আমি কইয়ের বদলে পাঁপড় ব্যবহার করেছি। তখন তার নাম লেলেফাঁ aux পাপ্পডম্ (L' elephant aux pappadam.)

এটা খানদানী ভোজন। অতএব সকালে সের দুই মুড়ি খাওয়ার পর লাঞ্চে এই হাতী-কই খাবেন।”[৪৭]

০৫.

সাধ ও সাধ্যের সামঞ্জস্য মুজতবা আলীর জীবনে কখনো ঘটেনি—যেমন ঘটেনি মাইকেল মধুসূদন এবং কাজী নজরুলেরও জীবনে। বাঙলা সাহিত্যের এই ত্রয়ী চরিত্রে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। মাইকেল ও মুজতবার পাণ্ডিত্য এবং অধ্যয়নের ব্যাপ্তি ও মননের গভীরতা অতুলনীয়; পানাসক্তিতে দু' জনেই সমান মল্ল। মজলিশে কাজী ও সৈয়দ সমগোত্রীয়। বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদন নব-ভগীরথ। ভাব-ভাষা-শব্দচয়নে নজরুল বাঙলা কাব্যের নোতুন নকীব। বাঙলা গদ্যে মুজতবা নবযুগের সিপাহ্‌সালার। মাইকেল-মুজতবা-নজরুল—তিন জনই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালির হৃদকমলে সশ্রদ্ধ স্থান পেয়েছেন। মুজতবা-নজরুল দু' জনই কোরান-পুরাণ হাতে অবতীর্ণ বিংশ শতব্দীর 'সত্যপীর'। মাইকেলের রামায়ণ

কাহিনী স্বাধীনতা প্রত্যাশী সংগ্রামী চেতনায় সম্বুদ্ধ যুগোপযোগী নব রূপায়ণ, আবার তিনি প্রতিবেশীর কারবালা-কাহিনীতে নিয়তির অপ্রতিরোধ্য শক্তির নিকট লাঞ্ছিত মানবাত্মার হাহাকারে উত্তম মহাকাব্যের সম্ভাবনাময় বীজ আবিষ্কার করে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। পোষাক-পরিচ্ছদে মুজতবা-মধুসূদন দু' জনেই Prince-like. তিন জনেই উপার্জন করেছেন প্রচুর, ব্যয় করেছেন দেদার। ফলে অনটন-হতাশা-দুর্ভাগ্যের নিকট তিন জনই হত-লাঞ্ছিত। নজরুলের অট্টহাস্যরোলের হুঙ্কারে দুর্দৈব হয়তো কিয়ৎক্ষণ থমকে দাঁড়িয়েছে। মাইকেল-মুজতবা নিয়তির অলঙ্ঘনীয় দাপটের সম্মুখে কখনো কখনো বিমূঢ়—দুই 'বাঙাল'-ই মাতৃভাষার জন্যে করেছেন আমৃত্যু সংগ্রাম।

সৈয়দ মুজতবা আলী বিবেক সমুন্নত রেখে মর্যাদাবান মানুষের মতো বেঁচে থাকতে চেয়েছেন। সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করেননি। চাকুরি এবং লিখে উপার্জন করলেও 'প্রতিভার জ্বালা', তাকে স্বস্থ হতে দেয়নি। গোলামীর শৃঙ্খল উম্মোচন করেছেন—প্রতারকের ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষা কারতে পারেন নি। রুজি-রোজগারের ভাবনা তাঁর সৃজনী প্রতিভাকে বারবার ব্যাহত করেছে। '৫৭ সনে এক শুভানুধ্যায়ীকে লিখছেন, "... ৫৩ বছর বয়স হ'ল অথচ দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতে এখনো শিখলুম না। গয়লার বুদ্ধি আশীতে। সৈয়দদের বুদ্ধি কততে জানেন! আপনার অভিধানে সৈয়দ শব্দ থাকলে, অর্থে লিখবেন, 'বুদ্ধি আশীর পরে।' " (প-২৩৭)। বিষয়বুদ্ধি-বর্জিত মুজতবা 'earned like a prince and spent like a prince.'পকেটে যতক্ষণ রেস্ত আছে ততক্ষণ তিনি বেপরোয়া এবং ব্যয়ে অকুণ্ঠ। প্রধানত লেখনীই ছিল উপার্জনের উৎস এবং কোনো কোনো প্রকাশক তাঁকে যথেষ্ট বিব্রত করেছেন। শ্রীযুক্ত কানাইলাল সরকারের অনুরোধে 'দেশে-বিদেশে' মুদ্রণের অনুমতি একটি বিশেষ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে দিয়েছিলেন। "প্রথম সংস্করণে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইটির জন্য তাঁকে মাত্র কয়েকশ' টাকা দে'য়া হয়।" (সা-২৭)। একে তো আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য, তদুপরি অর্থগৃধ্নু প্রকাশকদের অসাধুতায় বিক্ষুব্ধ মুজতবা আলী ১৯৫৭-এর এপ্রিলে জনৈক প্রকাশককে লিখছেন :

"প্রিয় জানকীবাবু,

... আমারও দিন ঘনিয়ে এলো 'সাহিত্যকার' হিসেবে। শেষের দিন কটা হাসপাতালে না পাগলাগারদে কাটবে তাই নিয়ে মাঝে মাঝে চিন্তা করি। তার পূর্বে ভিক্ষাভাণ্ড নিয়ে দোরে দোরে হানা।...

৩০ এ মার্চ কলকাতায় ছিলুম। তৎপূর্বে সেই মর্মে আপনাকে একখানা Card ছেড়েছিলুম। আপনাদের সন্ধান পাইনি। গা-ঢাকা দিয়েছিলেন নাকি ? কই, আমি তো কখনো বস্তা-পচা পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য আপনাদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলিনি!...

ভরসা তো দিয়েছেন অনেক বার, 'লিখে যান, টাকার অভাব হবে না।' হায় সেই ভরসা কবে পাবো, 'লিখবেন না, টাকার অভাব হবে না।' আমার যদি টাকা থাকতো তবে বহু সাহিত্যিককে (ও নিজেকেও) ঐ কথাই বলতুম।" (প-২৮)।

এঁদের অসাধুতা এবং দুর্ব্যবহারে তিক্তবিরক্ত আলী সাহেব শংকরকে বলেছিলেন, "আমি ভাবছি, আমার উইলে লিখে যাবো যে আমার মৃত্যুর পর আমার রোজগারের টাকায় একটা ট্রাস্ট তৈরি হবে। সেই ট্রাস্টের একমাত্র কাজ হবে অসাধু প্রকাশকদের বিরুদ্ধে তরুণ অসহায় লেখকদের পক্ষে মামলা করা।" [৪৮]

বিত্তের প্রাচুর্য না থাকলেও মুজতবার বিবাহ-পূর্বকালে অনটন তেমন প্রকট ছিলো না। অর্থাভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যয়ও বেড়েছে এবং এক সময় তা চরমে পৌঁছে মুজতবার জীবন বিষময় করে তোলে। ২৬শে এপ্রিল, ১৯৬৭ সনের একটি পত্রাংশ :

"... I do not remember to have been in such want of money during the last thirty years.

... ওদিকে পাবলিশারদের (পাবলিশালাদের বলতে ইচ্ছে করছে) কাছ থেকে কবে টাকা পাবো জানিনে।

অর্থাভাবে আমি সত্যি দিশেহারা।" (প-৫০)।

বন্ধু-পুত্র বিমল মুখোপাধ্যায় (বড়দা) হিসাবপত্র সম্পর্কে আলী সাহেবের পক্ষে প্রকাশকদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে সোমেন চট্টোপাধ্যায়কে মুজতবা আলীর অনুরোধ :

"He (Badda) proposes to do some WORK with the sharks, otherwise known as publishers.

... Please explain as much as you can of the accounts with the sharks." (প-৫৪)

একটি পত্র থেকে জানা যাচ্ছে 'ত্রিবেণী প্রকাশনী'র পক্ষ থেকে শ্রীনির্মলকুমার গোস্বামী এবং সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাক্ষরিত পাঁচশত টাকার একটি 'চেক' আলী সাহেবকে পাঠানো হয়। কিন্তু বিস্তারিত হিসাবপত্র তাঁকে জানানো হয়নি। এ' প্রসঙ্গে ১০ই মে, ৬৭ সনে সোমেনবাবুর উদ্দেশে পত্র :

"(ত্রিবেণীর) কানাইকে শেষ পর্যন্ত ধরতে না পারলে, ... নির্মলকুমার গোস্বামীকে ... ধরবে। ... ইনিই এবারে চেক সই করেছেন। এঁকে বলবে, 'আপনিই তো চেক সই করেছেন, অতএব আপনি যদি আদেশ দেন, তবে আপনার accountant (naturally of ত্রিবেণী) আমাকে statement-টা দেবে।' তৃতীয় শরীক সুশীল ব্যানার্জী। আহা, কী কোম্পানী! একজন 'সুশীল', অন্যজন 'নির্মল'—সার্থক নাম। কানাই অবশ্য ননীর সঙ্গে বেআইনিভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন।"—পরের বাক্যটিতে আলী সাহেবের ক্রোধ ঘৃণা চরমে পৌঁছেছে :

"আমার প্রকাশকমণ্ডলী সকলেই বোধ হয় খুব খুশী হন আমি যদি পাকিস্তান চলে যাই, এবং ফিরে না আসি!" (প-৫২)।

মানসিক অবসাদও ধীরে ধীরে তাঁকে গ্রাস করতে থাকে। লেখাও কমে আসে—"idea-র অভাবে নয়—energy নেই। যে একরত্তি আছে সেটা খর্চা হয় সুবোশাম আহার নিদ্রা-আশ্রয়ের-চিন্তায়।" (প-১৪২)। এ' চিন্তা আলী সাহেবের বহু পুরনো উপসর্গ। 'সংসার' বলতে সচরাচর যা' বোঝায় তার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হলেও নির্ঝঞ্ঝাট ছিলেন না। মধ্যরাতই ছিলো তাঁর লেখার প্রশস্ততম সময়। তা-ও নিয়ম-মাফিক হয়ে ওঠে না। ১৯৬০-এ শান্তিনিকেতন থেকে লিখিত পত্রের অংশ বিশেষ :

"... রাত বারোটায় আমার জাগ্রত হওয়ার কথা—কিন্তু আজ বড় ক্লান্ত বোধ করছি। আমার কুকুরটার সর্বাঙ্গে ভীষণ পোকা হয়েছে, কোনো ওষুধই মানছে না। চাকরটা আমার ২মাস অনুপস্থিতিতে কুসঙ্গে মিশে একেবারে গোল্লায় গেছে। ভিটকিলিমির হদ্দ ছাড়িয়ে গেল। বড় কষ্টে আছি। বৃদ্ধ হয়েছি।" (প-৭৯)।

চতুর্দিকে কিছু চেলাচামুণ্ডাও জুটেছিল—যারা সময়ে-অসময়ে মুজতবাকে দোহন করার চেষ্টা করেছে। এদের ওপর নানা ব্যাপারে তিনি অনেক সময় নির্ভরও করতেন এবং এ' দুর্বলতার সুযোগ অনেকেই নিয়েছেন। কখনো অসহায় মুজতবা আক্রোশে ফেটে পড়তেন। কিন্তু সক্রিয় প্রচেষ্টায় রাহুমুক্ত হতে পারেননি। '৬৭-তে অতিষ্ঠ মুজতবা তাঁর এক আস্থাভাজনকে লিখতে বাধ্য হন :

"I REALLY WANT TO GET OUT OF THIS GHANTU AND MEJDA CIRCLE. MEJDA IS THE EVIL GENIUS OF GHANTU. ... What stuck me to him (Ghantu) is the fact that his father was a friend of mine who had the deepest affection for me. So also the same with Mejda. But it is time that I abondon him and his Chela." (প-৫৩)।

একটা দুঃখবোধ মুজতবা আলীকে অনবরত তাড়া করেছে। সদাপ্রফুল্ল আনন্দময় পুরুষটির অন্তস্তলে একটা কল্পনাপ্রবণ কবিহৃদয়, রসিক পুরুষ আত্মগোপন করেছিলো। বিভিন্ন পরিবেশে বিচিত্ররূপে তা' প্রকাশমান। জীবন যেন এই জীবনময় পুরুষকে আর আকর্ষণ করতে পারে না— "তাই আমি (মুজতবা) সদ্য পুরনো দিনের স্মরণ করা ভিন্ন অন্য কোনোও আনন্দ পাইনে। বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কিছুই দেখি না, মন ভিতরের দিকে চলে যায়, আর বেলা কাটে আকাশ-কুসুম চয়নে।... আনন্দের কোনো নূতন অভিজ্ঞতা হয় না, অথচ, দৈনন্দিন জীবনের আঘাত-বেদনা তো আছেই। স্মৃতি ঝাপসা হয়েছে। মনের ভিতরকার পুরনো ফটোগ্রাফ প্রতিদিন অস্পষ্টতর হয়ে যাচ্ছে; জোর করে দেখতে গিয়ে চোখ পীড়িত হয় জল ফেলে।" (প-১১৩)।

দুঃখবোধজাত মৃত্যুচিন্তা বারবার মুজতবামানসে ছায়া বিস্তার করেছে। যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিক্ষণ থেকেই যেন তিনি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মধ্যে মধ্যে অনাসক্তি বা বৈরাগ্যও তাঁর চিন্তা-ভাবনায় স্থান পেয়েছে। মুজতবা আলী ১৯৭০-এ জার্মানি ভ্রমণের সময় একটি বাক্‌স ফেলে আসেন। তাতে বই ও মূল্যবান কাগজপত্র ছিলো। এটি উদ্ধারের জন্যে খুব চেষ্টা করা হয়। এ' প্রসঙ্গে শ্রীদ্বারিক মিত্রকে ৯/১০ জানুয়ারি, '৭১-এর পত্র :

"I shall be happy like a pig ... no,... no ... happy like two pigs in the mud if the box could be removed ... এবং পরের স্তবকেই বলছেন,- "Even if the box does not come back to me at all I do not mind much. After all I have not got many more years to live & shan't miss the books in it for long." (প-১৩০) একই বক্তব্য বছর চারেক পূর্বে ৮ ই নভেম্বর, ১৯৬৬ সনে বন্ধু সয়ফুল আলম খানের উদ্দেশে লেখা পত্রেও দ্রষ্টব্য :

"মৃত্যু আসন্ন। কোনো জিনিস কিনতে গেলেই ভাবি, আর ক'দিনই বাঁচবো, কি দরকার ? বিশেষ করে অভিধান, বিশ্বকোষ বা রেফারেন্‌স্ বুক—যেগুলো মানুষের বহু বৎসর ধরে কাজে লাগে।" (প-১৩৮)

জনপ্রিয়তম লেখক—খ্যাতির প্রায় মধ্যগগনেও—অর্থ সংকটে কতোটা পর্যুদস্ত হতে পারেন, সৈয়দ মুজতবা আলীকে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা যায়। অবশ্য এ-জন্যে তাঁর আপনসৃষ্ট অবদানও প্রচুর। বোলপুরে অবস্থানকালে শ্রীঅনিলকুমার দাস তাঁকে পিতৃতুল্য সেবাযত্ন করেছেন এবং আলী সাহেবও সকৃতজ্ঞচিত্তে বারংবার তা' স্মরণে এনেছেন। সামান্যতম জিনিসের জন্যেও তিনি অনিলবাবুকে নির্দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে চিরকুট পাঠাতেন। যথা,—

ক. ৬ই অক্টোবর, '৬৭-র সন্ধ্যায় লিখেছেন :

"Geriatone ওষুধটা আমার এখনই চাই। দাম ১১ টাকার মত। তুমি দামটা দিও।" (প-২৭০)।

খ. ৩১শে অক্টোবর, '৬৭ :

"১)... এক প্যাকেট বিস্কুট ... চাই। ইলিয়াসকে direction ও অনুমানিক দু-টাকা দিয়ো। সে বাজার থেকে কিনে নেবে।...

৪) একটা Vim powder চাই।

৫) একটা বাজার করার সস্তা থলেও। ...

৭) এক কিলো চাউল।" (প-২৬৩)।

গ. ৫ই নভেম্বর, '৬৭ :

"আমার জন্য টিনের নারকোল তেল তুমি কিনে দিও। একদম খতম।" (প-২৭১)।

ঘ. ১৩ ই নভেম্বর, '৬৭, সকাল দশটা :

"একটা জলটানার দড়ির অভাবে সত্যই ইলিয়াস মিঞার প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে।" (প-২৭২)

উল্লিখিত চিরকুটগুলো শুধু দৈন্যেরই উলঙ্গ প্রকাশ নয়, ব্যক্তি মুজতবার বিশেষ দিকের পরিচয়ও এতে সুস্পষ্ট। কি নিদারুণ অভাব-অনটন অগ্রাহ্য করে, পরমানন্দে মজলিশ জমিয়েছেন, দরাজ হস্তে অতিথি আপ্যায়ন করে সর্বজনসমক্ষে সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছেন। হাসির অবগুণ্ঠনে শোণিতাক্ত হৃদয়কে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে, অপমান কিংবা বঞ্চনার জন্যে কারো বিরুদ্ধে ফরিয়াদ না জানিয়ে নিজে নিজেই দগ্ধ হয়েছেন। শেষ পরিণতিটা মাইকেলের বড় কাছাকাছি। বহুজন পরিবৃত হয়ে আনন্দ সরোবরে কাটালেও শ্রীযুক্ত লীলা মজুমদারের মতো আমাদের মনেও প্রশ্ন জাগে, 'বন্ধুবান্ধব তাঁর অনেক, কিন্তু অন্তরঙ্গ কজন ছিল ?' অবশ্য বহু হৃদয়ের উষ্ণ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা যে তাঁর জন্যে ছিলো তাও স্বীকার্য। শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দাস একটি তথ্য জানিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী/সম্পাদক প্রয়াত অশোককুমার সরকার সৈয়দ মুজতবা আলীকে এককালীন ছয় হাজার টাকা প্রদান করেন তাঁরই মারফতে। দাতার নাম গোপন রেখে অতি কৌশলে টাকাটা আলী সাহেবকে দে'য়া হয়। শ্রীযুক্ত সরকারের অভিপ্রায়ও তাই ছিলো। কেননা 'দান'-এর কথা প্রকাশ পেলে আলী সাহেব কখনো যে সে অর্থ স্পর্শ করতেন না, সে- সম্বন্ধে স্বয়ং দাতার মনেও কোন রকম সংশয় ছিলো না। (সা-৫৬) আলী সাহেবের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন, দোষেগুণে বিভূষিত এই অত্যাশ্চর্য আকর্ষণীয় মানুষটিকে তাঁরা সহজে বিস্মৃত হতে পারেননি। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন গুজরাটী ছাত্রী শ্রীমতী সুশীলা আয়ার বোম্বাই স্টেশনে এসে কোলকাতা-যাত্রীর কাছে এক বোতল আচার গছিয়ে দেন—সবিনয় অনুরোধ—যেন 'সৈয়দদাকে' সেটা পৌঁছে দেন। (সা-২৬)। মনেপ্রাণে এমনকি ধনেও যখন একান্ত রিক্ত, অসাড় ডান হাত ও আঙুলের দিকে তাকিয়ে নৈরাশ্যের অন্তহীন দিকচক্রবালে আশালতার ব্যর্থ সন্ধানে পাণ্ডুবিবর্ণ, তখন তাঁর স্নেহভাজন এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দৌহিত্রের আগমনে আলী সাহেবের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে 'যেন আকাঙ্ক্ষিত পরমাত্মীয়-বন্ধুর দর্শন পেলেন।' (সা-২৬)।

ঈশ্বরে বিশ্বাসী মুজতবা লিখেছেন, "ভগবান দয়াময়। তিনি সব কিছুই দেন; কিন্তু তার 'টাইমিং'টা বড্ডই খারাপ। বৃদ্ধকে দেন তরুণী ভার্যা এবং হোটেলে যাবার পয়সা।"[৪৯] দয়াময় তাঁকে সবই দিয়েছিলেন, কিছুটা সংযমের উপাদান দিলে 'ভক্তটির' জীবন সুন্দর ও অধিক ফলপ্রসূ হতো। তিনি স্বয়ং স্বীয় মেধা ও প্রতিভা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কিন্তু ভাগ্য ফেরাতে পারলেন না। মুজতবা লিখেছেন— "যার অদৃষ্টে অর্থ নেই তার কপালে স্বয়ং মা-লক্ষ্মী ঠাকুরানীও ফোঁটা আঁকতে এলে সে তখন যায় নদী তীরে, কপাল ধুতে।"[৫০]— লক্ষ্মীর সঙ্গে মুজতবা আলীর সবসময়ই পথে কাটাকাটি হয়েছে। ফলে 'অক্ষত কপাল' অপরিবর্তিতই থেকেছে।

০৬.

পরিচিত মহলে সৈয়দ মুজতবা আলীর 'স্মৃতিশক্তি' সম্পর্কে ধারণা প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছেছিলো। এবং তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বহু ঘটনা অন্তরঙ্গজনদের স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে। আলী সাহেব নিজেকে পরিবারের 'ব্ল্যাকশিপ' বা 'কালাম্যাড়া' হিসেবে নির্দেশ করে আহ্লাদিত হতেন। কিন্তু আপন স্মৃতিশক্তির প্রামাণিকতা অতিশয় মুন্‌শিয়ানার সঙ্গে বড় মোলায়েম ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

"আমার মা বলতো, আমাকে দেখলে যতটা বোকা বলে মনে হয়, আমি ততটা বোকা নই; আর বড়দা বলতো, আমাকে দেখলে যতটা বুদ্ধিমান বলে মনে হয়, আমি ততটা বুদ্ধিমান নই। কোন্‌টা ঠিক জানিনে, তবে আমার স্মৃতিশক্তিটি ভালো সে কথাটা উভয়েই স্বীকার করতেন।"[৫১] স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিশক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। গুরুদেব তখন বিশ্বভারতীতে পড়াতেন। "একদিন তাঁর একটি রচনা সংশোধন করতে গিয়ে কবি বললেন, 'সৈয়দ এটা কি লিখেছিস ?' মুজতবা আলী সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ মিনিট রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ হুবহু গড় গড় করে বলে গেলেন।... (কবিগুরুর) বিস্ময় কাটতে বললেন, 'কিরে আমি তো জানি লোকে কবিতা মুখস্থ করে। তুই কি গদ্যও মুখস্থ করিস ?" (সা-৩৩)।

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী প্রফুল্ল সরকারের শ্রাদ্ধবাসরে সৈয়দ মুজতবা আলীও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং সাংবাদিক উক্ত অনুষ্ঠানে মুজতবার উপস্থিতিতে প্রসন্ন হননি।— "এক সময় তিনি সম্ভবতঃ নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই উপস্থিত সাংবাদিক ও অন্যান্যদের সম্মুখে গীতা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। এক সময় সৈয়দদা সবিনয় তাঁর কিছু ভুলভ্রান্তি নির্দেশ করলেন। শুধু তাই নয়, সুললিত কণ্ঠে স্মৃতি থেকে গীতার বিভিন্ন শ্লোক আবৃত্তি করে এবং তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সকলকে বিস্মিত করেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে সৈয়দদা স্বীকার করেন, সম্পূর্ণ গীতা তাঁর কণ্ঠস্থ...।" (সা-২৭) শুধু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য নয়, আলাপচারী তথা মজলিশ যখন জমিয়ে বসতেন তখন প্রসঙ্গানুযায়ী অবলীলায় সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষা এবং বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করতেন। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতী লীলা মুখোপাধ্যয়, সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং শংকরও আলী সাহেবের এই অলৌকিক কৃতিত্ব সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন।

জীবনের অন্তিম লগ্নে তাঁর এই ক্ষমতা কিছুটা ঝাপসা হয়ে আসছিলো। এবং এটা উপলব্ধি করে মুজতবা আলীও কখনো কখনো বিচলিত বোধ করতেন।

স্মৃতিচারণে শংকর স্মরণ করেছেন :

"শেষ যেবার আমার সঙ্গে দেখা হয়, তখন হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে আলী সায়েব বললেন, "শংকর, মনে হচ্ছে স্মৃতি লোপ পাচ্ছে। তুমি একবার সঞ্চয়িতা ধরো তো—ব্যাপারটা একটু খুঁটিয়ে দেখি।" ওঁর ক্লান্ত মলিন মুখে হঠাৎ হাজার ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠলো। বললেন, "ওমুখ পাতা খোলো তো।" ... "কর্ণকুন্তি সংবাদ ওই পাতায় রয়েছে তো ?" ... তারপর শুরু করলেন আবৃত্তি। কোথাও একবার থামলেন না, একটু ভুলও করলেন না।" ৫২

আড্ডা এবং মুজতবা সমার্থক। বিচিত্র বিষয়ে বিচিত্রতর গল্প এবং সরস কথকতার যোগান দিয়ে মজলিশ সর্বক্ষণ সরগরম রাখার সামর্থ্য ও মেজাজমর্জি দুটোই ছিল আলী সাহেবের অনুকূলে। এবং এই দুর্লভ গুণটি প্রথম কৈশোরেই তিনি অর্জন করেছিলেন। আলী সাহেবের স্বীকারোক্তি :

" ... আমি পনরো বছর বয়সে সিলেটের যাবতীয় slang শিখে ঘটি দেশে আসি। তারপর বছর দুই শ্যামবাজারের 'রক-ক্লাবে' বকাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে বিস্তর আড্ডা মারি। আমি নিজে বিশ্ববকাটে এবং একটি 'তুখোড় ইয়ার' ...।

আমার এই ইয়ার্কিপনা কখনো যায় নি। প্যারিস, ভিয়েনা, বার্লিন, লন্ডন এবং প্রাগে এই কর্মটি আরও মনোযোগ সহকারে করি। আমার জীবনের নীতি,—বই পড়বে গুণীদের, আর মিশবে অজ্ঞদের সঙ্গে। গুণীদের সঙ্গে মিশে আর লাভ কি? তাঁদের যা বলার তা তো তাঁদের কেতাবেই রয়েছে। বরঞ্চ তাঁরা often very disappointing. পক্ষান্তরে 'অজ্ঞদের' কোনো pretention নেই। তাই পদে পদে তারা চমক লাগাতে জানে। তাই ইয়োরোপের বহু শহরে আমি সর্বদাই দিন কাটিয়েছি লাইব্রেরিতে, রাতটা 'পাবে'—'পাবে'—তাড়িখানায়। sutting jokes-র আমার যা 'সঞ্চয়িতা' ... সেটি-কি আর বলবো, দম্ভ করতে নেই, মুর্শীদের মানা।" (প-২৩৩)।

সৈয়দ মুজতবা আলী যখন কথা বলতেন কিংবা মজলিশ জমাতেন তখন তিনি কথার মালা-ই গেঁথে যেতেন—স্থান-কাল-পাত্র প্রায় ক্ষেত্রেই বিবেচনায় স্থান পেতো না। ফলে কখনো কখনো অস্বস্তিকর পরিবেশ এবং ভুল বোঝাবুঝির যথেষ্ট অবকাশ সৃষ্টি হতো। বিশেষতঃ যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মুজতবাকে জানতেন না, তাঁদের পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়া ছিলো সহজতর। শেষের দিকে আলী সাহেব পরিচিতির গণ্ডী আর বাড়াতে চাননি। অবশ্য একবার সামান্য বাধাটুকু অতিক্রম করে তাঁর সম্মুখীন হতে পারলে মুজতবার হৃদয়ের উষ্ণ পরশ লাভ কষ্টসাধ্য হতো না। কেননা বাকী বাধাটুকু অতিক্রমণের দায়িত্ব তিনিই পালন করতেন।

ডঃ প্রীতীশ দত্ত সমকালীন পাঁচজন মজলিশী বাঙালীর উল্লেখ করেছেন—তুলসী গোস্বামী, শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, অপূর্ব চন্দ, ধূর্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুজতবা আলী।

এই অসাধারণ পণ্ডিত ও বাক্‌শিল্পী সম্পর্কে ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য স্বল্প কথায় যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন একটি পত্রে। 'অন্ত্যানুপ্রাস' সম্বন্ধে ডঃ ভট্টাচার্যের সুলিখিত প্রবন্ধ সম্পর্কে কৌতূহলী মুজতবার লেখা পত্রের উল্লেখ করেছি। এ' প্রসঙ্গে

'কথাসাহিত্য'-এর সম্পাদক মহোদয়কে লেখা ডঃ ভট্টাচার্যের পত্র:

"ডাঃ আলির পোস্টকার্ডটি পাইবার পরই আমাকে শান্তিনিকেতন যাইতে হয়। সেখানে তাহার সহিত দেখা করিয়া এই প্রসঙ্গে আলোচনা করি। ...

আলোচনা করি বলাটা ভুল হইল। প্রায় তিন ঘণ্টা বসিয়া নানা বিষয়ে তাঁহার কথা শুনিলাম। তাহার মধ্যে অন্ত্যমিলের প্রসঙ্গও ছিল।

ডাঃ আলির সহিত কি কথা হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট আমি দিতে পারিব না অর্থাৎ রিপোর্ট দিতে গেলে ঐ কথাকোবিদ পণ্ডিতটির প্রতি অবিচার করা হইবে। যে বাক্য একাধারে "হিতং মনোহারি চ", যাহাতে বস্তু আছে অথচ ভার বুঝা যায় না, তেমন বাক্য মুখান্তরিত করা কঠিন। করিলে হয় তাহার বস্তু মূল্য কমে, নয়তো অত্যন্ত গুরুভার হইয়া উঠে।"[৫৩] ডঃ আলী সম্পর্কে পত্রলেখকের প্রতিটি মন্তব্য যথাযথ এবং শব্দাবলী সুপ্রযুক্ত।

মজলিশের মধ্যমণি মুজতবা আলী মন খুলে অনর্গল কথা বলতেন। "... ওঁর সুন্দর ফুটফুটে চেহারা, মোলায়েম ও প্রশস্ত টাক, গরদের পাঞ্জাবী, উজ্জ্বল মুখশ্রী এবং সরস বাগবৈদগ্ধ্য'—এমন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের 'প্রতি আকৃষ্ট হতে লোকের এক লহমাও লাগে না।"[৫৪] পাণ্ডিত্য এবং রসবোধের সমন্বয়ে সৃষ্ট তাঁর বাগভঙ্গীর ইন্দ্রজালে বিমুগ্ধ শ্রোতার পক্ষে মোহপাশমুক্ত হওয়া ছিলো সুকঠিন ব্যাপার। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে উত্তরণের অনন্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সঙ্গীত, রাজনীতি, ইতিহাস, কলাশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব মায় যৌনতত্ত্ব—কোন্ তত্ত্ব, কোন্ বিষয় তাঁর অনধিত ছিলো ? আর বর্ণনভঙ্গী ? এক বাক্যে—অনন্যসাধারণ। সজনীকান্ত দাসের মতো ব্যক্তিও যখন প্রাতঃভ্রমণে মুজতবার মুখোমুখি হয়ে দ্বিপ্রাহরিক আহারনিদ্রার কথা বেমালুম বিস্মৃত হয়ে 'সন্ধ্যাপ্রদীপ' সন্দর্শনে সম্বিতে আসেন—যার অর্ধাংশ অতিবাহিত হয়েছে বিশ্বের তাবৎ পানীয় সংক্রান্ত আলোচনায়—সেই আশ্চর্য 'কথকঠাকুর' প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত দাস সশ্রদ্ধায় স্বীকার করতে বাধ্য হন, "আগে মুজতবা আলীর কথাবার্তা শুনিয়া মনে করিতাম যে তাহার মধ্যে গভীরতা নাই। কিন্তু আমাদের মতো তিনটি প্রাণীকে প্রায় ঘণ্টাদশেক যাবৎ যে তন্ময় করিয়া রাখিতে পারেন তাঁহার মধ্যে গভীরতা নাই এ কথা কি করিয়া বলি।"[৫৫]

কাইরোর আড্ডায় ফর্শী হুঁকো থেকে তামাকের যে 'খুশবাই' পেয়েছিলেন তার রেশ টেনে হয়তো শুরু করলেন তামাকের ইতিবৃত্ত।

"... সুগন্ধী ইজিপশিয়ান সিগারেট ভুবনবিখ্যাত। ... এই সিগারেট বানানোর পিছনে বিস্তর ইতিহাস, এন্তার রাজনীতি এবং দেদার রসায়নশাস্ত্র লুক্কায়িত রয়েছে।

সিগারেটের জন্য ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোন এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে পারে। ভারতবর্ষ প্রধানত ভার্জিনিয়া খায়, কিছুটা গ্রীক কিন্তু এই গ্রীক তামাক এদেশে টার্কিশ এবং ইজিপশিয়ান নামে প্রচলিত। তার কারণ একদা গ্রীসের উপর আধিপত্য করতো তুর্কী এবং তুর্কী গ্রীসের বেবাক তামাক ইস্তাম্বুলে নিয়ে এসে কাগজে পেঁচিয়ে সিগারেট বানাত। মিশরও তখন তুর্কীর কব্জাতে, তাই তুর্কীর কর্তারা কিছুটা তামাক মিশরে পাঠাতেন। মিশরের কারিগররা সেই গ্রীক তামাকের সঙ্গে খাঁটি মিশরের খুশবাই মাখিয়ে দিয়ে যে অনবদ্য রসনলী নির্মাণ করলেন তারই নাম ইজিপশিয়ান সিগারেট।" অতঃপর তামাকের স্বাদ নষ্ট না করে সিগারেটকে 'খুশবাইয়ে মজানোর অতীব কঠিন' কর্মের অতিশয় প্রাঞ্জল বর্ণনা দিয়ে আলোচনার সূত্রটাকে রসলোকের দিকে প্রবাহিত করেন।—"... যখন কোনো

ডাকসাঁইটে তামাক কদরদারের তদারকিতে কাইরোর কাফেতে তামাক সাজা হয় এবং সেই কদরদার যখন সে তামাকের নীলাভ ধূঁয়োটি ফুরফুর করে নাকের ভেতর দিয়ে ছাড়েন এবং নীলনদের মন্দমধুর ঠাণ্ডা হাওয়া যখন সেই ধূঁয়োটির সঙ্গে রসকেলি করে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে কাফের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়, তখন রাস্তার লোক পর্যন্ত উন্নাসিক হয়ে থমকে দাঁড়ায়, পাঁড় সিগারেট খেকো, পাইকারী সিগারেট ফোঁকো পর্যন্ত বুকের উপর হাত রেখে আসমানের দিকে তাকিয়ে 'অল্-হমদুলিল্লা, অল্-হমদুলিল্লা' বলে।" [৫৬]

'তামাকু সমাচারের' সুদীর্ঘ বর্ণনায় উৎফুল্ল ও প্রলুব্ধ শ্রোতা 'অল-হমদুলিল্লা' বলে এই অপূর্ব ধূম্রটির সুবাস পুরোপুরি গ্রহণ করতে না করতেই হয়তো আলী সাহেব 'ইলিশ মাহাত্ম্যের' শুভ সূচনা করে বসেছেন।—বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নদীতে যে মাছ বিচরণ করছে, যে মৎস্যে সওয়ার হয়ে বাদশাহ্ নাম্দার বেহেশ্ত্ পানে ধাবমান 'শহীদী, মর্যাদায়!

"…. আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, বাদশা সালামৎ কি মাছ খেয়ে শহীদ হলেন।

আমার এক সিন্ধী দোস্ত আছেন;…

তিনি বললেন, 'নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, পাল্লা মাছ।"

গঙ্গা উজিয়ে যেটা আসে বা একদা আসতো, সেটা ইলিশ—হিল্সা। নর্মদা উজিয়ে ঐ মাছই যখন আসে তখন ব্রোচের (Broach—ভৃগুকচ্ছ) লোক এটাকে বলে মদার, পার্সীরা বলে বীম্। সিন্ধু উজলেই বলে পাল্লা।

শাহ্-ইন্-শাহ্ বাদশা-সালামৎ মুহম্মদ তুগলুক শাহ ইলিশ চড়ে স্বর্গে গেলেন। স্বর্গে যাবেন না তো কোথায় যাবেন ? ইলিশ খেয়ে যে প্রাণ দেয় সে তো শহীদ—মার্টার! [৫৭]

আলী সাহেবের কথার শেষ নেই—বিষয়ও অফুরান। তুচ্ছ থেকে উচ্চে, উচ্চ থেকে তুচ্ছে ওঠানামায় তাঁকে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হতো না। একটি অপূর্ব সন্ধ্যা শুকতারার মতো জ্বল জ্বল করছে শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারের স্মৃতিতে—যে সন্ধ্যা 'কারো জীবনে বারবার আসে না।'যে-সন্ধ্যা মনোরম হয়ে উঠেছিলো মুজতবা আলীর বাগবৈদগ্ধ্যে, পাণ্ডিত্যের চমকে। উপস্থিত সাহিত্যিক জ্যোতিষ্কদের মধ্যে "তারাশঙ্কর ছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন, বাণী রায় ছিল। মুজতবা আলির মুখে ঐ একদিন ভাষাতত্ত্বের মূল-কথা শুনেছিলাম। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম। বাণী রায় আর থাকতে না পেরে, তেড়িয়া হয়ে বকাবকি করতে শুরু করে দিয়েছিল; 'কেন এসব কথা লিখছেন না ? কেন এমন কথা দেশের লোক শুনতে পাবে না ? শুধু কি রসের কথাই যথেষ্ট হল, এ পরম পাণ্ডিত্যের কথা কেউ জানতেও পারবে না।' "[৫৮]

বিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকে বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। চলতো অনুরোধ-উপরোধের পালা। তাদের একমাত্র দাবী 'সৈয়দদা' যেন তাঁর পাণ্ডিত্যের অন্ততঃ কিছুটা অংশ লিপিবদ্ধ করে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জ্ঞানচর্চার দিগন্ত বিস্তৃত করে যান। প্রত্যুত্তরে তিনি দ্রুত শিরোশ্চালনে মক্ষিকা-বিতাড়ন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন।

"বলতেন প্রবন্ধ লিখব না, প্রবন্ধ বলব। এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা সৈয়দদার। ২৫/৩০ জনের বৈঠকে তাঁর এক নতুন রূপ দেখতে পেতাম। যে-কোন বিষয়ে …. ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথার ফোয়ারা ছুটত তাঁর মুখে। সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ছিল তাঁর ব্যাখ্যা। গল্পের চেয়ে আকর্ষণীয়, কবিতার চেয়ে মধুর। … হাতের ত্রিসীমানায় কোনো বই-কেতাব নেই। আগে থেকে তৈরী হয়ে আসবার প্রশ্নই উঠত না, কারণ কখন যে কি বিষয়বস্তু এসে পড়বে বৈঠকে তার ধারণা ছিল না কারো। শ্রোতাদের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক

অনুরোধ আসত। ...তাঁর জ্ঞানের পরিধি অকল্পনীয়-...বিজ্ঞান...সাহিত্য ...দর্শনশাস্ত্র.... সমাজনীতি, বেদবেদান্ত, গীতা, উপনিষদ, ভবভূতি, কালিদাস, বাল্মীকি, দ্বৈপায়ন, কোরানশরীফ, জার্মান, ফরাসী সাহিত্য, মায় কার্ল মার্কস—বিশ্বচরাচরে এমন কিছু নেই যার উপর সৈয়দদার ভাষ্য শোনা যায়নি। বলার মধ্যে বড়াই নেই, অহং নেই, ঝরনা-ধারার মতই স্বতোৎসারিত ঝরে পড়ত।"[৫৯]

মোহনীয় বক্তব্য বিস্ফারিত নেত্রে শ্রবণকারী বিস্ময়াভিভূত শ্রোতা তাঁকে কতোটুকু অনুসরণ করতে পারেন সেটা একটা প্রশ্ন হলেও মুখ্য কথা নয়। আলী সাহেব হয়তো প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যাত্রা করে দেশ-বিদেশ পরিক্রমা সমাপনান্তে কুরান-পুরাণ-বেদ-উপনিষদ বাইবেল-ত্রিপিটকের প্রতি শ্রোতার গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করে, পানশালায় খানিকক্ষণ বিশ্রামের অবকাশে শব্দতত্ত্বের দুরূহ পথ অক্লেশে অতিক্রম করে সকলের অলক্ষ্যে রন্ধনশালায় আশ্রয় নেন। এমন প্রতিভার অনুসরণ কি সহজ সাধ্য! আর কতো তুচ্ছ জিনিসকেই না তিনি রসের ভুবনে রীতিমতো কৌলীন্যের স্থান করে দিতে পারতেন। বৈদ্যুতিক পাখার বিকৃত আওয়াজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মুজতবা আলী শুরু করলেন, "... যান্ত্রিক আওয়াজের পর্দাবিন্যাস। ট্রেনের হুইসল ও জাহাজ বা স্টিমারের ভোঁর মধ্যে হারমণি-মেলোডির তারতম্য থেকে শুরু করে চলে গেলেন ফেরিওয়ালাদের ডাকে। পূর্ববঙ্গের দুপুরের স্বাভাবিক নির্জনতা ও স্তব্ধতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘুমঘুম আচ্ছন্ন সুরে কীভাবে সেকালে ফেরিওয়ালারা ডাকত, কর্তা গিন্নির দিবানিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটিয়ে পরিবেশের সঙ্গে মেলানো সেই বিচিত্র সুরের ডাক আলী সাহেব শোনালেন। তারপর নানা অঞ্চলের ফেরিওয়ালাদের ডাকের নমুনা দিলেন। শেষে বললেন, আজকাল ফেরিওয়ালারা ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। বেমক্কা চেঁচায় খালি। কোন রসবোধ নেই।"[৬০]

মুজতবা আলীর সাক্ষাৎপ্রার্থী ডাঃ এম. এ. ওয়ালী জানালেন তাঁর কাজ ... Leprosy রোগী নিয়ে। এবং অতঃপর ডাঃ ওয়ালীর ভাষ্য :

... Leprosy শব্দটি শোনামাত্রই তিনি (মুজতবা) ভাষাতত্ত্বে প্রবেশ করলেন এবং আদিম সভ্যতার ইতিহাস টেনে আনলেন। Leprosy শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে উৎপন্ন। গ্রীক ভাষায় শব্দটির মানে ছাল ...গ্রীক থেকে ল্যাটিন সাহিত্যে ঐ শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে এল liber(leaf) অর্থ পত্র, যথা ভূর্জপত্র ... Liber শব্দটির আরবী রূপান্তরিত হলো আব্‌রেজা (কুষ্ঠ)। এই Liber শব্দটি থেকেই দুটি ইংরেজি শব্দের উৎপত্তি যথা: (১) Library, (২) Leprosy।" তিনি বলে চললেন, "বৈজ্ঞানিক মতে এই রোগের উৎপত্তি জীবানুমূলক। মনুসংহিতায় ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ এই রোগটিকে ভগবানের অভিশাপ রূপে উল্লেখ করায় সাধারণ মানুষের ধারণা কুষ্ঠরোগী নিশ্চয়ই পাপাচারী। যদিও বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে পাপকে ঘৃণা করো কিন্তু পাপীকে নয়। কিন্তু ধর্মের কথা কে শোনে? মানুষ মানুষকে জব্দ করতে পারলেই খুশী।"[৬১] তারপর হয়তো তিনি ধর্মের সারালোচনায় সারা দিনমান কাটিয়ে দিলেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর অনর্গল এবং নিরলস বাক্য নিঃসরণের পশ্চাতে একটি চমৎকার চুট্‌কির সন্ধান দিয়েছেন :

"আমাকে খামাখা মেলা বকর বকর করাবেন না। অবশ্য আমার মা বলতো, আমার দোষ নেই। আমাকে টিকা দেবার সময় ডাক্তার ছুরি আনেনি বলে একটা গ্রামোফোনের নীড্‌ল্ দিয়ে টিকা দিয়েছিল।"[৬২]—ফলে গ্রামোফোনের মতো তিনি বকেই যাচ্ছেন!!

০৭.

আমরা ব্যক্তি সৈয়দ মুজতবা আলীর আরো কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবো।

অগণিত ভক্ত পাঠকের অসংখ্য চিঠি মুজতবা আলী পেতেন। বিচিত্র বিষয়ে তাদের বিবিধ প্রশ্ন এবং প্রতি জনই উত্তরের প্রত্যাশী। আলী সাহেব সর্ব প্রশ্নের জন্য মাত্র চারটি উত্তরপত্র রচনা করে পোস্ট কার্ড-এ ছেপে নিয়েছিলেন। প্রয়োজনানুসারে যথোপযুক্ত উত্তরটি রেখে বাদবাকীগুলো কেটে দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। এতে সময়ের অপচয় হতো না—শুধুমাত্র প্রাপকের ঠিকানা লিখে ডাকে ফেলা। পন্থাটি ব্যস্ত লেখকদের উপযোগী বটে। এই 'নিবেদনপত্রটি' থেকে প্রাপ্ত তথ্য :

১. প্রশ্নের জবাব দানে মুজতবা আলীর অনাগ্রহ,
২. রাজনীতি বা রাজনৈতিক আলোচনা অতি সন্তর্পণে পরিহার,
৩. সভাসমিতিতে যোগদানে অনীহা এবং
৪. অনুরুদ্ধ হয়ে লেখায় অনিচ্ছা।

নিবেদন পত্রটির অনুলিপি :

"সবিনয় নিবেদন,

আপনি যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন সেইগুলির উত্তর দিবার মত শক্তি ও সামর্থ্য আমার নাই। অতএব অনুরোধ, আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া অধমের অক্ষমতা মার্জনা করিয়া দিবেন। একাধিক উত্তম গ্রন্থে এই সব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই পাইবেন। নমস্কারান্তে

সবিনয় নিবেদন,

দৈনন্দিন রাজনীতি সম্বন্ধে এ-অধম সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অতএব আপনি যে সব পশ্ন তুলিয়াছেন সে সম্বন্ধে অধমের বলিবার বা করিবার কোনো অধিকার বিধি আমাকে দেন নাই। অতএব সবিনয় অনুরোধ অধমকে নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। নমস্কারান্তে

সবিনয় নিবেদন,

নানা কারণে—বিশেষত বার্ধক্যজনিত শারীরিক দুর্বলতাবশত—সভা-সমিতিতে যোগদান করা অধমের পক্ষে আর সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। অতএব সকাতর অনুরোধ অধীনের অপরাধ মার্জনা করিবেন। দীর্ঘতর না লিখিতে পারার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। নমস্কারান্তে

সবিনয় নিবেদন,

পাওনাদারদের অতিশয় ন্যায্য 'অত্যাচারে' বাধ্য হইয়া অসংখ্য সম্পাদক ও প্রকাশকের নিকট হইতে বিস্তর দাদন লইয়া হাঁড়ি চড়াইতেছি। সেই দাদনের শোধ আশু কেন, সুদূর অভিষ্যতেও হইবে কি না সন্দেহ। তৎপূর্বে আপনার আদেশ পালন করি কি প্রকারে? পরকাল তো আছে। অতএব নিজ গুণে অধীনকে মার্জনা করিবেন। নমস্কারান্তে"

মুজতবা আলীর কবিমনের কথা পূর্বেই উল্লিখিত এবং প্রকৃতিপ্রেম ছিলো তাঁর মজ্জাগত। তাঁর রচনায় নিসর্গ বর্ণনে কবির হৃদয়ানুভূতি ও আন্তরিকতা প্রতিফলিত। প্রকৃতির মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন প্রাণের সন্ধান। মুজতবা-রচনাবলী থেকে নিসর্গের কয়েকটি উদ্ধৃতি :

ক. "ভগবান একই সৌন্দর্য কত না ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখান। শিশুর খলখলে হাসি আমি শুনিছে নির্ঝরিণীর কলকল রোলে, বিগলিত মাতৃস্তন্য দেখেছি আরবের মরুভূমির বুক ফেটে বেরিয়ে আসা সুধারসে, নবজাত শিশুর গাত্রগন্ধে পেয়েছি প্রথম আষাঢ়ের ভিজে মাটির গন্ধ!" (চিল্কা, ধূপছায়া, পৃ.৩৭)।

খ. "পূব বাঙলায় 'মাঠের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে, সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে' নয় সেখানে মাঠের শেষেই ঘনসবুজ গ্রাম আর গ্রামখানির উপর পাহারা দিচ্ছে সবুজের উপর সাদা ডোরা কেটে কেটে সুদীর্ঘ সুপারী গাছ। আর সে সবুজ কত না আভা, কত না আভাস ধরতে জানে। কচি ধানের কাঁচা-সবুজ, হলদে সবুজ থেকে আরম্ভ করে আম জাম কাঁঠালের ঘনসবুজ, কৃষ্ণচূড়া-রাধাচূড়ার কালো সবুজ। পানার সবুজ, শ্যাওলার সবুজ, কচি বাঁশের সবুজ, ঘনবেতের সবুজ—আর ঝরে-পড়া সবুজ পাতার রস খেয়ে খেয়ে পূব বাঙলার মা-টি হয়ে গেছেন গাঢ় সবুজ—কৃষ্ণ-শ্যাম। তাই তাঁর মেয়ের গায়ের রঙে কেমন যেন সবুজের আমেজ লেগে আছে। সে শ্যামশ্রী দেশ-বিদেশে আর কে পেয়েছে, আর কে দেখেছে?" (অবিশ্বাস্য, পৃ.৩-৪)।

গ. "দূরে পাগমান পর্বতের সানুদেশ, চূড়া—তারও দূরদিগন্তে হিন্দুকুশের অর্ধগগনচুম্বী শিখর, কাছে শিশির ঋতুর নিদ্রাবিজড়িত বিসর্পিল কাবুল নদী, আরও কাছের সুপ্তিময় নিষ্প্রদীপ গৃহ-গবাক্ষ চন্দ্রশালা-হর্ম্যমালা, পল্লবহীন নগ্ন বৃক্ষ, হৃতপত্র শাখা-প্রশাখা, উদ্বাহু মিনার-মিনারিকা, বিপরীতার্ধডিম্ব গম্বুজ, গোরস্তানের শায়িত সারি সারি কবরের নামলাঞ্ছন-প্রস্তর-ফলক—সর্ব সৌন্দর্য সর্ব বিভীষিকা, সর্ব সর্বাধিকারীর অলঙ্কার, সর্ব সর্বহারার দৈন্য, ভদ্রাভদ্র সকলের উপর নির্বিচারে প্রসারিত হয়েছে তুষারের আস্তরণ। আকাশের মা-জননী যেন এক বিরাট শুভ্র কম্বল দিয়ে তাঁর একান্ত পরিবারের ধনীদরিদ্র রাজা-প্রজা তাঁর সর্ব সন্তান সন্ততিকে আবরিত করে পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়েছেন।

কী নৈঃশব্দ্য, নৈস্তব্ধ্য! রাজপথের দ্বিতীয় যামের মদ্যানুরাগী, সখা, কদ্রূপ সঙ্গীতস্তনিত গণিকাবল্লভ সকলেই একই প্রিয়ার গভীর আলিঙ্গন সোহাগে সুষুপ্ত—সে প্রিয়া গৃহকোণের তপ্ত শয্যা। রাজপ্রাসাদের দুর্গপ্রাকারের প্রহর ডিণ্ডিম নিস্তব্ধ। কল্য ঊষার মধুর-কণ্ঠ মুআজ্জিন অদ্য নিশার নিদ্রাস্তরণে আকণ্ঠ বিলীন।" (শব্‌নম্, পৃ. ১৪০)।

১৯৬০-এ মুজতবা আলী কিছুদিন রাজশাহীতে এবং ১৯৪৭ সালে দক্ষিণ ভারতে অতিবাহিত করেন। এ-সময়ে লিখিত দিনলিপি মুজতবার 'নৈসর্গিক সৌন্দর্য-প্রিয়তার একটি অমূল্য নিদর্শন'। 'বর্ষা' আলী সাহেবের প্রিয় ঋতু, বিরহের ঋতু। "আমাদের পদাবলী, জয়দেব, কালিদাস, শূদ্রক যে বিরহ-বর্ণনা রেখে গেছেন তার সঙ্গে তো অন্য কোনো সাহিত্যের বিরহবর্ণনার তুলনা হয় না। তার একমাত্র কারণ আমাদের বর্ষা।" [৬৩] এ' ঋতুর উপভোগে তাঁর তৃপ্তি, চিত্তের প্রশান্তি। ডায়রীতে লিখেছেন :

"রাত ন'টা। জোর বৃষ্টি। খাঁটি বর্ষা। ... দক্ষিণ দিকটা তো ধূ ধূ খোলা, অজয় নদ পেরিয়ে ভেদে ইস্টিশান অবধি। তেড়ে আসে বৃষ্টি। দিনের বেলা দেখবার মত। কচি সবুজ ... ধান ক্ষেতের কার্পেটের উপর যেন ছুটে আসছেন লেডি বর্ষা—তাঁর সাদা গাউন ট্রেল করে করে আসছে কার্পেটকে সামান্য নুইয়ে নুইয়ে।

রাত্রের অন্ধকারে শুয়ে আছি, আর ঝপ্ ঝপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। Season par excellence বলতে আমি এই বুঝি। মাধবী জ্যোৎস্না, শরৎ প্রভৃতি না।"[৬৪]

পুত্রের উদ্দেশে লেখা পত্রে মুজতবার প্রত্যাশা, "বর্ষা ঋতু তোমার জীবনেও সেই স্থান দখল করবে যেটা সে আমার জীবনে করেছিল।"[৬৫]

রাজশাহীর প্রচণ্ড খরা। দারুণ দাবদাহে উৎকণ্ঠিত নয়ন পর্জন্যের প্রত্যাশায় ব্যাকুল এবং এ' ব্যাকুলতা আলী সাহেবের ভাষায় রমণীয় :

"পূর্বে কিছুক্ষণ খরার বিজলী হানলে। সন্ধ্যায় ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ জমেছিল। কিছুক্ষণের ভিতর তাও কেটে গেল। মেঘগুলো যেন কোথাকার বর্ষাভোজের পর ইতস্তত ছড়িয়ে ফেলা এঁটো পাতা। দেখলে হিংসে হয়, কোথাও যেন কপালীরা উত্তম বৃষ্টির উৎসব ভোজ করেছেন। আমাদের কপালে ছেঁড়া পাতা! ক্ষেমাঘেন্না করে সেগুলো চাটতে রাজী আছি— যদি তাঁরা বৃষ্টি হয়ে নামেন। তাও তাঁরা নামলেন না।"—প্রত্যাশিত বৃষ্টির কামনায় আকাশে ভ্রাম্যমাণ মেঘের প্রতি মানুষের লোলুপ দৃষ্টি এবং আশাহতের চমৎকার বর্ণনা।

সমুদ্র-নদী-নীলাকাশ তথা প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক অপূর্ব উপমা-রূপকল্পের আশ্রয় নিয়েছেন :

"আকাশ-ভরা মেঘের এক জায়গায় অতি ছোট একটা চক্র—তার ভিতর দিয়ে ট্যারচা হয়ে সূর্যরশ্মি পড়েছে শুভ্র বালুচরের উপর—আর সে রশ্মি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে নীল মেঘের নীল আকাশের উপর। বালুচর যেন আতশী কাচ হয়ে সূর্যের সঙ্গে চোখ-ঠারাঠারি করছে।"[৬৬]

দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রকে কতোরূপে মুজতবা আলী প্রত্যক্ষ করেছেন।

"আকাশ যেন উবু হয়ে শুয়ে সমুদ্রকে চুমো খাচ্ছে—এদিকে সমুদ্রের পা ওদিকে মুখ। রঙে রঙে সমস্ত জিনিসটা ঘটল। প্রথম চুম্বনে দিগ্বলয় লাল হল, তারপর নিবিড়তর চুম্বনের কাতরতায় বেগুনি হল, সেই বেগুনি ফিকে হতে লাগল, এদিকে ঢেউয়ের দোলায় সুন্দরীর পা যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছে—সমস্ত দেহ শান্ত। চুম্বনের তরঙ্গ শান্ত শরীরের ভিতর দিয়ে ওপার হতে এপারে এসে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে ফুলে উঠছে—কেন্দ্রীভূত আনন্দ এপারে এসে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তারপর বেগুনি সম্পূর্ণ কেটে গিয়ে ছাইরঙ হল। এ যেন সর্বশেষ নিবিড়তম চুম্বনে হৃৎপিণ্ডের শেষ রক্তবিন্দু ঠোঁট দিয়ে শুষে নিয়ে চলে গেল। এপার ওপার জুড়ে পড়ে রইল প্রাণহীন ফ্যাকাশে শবদেহ।

কালো চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়ল। তারপর আকাশে ছোট ছোট মোমবাতির পিদিম জ্বালিয়ে শবের পাহারা।"[৬৭] আকাশ-সমুদ্র মৈথুন উপভোগ্য। কিন্তু লেখকের মন তখন ধাবিত দেশের পানে—"গতিহীন, বেগহীন নির্জীবতা পূব বাঙলার নদীর পারে গড়ে ওঠা মানুষকে বাড়ীর কথা দেশের কথা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৬৮] মুজতবার গৃহমুখী মনের আকুলিবিকুলি কৈশোরের একটি পত্রে চমৎকার রূপপরিগ্রহ করেছে। ১৯শে আগস্ট, ১৯২১-এ শান্তিনিকেতন থেকে সিলেটের বন্ধুকে লিখছেন :

"তোমাদের ছাড়িয়া যে কী কষ্টে আছি তাহা বলিতে অক্ষম।

আজ কেবল সেই বিরহাতুরা প্রণয়িনীর কথা বার বার মনে হইতেছে, হায়, যে, বুকের আলিঙ্গন পথের কণ্টকস্বরূপ মনে করিতাম আজ সেই দুই বুকের মধ্যে কত পাহাড়, পর্ব্বত , নদী, ঘরবাড়ী—তাহা কে ভাবিত ?" (প-১৩৩)।

আলী সাহেবের রসিকতা শুধু মনোহারী নয়, বুদ্ধিদীপ্ত এবং ব্যঞ্জনাধর্মী। আমরা জেনেছি, শান্তিনিকেতনের দ্রষ্টব্য বস্তুসামগ্রীর মধ্যে সৈয়দ মুজতবা আলীর নামটিও ছিলো। দূরদূরান্ত থেকে বহু আশাভরসা নিয়ে এসে মুজতবা-দর্শনপ্রার্থীরা কি আবিষ্কার করতো ? স্বয়ং আলী সাহেবের উত্তর : "দেখেন বাঁধিপোতার গামছা পরা, উত্তমার্ধ অনাবৃত, বক্ষে ভাল্লুকের মত লোম মাথা-জোড়া-টাকা—ঘনকৃষ্ণ ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া রঙ, সাতদিন খেউরি হয়নি বলে মুখটি কদমফুল,—হাতলভাঙা পেয়ালায় করে চা খাচ্ছে আর বিড়ি ফুঁকছে!" ৬৯

মুজতবা আলী একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখবেন বলে স্থির করেছেন এবং আপন পুস্তকের 'বাজার' সম্পর্কে তিনি নিঃশঙ্ক। কেননা, 'অধুনা যেগুলি জনপ্রিয় তার চেয়ে আমার (মুজতবা আলীর) বই অনেক নিরেস হবে; ভরসা এই, দালদাই বাজারে বেশি বিক্রি হয়, আমারটার কাটতি সেই কারণেই হবে অধিকতর।" ৭০

বিজ্ঞানের প্রতি আলী সাহেবের ভক্তি অসীম। এবং জার্মান বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক। অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তারা কতো সহজেই না জটিলতর সমস্যার সরলতম সমাধানে পারঙ্গম!

"জরমন মাত্রই স্ট্যাটিস্টিকসের ভক্ত। একশটি মেয়েছেলের মধ্যে যদি নব্বুইটি কুমারী হয়, তবে তারা টরেটক্কা হিসেব করে বলে এই একশটি মেয়ের প্রত্যেকটি নব্বুই পারসেন্ট অক্ষতযোনি কুমারী এবং দশ পারসেন্ট গর্ভবতী!"৭১

মুজতবার সকৌতুক পর্যবেক্ষণে বিশেষ বয়সের এক শ্রেণীর ক্রীড়ামোদীর নিকট ক্রিকেটের মূল রস :

"এই যে কপোত-কপোতী তরুণ-তরুণী নানা ভঙ্গী নানা অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে আপন আপন আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তন্বঙ্গী কোমলাঙ্গীগণ অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অংশ—অধুনা উদরও অঙ্গস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে—প্রদর্শনকরতঃ বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছেন, উচ্চ হাস্যে প্রতিবেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ তাহাদের চিত্তে ঔৎসুক্য লহরীর সঞ্চার করিতেছেন, তদ্বিনিময়ে তরুণগণ ক্রিকেট শাস্ত্রে তাঁহাদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন যেন এক স্বয়ম্বর সভায় আপন গুণ স্বরূপ সালঙ্কার বর্ণনা করিতেছেন, ইহাই তো মুখ্য, ইহাই তো তত্ত্ব, এষাস্য পরমাগতি।" ৭২

রসরাজ সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবলীতে রসালাপের যেমন ছড়াছড়ি, তাঁর ডায়রীর পাতায়ও তেমনি চটক্দার চুট্কির সন্ধান মেলে। স্বপ্নেও তিনি 'রসিকতা তৈরী' করেন!

"এক ভদ্রমহিলা ভিখিরি tramp-কে শুধোচ্ছেন, 'তা, তুমি কাজকর্ম করো না কেন?'

'ম্যাডাম, কাজ দেয় কে ?'

'আমি দিচ্ছি। আমার বাগানটি বড় অযত্নে আছে। তুমি ওটাকে একটু সাফ-সুৎরো করে দাও।'

... তিনি একটা কাগজে 'কোদাল', 'কাস্তে' এসব লিখলেন। তারপর ভ্যাগাবন্ডকে বললেন, 'আমার আর তো কিছু মনে পড়ছে না। আচ্ছা তুমি কাগজ পেনসিল নিয়ে ভেবেচিন্তে বাকিগুলো লেখো। আমি ততক্ষণ তোমার জন্য গোটা দুই স্যান্ডউইচ নিয়ে আসি।'

ফিরে এসে দেখেন, ভ্যাগাবন্ড লিখেছে, বেশ বড় বড় হরফে,—

এক খানা খাট

দুটি বালিশ!" ৭৩

মুজতবা আলীর দিনলিপি থেকে কয়েকটি চুট্‌কি :

কোলকাতার কালীপূজো যে সাধারণ জনের পক্ষে কি প্রাণ-হন্তারক, তার রসালো বর্ণনা মুজতবা আলী ঘড়ির কাঁটা ধরে মিনিটে মিনিটে লিপিবদ্ধ করেছেন।

১. ... রাত্রে আলী সাহেবের সুনিদ্রা হয় না। এবং দিবানিদ্রা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যেস। কিন্তু পূজোর মওসুমে সেটি হবার জো নেই। তাই দুপুর দুটোর সময় স্বয়ং মা কালিকার নিকট তাঁর সকাতর প্রশ্ন,—

"মা কালী! একটা প্রশ্ন শুধবো মা, তুমি দুপুর বেলা এ্যাট্টু দিবানিদ্রা দাও না?" ৭৪

ডাঃ মুহম্মদ আবদুল ওয়ালীর নিকট সংরক্ষিত সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দিনলিপি' থেকে :

২. "শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে নূতন রীডিং রুম হয়েছে। দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে লেখা, Ladies : অন্যভাগে Silence.

স্পষ্টতঃ মনে হচ্ছে, Ladies-এর হিস্যায় Silence লিখে কোনো লাভ নেই।" (৪ঠা জুলাই, ১৯৫৯-এর পাতায় লেখা)।

৩. "ভেজালের কথা হচ্ছিল। আমি বললাম, আজকাল যে চাঁদ ওঠে সেও যেন ভেজাল। ভগবত ভাইয়ের কর্মচারী তারাপদ বললে, 'আজ্ঞে আজকাল মানুষ চাঁদে যেতে-যাওয়াতে লেগেছে। মানুষ যেখানে যায় সেখানেই ভেজাল হয়।।'" (১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯-এর পাতায় লেখা)।

শ্রীযুক্ত মনীশ চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি ডায়রীর ৭থেকে ৯পৃষ্ঠায় লিখিত বক্তব্যটিতে শুধু হাস্যরস নয়, উচ্চতর ব্যঞ্জনাও নিহিত।

৪. "পৃথিবীর সর্ব কম্যুনিস্‌ট্‌ পার্টি মস্কো থেকে টাকা পায়—কিন্তু alas!

স্পেন্ডারাদি তাদের খোঁটা দিতে পারেন না। দিলেই বলবে, 'হ্যাঁ আমরা নি; আমরা কম্যুনিষ্ট। এবং তোমরাও স্বীকার কর না কেন, যে CIB-র টাকা নিয়ে তোমরাও Imperialist!"আমরা স্বাধীন, আমরা free thinker" এ বুলি কপচাও কেন?'

সবচেয়ে মজার কথা: রুশ এবং মার্কিন যে দু 'দল টাকা ঢালছেন তারা নিজ নিজ টাকাঢালা সম্বন্ধে সমাধিবৎ নিশ্চুপ।

কথায় বলে, One who pags the fidler calls the tame.

সে তো দূরের কথা। এরা যে ফিডলারকে pay করেছেন সেইটেই তারা চেপে যেতে চান।

একবার চাপে পড়ে সুপারিশে নম্বর বাড়াবার জন্য অনেক পরীক্ষক ধরা পড়েন। সুনীতিবাবু বলেন, "আমি সতী সেজেছি; আমার কাছে সুপারিশ পৌঁছবার পূর্বেই আমি নম্বর পাঠিয়ে দিয়েছিলুম যে।'

আমার বেলা এ ক্ষেত্রে তাই। আমাকে যে দুই পক্ষের কেউই ফিডলার বলে স্বীকার করেননি! টু পাইস, ডেলিগেশন দূরে থাক!"

আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে :

৫. "Most modern poetry, cannot, perhaps is not intended to be understood without the aid of a crystall ball, a diving rod, and a psychiatrist couch." (সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরী-(২), বিভাব, শারদ সংখ্যা, ১৩৮৮, পৃ. ১২৮)।

এ-ছাড়া বিভিন্ন সময়ে দিনলিপিতে নানা কথা, নানা তথ্য ও মহাজনবাণী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে যেমন লঘু হাস্যপরিহাস স্থান পেয়েছে, তেমনি রাজনীতি, সাহিত্য

কিংবা চলতি ঘটনাও সমগুরুত্বে সন্নিবদ্ধ।

১৩৬৭ সনের ২৯শে বৈশাখ, মুজতবা আলী তাঁর ডায়রিতে প্রিন্স আলী খানের দুর্ঘটনায় অকাল-প্রয়াণের উল্লেখ করতে গিয়ে এর পেছনে একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্তের সন্দেহ পোষণ করেছেন। এর সত্যাসত্য প্রমাণসাপেক্ষ হলেও সমকালীন দেশী-বিদেশী তথা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী তিনি কতোটা বিচক্ষণতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতেন এতে তার সাক্ষ্য বর্তমান। মুজতবা লিখেছেন :

"১২ তারিখ প্রিন্স আলী খান মোটর দুর্ঘটনায় গত হয়েছেন। জিনিসটা অত সরল নয়।

প্রথমতঃ তিনি মারা গেলে করীম-প্রতিপক্ষ দলের আর কোনো ইমাম প্রার্থী রইলেন না।

দ্বিতীয়তঃ করীমের প্রতিপক্ষ দল নিজেদের অসন্তোষ হালে প্রকাশ করছিল। তাই করীম পক্ষীয় দলের পক্ষে এই 'দুর্ঘটনা'র ব্যবস্থা করা অসম্ভব ছিল না।

দুর্ঘটনায় দেখা যাচ্ছে,

(ক) আলী পূর্বে জানা ঠিকঠাক করা রাঁদেভূতে যাচ্ছিলেন—... আততায়ীর পক্ষে আগেভাগেই জানা কঠিন ছিল না।

(খ) আলী অতি বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ড্রাইভার। যে বয়সে মানুষ par excellence গাড়ি চালায় তাঁর বয়েস সেই। চালাচ্ছিলেন ৩৮ মাইল বেগে—প্যারিসে সে কিছুই নয়, তাও রাত্রিবেলা।

(গ) তিনি ধাক্কা মারেননি। মোড় নিতেই অন্য গাড়ি এসে তাঁকে ধাক্কা দেয়।"[৭৫]

১৯ শে এপ্রিল, ১৯৬৬-তে লিখেছেন :

"Things look bad.

Mrs. Gandhi said "Things are such that certain definite steps have to be taken."

Did Muslims smell rat? They passed (jamiat) a unanimous appeal to Pakistan not to break "Tashkent spirit!" "So dangerous is the situation", she said that she is thinking that some "steps may have to be taken."This also sound dangerous.

Oh God! When shall we at long last settle down to love our country. Did Mahatma shed his blood to lead us this impasse?"

(সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরী (২), বিভাব, শারদ সংখ্যা, ১৩৮৮, পৃ. ১৩০)।

সাময়িক মানসিক ভারসাম্যহীনতার জন্যে ১৯৬৬ সনে ডঃ আলীকে একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়। কোনো অজ্ঞাত কারণে মুজতবা নার্সিং হোম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তৎপূর্বে তাঁর চিকিৎসকের উদ্দেশে ডায়রির পাতায় লিপিবদ্ধ মর্মস্পর্শী পংক্তিগুলো তাঁর বিক্ষুব্ধ সংবেদনশীল মনের অটুট ভারসাম্যতারই পরিচয়বাহী। ১৯৬৬ সালের ২০শে এপ্রিলে লেখা পত্রাংশ :

'With the deepest regret I have decided not to stay in this House any more ... I have been treated as just a patient and as an insane patient at that. There will therefore be no difficulty for this institution to find another patient who will occupy the seat I am vacating. Had I been treated as more than just an ordinary patient, as an author, as more or less a learned man compared to the average run of patient—as you personally have done with the greatest

consideration for which I am really thankful from the bottom of my heart — there would have been no necessity for this unpleasantness. But, may I suggest while leaving, that author or no author, a man of sixty who has shown no signs of violence, may, in future, be treated with a bit greater consideration. ...

While leaving, I am really thankful to you very much indeed and practically all members of the staff. Of that part of the staff has anything against me, I can but only, most sincerely, apologise.

I shall enter some other nursing home and nothing will make me feel luckier than to be under your treatment there too. I had the feeling that you may be able to cure me completely.

If I have caused any irritation or damage to your institution, I can offer regret for the first pay for the second."

(সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরি (২), বিভাব, শারদ সংখ্যা, ১৩৮৮, পৃ. ১৩০-৩২)।

মুজতবা আলী বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব অভিমত এবং অভীপ্সাও ডায়রির পাতায় অনেক সময় লিপিবদ্ধ করেছেন।

ডাঃ মুহম্মদ আবদুল ওয়ালীর নিকট সংরক্ষিত দিনলিপির ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৫৯-এর পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশ :

ক. "৫. আর্ট অনুভূতির ব্যাপার। যেখানে সে information বা fact দেয় সেখানে ঐ information বা fact অশ্লীল কিংবা অন্যায় হতে পারে। বিশুদ্ধ আর্ট হতে পারে না।

৬. শ্লীল অশ্লীল habit এর ব্যাপার।"

খ. "পরশু আনে ফ্র্যাঙ্কের (আত্মজীবনী) ডায়েরি পেলুম। আমার বিপদ এই যে আমি করুণ জিনিস আদৌ পড়তে পারিনে। লিখতে তো একদম পারিনে।"

গ. "One Devabrata Mukherjee has given a talk on Taru Datta over All India Radio, published in Betar Jagat 16-30 April 1966 issue, appears to have good Master over French. Short talk but poignant."[৭৬]

'বিবিসি'-র একটি নাটক শুনে মুগ্ধ আলী সাহেব ৩০.৩.৬৬ তারিখে লিখেছেন :

ঘ. I am wondering whether I should ask the author of the drama called "Degrees of Guilt"–the author's name David Munro–to permit me to translate it in Bengali,–which may do the country, Bengal–some good."[৭৭]

শব্দতত্ত্বে আলী সাহেবের আগ্রহ এবং তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য সর্বজনস্বীকৃত। লঘুগুরু যে-কোনো আলোচনায় সামান্যতম সুযোগ পেলেও তিনি 'শব্দতত্ত্ব' নিয়ে রসগ্রাহী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। 'বর্ষার মোলায়েম বর্ণনা দিয়ে গল্প শোনানোর অভিপ্রায়ে পুত্রের উদ্দেশে রচিত পত্রেও তাই শব্দতত্ত্বই প্রাধান্য পেয়ে যায়—এ ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর ভূমিকা সহৃদয় শিক্ষকের মতোই।

"...সামনে দেয়ালে বেয়ে ওঠা মধুমালতী লতা দুলছে, লাল সাদায় মেশানো ফুলগুলো কাঁপছে,—

"...দাঁড়াও, এই লতাকে যে 'মধুমালতী' বলা হয় তার কোনো হদীস নেই। কারণ এগুলো তো এসেছে রেঙ্গুন থেকে—এখনও একশ' বছর হয়নি। অথচ 'মধুমালতী' প্রাচীন

নাম। ইংরিজিতে একে বলে Raangoon Creepers, (ইংরিজিতে 'শিউলি'কে বলে Sorrow Flowers, টগরকে বলে Twister jasmine, বেলকে বলে wood apple, সজনেডাঁটাকে বলে Drum sticks,ঢ্যাঁড়শকে বলে Lady's fingers—এগুলো ইংলন্ডে নেই বলে কোন ইংরেজ এগুলো বুঝবে না, অর্থাৎ এগুলো Anglo-Indian শব্দ)। ঠিক ঐ রকম মাধবী কী ফুল কেউ জানে না। গুরুদের এক নাম-না জানা লতাকে মাধবী নাম দেন।... 'পারুল'ও তাই। কেউ জানে না ওটা কোন্ ফুল। শান্তিনিকেতনের কাছে যে 'পারুল বন' আছে সেটা গুরুদেবের দেওয়া নাম। এখানকার ফুল সত্যই পারুল কি না, কেউ জানে না।"[৭৮]

ডায়রীগুলোর পাতায় নানা রকম বিচ্ছিন্ন কিছু পংক্তিও রয়েছে—চিত্রকল্প হিসেবে যেগুলো চমৎকার, আবার কোনো কোনো পংক্তি তাঁর বিক্ষিপ্ত মনের পরিচায়ক।

১. " জ্বলন্ত চক্ষুতে শুষ্ক অশ্রু।"

২. "সর্বদেহ ক্লান্ত অবসন্ন, কিন্তু মাথার ভিতর যেন ঝড়ের হাওয়ায় মশাল নাচছে।"

৩. "ট্রেনে জানলা দিয়ে বাইরের কালো ঘোড়ার রেস দেখছি, না একপাল কালো বিনুনী?"

৪. "বউটা যেন একটা আস্ত দোজখের বিল্লী। নরকের বিড়াল। Hell cat.' "[৭৯]

৫. "জামাতের চেয়ে আজান as collection prayer বেশী সার্বজনীন। বহু অমুসলমানের হৃদয়ও তাতে সাড়া দেয়।"[৮০]

বিবিধ ব্যাধি ও ঔষধপত্র সম্বন্ধে আলী সাহেবের কৌতূহলের স্বাক্ষরও 'দিনলিপি'তে রয়েছে।

ডাঃ ওয়ালীর নিকট সংরক্ষিত সৈয়দ মুজতবা আলীর দিনলিপিটির প্রথমেই নিউটনের একটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে এবং সে-সঙ্গে আলী সাহেবের অনবদ্য অনুবাদ।

"Men build too many walls
and not enough bridge."
—Isaac Newton.

"হায়রে মানুষ
বুদ্ধি তোমার
পাতাল চুমি,
যত না গড়েছ
দেয়াল,—সেতু তো
বাঁধোনি তুমি!"

মানুষে মানুষে 'সেতুবন্ধনের' প্রচেষ্টা আলী সাহেবের লেখক-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সফল প্রয়াস বললেও অত্যুক্তি হবে না। স্রষ্টার স্বরূপ সম্বন্ধে নির্দ্বন্দ্ব মুজতবা-সৃষ্ট নায়িকারও সুদৃঢ় প্রত্যয় :

" 'নারায়ণ' অর্থ তো জানি; নরনারী যাঁর কাছে আশ্রয় নেয়। ... আমি জপ করি সেই আল্লার (নারায়ণ) আশ্রয় নিয়ে, তাঁর রূপস্বরূপকে স্মরণ করে, যার নাম 'লতীফ' (সুন্দর)। এবং তনি শিব এবং সত্যও বটেন।"[৮১]

ব্যক্তিজীবনেও একেশ্বরে বিশ্বাসী সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন সর্ব সংস্কার-মুক্ত। শ্রদ্ধাস্পদা বৌদি রাধারাণী মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে আত্যন্তিক ভক্তির সঙ্গে পূজোর সময় ঠাকুরঘরে বসে 'গীতা' পাঠ করেছেন নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে। (সা-৪৬)। সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর সৃষ্ট চরিত্রাবলীর মাধ্যমেও উদার ধর্মমত প্রচার এবং মানুষে মানুষে মৈত্রী কামনা করেছেন। তাই দেখি লক্ষ্ণৌএর পরিবেশে মানুষ শাস্ত্রী ঘরের বধূকে লেখক আর্শীবাদ করছেন

" 'মা! ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো।'

সীমন্তিনী বললে, 'আমি আল্লাকে ইয়াদ করি।' "[৮২]

আলী সাহেবের রচনার মাধ্যমে কলোনের গির্জার ধর্মপ্রাণ বিশপের সঙ্গে পরিচিত হই, যিনি মুসলমানদের অনুরোধে গির্জার ভেতরে তাঁদের ঈদের নামাজ পড়ার অনুমতি দিয়েছেলেন। 'মা-মেরী মালিক। তিনি সর্ব সন্তানের মাতা।' সুতরাং, নামাজে আপত্তি কোথায়![৮৩] মিশরে ব্যবসারত ভারতের কুর্গ-এর অত্যাশ্চর্য জীবন-সংগ্রামী কোদণ্ড মুথহানা সানন্দ গ্রামের বাড়ীতে মুসলমানদের জমি দান করেন মসজিদ বানাবার জন্যে। তাঁর বক্তব্য অতি সরল :

"মুসলমান দেশের নুন-নেমক খাই, না হয় দিলুম তাদের জাত ভাইদের মসজিদ বানাবার জায়গা।"[৮৪] শুধু তাই নয়, গাঁয়ের 'মোল্লাদের' জন্য আল্-আজহার থেকে কুরান শরীফও কিনে পাঠাচ্ছেন!

আলী সাহেব শুধু বক্তব্যে নয়, দৃষ্টান্তের মাধ্যমেও সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় ছিলেন সদা সচেষ্ট।

মুজতবা-চরিত্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্য—সাহিত্যিক সততা। নিজের দুর্বলতা বা অক্ষমতা তিনি অকপটে স্বীকার করতেন। এবং অপরের ন্যায্য সম্মান ও স্বীকৃতি দানে ছিলেন অকুণ্ঠ। কেউ আলী সাহেবের সঠিক ভ্রান্তি নির্দেশ করলে তিনি সবিনয় প্রসন্নচিত্তে তা' মেনে নিতেন। সংশোধনেও আপত্তি ছিলো না। তাঁর 'বড়বাবু' প্রবন্ধ প্রসঙ্গে সাগরময় ঘোষকে লিখেছেন :

" ... ব্রজেন বাঁড়ুয্যের লেখা 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ইত্যাদি' সম্বন্ধে বইখানা আজ প্রবন্ধ পাঠানোর পর পাঠালুম। ... এতে আছে '... ২২। রেখাক্ষর বর্ণমালা। ১৩১৯ সাল (২৪ শে মে ১৯১২)। পৃ. ১২০।

... ইহার প্রাথমিক খসড়া ১২৯২ সালের 'বালকে', সচিত্র আকারে ১৩০৫ (ফাল্গুন-চৈত্র) ও ১৩০৬ সালের (আষাঢ়-শ্রাবণ) 'পুণ্য' এবং ১৩১৩-১৩১৫ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।'

আমি যে আমার প্রবন্ধে সম্পূর্ণ ভুল লিখেছি তা নয়। আমি লিখেছি ইটি পুস্তকাকারে বোধ হয় প্রাইভেট সার্কুলেশন (১ম খসড়া) হয়েছিল। সেটা ঠিক, কারণ ঐ পুস্তিকা শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে আছে ও আমি ব্যবহার করেছি। ব্রজেনবাবু এটি দেখেননি। পক্ষান্তরে আমিও জানতুম না, যে, প্রথম খসড়া 'বালক' ইত্যাদিতে বেরিয়েছিল। কাজেই in the light of ব্রজেনবাবুর information তুমি necessary মেরামতীটি করে নিয়ো।" (প-৯১)।

অপর পত্রে জনৈক জ্যোতিষবাবুকে লিখেছেন,

"... 'দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কাজ করতে হলে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা চাই ৬০ বছরের বুড়োর, আর শেলফের সর্বোচ্চ তাকে ওঠবার মত nimble feet ও ভলুম ২ নামাবার জন্য গায়ের তাগৎ চাই পঁচিশ বছরের চ্যাংড়ার।

... দ্বিজেন্দ্রনাথের আসল কাজ ধর্ম ও দর্শনে। সেটি এখনো আয়ত্ত করতে পারিনি।" (প-৯২)।

এমনিভাবে দোষে-গুণে দুর্বলতা-সংবেদনশীলতায় সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন সমকালের এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

তথ্য-নির্দেশ

১. শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লেখা পত্র-৩, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩০৫।
২. দর্পণ, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮০-৮১।
৩. সৈয়দ মোস্তফা আলী : আত্মকথা, পৃ. ১০।
৪. সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরী (১), বিভাব, আশ্বিন ১৩৮৭, পৃ. ২৭-২৮।
৫. মৃত্যু, বড়বাবু. পৃ. ২২০-২১।
৬. সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭২-৭৪।
৭. বিদেশে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪।
৮. ঐ, পৃ. ২০২-২৭।
৯. শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায় (ভানু রায়)-কে লেখা পত্র-২, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫।
১০. শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লেখা পত্র-৩, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩০২-০৩।
১১. আমীনুর রশীদ চৌধুরী : মুজতবা কথা, দেশ, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃ. ৪১৬।
১২. শংকর : তুলনাহীন মুজতবা আলী, দেশ, ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৪ পৃ. ৮৪১।
১৩. ঐ. পৃ. ৮৩৮।
১৪. রায়পিথৌরা : দেহলি প্রান্তে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ মে, ১৯৫২, পৃ. ৪।
১৫. নারায়ণ সান্যালকে লেখা পত্র, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড পৃ. ৪০১।
১৬. শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লেখা পত্র-৬, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩০৯-১০।
১৭. সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরী (১), বিভাব, আশ্বিন, ১৩৮৭, পৃ. ২৮।
১৮. প্রাণতোষ ঘটককে লেখা পত্র-৩, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪১২।
১৯. মহম্মদ আব্দুল ওয়ালী : সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, দেশ, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, পৃ. ১১।
২০. অনিলকুমার দাস : সৈয়দদার স্নেহ, আলোচনা, দেশ, ২৩ মার্চ, ১৯৭৪, পৃ. ৬৩৩-৩৪।
২১. কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ পৃ. ৭৭২।
২২. শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরীকে লেখা পত্র, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪২৮।
২৩. শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী : সুজন সৈয়দ (আলোচনা), দেশ, ৬ এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ. ৮০২-০৩।
২৪. কথাসাহিত্য, মাঘ ১৩৬৬, পৃ. ৩৯৯।
২৫. শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লেখা পত্র-১, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড পৃ, ২৯৯।
২৬. ঐ, পত্র - ৪, ঐ, পৃ.৩০৬।
২৭. ঐ, পত্র - ১০, ঐ, পৃ.৩২০।
২৮. ঐ, পত্র - ৩, ঐ, পৃ.৩০২।
২৯. ঐ, পত্র - ৬, ঐ, পৃ.৩১২।
৩০. ঐ, পত্র - ৬, ঐ, পৃ.৩০২।
৩১. ঐ, পত্র - ২, ঐ, পৃ.৩০১।
৩২. রাজশেখর বসুকে লিখিত পত্র, ঐ, পৃ. ৩২৯।
৩৩. সৈয়দ মুজতবা আলীকে লেখা পত্র, ঐ, পৃ. ৩৩০।
৩৪. শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লেখা পত্র-৫, ঐ, পৃ. ৩০৮।
৩৫. শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ)-কে লেখা পত্র-১, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম, খণ্ড, পৃ. ৩৯৬-৯৭।
৩৬. সৈয়দ মুজতবা আলী : লেখক সতীনাথ, সতীনাথ স্মরণে (সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত), প্র, ৮১।
৩৭. গৌরকিশোর ঘোষ : চাচাকাহিনী, দেশ, ২ মার্চ, ১৯৭৪, পৃ. ৩৫৩-৫৪।
৩৮. ইন্দ্রমিত্র : আরেক পঞ্চতন্ত্র, দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৬.পৃ. ১৮৫-৮৯।
৩৯. সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরী (১), বিভাব, আশ্বিন, ১৩৮৭, পৃ. ৩১।
৪০. ইন্দ্রমিত্র : আরেক পঞ্চতন্ত্র, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৭ পৃ. ১৮৯।

৪১. শারদীয়া জলসা, ১৩৭৫।
৪২. ইন্দ্রমিত্র : মোল্লার দৌড়, দেশ, ১১ আগস্ট, ১৯৮৪, পৃ. ১৫।
৪৩. শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লেখা পত্র-১২, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩২৩।
৪৪. প্রাণতোষ ঘটককে লেখা পত্র-১, ঐ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪০৮-০৯।
৪৫. সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরী (১), বিভাব, আশ্বিন ১৩৮৭, পৃ.২৭।
৪৬. ঐ, পৃ. ২৫-২৬।
৪৭. কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, পৃ. ৭৭৩।
৪৮. শংকর : তুলনাহীন মুজতবা আলী, দেশ ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ. ৮৪১।
৪৯. রায়পিথৌরা : সপ্তপর্ণী, আনন্দবাজার পত্রিকা, মার্চ ১৯৫৩, পৃ. ৪।
৫০. সিংহ মুষিক কাহিনী, কত না অশ্রু জল, পৃ. ১৮৫।
৫১. ভবঘুরে, ভবঘুরে ও অন্যান্য, পৃ. ১৮২।
৫২. শংকর : তুলনাহীন মুজতবা আলী দেশ, ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ. ৮৩৫।
৫৩. কথাসাহিত্য, মাঘ ১৩৬৬, পৃ. ৩৯৯-৪০০।
৫৪. গৌরকিশোর ঘোষ : চাচাকাহিনী, দেশ, ২ মার্চ, ১৯৭৪, পৃ. ৩৫৩।
৫৫. আমীনুর রশীদ চৌধুরী : মুজতবা কথা, দেশ, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, পৃ. ৪১৬।
৫৬. সৈয়দ মুজতবা আলী : আড্ডা, পঞ্চতন্ত্র, পৃ. ১০১-০৩।
৫৭. কচ্ছের রাণ, পঞ্চতন্ত্র (দ্বিতীয় পর্ব), পৃ. ৯।
৫৮. লীলা মজুমদার : সৈয়দ মুজতবা আলী, অমৃত, ১৩ ফাল্গুন, ১৩৮০, পৃ. ১২।
৫৯. অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায় : রম্যরচনার সম্রাট সৈয়দদা, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯১, পৃ, ১৪৪।
৬০. সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ : বড় সৈয়দ দেশ, ১৮ ফাল্গুন, ১৩৮০, পৃ, ৩৫৫।
৬১. মহম্মদ আব্দুল ওয়ালী : সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, দেশ, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, পৃ. ১১।
৬২. উল্টা-রথ, টুনি মেম, পৃ. ১৬৪।
৬৩. সৈয়দ মুজতবা আলী : বর্ষা, পঞ্চতন্ত্র, পৃ. ৪১।
৬৪. সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরী (১), বিভাব, আশ্বিন ১৩৮৭, পৃ. ২৫।
৬৫. পত্রাবলী, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৮।
৬৬. দিনলিপি, ঐ, পৃ. ৩৪৮।
৬৭. ঐ, ঐ, পৃ. ৩৫৭।
৬৮. ঐ, ঐ, পৃ. ৩৭১।
৬৯. দরখাস্ত, বড়বাবু, পৃ. ১১০।
৭০. প্রেমের প্রথম ভাগ, দু-হারা, পৃ. ৯৬।
৭১. আবার আবার সেই কামান গর্জন!, রাজাউজীর, পৃ. ২৩৪।
৭২. রায়পিথৌরার কলমে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৪২।
৭৩. দিনলিপি, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ, ৩৭১।
৭৪. ঐ, ঐ, পৃ. ৩৭৫-৭৬।
৭৫. ঐ, ঐ, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬।
৭৬. সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরী (১), বিভাব, আশ্বিন ১৩৮৭, পৃ. ২৮।
৭৭. সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরী (২), বিভাব, শারদ সংখ্যা, ১৩৮৮, পৃ. ১৩২।
৭৮. পত্রাবলী, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড পৃ. ৩৯৩।
৭৯. সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরী (১), বিভাব, আশ্বিন ১৩৮৭, পৃ. ২২।
৮০. সৈয়দ মুজতবা আলীর অপ্রকাশিত ডাইরী (২), বিভাব, শারদ সংখ্যা, ১৩৮৮, পৃ. ১২৮।
৮১. শহর্-ইয়ার, পৃ, ২৬২।
৮২. সাবিত্রী, পঞ্চতন্ত্র (২য় পর্ব), পৃ. ৭৯।
৮৩. বিদেশে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭।
৮৪. কোদণ্ড মুখহানা, পঞ্চতন্ত্র, পৃ. ১৩০।

অধ্যায় : নয়

০১.

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু ভাষায় পারদর্শিতা সত্ত্বেও সৈয়দ মুজতবা আলীর সৃষ্টিকর্মের বাহন ছিল মাতৃভাষা —বাঙলা। তিনি যে "অনারোগ্য, গোরস্তান-গমনোৎসাহী কঠিন ব্যাধিতে কাতর... সে ব্যামোর নাম 'সুপেরিয়রটি কম্‌প্লেক্স্'।" অতঃপর তাঁর সগর্ব স্বীকারোক্তি: "আমি আমার মাতৃভাষা নিয়ে এমনই শশব্যস্ত যে অন্যভাষা তার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের কিনা সে চিন্তা আমার পুরু নিরেট খুলিটা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকতে পারে না।"[১] ভাষার ক্ষেত্রে মুজতবা আলীর চিন্তাধারায় কোনো রকম অস্বচ্ছতা নেই। তাঁর ভূয়োদর্শন নির্দেশ করে,

"একমাত্র পরাধীনতাই মানুষকে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় ভাষা শেখায়।... এই পরাধীনতার পিঠ পিঠ আসে আর্থিক পরাধীনতা।"[২]

মাতৃভাষার অবজ্ঞাকারী ইংরেজী-প্রেমীদের উদ্দেশে তাঁর সতর্কবাণী :

"আমরা এখনো ইংরিজী-জাননে-ওলা আর ইংরিজী-না-জাননে-ওলার মাঝখানে সেই প্রাচীন অন্ধপ্রাচীর, অচলায়তন খাড়া রাখতে চাই।

এই ব্যবস্থাটাকেই আমি ডরাই, বড্ড ডরাই। এ ব্যবস্থা মেনে নিলে আপনারা একদিন আবার পরাধীন হবেন।"[৩]

স্বাধীন দেশে আপন মাতৃভাষার—সমৃদ্ধতম প্রাদেশিক ভাষা হওয়া সত্ত্বেও—মুমূর্ষু অবস্থাদৃষ্টে মুজতবার হতাশা প্রায় আর্তনাদের সামিল :

" কেউ বলে, 'রাষ্ট্রের অখণ্ডতার জন্য হিন্দী গ্রহণ করো', কেউ বলে 'ইংরেজি বর্জন করলে আমরা বর্বর হয়ে যাব।' হায়, বাঙলার পদমর্যাদা কেউ স্বীকার করে না।"[৪] এবং সর্বোপরি মহাসত্য :

"যে-সভ্যতা-সংস্কৃতি সে তার পিতা-পিতামহের কাছ থেকে পেয়েছে, যার কল্যাণে সে সভ্যজন বলে পৃথিবীতে স্বীকৃত হচ্ছে, যাকে সে পরিপুষ্ট করে পিতৃপুরুষের কাছ থেকে ঋণমুক্ত হতে চায়—সে তার মাতৃভাষা।"[৫]

বাঙালী সমাজ, জাতি—তার জীবনধারা ও চিন্তাচেতনা এবং মুমূর্ষু বাঙালীর ভবিষ্যৎ ভাবনা মুজতবার লেখার অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। মুজতবার প্রথম এবং শেষ পরিচয়—তিনি বাঙালী। বাঙালীত্বের প্রকাশে আলী সাহেব রীতিমতো শ্লাঘা বোধ করতেন। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গেই নিজেকে 'সিলট্যা খাজা বাঙাল' হিসেবে পরিচিত করেছেন। আপন চরিত্রে বাঙালীর বৈশিষ্ট্যগুলো নির্দেশ করেছেন—"...হুদোহুদো ভাত খাই, যত ঝাল হয় তত ভালো, দোক্তা সহযোগে প্রচুর পান সেবন করি... দ্বিপ্রহরে ঘণ্টা দুই পরিপাটি দিবানিদ্রা সেবন করি, চলাফেরা খেলাধুলো আমার দু'চোখের দুশমন,...অর্থাৎ আমি অতিশয় খাঁটি বাঙালী, ...।"

(প-২৪৪)। শুধুমাত্র বাঙালীর আরেকটি অতি প্রাচীন নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'পরশ্রীকাতরতা' থেকে সযত্নে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে চেয়েছেন। এতে তাঁর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হলেও আলী সাহেবের লেখায় ঈর্ষা-অসূয়াজাত বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা বীভৎস জিঘাংসার মূর্তিতে আবির্ভূত হয়নি। হাস্যরসে ব্যঙ্গরসিকতায় আমাদের জীবনের অসঙ্গতি দৈন্য-দুর্দশা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরতে চেয়েছেন—শুধুমাত্র মাতৃভাষার অবমাননাকারী 'পণ্ঠকদের' ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিচার করতে সমর্থ হননি। প্রয়োজনও ছিলো না।

পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে কৈশোর থেকেই মুজতবা প্রায় গৃহছাড়া। কিন্তু আমৃত্যু তাঁর বিষণ্ন মনটি সকাতর ঘুরে ফিরেছে অতি পরিচিত সিলেটের অন্তরঙ্গ পরিবেশে। গৃহমুখী কিশোর মনের পরিচয় বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন থেকে ১৯২১-২২-এ বন্ধুর উদ্দেশে লেখা একটি পত্রে :

"আমার আজকাল একটা ভয়ঙ্কর রোগ হয়েছে কেবল বসে বসে ভাবি তোমরা এখন কি কচ্ছ। আম্মা এতক্ষণে কাঁথা সেলাই শেষ করে নামাজ পড়া আরম্ভ করেচেন। মাইজম ভাই সাহেব (মধ্যমাগ্রজ) চা তৈরি করবার জন্য তাড়া কচ্ছেন এবং খানু এখন পারিবে না বলিয়া বিষম আপত্তি কচ্ছে। মাখন ও মলাই ইস্কুল হইতে ফিরে চীৎকার করে রুথদির কাণের দোলের (দুল্, ear-ring) সমালোচনা আরম্ভ করে দিয়েচে। রমজান শুকনো কাপড়গুলি তুলচে।" (প-১৩৫)।

শুধু কৈশোরে নয়, উত্তর জীবনেও তিনি যখন যেখানেই থাকুন না কেন তাঁর মানসবিহার চলেছে এই বাঙলায়—মূলতঃ বাঙলাদেশে। জিনীভার জাহাজে বসে তাঁর মনে পড়ে পদ্মার কথা, গোয়ালন্দী জাহাজের মনোমুগ্ধকর স্মৃতিতে পুলক বোধ করেন। বিদেশী মহিলার করুণ দৃষ্টিতে, তাদের কালো কেশে প্রত্যক্ষ করেন আপন মা-বোনদের। জিনীভার 'ফূর্তির জাহাজে' যখন অর্কেস্ট্রার সঙ্গে আনন্দান্বেষীরা একাত্ম হয়ে সুর মেলাচ্ছেন,

"গোলাপ বাগানে, সানসুসির,
গোলাপ বাগানে—
কি হয়েছিল ?
'সেই গোলাপ বাগানে আমি মেরিকে চুমো
খেয়েছিলুম—
প্রথম চুম্বন তো মানুষ কখনো ভুলতে
পারে না।' "

তখন গভীর বেদনায় মুজতবার উদাসী মন পদ্মার বুকে ভাসমান জাহাজে ফিরে গেছে। "মাঝি-মাল্লাদের চেঁচামেচি কেমন যেন আর কর্কশ বলে মনে হচ্ছে না। পাশে মোল্লাজীর নামাজ পড়া শেষ হয়েছে। সুর করে কোরান পড়তে আরম্ভ করেছেন। হাওয়াতে তাঁর দাড়ি দুলছে, পাগড়ীর ন্যাজ দুলছে। বরযাত্রীর দল যাচ্ছে, না কনে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে, কে জানে—একমাথা সিঁদুর-মাখা একটি মেয়ে ঘনঘন শাঁখ বাজাচ্ছে।...

উত্তমার্ধ নগ্ন, জাহাজের রসির মতো মোটা ধবধবে পৈতে-ঝোলানো এক ব্রাহ্মণ বললেন,'দেখো ত, মিয়া, ঠিক ঠিক রাজবাড়ির টিকিট দিয়েছে তো ?"৬

পিরামিডের দেশে শ্রান্ত-ক্লান্ত এই বঙ্গসন্তানের সম্মুখে যখন ভুবন-বিখ্যাত মিশরীয় খানাদানা হাজির করা হয়েছে তখন তাঁর প্রাণ হাহাকার করে ওঠে এক মুঠো আতপ চালের ভাত, উচ্ছে ভাজা, সোনামুগের ডাল আর মাছের ঝোলের জন্য! এমনকি স্বর্গে

যেতেও তাঁর দারুণ অনীহা। বাঙালী-বল্লভ ইলিশ-বিহীন বেহেশ্‌তে কোন্ মূর্খ যেতে চায়! কাইরোর আড্ডা-প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্বের আড্ডা-রসিক মাত্রই তসলীম জানায়। বাঙালীও স্বদেশে-বিদেশে এই প্রতিষ্ঠানটিকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে। মুজতবাও ভালোবাসেন "হেদো, হাতীবাগান, শ্যামবাজার। ও-সব জায়গায় তাজমহল নেই, পিরামিডও নেই। তাতে আমার (মুজতবার) বিন্দুমাত্র খেদও নেই। আমি ভালোবাসি আমার পাড়ার চায়ের দোকানটি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দিই। পাড়ার পটলা, হাবুল আসে, সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে গুষ্ঠীসুখ অনুভব করি আর উজির-নাজির মারি। আমার যা কিছু জ্ঞানগম্মি তা ঐ আড্ডারই ঝরতি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে।"[৭]

মুজতবার মানসিক গঠন তৈরী হয়েছে একান্তভাবে বাঙলার মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে, সঞ্জীবিত হয়েছে, এ' দেশেরই আবহাওয়ায়। ইন্দোনেশিয়ার বস্ত্রশিল্প প্রদর্শনীতে 'ঢাকাই' নক্‌শা দেখে লেখক আনন্দে আত্মহারা। "মাতা, ভগ্নী সকলকেই বাল্যকাল হইতে দেখিয়াছি, ঢাকাই শাড়ি পরিতে। দাওয়ায় বসিয়া কত সহস্রবার দেখিয়াছি, বাঁশের বেড়ায় শাড়ি শুকাইতেছে এবং সেই সব পাড়ের নক্সাই তো আমাকে রসশাস্ত্রের প্রথম অ আ ক খ শিখাইয়াছে।"[৮] বাঙালীর কৃতি-কৃতিত্বে তাঁর গৌরব ও গর্ব সীমাহীন। ভারতের সর্বত্র সমাদৃত জাতীয় সঙ্গীতদ্বয় বাঙলাদেশেই রচিত এবং "স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় বাংলাদেশেই।...এর কারণ বাঙালী আপন দেশ ভালোবাসে এবং সে বিদ্রোহী। দেশকে ভালোবাসলে মানুষ তার ভাষাকেও ভালোবাসতে শেখে।"[৯] —এটা শুধু মুজতবা আলীর মুখের কথা নয়—তাঁর বুকের ভাষা। গান্ধী-ঘাটে স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন দেখে তাঁর 'অবিমিশ্র আনন্দের বিষয়, এ-ঘাটের পরিকল্পনা করেছেন এক বাঙালী যুবক। ... নাম হবিবুর রহমান।' প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ঘটনায় মুজতবার অন্ততঃ একবার 'বঙ্গ-পরিক্রমা' হয়ে যায়। মহানগরী দিল্লীতে ফুটবল খেলা দেখে তাঁর মন অতৃপ্তই থেকে যায়। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-মহামেডানের পীঠস্থান কোলকাতায় ফুটবলের 'মল্লযুদ্ধ দেখিতে হইলে দ্বাদশপ্রহর পূর্বে ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন বন্ধুবান্ধবসখাসজ্জন লইয়া উপস্থিত হইতে হয়, আর মহানগরী ইন্দ্রপ্রস্থে মাত্র অর্ধঘন্টা!' এবং দিল্লীর বেরসিক দর্শকবৃন্দ, 'ক্রীড়াশেষে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা সুখে বিগতস্পৃহ মুনিজনের ন্যায় শান্ত সমাহিত চিত্তে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাবর্তন' করেন। আর কোলকাতায়?

"বিকট চিৎকার, ছত্রহস্তে লম্ফঝম্ফ, শ্রাবণের বারিধারার মত শোকাশ্রু, আনন্দবারি বর্ষণ, মল্লবিশেষের নাম উল্লেখ করিয়া তীব্রকণ্ঠে তাহার চতুর্দশ পুরুষকে অভিসম্পাত, পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিপক্ষানুরাগীকে নিদারুণ চপেটাঘাত, ফলস্বরূপ অনুরাগীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ, তস্য-ফলস্বরূপ ছত্র ও পাদুকাক্ষয়, রক্তপাত অঙ্গাঘাত, গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর জয়ী হইলে সন্দেশবিতরণ, পরাজিত হইলে গৃহিণীকে কটুবাক্যবর্ষণ"[১০]—এসবের অনুপস্থিতিতে ক্রীড়াদর্শন 'কালক্ষেপ' বৈকি!

'বাঙালী' বলতে মুজতবা আলী 'উভয় বাঙলার এবং বাঙলার বাইরেও হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ বাঙলাভাষী জনকেই' বুঝতেন।[১১] তিনি বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "বাঙালীকে এ কথা ভুললে চলবে না, সে বাঙালী। সে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, খ্রীশ্চান নয়, —সে বাঙালী।"[১২] স্বাধীনতা সংগ্রামী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নির্বাসিতের আত্মকথা" নিঃসন্দেহে উপাদেয় সুখপাঠ্য গ্রন্থ। এ' অভিমতের পশ্চাতে মুজতবা আলীর ভিন্নতর দুর্বলতাও নিহিত।

"…….উপেন্দ্রনাথ ছিলেন একদম ন-সিকে বাঙালী। তাই, 'আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলকার হাত হইতে নির্বিচারে রুটি খাই দেখিয়া মুসলমানেরা প্রথম প্রথম আমাদের পরকালের সদ্গতির আশায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, হিন্দুরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ন হইয়াছিলেন; শেষে বেগতিক দেখিয়া উভয় দলই স্থির করিল যে, আমরা হিন্দুও নই, মুসলমানও নই,—আমরা বাঙালী।'

বাঙালীর এরকম নেতিবাচক রমণীয় সংজ্ঞা আমি আর কোথাও শুনিনি।"[১৩]

মুজতবা আলী বাঙলার ভৌগোলিক সীমানার চেয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখেছেন বাঙালীর সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তিকে। তিনি উল্লেখ করেছেন, "আমার ধ্যানের বাঙলা বাঙলাদেশে সীমাবদ্ধ নয়—পশ্চিম বাঙলার গুটিকয়েক জেলাই তার বিহার-ভূমি নয়—আমার ধ্যানের বাঙলা আসাম, বিহার, উড়িষ্যার সুদূরতম প্রান্ত অবধি—না, কম বলা হল, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, দিল্লী, জয়পুর, যেখানেই বাঙলা সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে, ছায়া পড়েছে, সেখানেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙলা। পূর্ব বাঙলাও তাই এ-ধ্যানের বাঙলার ভিতরে।"[১৩] এবং সে-জন্যেই ভাষা আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশে বেদনাবিধুর মুজতবা আলীর অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি : "পূর্ব বাঙলায় আজ যাঁরা বাঙলা ভাষার জন্য মৃত্যুবরণ করল তাঁরা আমাদের নমস্য।"[১৪]

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য কখনো মসৃণ পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়নি। সংগ্রামের মধ্যেই এ' ভাষার জন্ম, কন্টকাকীর্ণ পথ পরিক্রমার মধ্যেই তার সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন। মুজতবা অত্যন্ত শ্লাঘার সঙ্গে সেই ঐতিহ্য স্মরণ করেছেন।

"বাঙলা সাহিত্যের আঁতুর ঘর বৌদ্ধ-মন্দিরে চর্যাপদ দিয়ে…তারপর তার বৈষ্ণব রূপ।…বাঙলাগদ্যের সূত্রপাত রামমোহনে। তিনিও বিদ্রোহী—প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কতই না জঞ্জাল তিনি লৌহ-সম্মার্জনী দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে গেলেন।…বাঙলার শ্রেষ্ঠতম সন্তান বিদ্যাসাগর মহাশয় …—তিনিও 'সনাতন' ধর্মের বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কর্মের বিজয় পতাকা তুলেছেন। তারপর মাইকেল—তিনি তো কেরেস্তান।…ওদিকে পূর্ব-বাঙলায় মুসলমানরা কেচ্ছা-সাহিত্য, মুর্শীদিয়া, জারী, দর্বেশী রচনা আরম্ভ করেছেন—…দীনেশচন্দ্র তো সেগুলো অবহেলা করলেন না।…মীর মুশররফ হুসেন 'বিষাদসিন্ধুতে' মুসলমানের কারবালার কাহিনী লিখলেন;… তত্ত্ব এতে নেই, তবু বাঙালী আজও সে বই কেনে। তারপর রবীন্দ্রনাথ—… তিনি হিন্দু নন, ব্রাহ্ম নন, —তিনি বাঙালী। তারপর সুকবি নজরুল ইসলাম। মুসলমান।… একে মুসলমান, তায় বিদ্রোহী। অথচ বাঙালী হিন্দু তাঁকে কী শ্রদ্ধাই না দেখিয়েছে…।

বাঙালী বাঙালী। হিন্দুধর্মের প্রতি তার সোহাগ নেই, মুসলমানকে সে অবহেলা করেনি, কেরেস্তানও তার ভাই। এ রকম উদারতা কটা জাত, কটা সাহিত্য দেখিয়েছে?"[১৫]

শত দুঃখ-দুর্দশায় নিপীড়িত, বঞ্চনায় জর্জরিত বাঙালীর কি মোহন রূপই না মুজতবার চিত্ত অধিকার করে রয়েছে :

"পাঞ্জাবীদের তুলনায় এরা কালো, বেঁটে, রোগা, অনেকেই হাড্ডিসার, এদের সূট কেনার পয়সা নেই, যদি বা থাকে তবু মাসে দুবার করে প্রেস করিয়ে ব-তরিবৎ পরতে জানে না, এদের রমণীরা এখনো সেই মান্ধাতার আমলের শাড়ী ব্লাউজ পরে, পেটকাটা এক বিঘতী কাঁচুলির উপর অবহেলার দোপাট্টা ফেলে এরা গুম্‌গুম্ করে হাঁটতে শিখলে না, এদের বাচ্চারা ট্যাঁশ উচ্চারণে 'ড্যাডি' 'মাম্মি' 'ওকে' 'নো কে' বলতে শিখলে না—

এরাই বাঙালী।" এক সময় এ' দেশের শিক্ষিত জনমাত্রই সংস্কৃত কিংবা আরবী-ফারসীর চর্চা করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা সাহিত্য ভারতের যে-কোন প্রাদেশিক সাহিত্যের চেয়ে ছিলো শ্রেষ্ঠ। এই সাহিত্যসৌধের মজবুত ভিত্তি রচনায় প্রধানতঃ সংস্কৃত এবং আংশিক আরবী-ফার্সীর ঐতিহ্যে বিমুগ্ধ বাঙালী 'দুমুঠো অন্নের জন্য... আজ এতই কাতর যে, জোর করেও তাকে আজ আর সংস্কৃত পড়ানো যাচ্ছে না। তবে এ কথা ঠিক, তাই নিয়ে সে লজ্জা অনুভব করে...।

এই লজ্জাটুকু নিয়েই বাঙালী।"১৬

মা, মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা অবিচ্ছেদ্য। মা-জননী নিজেকে ব্যাপ্ত করে রেখেছেন মাতৃভূমির সর্বত্র। আবার তাঁর অপরূপ মহিমা সংহত রূপ লাভ করে মাতৃভাষায়। দেশের মানুষ ও প্রকৃতিকে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই দেশপ্রেম পায় প্রগাঢ়তা। মুজতবা আলীর মন-মানসিকতায় যে আন্তর্জাতিক চেতনা স্পন্দিত তা' প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর রচনার সর্বত্র। বাঙালী-পাঞ্জাবী-গুজরাটী তথা ভারতীয়, জার্মান,ফরাসী, চেক গ্রীক, আরব, চীনা, জাপানী প্রভৃতি চরিত্র গলাগলি হয়ে পাঠকের সম্মুখে বিমূর্ত। তবু বলতে হয় তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিলো জন্মভূমি সিলেট এবং দীক্ষাভূমি শান্তিনিকেতনের প্রতি, আর যে শহর পরম করুণায় তাঁর চিত্তলোক রসসিক্ত করে রেখেছিলো দীর্ঘ সময়—সেই কোলকাতার জন্য। এবং সর্বোপরি তিনি ভালোবাসতেন—গভীর মমতায় তাঁর চৈতন্যে লালন করেছেন—তাঁর স্বদেশকে, যে-ভৌগোলিক সীমানায় আপামর জনসাধারণ ভাববিনিময় করে আপন মাতৃভাষা বাঙলায়, সেই দেশকে। কতো দেশ-মুল্লুক ঘুরেছেন!

"নরগিস দেখেছি, দায়ূদী কিনেছি, লিলি শুঁকেছি, বসরার গোলাপ বুকে গুঁজেছি, বড় বড় ফুলের বাজারে পুষ্প প্রদর্শনীতে অবাক হয়ে বিদেশী ফুলের জৌলুস দেখেছি, কিন্তু কখনো বেশিক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে পারিনি আমার রক্তপদ্মকে।"১৬ —ইনিই ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী—যাঁর উপন্যাসের নায়িকা পর্যন্ত একজন বাঙালী 'পীর'-এর সান্নিধ্যে সত্য ও শান্তির সন্ধান লাভ করে। আপন নায়িকার উদ্দেশে লেখকের 'সানন্দ নমস্কার'-এর হেতু : "বাঙালীমাত্রই—কী হিন্দু, কী মুসলমান—হরবকত তাকিয়ে থাকে পশ্চিমবাগে। কন্নৌজের ব্রাহ্মণ গুরু, দিল্লীর মুসলমান পীর এঁরা এই 'পাপ' বঙ্গদেশে আসেন পশ্চিমের কোনো-এক 'পুণ্য' লোক থেকে।

শহর্-ইয়ারের হৃদয় মন গড়ে দিয়েছেন বাঙালী রবীন্দ্রনাথ।

ধর্মক্ষেত্রে সে যখন অবতরণ করলো তখন সে বরণ করেছে, বাঙালী পীর।"১৭

'গোলামদের' বিত্ত অর্জনের অন্যতম পন্থা মনিবের ভাষা রপ্ত করা। কিন্তু মুজতবার ছেলে তো গোলাম নয়, তাই তাঁর আশা "সে একদিন বাঙলাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবে। আমার ছেলে না পারুক, যদি আপনার ছেলে পারে তাতেই আমি খুশী এবং সেদিন তার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে ইংরেজ ফরাসী আপন আপন মাতৃভাষাতে তার কেতাব অনুবাদ করে—...তবে আমি অমর্ত্য-লোক থেকে তাকে দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করবো।"১৮ মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় আপন বৈদগ্ধ্যের বিকাশ কিংবা বিশ্বভাণ্ডারে কোনোরূপ স্থায়ী সৃষ্টি—যা কালোত্তীর্ণ হতে সমর্থ—সম্ভব নয় এবং তার প্রমাণস্বরূপ মুজতবা আলী বাঙলার 'অত্যাশ্চর্য প্রতিভা' সরোজিনী নাইডুর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন :

"...বিদেশী মায়ামৃগের সন্ধানে বেরিয়ে সরোজিনী স্থায়ী যশের সতী সীতাকে হারালেন।...মাতৃস্তন্য না খেয়ে হরলিক্স খেয়েছিলেন বলে তাঁর (ইংরেজী) কবিতা

কখনও মাতৃরসের স্নিগ্ধতা পেল না।... সরোজিনী প্রমাণ দিলেন, বিদেশী ভাষায় কখনও স্থায়ী সৃষ্টিকর্ম সম্ভব হয় না। আর কোনো ভারতবাসী ভবিষ্যতে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাতে কবিতা লিখবে না। পূর্ব-পাকিস্তান উর্দু গ্রহণ না করে বিচক্ষণতার কার্য করেছে। পশ্চিম বঙ্গ যেন হিন্দী মৃগের সন্ধানে না বেরোয়।"[১৯]

বাঙালী সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের ভেতরে থেকেই আলী সাহেব বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের সাধনার কথা বলেছেন। আপন ভাষা ও অন্যান্য স্বাতন্ত্র্য বর্জন করে নয়। প্রসঙ্গতঃ তিনি একটি উর্দু কবিতার উল্লেখ করেছেন। "মোমিন নামক কবিকে বলা হয়েছিল, 'আর কেন? সমস্ত জীবন তো কাটালে পাপ কর্ম করে; এইবার একটু ধর্মে মন দাও!' মোমিন বললেন,

"উম্র সারী তো কটী ইশ্‌কে বুতাঁ মে
মুমিন!
আখরী ওক্তমে ক্যা খাক্ মুসলমাঁ
হোঙ্গে?"

"সমস্ত জীবন তো কাটলো প্রেম-প্রতিমাদের
মহব্বতে, রে মুমিন,
এখন এই আখেরী সময়ে কি ছাই
মুসলমান হব।"

তাই হিন্দী-উর্দু মাথায় থাকুন। যেটুকু টুটি-ফুটি শেখা আছে সেই 'করেঙ্গা' 'খায়েঙ্গা', 'হাই', 'হুই' করে বাকী কটা দিন 'প্রেমসে' চালিয়ে নেব।"[২০] রাষ্ট্রভাষা যা-ই হোক না কেন মুজতবার পক্ষে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষার দ্বারস্থ হওয়া সম্ভব নয়— যদিও সাধারণের তুলনায় 'রাষ্ট্রভাষায়' তাঁর ব্যুৎপত্তি যথেষ্ট উচ্চ মানের। মুজতবার বাঙলা ও বাঙালী প্রীতি অনেকের কাছেই প্রীতিপ্রদ মনে হয়নি। অত্যধিক বাঙালীয়ানার জন্যে তাঁকে অশোভন কটুকাটব্যও হজম করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি নিরস্ত্র হননি। সপক্ষে আলী সাহেবের নিজস্ব চুট্‌কি :

"পূর্ব বাঙলার গয়নার নৌকা ঘাটে ভিড়তেই ভাড়াটেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সব জায়গা দখল করে নিল। একটা চাষা ধরনের লোক কিছুতেই ঢুকতে না পেরে ছইয়ের বাইরে সেই হিমে বসে রইল।

জায়গা দখল পর্ব শেষ হতে ভিতরে আলাপচারি আরম্ভ হয়েছে।

'আপনার নাম?'

'আজ্ঞে, তারাপদ হালদার। আপনার?'

'আজ্ঞে কেষ্টবিহারী পাল।'

তৃতীয় ব্যক্তিকে, 'আর আপনার?'

'আজ্ঞে শশধরচন্দ্র গুণ।'

... তখন এক মুরুব্বী বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন,

'তোমার নামটা তো জানা হল না, বাবাজীবন।'

লোকটি অতিশয় সবিনয় বললে, 'আজ্ঞে,... আমার নাম পাঁচকড়ি বৈঠা।'

'বৈঠা! এ আবার কি বিদ্‌ঘুটে পদবীরে বাবা!'

লোকটি আবার বৈষ্ণবতর বিনয়ে বলল, 'আজ্ঞে, আপনারা.—হালদার, পাল, গুণ

সব নৌকোর ভিতরে বসে আছেন। নৌকো চালাবে কে ? তাই আমি বৈঠা একা একাই নৌকো চালাচ্ছি।'

বাঙালী কেষ্টবিষ্টুরা নৌকোর ভিতরে বসে আপন ধান্দায় মশগুল। তাই রায়পিথৌরা বৈঠা হরবকৎ চেল্লাচেল্লি করে।"[২১]

মনীষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যে একদা সমৃদ্ধ বাঙালী বিভাগোত্তরকালে চাকুরি-ব্যবসা-বাণিজ্যে তথা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে প্রায় অস্তিত্ববিহীন, অধঃপতনের প্রান্তসীমায়। এই অধোগতির কারণ নির্দেশনায় নিষ্পেষিত সংবেদনশীল বাঙালীর প্রতি মুজতবার অন্তহীন সহানুভূতি প্রকাশিত এবং তার প্রখর মর্যাদাবোধে পরোক্ষে তিনি গৌরবান্বিত।

"স্পর্শকাতরতাই বাঙালীর শ্যাম এবং ঐ স্পর্শকাতরতাই তার শূল। ......যেখানে পাঁচটা সিন্ধী পারমিটের জন্য বড় সায়েবের দরজায় পঞ্চান্ন দিন ধন্না দেবে সেখানে বাঙালীর নাভিশ্বাস ওঠে পাঁচ মিনিটেই। সংসারে করে খেতে হলে ড্রিল ডিসিপ্লিন দরকার। আর এসব জিনিস পারে বুদ্ধি-সুদ্ধিতে যারা কিঞ্চিৎ ভোঁতা, অনুভব-অনুভূতির বেলায় একটুখানি গণ্ডারের চামড়াধারী।"[২২]

স্পর্শকাতরতা এবং বৈদগ্ধ্য বাঙালী চরিত্রে ও জীবনে কাল্ হয়ে দেখা দিয়েছিলো। বিভাগোত্তরকালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালীর ঔদ্ধত্যের বর্ণনায় সৈয়দ মুজতবা আলী :

"যে বোহরার পো পর্শুদিন তক্ বোম্বায়ের রাস্তায় রাস্তায় ছাতা মেরামত করে দিন-গুজরান করতো, যে খোজার ব্যাটা বটতলায় ইঁটের উপর খদ্দের বসিয়ে "নোয়ার ড্যাঁটার" ইটালিয়ান চশমা বেচত, যে মেমন উদয়াস্ত কেনেস্তারার তৈরী ঝাঁঝারি বদ্না ফেরি করে বেড়াত আর যে কচ্ছী ভৃগুকচ্ছের গলিতে গলিতে "তালা কুঞ্জিনা ধান্দা" করে চাপাতী শাক খেত তারা ফাদার অব দি নেশনের কেরপায় ঢাকায় এসে রাতারাতি হয়ে গেল শেঠিয়া, মালিক, শিল্পপতি, আঁতর প্রবর, চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারমেন এবং সর্বোপরি বিশ্বজুটের সর্বাধিকারী হর্তা-কর্তা বিধাতা। আর ছাপরা ইষ্টিশানের বেহারী মুটে হল ট্রাফিক ম্যানেজার।

তালাকুঞ্জির ফেরিওলা থেকে ইঁটে বৈঠানওলা পরকলা বেচনেওলার দাপট তখন দেখে কে ?"[২৩] সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর গৌরবময় সংগ্রামী চেতনার উল্লেখ করে ডঃ আলী প্রচলিত প্রবাদ 'হুনরে চীন' ও 'হুজ্জতে বাঙ্গাল'-এর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

"... প্রবাদটির ফার্সী মূল রূপ "হুনর্-ই-চীন ওয়া হুজ্জৎ-ই-বাঙ্গাল"। অস্যার্থ 'স্কিল অব চায়না অ্যাণ্ড রেবেঁলিয়াসনেস (অবসটিনেসি) অব বেঙ্গল'।... অর্থ দাঁড়ায়, চীন বিখ্যাত তার নৈপুণ্যের জন্য বঙ্গদেশ তার পৌনঃপুনিক বিরোধিতার (একগুঁয়েমির) জন্য।"[২৪]

বঙ্গদেশ বারংবার দিল্লীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। প্রবাদটি সম্ভবতঃ তারই ইঙ্গিতবাহী।

সৈয়দ মুজতবা আলীর অন্যতম প্রিয় কবি হাইনরিষ হাইনে। তিনি শুধু কবিই নন, আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন জার্মানীর সাধারণ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্যে। ফলে তাঁকে জীবনের অধিকাংশ সময় প্যারিস-নির্বাসনে অতিবাহিত করতে হয়। হাইনের ধ্যান-ধারণায় সর্বদাই ছিলো জার্মানী তথা জার্মানীর জনসাধারণের মুক্তি ও কল্যাণকামনা। যে বাঙালী তাঁর পাঁজর জ্বালিয়ে দুঃখ-দহনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে স্বরাজ এনেছে, সে বাঙালী কোথায় ? মুমূর্ষু বাঙালীকে দিক্ নির্দেশ করবেন কে ? এই

জিজ্ঞাসায় মুজতবা বিচলিত, বিদ্ধ। তিনি স্মরণে এনেছেন নির্জিত কবি হাইনের একটি কাহিনী। সম্রাট ম্যাকসিমীলিয়ান পাষাণ প্রাচীরের কঠিন কারাগারে নিক্ষিপ্ত। অমাত্য, মন্ত্রীপরিষদ সকলেই তাঁকে বর্জন করেছে। এমনি অবস্থায় আশার বাণী নিয়ে, মুক্তির নব সূর্যোদয়ের সুসংবাদ নিয়ে এলো রাজসভার ভাঁড় বিশ্বাসী কুন্‌ৎস্‌ফন্ ড্যার রোজেন—যাঁর একমাত্র কাজ ছিলো জার্মানীর জনসাধারণের মনোরঞ্জন করা, দুঃখ-দুর্দিনে তাদের জন্যে অভয় বাণী নিয়ে আসা। যে উদাত্ত কণ্ঠে পিতৃভূমির উদ্দেশে প্রগাঢ় দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে অভয় দান করতে পারে— "হে আমার দেশবাসিগণ, তোমরাই তো প্রকৃত সম্রাট, তোমরাই তো দেশের প্রকৃত প্রভু। তোমাদের ইচ্ছা, এমন কি তোমাদের খেয়াল-খুশীই তো দেশের প্রকৃত শক্তি—এ শক্তি 'বিধি-দত্ত' রাজদণ্ডকে অনায়াসে পদদলিত করে! হতে পারে আজ তোমরা পদ-শৃঙ্খলিত, কারাগারে নিক্ষিপ্ত—কিন্তু আর কত দিন ? ঐ হেরো, মুক্তির নব অরুণোদয়!'

হে বাঙালী, আজ তুমি দুর্দশার চরমে পৌঁচেছো।

কোথায় তোমার কুন্‌ৎস্ ফন্ ড্যার রোজেন? যে তোমাকে আশার বাণী শোনাবে?"[২৫]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বঞ্চিত বাঙালীর নির্জীব অসহায়তায় মুজতবা মানসের হাহাকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসে অগ্নিযুগের বাঙলাকে স্মরণ করেন :

"... বিপ্লবী যুগের এই তরুণদের হৃদয়, কী অদ্ভুত সাহস, আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী অবিশ্বাস্য তাচ্ছিল্যে ভরা ছিল।... উল্লাস, কানাই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে হেসেছিল—যেন কাঁধ থেকে বেঁচে থাকার একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল। আজ যখন বাঙলাদেশের দিকে তাকাই, তখন বারংবার শিরে করাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করে, হে ভগবান, সে যুগে তুমি অকৃপণ হস্তে বাঙলাদেশকে এত দিয়েছিলে বলেই কি আজ তোমার ভাণ্ডার সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গিয়েছে ?"[২৬]

০২.

"আমি হিন্দু নই, ব্রাহ্ম নই, আমি নিষ্ঠাবান মুসলমানের ছেলে, রবীন্দ্রনাথ আমার গুরু, হিন্দু ব্রাহ্ম সকলকেই আমি শ্রদ্ধা করি"[২৭] —সর্ব ধর্ম মন্থন ও আত্মস্থ করে বিশ্বধর্মের সারভাগ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। ধর্মের বলির জন্যে মানুষ নয়, মানুষের কল্যাণের জন্যেই ধর্ম এবং সাধারণ মানুষের মানসিক প্রশান্তি ও বিক্ষিপ্ত চিত্তের প্রশমনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব প্রশ্নাতীত—এ' বিষয়ে তাঁর মনে কোনো রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্থান ছিলো না। ধর্মচর্চায় ছিলো তাঁর পরমানন্দ এবং তিনি ধর্মনিষ্ঠও ছিলেন। কিন্তু প্রচলিত ধর্মীয় আচরণ বা অনুশীলন থেকে সযত্নে নিজেকে সরিয়ে রাখতেন। কেননা, ডঃ আলীর আত্যন্তিক বিশ্বাস—তেষ্টা না থাকলে অহেতুক জলপানের কোনো প্রয়োজন নেই। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মান্ধ আচারনিষ্ঠদের নিয়ে হালকা রসিকতাও করেছেন। এ' প্রসঙ্গে এক প্রশ্নোত্তরে শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লিখেছেন,—" 'ধর্মশিক্ষা' এখনো পাইনি।... আর তোমরা তো কায়স্থ। তোমাদের মহা সুবিধে—কোন 'ধর্মকর্ম' করার আদেশ তোমাদের উপর নেই। কিঞ্চিত আতপ চাল আর দুটো কাঁচকলা বামুনকে ডেকে

দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়। হিন্দু ধর্ম বড় Specialist-দের ধর্ম। বামুনরা Specialist —... সেই Specialist যখন রয়েছে তখন তুমি আমি খামকা অত তকলীফ বরদাস্ত করে আনাড়ির মত এমেচারি করতে যাব কেন ?... আমার অবশ্য সমূহ বিপদ। একে তো সব মুসলমানকেই পাঁচ বেকৎ নামাজ করতে হয়, তার উপর আমি আবার সৈয়দ, মুহম্মদের বংশধর... তার উপর আমার গুরুবংশ... এবং fianally কাইরোর ভুবনবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝাড়া দেড়টি বছর শুদ্ধমাত্র* স্মৃতি... নিয়ে research করেছি।

আমার মত 'জ্ঞানপাপী' এ জগতে দুর্লভ। আমার কি গতি হবে, বলো তো।"[২৮]

এ' দেশের বৈষ্ণব-সহজিয়া-আউল-বাউল এবং সূফী সাধকেরা সাধনার সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করে যে সহজ সত্যের তথা চিরন্তন মানবধর্মের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মধুর সম্পর্ক আবিষ্কার করে ভাবোদ্বেল হয়েছিলেন মহাপ্রাজ্ঞ আলী সাহেবও তাঁর শাস্ত্রচর্চার উপান্তে পৌঁছে সেই একই সত্যের মহিমান্বিত রূপ দর্শন করে তাঁদেরই সঙ্গে একাত্ম বোধ করেন। সেই সহজ সত্যের সন্ধান যিনি লাভ করেছেন তাঁর কাছে সর্ব ধর্মের বিরোধ, মানুষে মানুষে বিভেদ বিলীন হয়ে যায়। অমলিন চিরশাশ্বত রূপে মূর্তিমান হয়ে উঠে চিরায়ত মানবধর্ম। এর জন্যে যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন নেই, অপ্রয়োজনীয় ধর্মব্যবসায়ী কিংবা সমাজপতির অঙ্গুলি নির্দেশ। মৃত্যুর মাসখানেক পূর্বে মুজতবা আলী তাঁর এক ভাগিনেয় প্রাক্তন জেলা প্রশাসক জনাব আবদুল কাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, প্রার্থনার সময় তিনি কি বলেন।

"আমি (কাদের) বললাম, 'আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং তাঁর করুণা ভিক্ষা করি।' মামা শুধালেন, তুমি যখন বিচার কর তখন কি দেখে আসামীকে সাজা দাও।' আমি বললাম, 'প্রথম সিদ্ধান্ত নিতে হয়, আসামী জেনেশুনে পাপ বা অন্যায় করেছে কি না। অজানায় করে থাকলে সাজা হয় না।' মামা বললেন, 'অজানায় পাপ করলে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনার কি কারণ থাকতে পারে। তিনি রহমানুর রাহিম, কিন্তু তোমরা তাঁকে কসাই বা জল্লাদ বানিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছ ? অবশ্য শুধুমাত্র বিনয় প্রকাশের জন্যে তাঁর কাছে বিনা কারণে মাথা নত করা যায়।" (সা-৮)।

মানবসভ্যতার পশ্চাতে ধর্মের বিরাট অবদান সম্পর্কে মুজতবা আলী ছিলেন সম্পূর্ণ অবহিত। দীর্ঘদিনের ইতিহাস, ধর্মীয়চেতনা এবং ঐতিহ্যানুসরণ সভ্যতার ক্রমবিকাশকে করেছে ত্বরান্বিত। ইতিহাস ও ধর্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে অন্বিত। আবার ধর্মীয় ইতিহাসের পশ্চাতে কাজ করেছে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। শক্তিমত্তার বশবর্তী হয়ে কোনো জাতির ওপর বিশেষ কোনো ধর্মমত তাদের অনিচ্ছায় চাপিয়ে দেয়া হলে তা' কখনো সুফলপ্রসূ হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস তারই সাক্ষ্য বহন করে। অন্যদিকে ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ধর্মহীন রাজনীতি প্রাচীন বা মধ্যযুগের বিশ্বে ছিলো না, বিংশ শতাব্দীতেও রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মের প্রচণ্ড প্রভাব কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। রাজা এবং চার্চের সম্বন্ধ বিচার-বিশ্লেষণ করলে কিংবা আমাদের দেশের রাজনীতি ও ধর্মীয় চেতনার গতি-প্রকৃতি অনুসরণ করলেও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। অবশ্য তা' কতোটা মানব-কল্যাণমুখী—সেটা ভিন্ন প্রশ্ন।

"...ধর্মের ইতিহাস অধ্যয়ন করলেই দেখতে পাবেন ভগবানকে পাওয়ার জন্য ধর্ম যতখানি মাথা ঘামিয়েছে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি চেষ্টা করেছে মানুষে মানুষে সম্পর্ক সভ্যতর করার জন্য। ধর্ম চেষ্টা করেছে, ধনী দরিদ্রের পার্থক্য কমাতে, অন্ধ-আতুরের

* আসলে মাত্র কয়েক মাস।

আশ্রয় নির্মাণ করাতে—এক কথায় এমন এক নবীন সমাজ গড়ে তুলতে, যেখানে মানুষে মাৎস্যন্যায় বর্জন করে, একে অন্যের সহযোগিতায় আপন আপন শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ করতে পারে।”[২৯]

সুতরাং সামাজিক তথা মানবের সার্বিক মঙ্গলার্থে ধর্মপ্রচারকরা যুগে যুগে পৃথিবীতে একেকটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং তাঁদের আহ্বানে ছিন্নমূল নিরন্ন নিপীড়িতের দলই সাগ্রহে সাড়া দিয়েছে। অর্থনৈতিক ভিত্তিহীন, শুধুমাত্র ধর্মের মহান বাণী আশ্রয় করে কোনো ধর্মের প্রতিষ্ঠা দুরূহ।

“হজরৎ যখন মক্কায় একেশ্বরবাদ প্রচার করলেন তখন মক্কাবাসী সাড়ে তিন শ' দেবতা স্বীকার করতো। আরেকটা বাড়লে আপত্তিটা কি ?...

কিন্তু যেই তিনি প্রচার করলেন, ধনীর উপর ট্যাকশো বসিয়ে সে-ধন ...গরীবদের, 'হ্যাভ-নট'-দের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন তখনই লাগল গণ্ডগোল। ওদিকে 'হ্যাভনট'রা জুটলো তাঁর চতুর্দিকে—টাকাকড়ি নয়া করে ভাগাভাগি হলে তারাই হবে লাভবান! ধনী আদর্শবাদী জুটলেন অত্যল্পই, মক্কাবাসীরা তখন স্থির করলো, একে খুন না করে নিষ্কৃতি নেই।

খৃষ্টের বেলাও তাই।

তিনিও...প্রচারকার্য আরম্ভ করেছিলেন সমাজের দরিদ্রতম স্তরের গরীব জেলেদের নিয়ে।...

ইহুদি ভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে সহস্র সহস্র শিষ্য-শিষ্যা, বিশ্বাসী গ্রামবাসী অনুগতজনকে নিয়ে প্রভু যিশু সগৌরবে প্রবেশ করলেন জেরুস্লমে। সেখানে গেলেন সেই সর্বজনমান্য মন্দিরে।...

মহাজন, ক্রেতা-বিক্রেতাদের তিনি ঝেঁটিয়ে বের করে দিলেন মন্দিরের বাইরে। ...টাকার থলেগুলো উজাড় করে ঢেলে দিলেন মাটিতে, ব্যাঙ্কারদের টেবিল করে দিলেন চিৎপাত। বললেন, 'শাস্ত্রে আছে: আমার ভবনের নাম হবে “উপাসনা ভবন”, আর তোরা এটাকে করে তুলেছিস “চোরের আড্ডা” (ডেন্ অব থীভজ্)।'

সেই সময়ই স্থির করলেন, পুঁজিপতি ও তাদের ইয়ার যাজক সম্প্রদায়—যীশুকে বিনষ্ট করতে হবে, ক্রুশবিদ্ধ করে মারতে হবে।”[৩০]

মুজতবা আলী অন্যত্র বলেছেন—“ধনীদের আয়ের কিয়দংশ 'জাকাত' অর্থাৎ গরীবদের দান করতে হবে।...কাজেই ইসলামের এই সাম্যের ভিত্তিতে ধনবণ্টননীতি যদি পালন না করা হয়—redistribution of wealth দ্বারা যদি 'হ্যাভ্নট'দের কোন সুব্যবস্থা না হয়, তাহলে ইসলামের মূল-নীতি মানা হবে না।”[৩১]

শতাধিক বৎসর পূর্বেও সাধারণ ধর্মনিষ্ঠ সজ্জন ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যেই নিজেকে সংশ্লিষ্ট রেখে নিরুপদ্রবে জীবনযাপনে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রতিবেশীর ধর্মকথা বা অনুশীলন তাঁকে সামান্যতমও আকর্ষণ করতো না। শুধু তাই নয়, পরধর্মাবলম্বীর সংশ্রব এড়িয়ে স্বধর্মের বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত এবং বিশেষতঃ অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত কিংবা কুসংস্কারের ঠুলি পরিহিতদের হাতে ধর্মের শাসনদণ্ড গচ্ছিত থাকার ফলেই তথাকথিত ধর্মাচরণ করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ অজ্ঞাতে অধর্মের পথে অগ্রসর হয়। ফলে সামাজিক অকল্যাণ ও মানবীয় সুকুমার বৃত্তির মৃত্যু হয়ে উঠে অবধারিত। মুক্তদৃষ্টির পর্যবেক্ষণে ধর্মে নিহিত কল্যাণবোধই প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

সৈয়দ মুজতবা আলী 'ঈদ-আনন্দোৎসব' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, “বস্তুত ইসলামই

ইনকাম ট্যাক্স—জাকাৎ—ধর্মের অঙ্গরূপে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক করে।"[৩২] এমনকি ধর্মীয় আচার-আচরণেরও মূল লক্ষ্য মানুষে মানুষে মিলন, ভ্রাতৃভাব গড়ে তোলা এবং পরস্পরের নৈকট্য লাভ। উদাহরণ হিসেবে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুশীলন বা অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলী সাহেব উল্লেখ করেছেন যে, দৈনিক অবশ্য পাঁচবার পালনীয় (ফর্জ) নামাজ বাড়ীতে কিংবা মসজিদে পড়া যায়। কিন্তু জুম্মার নামাজ অবশ্যই মসজিদে পড়তে হবে। এর উদ্দেশ্য শুধু ধর্মাচার নয়, প্রত্যেক মুসলমান যেন সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন মসজিদে প্রতিবেশী সমধর্মীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একাত্মবোধজাত ঐক্য ও শক্তি অনুভব করতে পারে। "এরপরই আসে বৎসরে দু' বার করে ঈদের নামাজ। ইমানদার মুসলিম মাত্রই চেষ্টা করে, বৃহত্তম মুসলিম জনসংঘের সঙ্গে জমাৎ-এ সে যেন নামাজ পড়তে পারে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য যত দূর-দূরান্ত থেকে যত সব নামাজার্থী ঈদগাহ্‌তে জমায়েৎ হয়ে তাদের সংখ্যা, তাদের ধর্মানুরাগ দেখে তাদের প্রত্যেকেই যেন আত্মবল, সংহতি-শক্তি অনুভব করতে পারে। ঐদিন পরিচিত জনের মাধ্যমে বিস্তর অপরিচিতের সঙ্গে তার পরিচয় হয় ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন দ্বারা।...কিন্তু সর্ব দৃষ্টিবিন্দু থেকেই ঈদ-উল-আজহা বহুগুণে গুরুত্বব্যঞ্জক।

...আল্লা যাকে তওফীক দিয়েছে...সে যেন জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কাশরীফে গিয়ে বিশ্ব মুসলিমের সঙ্গে একত্র হয়। বিশ্ব মুসলিমের সত্তা-সংহতি-ব্যাপ্তি সে যেন দেখে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, তার ক্ষুদ্র সত্তা যেন বৃহত্তম মুসলিম সত্তার সঙ্গে সম্মিলিত হয়।"[৩৩]

মুজতবা আলীর দৃঢ়প্রত্যয়, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও পরস্পরের প্রতি সন্দেহপ্রবণ মানবসমাজে ধর্মের অমোঘ পন্থা ও বাণীই তাদের শান্তির পথে নিয়ে যেতে পারে। এবং তা সম্ভব সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সশ্রদ্ধায় একে অন্যের ধর্মকে জেনে। "ধর্ম নিয়ে আজকাল আর যুদ্ধ হয় না, কিন্তু ধর্ম এখনো মানুষে মানুষে দেশে দেশে মৈত্রী আনতে সহায়তা করতে পারে। তবে তা স্বধর্ম বর্জন করে নয়, অন্য ধর্ম থেকে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ করে—।"[৩৪] তিনি উল্লেখ করেছেন, ধর্ম আচরণে নয়, ধর্ম চর্চাতে তাঁর চিরকালের শখ। এবং এরই বশবর্তী হয়ে একবার ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমানের পুণ্য তীর্থভূমি প্যালেস্টাইনে গিয়েছিলেন। ধর্মচর্চার গভীরতম স্তরে উপনীত হয়ে ডঃ আলীর উপলব্ধ সত্য :

"ধর্ম পরিবর্তনের যুগ আর নেই, প্রয়োজনও নেই। একদা এ পৃথিবীতে অন্য ধর্মের তত্ত্ব এবং সার অনুসন্ধান করতে হলে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ এবং সে সমাজে সম্পূর্ণ প্রবেশ না করে সে ধর্মের ফল লাভ করার কোনো পন্থা উন্মুক্ত থাকতো না—কারণ তখন প্রত্যেক ধর্ম আপন আপন—সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকত। আজ সর্বধর্মগ্রন্থ অনায়াসলভ্য, আজ আমরা অন্য ধর্মের সাধুসজ্জনদের সহবাস করতে পারি, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের দোষ-গুণ আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করে নিতে পারি।... সুতরাং আজ আর ধর্ম পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই; আজ হিন্দু খ্রিস্টান না হয়েও আপন সমাজে অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে পারে, মুসলমান হিন্দু না হয়েও শঙ্করদর্শন মেনে নিয়ে জীবন সে ধারায় চালাতে পারে।"[৩৫]

মুজতবা আলী গভীর দুঃখে স্মরণ করেন, ষড়দর্শন নির্মাতা আর্য মনীষীদের উত্তরপুরুষরা ভারতবর্ষে মুসলিম আগমনের পর সাতশত বৎসর চতুষ্পাঠীতে দর্শনচর্চা করেছেন, কিন্তু পার্শ্ববর্তী মদ্রাসায় একই সময়ে আরবীতে প্লাতো থেকে আরম্ভ করে কিন্দী, ফারাবী, বু আলী সিনা, অল-গজ্জালী, আবু রুশদ্ প্রভৃতি মনীষীর যে দর্শনচর্চা হয়েছে তার সন্ধানই পেলেন না। অনুরূপ মুসলমান মৌলানারাও অমুসলিম প্লাতো-

আরিস্ততলের দর্শনচর্চায় আকণ্ঠনিমগ্ন হলেও হিন্দু-মনীষার খোঁজ পর্যন্ত করলেন না। "সবচেয়ে পরমাশ্চর্য,...যে চরক-সুশ্রুতের আরবী অনুবাদে পুষ্ট বু আলী সিনার চিকিৎসাশাস্ত্র—'য়ুনানী' নামে প্রচলিত...মাদ্রাসায় পড়েছেন, সেই সিনার চরক-সুশ্রুতের মূল পাশের টোলে পড়ান হচ্ছে।"[৩৬]

ধর্মান্ধতা যুগে যুগে মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে, মহাসত্যের পথ থেকে ঠেলে দিয়েছে নিশ্ছিদ্র তমসাচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় অন্ধকূপে। মনুষ্যসৃষ্ট আচারিক ভিন্নতার জন্যে কতো সহজে একে অপরকে 'ধর্মহীন' অভিধায় চিহ্নিত করেন। ডঃ আলী লিখেছেন—"মুসলমান ধর্মে বলা হয়, যে লোক আর্তের সেবা তথা মিথ্যাচার বর্জন করে সৎপথে চলে—তাকে 'পয়গম্বরহীন' মুসলমান বলা যেতে পারে, হজরৎ মুহম্মদকে পয়গম্বররূপে স্বীকার করেনি বলেই ধর্মহীন নয়।"[৩৭] স্বসৃষ্ট ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং কূপমণ্ডুকতার ফলেই ধর্মের দোহাই দিয়ে "হিন্দুধর্ম ভিন্নধর্মালম্বীকে আপন ধর্মে গ্রহণ করে না। ...মুসলমান বিধর্মীকে মুসলমান করতে চায়। উভয়ের মিলনের চিন্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিংবা মুসলমান মৌলবী কেউ করেন না।"[৩৮] মুজতবা আলীর একান্ত বিশ্বাস ছিলো, ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে শুধুমাত্র মনুষ্যত্বের নিরিখে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে সৌহার্দ্য গড়ে তুলতে পারে।

"...হিন্দু হিন্দু থাকবে, মুসলমান মুসলমান থাকবে অথচ উভয়ের মধ্যে মিলন হবে, হৃদ্যতা হবে।"[৩৮]

ধর্মের পূর্বে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারও তাৎপর্যহীন বলে ডঃ আলী অভিমত পোষণ করেন। বরঞ্চ এতে মানুষে মানুষে বিভেদ সন্দেহ বৃদ্ধি পায় মাত্র। তিনি মনে করেন, " হিন্দুধর্ম' বলে কোনো জিনিস থাকতে পারে না। ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি তার অর্থ সনাতন চিরন্তন ধর্ম। এ ধর্মের আগে 'হিন্দু' শব্দ লাগানো যায় না। ঠিক যে রকম 'হিন্দু ভগবান', 'মুসলমান ভগবান' কিম্বা 'খ্রিষ্টান ভগবান' হতে পারেন না।

শুধু হিন্দুরাই নয়, বৌদ্ধরাও যখন ত্রিশরণ মন্ত্রে 'ধম্মং শরণং গচ্ছামি' বলেন তখন তো 'ধম্মের' পূর্বে বৌদ্ধ শব্দ লাগান না।

কুরানে ধর্ম শব্দের জন্য পাই 'দীন' কিংবা 'দীনুল্লা' অর্থাৎ যে 'দীন আল্লার দিকে নিয়ে যায়।' অন্য শব্দ 'ইসলাম'। 'ইসলাম' শব্দের ধাতু 'ভগবানের ইচ্ছার সম্মুখে....আত্মসমর্পণ করা।'

তাই ধর্ম শব্দের আগে 'হিন্দু' কিম্বা 'মুসলমান' শব্দের প্রয়োগ আমি বুঝে উঠতে পারিনে। ধর্ম সর্বমানবের জন্য,—তার আবার হিন্দু-মুসলমান কি ?"[৩৯]

'ধর্মের' সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা সম্ভবতঃ আজো নিরূপিত হয়নি। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত সৈয়দ মুজতবা আলী 'ধর্মবাবদে' নিজেকে মনে করেন "একটি আস্ত চিনির বলদ। ওটা দেখেছি, শুঁকেছি, ওর দরদাম নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি, কিন্তু ওটা কক্‌খনো চাখিনি—খেয়ে দেখা তো দূরে।"[৪০] জিজ্ঞাসুজনের নিকট সবিনয় কবুল করতে হয় :

"...আমি আসলে ইনফর্মেশন আপিসের কেরাণী। কোন্ ট্রেন ক' ঘণ্টা লেট্ বাৎলে দি। অমৃতসর যেতে হলে কোথায় চেঞ্জ করতে হয় বলে দি, তাঞ্জোরের ভাড়া কত, সেটাও বলে দি, তার মানে তো এ নয়, যে আমি কুল্লে লেট্ ট্রেনে সশরীরে ছিলুম, কিম্বা অমৃতসর তাঞ্জোর ঘুরে এসেছি।"[৪১] 'ধর্ম কি ?' —এর সদুত্তর অজানা থাকলেও আলী সাহেব জানেন যে, ধর্মের সন্ধান করে পাপী। কারণ "পুণ্যাত্মা তো পেয়ে গিয়েছে—'য

এতদ্ বিদুঃ অমৃতাং'—যিনি তাঁকে জেনেছেন তিনি অমৃত হয়ে গেছেন—তাই তো মন্দিরে যায় পাপী,...তীর্থে তীর্থে পাপীর ভিড়, ...এত অনাচার। তা সে গয়া বলো, আর আজমীর শরীফই বলো।

ধর্ম খোঁজে আর এক গোষ্ঠী। যারা সংসারে অনর্থক, অহেতুক, খামকা বড্ড বেশী মার খেয়েছে। তরুণী বিধবা মা একমাত্র পুত্র হারিয়েছে, রমণী যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীকে হারিয়েছে, ভাই ভাইকে হারিয়েছে,...এরা কোনো দিকে সান্ত্বনার সন্ধান না পেয়ে হাউ মাউ করে কাঁদে, পায়ে লুটিয়ে পড়ে গুরুদের সামনে। যদি সেখানে মনের শান্তি পায়।"[৪১]

ধর্মতো মানুষের একটা বিশ্বাস, আপন ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে যে বিশ্বাসকে আশ্রয় করে সে মুক্তি খোঁজে, মোক্ষের সন্ধান করে। নিজ শক্তিতে আস্থাহীনজন গুরু-মুর্শিদের শরণ নেয়। "খৃস্টান বিশ্বাস করে, প্রভু যীশুই একমাত্র ত্রাণকর্তা। সেই একমাত্র ত্রাণকর্তাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করলে মানুষ অনন্তকাল নরকের আগুনে জ্বলবে। আমি বিশ্বাস করি, প্রভু বুদ্ধ, হজরৎ মহম্মদে বিশ্বাস করেও ত্রাণ পাওয়া যায়। এমনকি কাউকে বিশ্বাস না করে আপন চেষ্টাতেও ত্রাণ পাওয়া যায়।"[৪২]

মুজতবা আলী সূফী কিংবা বৈষ্ণব-সহজিয়াদের মতোই বিশ্বাস করতেন, কোনো আনুষ্ঠানিকতার বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে নয়, শুধুমাত্র প্রেমের মধ্য দিয়েই পরমকরুণাময়ের অস্তিত্ব হৃদয়ে উপলব্ধি সম্ভব। কাজেই আল্লাহ্‌র সন্ধানে প্রাণপাত করা পণ্ডশ্রম বৈকি! সাধুর সঙ্গে তিনিও ঐকমত্য পোষণ করেন :

' "ভগবান কোথায়"—নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছিলো সাধুকে,...কৃচ্ছ্র-সাধনাসক্ত, দীর্ঘ তপস্যারত চিরকুমার সাধু বলেছিলেন, "তরুণ-তরুণীর চুম্বনের মাঝখানে থাকেন ভগবান"।'[৪৩]

সৃষ্টিকর্তার মধুর রূপই মুজতবাকে আকৃষ্ট করেছিলো। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে বয়স্যকে লিখতে পারেন, "আপনাদের হিন্দু ধর্মে ভগবানের সঙ্গে দাস্য, সখ্য নানা প্রকারের সম্পর্ক আছে। ...আমার সঙ্গে ওঁয়ার সম্পর্ক 'হাস্যরসের'—তার সঙ্গে মেশানো আছে একটু grotesque, একটু bizarre, রোজ 'রেতে'...ঘুমুবার পূর্বে ভগবানের সঙ্গে আমার দু' দণ্ড রাসালাপ হয়।" (প-২৩২)

সৈয়দ মুজতবা আলী সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। এবং বারংবার উচ্চারণ করেছেন, মনুষ্যত্বই মানুষের একমাত্র ধর্ম, একমাত্র অভিজ্ঞান। সমকালে একই লোকে বসবাস করা সত্ত্বেও হাজারো বন্ধন আমাদের মনোলোককে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে, অপরিচয়ের অচলায়তন পরস্পরকে করেছে বিচ্ছিন্ন। মুজতবার সমগ্র রচনার মধ্যে একটি সক্রিয় প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তিনি আমৃত্যু সচেষ্ট ছিলেন, অপরিচিতির গণ্ডী ভেদ করে মানুষকে পরস্পরের সম্মুখীন করে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে। তাই তো দেখি জার্মানীর বেদেনী এক লহমায় তাঁকে আপনজন হিসেবে সনাক্ত করে নেয়। সামান্য দু' হাজার বছরের ব্যবধানে আপনজন কি পর হতে পারে! আমরা অতি ক্ষুদ্রমতি। তাই তাঁকে সকলের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের পরিচিত আঙ্গিনায় একান্ত নিজের জন হিসেবে ভাবতে ভালোবাসি।

মুজতবা আলী ধর্মকে কখনো অস্বীকার করেননি। তিনি "সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কোনোদিনই কোনো ক্ষুদ্র ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী।—যে বাঙালীর ধমনীতে প্রবাহিত হিন্দুর নির্লিপ্ততা,

ইসলামের সাম্য ও বৈষ্ণবের প্রেম।"[৪৪] শুধু ধর্মের সন্ধানে তামসিক অতীতের অন্ধ গুহায় প্রত্যাবর্তনে তিনি ছিলেন অনীহ। ধর্মে আস্থাশীল বলেই 'কায়মনোবাক্যে' মানেন,

"নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখ্য ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত তাহার আর শ্রীর অন্ত নাই, হে রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনিয়াছি। যে চলে দেবতা ইন্দ্রও সখা হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলিতে চাহে না, সে শ্রেষ্ঠজন হইলেও সে ক্রমে নীচ (পাপী) হইতে থাকে, অতএব, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।"[৪৫] এবং ধর্মের চেয়েও বেশী মানেন ভারতীয় বৈদগ্ধ্যকে। এই বৈদগ্ধ্যকে যুগ-ধর্মোপযোগী করে বিশ্বসভায় উপস্থাপন করতে হবে। "তারপর এগিয়ে চলতে হবে তাদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে, ইয়োরোপ, চীন, আরবের সর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলার সর্বোত্তম নিদর্শন গ্রহণ করে, ভারতের সম্পদ দান করে।"[৪৫]

এই বৈদগ্ধ্যকে জানবার জন্যে, এর অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে এবং তাকে সর্বাত্মক ঋদ্ধ করার মানসে দেশীয় ঐতিহ্য-ইতিহাস-ধর্ম-সংস্কৃতি তথা জনচেতনার সঙ্গে একাত্ম হতে হবে এবং সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ও মাণ্ডুক্য পদদলিত করে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়ার জন্যে মুজতবা আহ্বান জানিয়েছেন—এটাই যুগবাণী—যুগধর্ম। এ' ধর্মকেই ব্যক্তিজীবনে বরণ করেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী।

০৩.

স্বদেশী ও খিলাফত আন্দোলনকালে সৈয়দ মুজতবা আলী পরাধীনতার গ্লানি এবং সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস স্বরূপের সম্মুখীন হন। বিদ্রোহী কিশোর মন ইংরেজের শিক্ষায়তন অপেক্ষা মোজা বুননের ক্ষুদ্র পরিসরকেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বলে বিবেচনা করেছে। কাবুলে অরাজকতার দিনে 'ধবল-দম্ভের' বিকট মুখব্যাদান তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ বিমুখ করে তোলে। অবমাননার জ্বালা তাঁকে পলে পলে দগ্ধ করতে থাকে। মুজতবা-মানসে পুঞ্জীভূত মর্মান্তিক ক্ষোভ অন্তহীন ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে তাঁর রচনার সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৃটিশ-বিদ্বেষের প্রাচুর্য। শ্বেত শাসকের কোনো কোনো সদগুণ তাঁকে আকৃষ্ট করলেও দীর্ঘদিনের লাঞ্ছনা ইংরেজদের ঘনিষ্ঠতা লাভে মুজতবাকে কখনো প্রলুব্ধ করতে পারেনি। ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রতি জার্মানীর সম্ভ্রমবোধ আলী সাহেবকেও ঐ দেশটির প্রতি সহানুভূতিশীল তথা সশ্রদ্ধ করে তুলেছিলো। "এতদিন জর্মনদের বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষ একদা সভ্যতা-সংস্কৃতির উচ্চ শিখরে উঠেছিল বটে, কিন্তু বর্তমানযুগে সে দেশে শুধু ম্যালেরিয়া, গোখরো এবং ইংরেজ। (যদিও অবান্তর তবু বলে ফেলি, শেষের দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বেশি বেইমান সেটা পশুবিদ্‌রা এ যাবৎ স্থির করে উঠতে পারেননি!)"[৪৬] এ' বিদ্বেষ একদিনের সৃষ্টি নয়। যুগ যুগ যে অত্যাচার অবিচার অমানবিক আচরণ এ-দেশবাসীর ওপর চলেছে তার ফিরিস্তি দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ। আলী সাহেব কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো বা গালগল্প চুট্‌কির মাধ্যমে ইংরেজচরিত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে পরাধীন ভারতের অসহায় মানুষের চিত্র তুলে ধরেছেন। সাহিত্য-সঙ্গীত-

চিত্রকলা-ভাস্কর্য প্রভৃতি সুকুমার কলা, এমনকি পোষাক-পরিচ্ছদ ও রন্ধন-প্রণালীর ক্ষেত্রে 'চরুয়া' ইংরেজ যে কতোটা ফরাসী ও জার্মানদের মুখাপেক্ষী তার বিশদ বয়ান দিয়ে দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন, "আমরা যেন ইউরোপের তাবৎ কর্মকীর্তি ইংরেজদের জমার খাতায় লিখিয়া তাহাকে অহেতুক ভক্তি না দেখাই।"[৪৭] ফরাসীর জাতীয় গৌরব তার সৃষ্টি কলার সর্বত্র এবং এ' গৌরব সম্পর্কে তারা অত্যন্ত সচেতন। জার্মান জাতিকে যতই মসীলিপ্ত করে চিত্রিত করা হোক না কেন তারাও 'বিদগ্ধ পৃথিবীর পুণ্যভূমি' প্যারিসে বিজেতারূপে পদার্পণ করে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। তারা "লুণ্ঠন করিল না, ধর্ষণ করিল না; স্থাপত্য এখনো অটুট, বিশ্ববিদ্যালয় ভস্মীভূত হয় নাই।... মনে পড়িতেছে তাজমহলের গাইড বলিয়াছিল, কাহারা নাকি তাজের মণিমুক্তা সরাইয়া ফেলিয়াছে।"[৪৮]

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে মুজতবা পরাধীনতার অভিশাপে শৃঙ্খলিত দেশবাসীর অসহায় করুণ চিত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। 'দুই বিদেশী সিপাহী রিক্সা হইতে নামিয়া আলোচনা করিতেছিল, কত ভাড়া দেওয়া যায়। একজন বলিল, "বেশী না, কারণ শুনিয়াছি রিক্সাওয়ালারা বেশীদিন বাঁচে না।···

গোড়ার কথা চিন্তা করিয়া অন্য তত্ত্ব খুঁজিয়া পাইলাম। ভারতবাসী ইংরাজের মতো দীর্ঘজীবী নহে বলিয়াই তাহার বেতন কম। চা-বাগানের, জুটমিলের কুলী সায়েবের মতো দীর্ঘজীবী নহে বলিয়া তাহার মজুরী কম, কেরানীর বেতন কম, এমন কি কালা-হাকিমেরও বেতন কম।"[৪৯] শিখ সর্দারজীর সঙ্গে মুজতবা আলীও সম্পূর্ণ অভিন্ন মত পোষণ করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ পরাজিত হলে "দুনিয়া থেকে বেইমানি লোপ পেয়ে" যেতো। শৃঙ্খলিত মানুষের বন্ধন-মুক্তির কামনা এবং অবমাননার জ্বালা কিঞ্চিৎ প্রশমনের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা পাই তাঁর রচনায়। ১৯৩৮-এ মুজতবার জার্মান সফরকালে 'মহামান্য সম্রাটের অতিমান্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীল শ্রীযুক্ত চেম্বারলেন সায়েব মুক্তকচ্ছ হইয়া ছুটিয়াছেন গডেস্‌বের্গে শহরে হিটলারের হাতে চড় খাইবার জন্য। আর সে কি বেসরম বেইজ্জতি চড় খাওয়া! ...

আহা, সেদিনের কথা স্মরণ করিলে গায়ে পুলক লাগে, ভগবানে লুপ্ত বিশ্বাস সেই দিনই ফিরিয়া পাইয়াছিলাম, গুরু আছেন, ধর্ম আছেন, যাইবে কোথায়?... অতি নির্লজ্জতার সহিত পুনরায় বলিতেছি, বড় সুখ পাইয়াছিলাম। রোজ সকালে উঠিয়া গাঁটের মবলগ সিক্কা পয়সা খসাইয়া বারোখানা জর্মন খবরের কাগজ কিনিতাম, চিরিয়া চিরিয়া কুটিয়া কুটিয়া, মন্ত্রিবরের অপমান নির্যাতনের খবর পড়িতাম, শূন্যঘরে অট্টহাস্য করিতাম, সশ্রদ্ধমনে কাটিঙ্‌ রাখিতাম, দেশ হইতে দুঃসংবাদ আসিলে সেই কাটিঙগুলি পড়িয়া শাস্ত্রপাঠজনিত বিমল শান্তি অনুভব করিতাম।"[৫০]—অন্তরীণাবদ্ধ বিক্ষুব্ধ মানসিকতার রসগ্রাহী নিদর্শন! দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও মুজতবার সতেজ মনটি ছিলো চিরসজীব এবং তার স্পর্শে অপর হৃদয়েও আনন্দের হিল্লোল সঞ্চারিত হয়ে ক্ষীয়মাণ প্রাণে স্পন্দন জাগাতো। বৃটিশ-বৈরী জার্মানীর প্রতি মুজতবার সহানুভূতির পরিচয় আগেও পেয়েছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীকে লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে সমবেত মিত্রশক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষকে দেখে ব্যথিত ডঃ মুজতবা আলী পূর্বেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "... সাফসফা বলিয়া দাও, জর্মনির সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নাই, আমরা ভাগ বখরা চাই না। ইজ্জতটা বাঁচিবে।"—শেষ পর্যন্ত ভারতের হিস্যায় পড়ে একটি জরাজীর্ণ

জাহাজ। 'তেইশ বৎসরের বৃদ্ধা' জাহাজটি গ্রহণ করতে ভারতীয় প্রতিনিধি অস্বীকৃত হলে আলী সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এবং সকৌতুক ভারতীয় প্রতিনিধির 'ভাষাজ্ঞান' লক্ষ্য করে আমাদেরও কিছুটা আনন্দরস পরিবেশন করেন।

"ইংরিজি ভাষায় জাহাজ স্ত্রী লিঙ্গ। তেইশ বৎসরে তাহা সাধারণতঃ রমণীয় কিন্তু জাহাজের বেলা নহে। জর্মন ভাষায় জাহাজ ক্লীব লিঙ্গ। জাহাজখানা যখন জর্মন তখন ঐ লিঙ্গই এই স্থলে বর্তিবার কথা। প্রতিনিধি এ হেন অমঙ্গলসূচক বস্তু গৃহে আনয়ন না করিয়া দূরদৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। ঐ জাহাজ চড়িয়া প্রতিনিধি বাড়ী ফিরিবার চেষ্টা করিলে, —তওবা তওবা অমঙ্গল চিন্তা বর্জনীয়।"[৫১]

স্বরাজ যখন দ্বারপ্রান্তে সে মুহূর্তেও ইংরেজ তার স্বরে বিশ্ববাসীর নিকট প্রমাণ করতে কসুর করেনি—এই উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত। এবং এ' দেশ সম্পর্কে বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য সর্ববিধ অপ-প্রচার কুৎসা রটিয়েছে। মুজতবা আলী তাঁর স্বভাবসুলভ মোহনীয় শৈলীতে বলছেন যে, যারা এ' ধরনের প্রোপাগাণ্ডার অশ্বডিম্ব প্রচার করে, "আমাদের কর্তব্য....তাহাদিগকে কর্ণমর্দন করিয়া গোলাপীকে লাল করিয়া দেওয়া। সাধারণতঃ এ কর্মটি করে ...স্বাধীন দেশের বিদেশস্থ রাজদূতাবাস।" তাই তিনি স্বরাজের আগে ভাগেই একটি অতি নগণ্য পদের জন্য আর্জি পেশ করেছিলেন :

"... ভারতবর্ষ নিরঙ্কুশ স্বাধীন হইলে লন্ডনে আমাদের রাজ-দূতাবাস নির্মিত হইবে, তখন অধম দারোয়ানের চাকরীটির জন্য দরখাস্ত করিবে। আমাকে তো আর কেহ এ্যামবেসেডর নিযুক্ত করিবে না। তবে আমার যাহা করিবার বাসনা তাহা দারোয়ানের নোকরীতেই সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিব।"[৫২]

০৪.

সৈয়দ মুজতবা আলী সক্রিয় রাজনীতিতে কখনো অংশগ্রহণ করেননি কিংবা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যও ছিলেন না। অবশ্য প্রথম কৈশোরে অসহযোগের জোয়ারে সরকারি স্কুল পরিত্যাগ করেছিলেন। মুজতবা-রচনাবলী এবং চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে তাঁর জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বরাজ ও খিলাফত হরণকারী ইংরেজদের প্রতি ধূমায়মান আক্রোশ ও কৈশোরের আবেগে তাঁর মনে উদ্গত জাতীয়বাদের অঙ্কুর শান্তিনিকেতনের অনুকূল হাওয়ায় পরিপুষ্ট হয়। এবং জার্মানীতে এই চেতনা দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। ভারতীয় বৈদগ্ধ্যের প্রতি জার্মানীর সশ্রদ্ধ মনোভাব এবং এ' দেশের সর্বস্ব লুণ্ঠনকারী 'শপ লিফটারজ্', 'চরুয়া'দের চিরশত্রু জার্মানীর প্রতি প্রীতি ও তাদের মৈত্রী কামনায় উন্মুখ মুজতবা আলী জার্মানদের দার্ঢ্য এবং শ্রেষ্ঠত্বের পশ্চাতে সক্রিয় জাতীয়তাবাদী মনোভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে 'জর্মনীর শবদেহ ছিঁড়িয়া চিরিয়া খাইবার জন্য' প্যারিসে সমবেত 'বহুতর শকুনি-নেশন'-এর মধ্যে ভারতবর্ষের নাম দেখে লজ্জিত মুজতবার সুস্পষ্ট বক্তব্য, "আমরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মঙ্গল কামনা করি; আমরা এই যুদ্ধে স্বেচ্ছায় কোনো পক্ষ অবলম্বন করি নাই। আমাদের স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া উচিত যে, জর্মনীর উপর আমাদের কোনো দাবী-দাওয়া নাই।"[৫৩]

অবশ্য ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং জনমত উপেক্ষার শোচনীয় পরিণাম কতো মর্মান্তিক হতে পারে—তা-ও তিনি এই জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস স্বরাজ আন্দোলন, তাঁর ব্যাপক প্রভাব এবং শান্তিনিকেতনের সঙ্গে গান্ধীজীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক মুজতবাকে নিঃসন্দেহে মহাত্মার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলো। তদুপরি তিনি কখনো স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে ভারতের খণ্ডিত রূপ প্রত্যক্ষে আগ্রহী ছিলেন না—যা' ছিলো ডঃ আলীরও একান্ত অভিপ্রায়। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ শেষাবধি ছিল অমলিন, অবিচল। সর্বত্যাগী, ক্ষমতার প্রতি নিস্পৃহ মহাঋষির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে এবং পাকিস্তানের 'কায়েদে আযম'-এর সঙ্গে তাঁর তুলনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন, "মহাত্মা গান্ধী...বোধ হয়, স্বরাজ লাভের পর সভয়ে পার্লামেন্টের ছায়াটি পর্যন্ত মাড়াননি। ....গাঁধী যেরকম পার্লামেন্টের মুখ দর্শন করেন নি, লেট ব্যারিষ্টার জিন্নাও হুবহু তেমনি জেলের মুখ দর্শন করেন নি। তিনি কাইদ-ই-আজম, সদর-ই-পাকিস্তান হবেন না, তো হবে কে ? গাঁধী ?"[৫৪] স্বরাজীদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভালোবাসার প্রকাশ আলী সাহেবের বিভিন্ন রচনায় পরিলক্ষিত। ১৯৪৫ সালের ১লা ডিসেম্বর-এ জনৈক কারাবন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জীবনের আলেখ্য দান প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলী বলেন :

"১৯২০-এ অসহযোগ আন্দোলনে ভদ্রলোক যোগ দেন। ১৯২৭-এ নানাপ্রকারে প্রপীড়িত হইয়া মস্কো চলিয়া যান। ১৯২৮-এ অসুস্থ শরীর লইয়া বার্লিন। ১৯৩৩-এ কয়েক দিবস জর্মন জেল। ১৯৩৪-এ দেশে প্রত্যাবর্তন। ১৯৩৫-এ এখানে বৌন্ড ডাউন। ১৯৩৬-এর গ্রীষ্মে গ্রেপ্তার ও সাত মাসের জেল। ৩৭-৩৮ বাহিরে। সেপ্টেম্বর ৩৯-৪০ জেলে—প্রায় এক বৎসর। ৪১-৪২ এক বৎসর বাহিরে। ৪২-এর এপ্রিলে পুনরায় লক্ষ্ণৌয়ে গ্রেপ্তার ও বন্দী—তারপর ফতেগড় তারপর বাঙলাদেশের জেল—সর্বকারাগারতীর্থ পরিক্রমা করিয়া এখন তিনি তথাগত—আজও তিনি জেলে। একটানা তিন বৎসর আট মাস। কত রোগশয্যা, মৃত্যুদর্শন, কত হাসপাতাল, আত্মীয়-স্বজনের কত আকুলিবিকুলি, কত কর্তার সঙ্গে কত সাক্ষাৎ কত প্রতিশ্রুতি, কত আশা-নৈরাশ্যের সুখস্পর্শ পদাঘাত!

ইতোমধ্যে পত্নীর ছয়মাস কারাবাস, ভগ্নীদর্শনাগতা শ্যালিকার তিন মাস ও নিরীহ পাচকের নয় মাস!

ভদ্রলোকের নাম শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভগ্নস্বাস্থ্যবশতঃ ওজন কমায় তিনি এখন ছোটলোক এবং ছোটলোকের সঙ্গই তিনি বাঞ্ছা করেন।"[৫৫]

পাষাণ কারাগারের বদ্ধ পরিসরে বছরের পর বছর দুঃসহ যন্ত্রণাময় মুহূর্তগুলো এই সব আত্মোৎসর্গকারী নিবেদিতপ্রাণ দেশপ্রেমিকরা কাটিয়েছেন এবং জীবনের সিংহভাগ নরকযন্ত্রণা ভোগ করে ১৯৪৭ সালে তাঁরা মুক্তি পেলেন। দেশপ্রেম ও তারুণ্যের উদ্দামতায় যাঁরা কারাবরণ করেছিলেন, জেলপ্রত্যাগতদের মধ্যে কি আর তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ? মুজতবার সরস বর্ণনায় এই ত্যাগী পুরুষদের গৃহপ্রত্যাগমন দৃশ্যটি অবলোকন করে হাসতে হাসতে আমাদের চোখের পাতা আর্দ্র হয়ে আসে। তাঁরা কি পেলেন ? আমরাই বা তাঁদের জন্যে কতোটুকু করেছি ?

"হঠাৎ করে গাঁধী বড়লাটে একটা ফয়সালা হয়ে যাওয়ার বরকতে এবং ঐ সুবাদে জেলগুলোর চুনকাম-মেরামতী... এ হেন ... উপলক্ষে তাঁদেরও (রাজবন্দীদের)

কিছুদিনের তরে নেটিভ হোম দেখার জন্য মহামান্য সম্রাটের রাজসিক অতিথিশালা থেকে ঝেঁটিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে—... কেউ বেরিয়েছেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কেউ বা ডিগ্রিহীন জ্বর-যক্ষ্মা নিয়ে, কেউ বা স্ট্রেচারে শুয়ে শুয়ে বাড়ি এসেছেন,..."[৫৬]

মুসলমানদের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী হলেও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী মুজতবা কখনো ছিলেন না। জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত দানে সমৃদ্ধ গৌরবময় অতীতের ওপর ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৈদগ্ধ্যের যে সুবিশাল এমারত সুপ্রতিষ্ঠিত—তাতেই ছিলো তাঁর অবিচল আস্থা এবং তারই লিপিবদ্ধ রূপ মুজতবা-রচনাবলী। বিশ্বধর্মে যে সত্যের সুনিশ্চিত সন্ধান তিনি পেয়েছেন, তা হলো—মানবতা। মুজতবা আত্যন্তিকভাবেই মানেন, "একটিমাত্র জয়ধ্বনি আছে দগ্ধ পৃথ্বীতলে যে জয়ধ্বনিতে কি হিন্দু কি মুসলমান, কি কৃষ্ণ কি শ্বেত সর্বমানুষ আত্মহারা হয়ে যোগ দেয়। সে ধ্বনিটি হচ্ছে 'জয় মানুষের জয়।' "[৫৭]

মুজতবা আলী রাজনৈতিক দলে যোগদান না করলেও স্বাধীনতাপূর্ব ও পরবর্তীকালে মসীযুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিলেন। বৃটিশরাজত্বে লিখিত নানা নিবন্ধে স্বাধীনতাস্পৃহ মানুষের আবেগ-অনুভূতি তথা হৃদ্‌স্পন্দন মুজতবার ঋদ্ধ রচনার প্রসাদগুণে শিক্ষিত মানসের জড়ত্ব মোচনে কিছুটা সহায়ক হয়েছিলো। ১৯৪৫-এর ২২শে সেপ্টেম্বরে তিনি লিখেছেন, "উত্তম বিদেশী রাজও নিকৃষ্ট স্বরাজের এরজাৎস হইতে পারে না। অপটু গৃহিণীকে ত্যাগ করিয়া নিপুণা দাসীকে কোন্ মূর্খ স্ত্রীরূপে বরণ করে।"[৫৮]

সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে প্রলম্বিত করার মহাজনী পন্থা সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিফহাল মুজতবা ছিলেন জাতীয় ঐক্য এবং অখণ্ড ভারতের একনিষ্ঠ সমর্থক। ফলে কংগ্রেসের প্রতি তাঁর সমর্থন অপ্রকাশ্য ছিলো না। এবং ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকলের প্রতি সাম্রাজ্যবাদ-বৈরী একই পতাকাতলে সমবেত হয়ে স্বরাজলাভের সাধনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যে বারংবার আবেদন করেছেন।

"ভুলিলে চলিবে না যে কংগ্রেস পূর্ণ অখণ্ড ভারতবর্ষের মুখপাত্র। কংগ্রেসের আন্দোলন দেশের আন্দোলন, ও স্বরাজলাভের জন্য দেশের জনসাধারণের ব্যাপক আন্দোলন মাত্রই কংগ্রেসের আন্দোলন—সে স্বতঃস্ফূর্তই হইক আর ধৈর্যচ্যুতি বশতই হউক।"[৫৯]

অন্যত্র কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত-নীতি সম্পর্কে লিখেছেন :

"সর্বজাতি-ধর্ম বর্ণ মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করিবে ও সেই সম্মিলিত শক্তি পৃথিবীর মধ্যে স্থায়ী আসন লইয়া সত্য ও ধর্মের পথে চলিবে, কংগ্রেসের ইহাই মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে কংগ্রেস কখনও বিশ্বাস হারাইবে না, ও আজ যদি কোনো বিশেষ বর্ণকে নির্যাতন করিয়া অথবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে বলি দিয়া কংগ্রেস স্বরাজ পাইবার সম্ভাবনা দেখিতে পান, তবুও তাহা গ্রহণীয় মনে করিবে না।"[৬০]

স্বাধীনতার পর কোনো কোনো কংগ্রেসী নেতার পদস্খলন তাঁকে ব্যথিত করলেও পণ্ডিত নেহরুর প্রতি মুজতবার ভক্তি-শ্রদ্ধা পূর্ববৎ ছিলো। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। পণ্ডিতজীর নেতৃত্বে ভরসা রাখার কারণে মুজতবা বলেছেন, "তাঁকে (পণ্ডিত নেহরুকে) অবিশ্বাস করার অধিকার তিনি আমাকে দিয়েছেন। তিনি গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন বলেই সে স্বাধীনতা আমাকে দিয়েছেন।"[৬১] এবং কম্যুনিজমে ব্যক্তি-স্বাধীনতা তথা ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্যের অনুপস্থিতি-ই

মুজতবাকে তা' আকর্ষণ করতে পারেনি। একই কারণে সামরিক শাসন এবং ধর্মীয়রাজেরও তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। গণতন্ত্রে আস্থাবান মুজতবা আলী বিশ্বরাজনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ-খবর রাখতেন এবং সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মতো ওয়াকিফহাল ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্লভ। সাধারণের দৃষ্টিতে 'সামান্য ঘটনার' পশ্চাতেও কতো ধুরন্ধর রাজনীতি, কুটিল স্বার্থপরতা থাকতে পারে আলী সাহেবের একাধিক প্রবন্ধে তার পরিচয় রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক উচ্চাশা এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করার হীনচক্রান্ত সম্পর্কে মুজতবা আলী বহু পূর্বেই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। প্রকৃত গণ-আন্দোলনে সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ অনভিপ্রেত না হলেও ক্ষমতাসীন আর্মি-অফিসারদের নেতৃত্ব অবাঞ্ছিত। কারণ "আর্মি-অফিসারদের নেতৃত্বে এবং মোল্লা-পুরুতের নেতৃত্বে কোনো তফাৎ নেই। এদের কেউই সত্যকার গণতন্ত্র চায় না। 'ডিসিপ্লিন', 'শাস্ত্রাধিকারের' দোহাই কেড়ে এরা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক মর্যাদা ও অধিকার পদে পদে খণ্ডন করতে চায়।"[৬২]—আজ তৃতীয় বিশ্ব এই অভিশাপ হাড়ে-মাংসে উপলব্ধি করছে।

স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোলকাতার মুসলমান ছাত্রদের বলিষ্ঠ ভূমিকা লক্ষ্য করে স্থানীয় একটি ইংরেজী দৈনিকে সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করা হয় :

"Many non-Muslims wonder why these Muslims have taken this attitude. The answer is not difficult to find. It is the Muslim way, the result of over 13 centuries of teaching experssed in the practice of the precepts laid down in the holy Qur'an and the traditions of the prophet Muhammad : Love your neighbours, side with him that is weak, oppressed or ill-used, serve Allah by serving his creatures; the true Muslim is represented in his two little things, his heart and his tongue."

নিরীহ ছাত্র-জনতার ওপর লাঠি-গুলি চালনায় বিক্ষুব্ধ যে কোনো মুসলমান ধর্মীয় সত্য রক্ষায় প্রতিবাদী হতে বাধ্য।

"It was their bounden duty to sympathise. Their hearts, brimful with the sublime teaching of Islam made them translate their sympathy into action. Some of them fell, side by side, with those who perhaps not in person, represented the terrible menace to Islam and Muslim in India.

It was the Muslim way, most nobly expressed."[৬৩]

মুজতবা আলীও আশা প্রকাশ করেছেন :

"যে দিন স্বাধীনতা সংগ্রামের শঙ্খধ্বনি ভারতবর্ষ প্রকম্পিত করিবে, সেদিন তাহার রুদ্রদমন-চেষ্টা পুনর্বার ক্রুর বুধ-শুক্র রূপ ধারণ করিবে, সেই শুভদিনে প্রতিবাসী যখন প্রতিবাসীর দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে সেদিন তরুণ মুসলিম, প্রবীণ মুসলিম 'মুসলিম ওয়ে' মুসলিম-পন্থায় দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইবে—তাহার বিরুদ্ধে কি 'design' কি 'menace' ভ্রূক্ষেপমাত্র করিবে না।"[৬৪] স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পরাধীন দেশে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং স্বরাজলাভ। আর আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের অভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। এ-জন্যেই তাঁর বিবেচনায় নারী-পুরুষের স্বতন্ত্র শিক্ষায়তন অবাঞ্ছিত।

"সাম্প্রদায়িক ইস্কুল-কলেজও ঠিক সেই কারণেই বর্জনীয়। আদর্শবাদ যখন তরুণ

গ্রহণ করিবে, তাহারা যদি তখন অন্য সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা, ভাবঅনুভূতির সন্ধান না পায়, তবে পরবর্তী জীবনে তাহারা কি করিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হইবে, তাহাদের সহযোগে অন্যায়, অসত্য, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে ?"[৬৫]

সংবাদপত্রীয় নিবন্ধগুলোতে মুজতবা আলীর দেশপ্রেম পরাধীনতার গ্লানির মধ্যে অধিক ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে। হৃদয় ও নেত্র স্বচ্ছ রেখে শুধুমাত্র দেশ ও জাতির বৃহত্তর মঙ্গল কামনায় তিনি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। যে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলো তাতে তাঁর বিবেকবুদ্ধির অনুমোদন ছিলো না। এই তত্ত্ব যে কতো হাস্যকর এবং অন্তঃসারশূন্য, তির্যক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে জাতিবৈরীর কৃত্রিমতার দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন,—"মুসলমানরা আদপেই কাসুন্দো বানাতে পারে না বলে কাসুন্দো বানাবার সময় অক্ষয় তৃতীয়ায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বড্ড বেড়ে যায়। বানাবার 'আস্য' না থাকলেও সহাস্যবদনে খাবার 'আস্য' সকলেরই আছে।"[৬৬] মুজতবার উপন্যাসের নায়িকাও এ' বিষয়ে নির্দ্বন্দ্ব, 'একমাত্র রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা বলে, হিন্দু-মুসলমানে সম্পর্কটা অহিনকুলের।'[৬৭]

ইংরেজ বেকায়দার পড়ে স্বরাজ প্রদানের আশ্বাসবাণী শুনিয়েছে এবং বারবার নানা অজুহাতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। সাধারণের ধৈর্য-চ্যুতির অক্ষম আক্রোশ ব্যঙ্গ হতাশায় মূর্তমান আলী সাহেবের লেখায় :

"সরকার স্বরাজ দিবার শুভদিনটি কত হাজার বৎসর পরে কোন্ প্রলয়রাত্রির পূর্ব মুহূর্তে ছাড়িবেন তাহা বলেন নাই, বলিবার বাসনাও রাখেন না। ভাবটা এই 'সবুরে মেওয়া ফলে'। দেশ-সেবকরা বলেন 'মেওয়া ফলিয়ে যে পচিবার উপক্রম করিল। দুর্ভিক্ষে পচিতেছে, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় পচিতেছে, রোগ-মহামারিতে পচিতেছে, নৈরাশ্য হাহাকারে পচিতেছে। আর কত অপেক্ষা করিব ?"[৬৮]

স্বাভাবিক অবস্থায় ইংরেজ যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করবে না—এ বিষয়ে মুজতবা আলীর অণুমাত্র সন্দেহ ছিলো না। হীন কূটনৈতিক চক্রান্ত ও শঠতার আশ্রয় নিয়ে স্বরাজের 'টোপ' দেখিয়ে তারা দীর্ঘসূত্রিতার যে নীতি নিয়েছিলো তাতে স্বরাজলাভের প্রত্যাশা ছিলো সুদূর পরাহত। আলী সাহেবের বিবেচনায় এ ছিলো আসলে 'ধোকা-ফোকা' খেলা। এ্যাটলি সাহেব যেন মহামূল্যবান 'স্বরাজ' হাতে নিয়ে নদীর এক পারে দাঁড়িয়ে অপর পারে অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ তাবৎ ভারতীয়দের আহ্বান করছেন একযোগে সে বৈতরণী অতিক্রম করে স্বরাজ গ্রহণ করবার জন্য। স্বভাবসুলভ সরস ভঙ্গিমায় মুজতবার জিজ্ঞাস্য:

"...কে কে জলে নামিবেন? কংগ্রেস তো নামিবেনই...লীগ নামিবেন কি?...(দেশীয় রাজ্যের) রাজারা তো সাঁতার কাটেন না। প্রজাদের পৃষ্ঠে বসিয়া যে যাইবেন তাহারও কোনো উপায় নাই; কারণ প্রথমতঃ প্রজাদের সে-সন্তরণে যোগ দিবার কোনো প্রস্তাবই হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহারা সরজমিনে উপস্থিত থাকিলে মণিটির হিস্যা পাইবার জন্য চেল্লাচেল্লি করিবে, হয়ত বা সাকুল্য মণিলাভের তালে থাকিবে। কাজেই মনে হইতেছে রাজারা দুই শত বৎসরের প্রাচীন খানদানী বাতরোগের অর্থাৎ সরকারের সঙ্গে কৃত সনাতন সন্ধিশর্তের দোহাই দিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া রহিবেন অথবা শূন্যে হাত-পা ছুঁড়িয়া সাঁতারের ভান করিবেন।

না হয় সাঁতরাইলাম, কিন্তু তথাপি প্রশ্ন ক্রীপস-নদীতে যে হাঙর-কুমীর আমাদের পা কামড়াইয়া সব কিছু ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছিলেন তাহারা ইতোমধ্যে বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছেন কি ?

সর্বশেষ প্রশ্ন, সায়েবের হস্ত মুষ্টিবদ্ধ। এ যেন 'ফোকা' 'ধোকা' খেলা। আমরা সকলে এক যোগে হাঙ্গর-কুমীর এড়াইয়া নদী পার হইয়া এক বাক্যে চীৎকার করিয়া বলিব, 'আমরা ফোকা চাই' অথবা 'ধোকা চাই'; তখন সায়েব হস্তোন্মোচন করিবেন।"[৬৯]

সুতরাং অনুনয়-বিনয় কিংবা অনুগ্রহের দান হিসেবে নয়, নিজেদের সংহত সঙ্ঘ-শক্তি বলেই পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করতে হবে। 'সর্ব-স্বাধীনতাকামীর প্রাতঃস্মরণীয়—সা'দ জগলুল পাশা' মিশরের মুক্তির জন্য যে সংগ্রাম করেছেন, ইব্নে সউদ মক্কা থেকে ইংরেজের পুত্তলিকা বিতাড়িত করেছেন এবং আরবদের ঐকবদ্ধ করে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদের মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করেছেন তাতে উদ্দীপিত মুজতবা আশা ব্যক্ত করেছেন, "মধ্যপ্রাচ্যে সম্মিলিত আরবশক্তি যখন সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে সংগ্রাম ঘোষণা করিবে তখন যেন ভারতবর্ষও তাহার সুবর্ণসুযোগ না হারায়।"[৭০]

পাষাণ কারাগারের কঠিন নিগড়ে শৃঙ্খলিত মুক্তিপাগল দেশপ্রেমিকদেরও তো সেই একই প্রত্যাশা—বিদেশী রাজের দয়ায় নয়, সংগ্রামী দেশবাসীরাই একদিন লৌহকারাগারের অর্গলমুক্ত করে বিজয়ী বীরের সম্মানে বিভূষিত করে তাঁদের সগর্বে সগৌরবে মুক্ত স্বদেশের স্বাধীন মানুষদের সামনে দাঁড় করিয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবে—তাঁদের সুকঠিন আত্মত্যাগের মহিমা ভবিষ্যৎ বংশধরদের অন্যায়-অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী করে তুলবে।

সৈয়দ মুজতবা আলী ধর্মচর্চায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। ধর্ম তাঁকে কি দিয়েছে ? কোন্ অমৃতবাণী তাঁর অন্তর গ্রহণ করেছে ? ধর্ম তাঁর নিকট স্বর্গলাভের জন্যে নয়, অলৌকিক জগতের সন্ধানও তা দেয়নি, 'ধর্মজ্ঞ' পরিচয়ে অন্যের সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম আদায়ের জন্যেও ধর্ম নয়। তাহলে ? সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষ্য :

" 'ধর্ম'কে ধরিয়া মানুষ অগ্রসর হয়। স্বাধীন মানুষ তখন শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন সৃজন করিতে করিতে মহামানবের তীর্থভূমির দিকে অভিযান করে। মহাকালের মন্দিরে উপনীত হইয়া সে তাহার মণিমালা দিয়া অনন্তের অঙ্গদ কুণ্ডল সাজায়।

পরাধীন মানুষ অগ্রসর হইতে গিয়া দেখে পায়ে শিকল সম্মুখে প্রস্তর প্রাচীর। তখন তাহার ধর্ম সে শিকল সে প্রাচীর ভাঙ্গিতে আদেশ দেন। তখন তাহাই তাহার একমাত্র ধর্ম। একমাত্র ধরিবার জিনিস।

গর মুল্ককি খাতির মেরে দুনিয়ামে য়হ
তওকীব হো,
হাতমে হাতকড়ি ঔর পৈর মে জঞ্জীর হো,
বাদ মরণেকে ভি দু জনম নয়ে তমীর হো,
মঞ্জুর হো, মঞ্জুর, মঞ্জুর হো।

দেশের জন্য যদি আমার পৃথিবীতে
এই ভাগ্য হয়
যে হাতে হাতকড়ি ও পায়ে শিকল

মরার পরও যদি আমার জন্য
নূতন নরক সৃষ্ট হয়,
তাহাই মঞ্জুর, তাহাই মঞ্জুর, তাহাই মঞ্জুর।"[৭১]

—সর্বকালের স্বাধীনতাকামী মানুষের এ' ছাড়া আর কোন্ ধর্ম আরাধ্য হতে পারে? এতদ্ব্যতীত শাস্ত্র ও ধর্মচর্চা ছাড়া ধর্মব্যবসায়ীদের হাত থেকে নিষ্কৃতিরও পথ নেই। ডঃ আলী লিখেছেন :

"আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্মের নামে যে রাজনৈতিক ধাপ্পা, অর্থনৈতিক শোষণ চলে তার শেষ কোনোদিনই হবে না, যতদিন না দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ভারতীয় ইউনিয়ন সম্বন্ধেও এই নীতি প্রযোজ্য।"[৭২]

০৫.

আচার-আচরণ ক্রিয়াকর্ম এবং ধর্মীয় অনুভূতির ব্যবধান সত্ত্বেও বৃহত্তর ভুবনে মানুষ মানুষের সঙ্গ কামনা করে এবং মনন ও ধ্যানের ক্ষেত্রে একই পথের পথিক হিসেবে নিজেদের আবিষ্কার করে তাঁদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

ধর্মে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য অনস্বীকার্য। ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুর উদারতা বিস্ময়কর। কেননা তাঁর এই বিশ্বাস বিশেষ কোনো সঙ্কীর্ণ তত্ত্ব বা তথ্যে গণ্ডীবদ্ধ নয়। আবার "মুসলমানরা ধর্মবিশ্বাসে কঠোর নিয়মের বশবর্তী। ...

... সামাজিক ব্যাপারে মুসলমান উদার। হিন্দুর সঙ্গে একগৃহে বসবাস করিতে মুসলমানদের কোনো আপত্তি নাই, একই পাকের ভাত, ডাল, মাছ, কাসুন্দী সকাল সন্ধ্যা পরমানন্দে খায়... মৃত্যুর পর তাহাকে শ্মশানে গোর দিলেও তাহার ধর্মচ্যুতি হয় না।

... এক কথায় হিন্দু যেখানে উদার মুসলমান সেখানে সঙ্কীর্ণ ও মুসলমান যেখানে উদার হিন্দু সেখানে সঙ্কীর্ণ।"[৭৩] কিন্তু এটাই তো শেষ কথা নয়, চরম সত্য নয়। ইসলাম অর্থ শান্তির ধর্ম। একে স্বীকার করে যুগে যুগে কোটি কোটি মানুষ আত্মার শান্তি পেয়েছে। "হিন্দুরাও সর্ব তর্ক, সর্ব আলোচনা, সর্ব পূজা, সর্ব উপাসনার পর বলেন শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। নতমস্তকে বলেন, পৃথিবীতে শান্তি হউক, অন্তরীক্ষে শান্তি হউক; মুসলমানেরা বলেন ইহলোকে (দুনিয়া) শান্তি হউক, পরলোকে (আখিরা) শান্তি হউক।"[৭৪]

দুটো ধর্মের মূলধারা যে একই খাতে গঙ্গা-যমুনার ন্যায় প্রবহমান—জলের রঙ থেকে শুধু ধারাদুটোর স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে—রাজপুত্র দারাশীকুহ্ তাঁর সুদীর্ঘ সাধনার সার্থক ফসল 'মজমা-উল-বহরেন' বা দ্বি-সিন্ধুমিলনে তা প্রতিপন্ন করেছেন। বিলাসব্যসনে আবাল্য লালিত মুঘল যুবরাজ "ইসলামের সাধনামণি সূফীতত্ত্ব ও হিন্দুদর্শনের চিন্তামণি বেদান্ত তাঁহার জ্ঞানকাঞ্চনাঙ্গুরীয়তে একাসনে বসিয়া যে রশ্মি ধারার সম্মেলন করিলেন"— মুজতবার শোকের অন্ত নেই— "তাহা দেশের তমসান্ধকারকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না।"[৭৫]

উপনিষদের ঋষি যোগবলে যেমন পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হন, "মু'তাজিলা সূফী

পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত ...ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়যোগে পরমাত্মাকে দর্শন" করেন। বাঙলার সাধক কবি সৈয়দ শাহ্‌নূরের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয় :

"রসিক দেখে প্রেম করিয়ো যার দিলেতে ফানা,
অরসিকে প্রেম করিলে চোখ থাকিতে কানা।
ওজুদে মজুদ করি লীলার কারখানা,
সৈয়দ শাহনূর কইন দেখলে তনু ফানা॥

যিনি ব্রহ্মানন্দে আত্মনিলয় (ফানা) করিতে সমর্থ হইয়াছেন, একমাত্র সেই রসিকের সঙ্গে প্রেম করিবে। তদভাবে তুমি চক্ষুষ্মান অন্ধ। এই দেহেই (ওজুদ) লীলার কারখানা মজুদ। তাহা যদি দেখিতে পারো তবেই তুমি দেহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ (ফানা) করিবে।

(... ভাষার দিক দিয়াও এই চৌপদী 'রুবাইয়াৎ'টি হিন্দু-মুসলিম অধ্যাত্মিক সাধনার কি অপূর্ব সংমিশ্রণে গঠিত—রসিক, প্রেম, লীলা শুদ্ধ সংস্কৃত, চোখ, কানা বাঙলা; ফানা ওজুদ মজুদ শুদ্ধ আরবী; কারখানা ফারসী; কইন বাঙাল।)"৭৬

সাধনার ক্ষেত্রে আশ্চর্যভাবে হিন্দু-মুসলমান একই মার্গে বিচরণ করেছেন। লালন ফকির গুরুপদে আশ্রয় নিয়ে আত্মা-পরমাত্মার ভেদ জানতে চেয়েছেন। একই আকৃতি প্রকাশ পেয়েছে পূর্ববঙ্গের আরেক কবি সাবাল আলীর কণ্ঠেও—

"অক্ষরে না ধরে নাম শ্যাম বিনোদিয়া
দেখ, ভোলা মন আপন ঘরে ছাপাইয়া ॥
আল্লা আদম দুই দম একদম করিয়া
আদমপুরের বাজারে গোলাঘর বাঁধিয়া ॥
সাবাল আলীয়ে কইন মুরশীদচরণে ধরিয়া
অক্ষরে না ধরে নাম তাই দেও বাতাইয়া ॥"

'আল্লা' আর 'আদম' (মানুষ) একদম হইয়া আদমপুরে (মানুষের ভিতরে)· গোলাঘর বাঁধিয়া বসিয়া আছেন; সাবাল আলী তাই মুরশীদকে চরণে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'তাঁহার পূর্ণ নাম পূর্ণ স্বরূপ কি ?

... ইসলামে সাংখ্যদর্শনের স্থান নাই; আল্লা এক এবং অদ্বিতীয় কাজেই প্রকৃতি-পুরুষের আসন সেখানে নাই। অথচ লালন আল্লা ও নবীকে (প্রফেট) সংখ্যাদর্শনের তত্ত্বজ্ঞানে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ "আসমান জমিন জলধি পবন। নবীর নূরে করিলেন সৃজন। তখন কোথায় ছিল নবীজীর আসন। নবী পুরুষ কি প্রকৃতি আকার ॥ আল্লা নবী দুটি অবতার। আছে গাছে বীজেতে যে প্রকার। তাও নাও হে জেনে ॥"

মুসলমান সৃষ্টিতত্ত্বে বৈষ্ণবের লীলার স্থান নাই; কারণ আল্লা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন যুক্তিযুক্ত বিশেষ কারণবশতঃ তাঁহাকে স্তব করিবার জন্য। পূর্ববঙ্গের কবি তবু বলিতেছেন, "ওজুদে মজুদ দেখো লীলার কারখানা। সৈয়দ শাহনূরে কইন দেখলে তনু ফানা ॥"

হিন্দু রাধারমণ গাহিলেন, "গুরু জগৎ উদ্ধার। আমারে কাঙাল জানিয়া পার কর। আকাশেতে থাক তুমি পাতালে বাস কর। রমণীর রূপ ধরিয়া গুরু পুরুষের মন হর। সর্প হইয়া দংশ তুমি ওঝা হইয়া ঝাড়ো। ভেবে রাধারমণ বলে এপার, সে পার। সকলরে তরাইলায় গুরু আমারে পার কর।" মুসলমান লালন গাহিলেন, "মুরশীদের চরণ সুধা, পান করিলে যাবে ক্ষুধা। করো না দেখে দ্বিধা, যেহি মুরশীদ সেহি খুদা। আপনি খুদা

আপনি নবি, আপনি সে আদম ছবি। অনন্ত রূপ করে ধারণ, কে বোঝে তার নিরাকরণ। নিরাকার, হাকিম, নিরঞ্জন মুরশীদরূপ ভজন পথে।" ' ৭৭

সাধনা ও ধ্যানের ক্ষেত্র ব্যতীত শুধুমাত্র রসসৃষ্টির প্রয়াসেও হিন্দু মুসলমানের অনুভূতি সম্মিলিত হয়েছে। কারবালার শোকগাথায় বাঙলার কবি দেশজ ঐতিহ্য থেকে উপমা চয়ন করে শ্রোতা সাধারণের সহানুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন।

"হানেফ বলে আয়রে কোলে জয়নাল বাছাধান।
যে না পথে দিছিরে দু' ভাই জোড়ের হোসেন-হাসন।
সেই না পথে যাবো আমি করো গোর কাফন।
রাম-লক্ষ্মণ গেছেরে বনে অযোধ্যা ছেড়ে।
এই রকম গেছেরে দুই ভাই মদীনা শূন্য করে ॥"

সুদীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসকারী, একই ঐতিহ্যে লালিত দুটো ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর চৈতন্যের ক্ষেত্রে অভিন্ন ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সৈয়দ মুজতবা আলী অভিমত ব্যক্ত করেছেন, "ইহার পরও যদি বলা হয় হিন্দু-মুসলমান জনগণের সাধনার মার্গ ভিন্ন ভিন্ন ছিল তবে সাহিত্য মিথ্যা, ইতিহাস মিথ্যা।"৭৭

গ্রামীণ সমাজের নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষের দিকে তাকালে কোন্ সত্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে? সামাজিক নিষ্পেষণ এবং প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তা ধর্মীয় বিধিনিষেধকে অবহেলায় লঙ্ঘন করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে। ভট্টাচার্য কিংবা মৌলানা দেবোত্তর জমি, ওয়াক্ফ্-সম্পত্তি ভোগের অধিকারী ছিলেন বলে পরস্পরের ওপর তাঁদের কোনোরকম নির্ভরতা ছিলো না।

"কিন্তু মুসলমান চাষা তো এ দম্ভ করিতে পারে নাই যে হিন্দু জেলেকে সে ধান বেচিবে না, হিন্দু জোলা তো এ অহংকার করিতে পারে নাই যে মুসলমানকে কাপড় না বেচিয়াও তাহার দিন গুজরান হইবে।

... তাই দেখিতে পাই মোল্লা-মৌলবীর বারণ সত্ত্বেও মুসলমান চাষা জানিয়া শুনিয়া হিন্দুকে বলির জন্য পাঁঠা বিক্রয় করে, পয়সা রোজগারের জন্য বিসর্জনে ঢোল বাজায়; হিন্দু গয়লা মুসলমান কসাইকে এঁড়ে বাছুর বিক্রয় করে। এই কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান শব্দার্থে পাশাপাশি বাস করিয়াছে। একে অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগ লইয়াছে। আশা-আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পাইয়াছে।"৭৮

লোকসাহিত্য, গানে-গাথায়-কথকতায় এর অজস্র উদাহরণ সহজলভ্য। এমন কি শিক্ষিত বাঙালীও যে এ-সত্য হৃদয়ঙ্গম করেননি—এমন নয়। মুজতবা আলী যথার্থই নির্দেশ করেছেন, বাঙালী হিন্দু যে মুসলমানদের লেখা অনাদর করেন তা' নয়, তাদের মধ্যে শক্তিশালী লেখকের ও লেখার অভাবেই হিন্দুকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে হয়েছে। "... মীর মশারফ হুসেন সাহেবের বিষাদসিন্ধু বহু হিন্দু পড়িয়া চোখের জল ফেলিয়াছেন...। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ লালন ফকীরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ... তারপর আসিলেন নজরুল ইসলাম। সাধারণ বাঙালী হিন্দু তখন জানিতে পারিলেন যে, মুসলমানও কবিতা লিখিতে পারেন; এমন কি উৎকৃষ্ট কবিতাও লিখিতে পারেন।"৭৯ এ' সত্যের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বয়ং সৈয়দ মুজতবা আলী—ষাটের দশকে যিনি ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের সর্বাধিক পাঠক-নন্দিত গদ্যশিল্পী, যাঁর সৃষ্টি বাঙলা গদ্য-সাহিত্যে 'মাইল স্টোন' হিসেবে চিহ্নিত।

১৯৪৬ সালে প্রকাশিত সুধীরকুমার দাশগুপ্তের চটি পুস্তিকা Pakistan and Self-Determination-এর দীর্ঘ 'Foreword'-এ কৃত্রিম দ্বিজাতি তত্ত্বের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করতে গিয়েও উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলো ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী নৈপুণ্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। মুসলিম সুফীতত্ত্ব ও ভারতীয় ভক্তিবাদের সমন্বয়, সাহিত্যে উদার মানবিকতার জয়ধ্বনি এবং মহাভারতের বঙ্গানুবাদ তথা বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণায় মুসলমান সুলতান-সুবাদারদের অবদান স্মরণ করেছেন। নির্দেশ করেছেন ভারতীয় স্থাপত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রয়াসেরই সুকৃতি। ফলে "the Hindu is in no hurry to disown the Taj as 'exotic', as 'purely Muslim' when the foreigner goes into ecstasy over it, nor have the Muslims, so far, shown any lack of zeal in claiming Kabir and Dadu as their own mystic saints." (পৃ.VII)

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও যে উভয় সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করেছিলো তার নজির হিসেবে উল্লেখ করেছেন :

"A cursory glance over the pages of Ain-i Akbari and a casual comparison of revenue settlement described there with that of Farghanah, the original home of the Mughals, will convince even the layman that Todar Mall's success as a statesman was chiefly due to his deep knowledge of Hindu polity and his power to adapt and assimilate the democratic principles of Islam brought by the invaders. During the reign of the later Mughals, we notice a healthy co-operation of the Muslim Subahdars (governors), Diwans (Finance Ministers), Bakhshis (pay-masters) and Jagirdars on one hand and Hindu financiers, bankers, and the bunyas on the other. If court intrigue could be called politics, we merely draw the attention of the reader to the alliance of the Indian Muslims like the Syed brothers (the Prime Minister and Commandar-in- Chief) and Maharaja Ajit Singh of Jaipur against the Turanian and Iranian adventurers who found undue favour with the Emperor Farrukh Syar. To what length this alliance between the natives of the soil against foreigners can go is proved by the tragic fact that Ajit Singh lent active assistance to the Syed brothers in murdering his son-in-law Farrukh Siyar in order to safeguard Indian interest in the Imperial court, and incidentally gained, over his pompous designation, uncharitable title, 'damad-kush' (son-in-law murderer) from the street- urchins of Delhi." (পৃ. V-VI)

'পূর্বাভাষ'টিতে ১৯৪৭-এর দেশবিভক্তি একটি ভ্রান্ত ও পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত। এবং উপমহাদেশের এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন মুজতবা আলী যে কতোটা নিস্পৃহভাবে গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ হিসেবে দাক্ষিণাত্যে লেখা ১৪ই আগস্ট, '৪৭-এর দিনলিপির পৃষ্ঠাটিই যথেষ্ট। তাতে শুধু উল্লিখিত :

"পশ্চিমের বর্ষা এদেশে দুর্বল—পূবের বর্ষার এখনো ঢের দেরি। ইংরাজ রাজত্বের অবসান হয়েছে, দেশী লোক এখনো আসনে বসেননি—তারি ফাঁকে লাহোর কলকাতার অরাজকতার মত গরমের একচোট নির্মম প্রহার!"[৮০] —ব্যস্, এই পর্যন্ত। আর বিভাগোত্তরকালেও তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করবার উদ্দেশ্যে তৎকালীন পাকিস্তানে আসেননি। এবং স্বাধীন বাঙলাদেশের অভ্যুদয়ের পরেও ভারতীয় নাগরিকত্ব পরিত্যাগের কোনো রকম আভাস দেননি। মুজতবা আলীর সাহিত্য সাধনার লক্ষ্যও ছিলো মানুষে মানুষে ঐক্যসম্প্রীতির সন্ধান। 'দেশে-বিদেশে' প্রকাশিত হলে ডঃ সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়ও বিশেষভাবে গ্রন্থটির অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন :

"... যখন দেশব্যাপী রক্তারক্তি, খুনোখুনি, নরহত্যা, জাতিহত্যা, দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের বহিষ্করণ প্রভৃতি অনর্থ ও অনাসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভারত দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে গেল, তখন, ... একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মুসলমান, বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান উভয়ের সাধারণ ভাষায় এই অপূর্ব বইখানি লিখে, নীরবে ... ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ জানালেন; আর প্রমাণ করে দিলেন যে ধর্ম আলাদা হ'লেও বাঙালী হিন্দু আর বাঙালী মুসলমান একই মানসিক সংস্কৃতির মানুষ, একই জাতির মানুষ।" [৮১]

এতোসব প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের দুস্তর ব্যবধান, তাদের মিলনের ক্ষেত্রে কাল্পনিক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশকদের উদ্দেশ্য ? রাজনীতি। ব্যক্তিস্বার্থের কারণেই রাজনীতিকরা হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করে থাকেন। ফলে মানুষে মানুষে হানাহানি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটে ধর্মেরও ধর্মনাশ। পরাধীন ভারতে ইংরেজ এ-কাজটি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করেছে এবং হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে শাসন-শোষণ চালিয়েছে। দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতি বিরূপ মুজতবা আলী তাদের একটি মাত্র গুণ ও তার কারণ উল্লেখ করেছেন : —"হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সেখানে হয় না। কারণ হিন্দু -মুসলমানকে লড়াইয়া সেখানে রাজার কোনো ফায়দা নাই।" '[৮২]

বিভাগোত্তরকালে সৈয়দ মুজতবা আলীর উপলব্ধি এবং বৃহত্তর কল্যাণার্থে ভারত ও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে তাঁর আবেদন :

"পূর্ব-পাকিস্তানের ভারতীয় ঐতিহ্য নগণ্য নয়, অবহেলনীয় নয়। পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বনামধন্য হয়েছেন, তাঁদের বংশধরগণ যেদিন নবীন রাষ্ট্রে আসন গ্রহণ করে সভ্যতা-কৃষ্টি আন্দোলনে যোগ দেবেন সেদিনই উভয় সম্প্রদায়ের অর্থহীন তিক্ততার অবসান হবে। (এ-স্থলে অবান্তর হলেও বলি ঠিক তেমনি ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানদের অবহেলা করেও সে রাষ্ট্র পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে পারবে না।)" [৮৩]

০৬.

ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং বৈদগ্ধ্য সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলী রীতিমতো গর্বিত ছিলেন। এর উত্তরাধিকারে বাঙালীর দাবী অনস্বীকার্য। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গও ক্ষণতরে স্মরণ করে সর্ব ভারতীয় ঐতিহ্যের উল্লেখ করেছেন :

"বৌদ্ধচর্যাপদে তার জন্ম, তার গায়ে বৈষ্ণবপদাবলীর নামাবলী, 'মঙ্গল'-মুকুট তার শিরে, আরবী-ফারসী শব্দের খানা খেয়েছে সে বিস্তর ...

আর কিছু না হোক আরবী ফারসীর যে-দুটো জানলা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি—সেগুলো সামান্য ফাঁক করে দিয়েই কবি নজরুল ইসলাম আমাদের গায়ে তাজা হাওয়া লাগিয়ে দিলেন— ...

আর পূবের জানলাও তো খুলে ফেলা সহজ। বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিপিটক তো ভারতের পিটকেই বন্ধ আছে। ত্রিশরণ ত্রিরত্নের রত্নাকর তো আমরাই।"[৮৪]

মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্যে বাঙালীর মরণপণ সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে একক ও অনন্য। স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ডঃ আলী পরম সন্তোষে লিখেছেন :

"... সেপাই কলম জিনিসটাকে বিলকুল বেফায়দা জানে বলে টিপসই দিয়ে তনখা ওঠায়, আর কবি, যদিও বা তিনি বীররস সৃষ্টি করার সময় তরবারি হস্তে বিস্তর লম্ফ ঝম্প করেন তবু তিনি জানেন ও জিনিসটা একদম বেকার—ওটা দিয়ে তাঁর পালকের কলম মেরামত করা যায় না। বাঙলাদেশের লেখক, চিন্তাশীল ব্যক্তি, এমন কি পাঠককেও লড়াই করতে হয়েছে অরক্ষণীয়া বাঙলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে, ..."[৮৫]

যুগে যুগে নানা জাতি নানা ধর্ম এদেশে এসেছে , আশ্রয় লাভ করেছে। নিজের সংস্কৃতি দিয়ে যেমন ভারতীয় বৈদগ্ধ্যকে ঋদ্ধ করেছে, তেমনি দেশজ ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করে নিজেদেরও করেছে পরিপূর্ণ। এবং সর্বোপরি পরস্পরের মিলনে জন্ম নিয়েছে ভারতের নোতুন সংস্কৃতি। নোতুনকে বরণ করে, বহিরাগতকে আপন দানে পুষ্ট করে, উভয়ের আত্মা তথা হৃদয়ের উৎকর্ষের সমৃদ্ধিই ছিলো ভারতের সাধনা। এ-দেশ যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত মুক্ত ছিলো না, এটা সত্য হলেও চরম সত্য নয়। অন্যথায় "মধ্যযুগের সাধুসন্ত জন্মগ্রহণ করিতে পারিতেন না; ইংরাজ শাসন সত্ত্বেও আউল বাউল বাঁচিয়া থাকিত না; জয়সীর পদুমাবত, পরাগলী মহাভারত সৃষ্ট হইত না; মুসলমান কবি রাধার বিরহে আপন বিরহ যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে পারিত না; হিন্দু কবি কারবালার উষ্ণ মরুভূমিকে নয়নজলে সিক্ত করিত না; তাজমহল অখণ্ড ভারতের একবিন্দু নয়নজল হইয়া কালের কপোলতলে সমুজ্জ্বল হইত না; ফৈয়াজ আব্দুল করীম 'নন্দকুমারে' 'বন্দনা' গাহিতেন না; কাজী বিদ্রোহের গান গাহিয়া বাঙালী যুবককে উত্তেজিত উদ্দীপ্ত করিতে পারিতেন না।" আর বিদেশীর কৃপায় আমাদের জ্ঞানরাজ্য প্রসারতা পেয়েছে কোন্ 'সত্য' জেনে ? "'ভারতবর্ষ কখনো ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল না', ... 'ভারতের সর্ব পুণ্য চেষ্টা তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস', ... 'অন্ধকূপ ভারতীয় বর্বরতার প্রতীক' এবং সর্বশেষে মোক্ষলাভ করিলাম—'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে' গ্রহণ করিয়া।"[৮৬] মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার বেসাতি দিয়ে শক্তিমদমত্ত বিদেশী জগদ্দল পাথর আমাদের বক্ষে চিরস্থায়ী হতে চেয়েছিলো। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেনেট' ১৯৪৬ সনের জুন মাসে একটি প্রস্তাবে দেশের ইতিহাস পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সৈয়দ মুজতবা আলী পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এমন ভাবে করার জন্য সুপারিশ করেন যাতে এদেশের ছাত্র-যুবসমাজ স্বদেশের যথার্থ ইতিহাস-ধর্ম-সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্য তথা ভারতীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, উদ্দীপ্ত হতে পারে এবং স্বরাজলাভের বাসনা যেন তাদের স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করে। কারণ 'পরাধীন জাতির একমাত্র রাজনীতি স্বাধীনতা। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষার কথাও মুজতবা গভীরভাবে ভেবেছেন। এ বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিলো না যে, জনগণের বোধ্য ভাষা তথা মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় জনচিত্ত উদ্বোধিত করার প্রচেষ্টা 'পুত্রার্থে' বন্ধ্যা গ্রহণের ন্যায়'।

ভারতীয় সভ্যতা শুধু স্বদেশের সীমাতেই আবদ্ধ ছিলো না। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোও এ' সভ্যতার আলোকে আলোকিত, সমৃদ্ধ। এ-দেশের প্রাচীন গ্রন্থরাজী থেকে "ভারতমাতার সভ্যতা-দায়িনীরূপ কিছুতেই সংগ্রহ করা যায় না। তাহার প্রধান কারণ, ... ভারতবর্ষ যে-সব দেশকে আপন ধর্ম, কলা, কাব্য, রাজনীতি দান করিয়া সভ্য

করিয়াছে সে-সব দেশকে আপন অধিকারভুক্ত করিয়া শোষণ করে নাই, ... ভারতীয় বণিক খৃস্টের বহু পূর্ব হইতে নানা দেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছেন, শ্রমণ-ভিক্ষু ধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছেন, উদ্যোগী পুরুষ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু কোনো প্রকার শোষণ করেন নাই বলিয়া এই দেশের ঐতিহ্যে তাহার জমাখরচের কোনো হিসাব নাই।"[৮৭] ফরাসী প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ মিঃ ক্যদেজ-এর লেখা 'ভারতীয় সভ্যতা দ্বারা গঠিত দূর-প্রাচ্যের প্রাচীন ইতিহাস' নামক প্রামাণিক গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া কতোভাবে ভারতীয় সভ্যতার কাছে ঋণী। উক্ত ভূখণ্ডদ্বয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা ব্যতীত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চা পূর্ণাঙ্গ হবে না। "বহু রীতি-নীতি, বহু আচার-ব্যবহার ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইয়াছে, কিন্ত ঐসব ভূ-খণ্ডে অদ্যাপি বিরাজমান। ... ভারতের শতরন্ধ্র বিশিষ্ট প্রাচীন ইতিহাসকে দিব্য সুন্দর রূপ দিতে হইলে এই সব রীতি-নীতির ইতিহাস ও ইতিবৃত্ত অবর্জনীয়।" তাই মুজতবা আলী মনে করেন :

"আত্মবিস্মৃত ভারতের আজ প্রয়োজন এই জ্ঞান সঞ্চয় করা যে সে-ও একদিন দিয়াছিল এবং অকৃপণভাবেই দান করিয়াছিল; ...

... সাহিত্যের দিক দিয়া রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণ দূরপ্রাচ্যের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিয়াছে ও তাহার কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়াছে।... পূর্ব প্রাচ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অদ্যাবধি দর্শকবৃন্দ রাম-সীতার কাহিনী শ্রবণ ও নৃত্যনাট্য দর্শন করিয়া অশ্রুবর্ষণ করে।" এতদ্ব্যতীত 'মনুসংহিতা' এবং ভারতবর্ষীয় 'অর্থশাস্ত্র' অনুসরণ করে অন্যরা তাদের আইন-কানুন প্রণয়ন এবং রাজ্যপরিচালনা করেছে। ভাষা এবং ভারতীয় বর্ণমালার প্রত্যক্ষ প্রভাব উক্ত দেশগুলোর ভাষা ও লিপির গঠনে সহায়ক হয়েছে। [৮৭]

স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই মুজতবা আলী অনুমান করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে, জাতীয় ঐক্যে যদি কখনো ফাটল ধরে তাহলে ভারতের অখণ্ড সত্তা বিলুপ্ত হবে। এবং রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে এমন একটি আশঙ্কা তাঁর মনে দানা বেঁধেছিলো। ১৯৪৬ সনের মার্চে 'বঙ্গীয় রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি'র এক বিবৃতিতে হিন্দীর পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে উল্লিখিত হয় 'নেতাজী সুভাষচন্দ্রও হিন্দী-অনুরাগী ছিলেন এবং বিশুদ্ধ হিন্দীতে কথা বলিতে পারিতেন।'—এই উক্তির মধ্যে আলী সাহেব একটি অশুভ ও তাঁর বিবেচনায় অবাস্তব, বৃহত্তর ভারত এবং জাতীয় ঐক্যের সংহারক বীজ উপ্ত দেখেছিলেন। এর প্রতিবাদে তিনি লেখেন, "নেতাজী কি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ—কি হিন্দী, কি উর্দু, কিছুই বলেন নাই। নেতাজী যে ভাষা বলিয়াছিলেন, তাহা সাম্প্রদায়িক হিন্দী বা সাম্প্রদায়িক উর্দু নহে।. . .

নেতাজী যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, সে ভাষা উভয়ের আশ্চর্য সংমিশ্রণের ফল।" নেতাজী শব্দতাত্ত্বিক না হয়েও এবং ভাষায় নৈপুণ্য অর্জনের মতো বিলাসিতায় মগ্ন থাকবার মতো অবকাশ লাভ না করেও কোন্ অলৌকিক ক্ষমতায় বাগ্দেবীকে এমন কৌশলে আপন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিলেন ? মুজতবা এ' রহস্যের সমাধান করেছেন :

"রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি যে মহাত্মার থাকে, দেশকে সত্যই যিনি প্রাণমন সর্বচৈতন্য সর্ব অনুভূতি দিয়া ভালোবাসেন, সাম্প্রদায়িক কলহের বহু ঊর্ধ্বে নির্দ্বন্দ্ব পুণ্যলোকে যিনি

অহরহ বিরাজ করেন, যে মহাপুরুষ দেশের অখণ্ড সত্যরূপ ঋষির ন্যায় দর্শন করিয়াছেন, বাক্যব্রহ্ম তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে বিরাজ করেন। তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেন তাহা সত্যের ভাষা, ন্যায়ের ভাষা, প্রেমের ভাষা। সে ভাষা 'শুদ্ধ হিন্দী' অপেক্ষাও বিশুদ্ধ হিন্দী, 'শুদ্ধ উর্দু' অপেক্ষাও বিশুদ্ধ উর্দু। সে ভাষা তাঁহার নিজস্ব।

একদিক দিয়া তিনি যেমন 'স্বাধীন ভারত' না বলিয়া 'আজাদ হিন্দ' বলিয়াছিলেন, অন্য পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞ মুসলিম তাঁহাকে 'নেতাজী' বলিয়া হৃদয়াসনে বসাইয়াছিল।" [৮৮]

যদিও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আলী সাহেব এ পর্যায়ে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বা পরামর্শ দান করতে পারেননি তবু সর্বভারতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতি তাঁর সজাগ সতর্ক দৃষ্টির পরিচয় মেলে। মুজতবা-মানসে 'অখণ্ড ভারত' চেতনার আন্তরিকতা ও অকৃত্রিমতার আরো একটি নিদর্শন—তিনি সেই সময়েই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে সমগ্র ভারতে একই লিপি প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা বিচার-বিবেচনা করবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। উদ্ধৃতি সহযোগে তিনি প্রমাণ করেছেন, একই বর্ণমালায় লিখিত বলে আসামী ভাষা শিক্ষিত বাঙালীর অবোধ্য নয়। অপর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, অপরিচিত লিপির জন্যেই অনেক ভাষা আমাদের নিকট আজীবন অবোধ্যই থেকে যায়। যেমন :

" 'ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে' বাক্যটি হিন্দীতে 'ভারতবর্ষকী অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর নির্ভর করতী হৈ', এবং গুজরাতিতে 'ভারতবর্ষনী অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পর নির্ভর করেছে' বলিলে বিশেষ ভুল হয় না। কিন্তু যেহেতু গুজরাতি ও হিন্দী ভিন্ন লিপিতে লেখা হয়, আমরা এই সব ভাষা দূরে রাখি; ঐ সব ভাষা-ভাষীরাও একে অন্যের মধ্যে তাহাই করেন।

তাহা হইলে প্রশ্ন, তাবৎ ভারতবর্ষে একই লিপি প্রচলিত হইলে ভালো হয় কিনা ?"[৮৯]

স্বদেশপ্রীতিবশতঃই এ'দেশের জনসাধারণের প্রতি এবং দৈশিক ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও সনাতন মূল্যবোধের প্রতি মুজতবা আলীর ছিলো প্রগাঢ় আস্থা। এ' মূল্যবোধের অবক্ষয়ে তিনি বিচলিত বোধ করেছেন। ভারতীয় সভ্যতা-বৈদগ্ধ্য-ঐতিহ্য অনেকটাই ছিলো গ্রাম কেন্দ্রিক। টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তব ছিলো এর লালন কেন্দ্র। প্রধানতঃ সংস্কৃত এবং অনেকটা আরবী-ফার্সী ভাষা এই বৈদগ্ধ্যের মূলে রসদ জুগিয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অপ্রতিরোধ্য হাওয়ায় এই বৈদগ্ধ্যের সম্পূর্ণ বিনষ্টির আশঙ্কায় আলী সাহেবের হতাশা নানাভাবে প্রকাশিত। ঐতিহ্যপ্রীতিবশতই সংস্কৃত, আরবী-ফার্সী ভাষার প্রতি তাঁর ছিলো বিশেষ দুর্বলতা। তিনি লিখেছেন :

"কৃষ্টির দিক দিয়ে গ্রামগুলি তো উজাড় হইয়াছে কারণ গ্রামের কোনো মেধাবী ছেলে যদি কোনো গতিকে বি. এ. পাশ করিতে পারে, তবে সে তো আর গ্রামে ফিরিয়া যায় না। গ্রাম তাহাকে কি চাকরী দিবে ? ১২ টাকার স্কুল মাষ্টারী, না ১৫ টাকার পোষ্টমাষ্টারী ? . . . অথচ একশত বৎসর পূর্বেও গ্রামের হিন্দু ছেলে নবদ্বীপ ভট্টপল্লী, কাশীতে অধ্যয়ন করিয়া দিগগজ পণ্ডিত হইয়া গ্রামেই ফিরিত; সেইখানেই বাস করিত। মুসলমান ছেলে দেওবন্দ, রামপুর পাশ করিয়া, ওস্তাদ-দত্ত মস্ত পাগড়ী পরিয়া সেই গ্রামেই ফিরিয়া আসিত, সেই গ্রামেই বাস করিত। তাঁহারাই গ্রামের চাষী মজুরকে ধর্মপথে চলিবার অনুপ্রেরণা দিতেন।"[৯০]

১৯৪৫-এ যখন আসাম সরকার স্বীকার করেন যে, সরকারি সাহায্য-বর্জিত মক্তব-মাদ্রাসা সরকারীগুলোর চেয়ে ভালো চলে এবং ছাত্ররা উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে তখন মুজতবা আলী 'এই ভালো চলার পশ্চাতে কী নিদারুণ আত্মত্যাগ অনশন উপবাস' রয়েছে তার বর্ণনায় হৃদয় নিংড়ানো দরদ ঢেলে বাস্তবচিত্র তুলে ধরেন :

"বড় বড় মৌলানারা প্রায় বিনা বেতনে পরের বাড়ির বৈঠকখানায় বাস করিয়া এই সব মাদ্রাসায় শিক্ষা দেন.... কুড়ি বৎসর কঠোর বিদ্যাভ্যাসের পর ইঁহাদের কাহারো বেতন কুড়ি টাকা মাত্র। ছাত্রেরামুষ্টিভিক্ষা করিয়া—অর্থাৎ চাষাদের বাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাউল সঞ্চয় করিয়া সেই অর্থে—মাদ্রাসা চালায়। ঝঞ্ঝাবাতে দারিদ্র্যনম্র পাঠশালা ভূমিসাৎ হইলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনধ্যায় . . . বিদ্যার্থীদের রোগক্লিষ্ট ও অবসন্ন মুখচ্ছবি। জ্ঞানার্জন ব্যতীত অন্য সব দিক দিয়া তাহাদের ভবিষৎ অন্ধকার। . . .

ইহারাই ভারতবর্ষের মুসলমানদের আটশত বৎসরের শাস্ত্রালোচনা বাঁচাইয়া রাখিয়াছে . . .

. . . ইহারা যদি মরে তবেই 'মুসলিম ইন ডেঞ্জার'—ইসলাম কখনই কোনো অবস্থাতেই ইন ডেঞ্জার হইতে পারে না।"[৯১]

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে জনসাধারণের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা হলে আলী সাহেব সর্বান্তকরণে তাদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এবং তিনি সদৃষ্টান্ত প্রমাণ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় নয়, টোল-চতুষ্পাঠীগুলোই সংস্কৃত চর্চাকে আপন সীমিত শক্তি ও সামর্থ্যের মধ্যেও কোনোক্রমে বাঁচিয়ে রেখেছে। স্বল্পবেতনভোগী 'পণ্ডিত মশাই' এবং 'মৌলভী সাহেবদের' প্রতি শ্রদ্ধা-সহানুভূতি মুজতবার বরাবর ছিলো। 'পাদটীকা'র 'পণ্ডিত মশাই'-এর করুণালেখ্য এখনো পাঠককে অশ্রুসজল করে তোলে। এঁদের পাণ্ডিত্য ও মনীষার প্রতি মুজতবার শ্রদ্ধাঞ্জলি :

"কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর বাক্যামৃত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, দক্ষিণে তামিল পণ্ডিতের সামবেদ গান শুনিয়া পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিয়াছি, পুণার বিদগ্ধজনের সাহিত্যালোচনা শুনিয়া জীবন ধন্য মনে করিয়াছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যখনি এই অনুভূতি জন্মিয়াছে যে, আজ যাঁহারা দেশের অর্থনীতি, সাহিত্য, সমাজসেবার কর্ণধার তাঁহাদের সঙ্গে ইঁহাদের যোগসূত্র নাই। তখন উভয় পক্ষের জন্যই হৃদয়ে গভীর শোক অনুভব করিয়াছি। আধুনিক সমাজে এই পণ্ডিতগণের স্থান নাই, অর্বাচীনেরা মনে করেন ইঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল, অগ্রগামী সমাজ ইঁহাদের নিকট হইতে কোনো সাহায্য আহরণ করিতে পারে না।"[৯২] পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের আজীবন লব্ধ পাণ্ডিত্য দ্বারা জ্ঞান বিতরণ করে সমাজকে সুস্থ সবল সচল রাখেন। কৃতজ্ঞ সমাজ তাঁদের "পদপ্রান্তে অর্থবিত্ত দক্ষিণারূপে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ... সমাজ দত্ত করুণাসিক্ত ভিক্ষাঞ্জলি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া অপমানিত হইতে হয় না। এই মন্তব্য ভারতবর্ষের ইসলাম শাস্ত্রের মৌলানা মৌলবী সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।"[৯২]

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে সবিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে ধর্মচর্চার ব্যবস্থা রয়েছে এবং আধুনিক জীবনধারা থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন নয়। "অথচ এই দেশের আধুনিক সমাজকর্তারা মনে করেন যে, সংস্কৃত তথা আরবী ফারসীর প্রতি যাহারি ভক্তিভাব আছে, সেই 'প্রাচীনপন্থী' 'ধর্মপ্রাণ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতীক'।" এই অযৌক্তিক মনোবৃত্তির অসারতা প্রতিপন্ন করে আলী সাহেব লিখেছেন,—

"... আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত চর্চার জন্য ... প্রচুর অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন। অর্থাৎ সংস্কৃত শিক্ষায়তনে যেরূপ আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন ঠিক সেইরূপেই আমাদের 'আধুনিক' বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রাচীন ঐতিহ্যগত শিক্ষাদানের ব্যাপকতর আয়োজন করা উচিত।

এই মন্তব্যগুলি মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ফারসী শিক্ষাদান সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য।"[৯২]

উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ এবং অজ্ঞতাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে 'দৈনিক বসুমতী'তে আলী সাহেব শুধিয়েছিলেন, "ভারতবর্ষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করবে কে ? ভারতীয় ইতিহাসের সে ধারার সন্ধান কোথায়—যে ধারা বহু জাতি, বহু বর্ণ, বহু আর্য, বহু আনার্যকে এক করে নিয়ে বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে বিশ্বমানবকল্যাণের সাগর সঙ্গমের দিকে বিজয় গর্জনে অগ্রসর হয়েছিল ?"[৯৩]

স্বাধীনতা লাভের পর গৌরবোজ্জ্বল অতীতের স্মরণে মুজতবা আলী অনাগত কালের ভারতের স্বপ্ন দেখেন, সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের সাধনায় তার অগ্রযাত্রা থাকবে অব্যাহত। কারণ, "সাধনার ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির জগতে ভারতবর্ষ একদিন যে দিব্যদৃষ্টি পেয়েছিল, যার ফলে তার কাছে আত্ম-পর এক হয়ে গিয়েছিল, যার কৃপায় সর্বসংস্কারমুক্ত হয়ে সে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মঙ্গল, যা কিছু সত্য অনায়াসে গ্রহণ করতে পেরেছিল, আজও সে সম্পদ ভারতবাসীর অবচেতন মনে সুষুপ্ত। সে সত্যযুগ পশ্চাতে ছিল, সে সত্যযুগ সম্মুখেও রয়েছে।"[৯৪]

তথ্য-নির্দেশ

১. শহর্-ইয়ার, পৃ. ৯৩।
২. অল্পে তুষ্ট, রাজাউজীর, পৃ. ২১৮।
৩. ইংরেজী বনাম মাতৃভাষা, ধূপছায়া, পৃ. ১৬৬।
৪. মামদোর পুনর্জন্ম, চতুরঙ্গ, পৃ. ৯১।
৫. হতভাগ্য কাছাড়, বড়বাবু, পৃ. ৭৯।
৬. বিদেশে, পঞ্চতন্ত্র, পৃ. ১৪৮।
৭. কাইরো, পঞ্চতন্ত্র, পৃ. ৮।
৮. রায়পিথৌরার কলমে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২১৯।
৯. মাভৈঃ!, কত না অশ্রু জল, পৃ. ২৫০।
১০. রায়পিথৌরার কলমে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২১৭।
১১. নিবেদন, ময়ূরকণ্ঠী।
১২. রায়পিথৌরার কলমে, সৈয়দ মুজতবা আলী, রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৭০।
১৩. 'উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-নির্বাসিতের আত্মকথা', ময়ূরকণ্ঠী, পৃ. ১৫৬।
১৪. রায়পিথৌরা : দেহলিপ্রান্তে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, পৃ. ৪।
১৫. রায়পিথৌরার কলমে, মৈয়দ মুজতবা আলী রচনালী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৭০-৭১।
১৬. রায়পিথৌরা : সপ্তপর্ণী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ই জানুয়ারি, ১৯৫৩, পৃ. ৪।

১৭. শহ্‌র-ইয়ার , পৃ. ১৮৬-৮৭।
১৮. রায়পিথৌরা : সপ্তপর্ণী, আনন্দবাজার পত্রিকা ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩, পৃ. ৪।
১৯. 'এতো মেয়ে মেয়ে নয়–', ময়ূরকণ্ঠী, পৃ. ৩২।
২০. রায়পিথৌরার কলমে, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৬১-৬২।
২১. ঐ, পৃ. ২৮৮।
২২. চরিত্র-বিচার, বড়বাবু, পৃ. ২১২।
২৩. পিণ্ডিয় পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, বাংলাদেশ, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮।
২৪. "হুজ্জৎ-ই-বাঙ্গাল", উভয় বাংলা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪০৬।
২৫. কই সে ?, বেতার জগৎ, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৬০, পৃ. ১৬।
২৬. 'উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়–নির্বাসিতের আত্মকথা', ময়ূরকণ্ঠী, পৃ. ১৫৮।
২৭. সৈয়দ মুজতবা আলী : পঁচিশে বৈশাখ, দেশ, ১০ই মে, ১৯৫২, পৃ. ৭১।
২৮. শ্রীদীপঙ্কর বসুকে লেখা পত্র-৩, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩০৪-০৫।
২৯. রায়পিথৌরা : সপ্তাপর্ণী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩রা মার্চ, ১৯৫৩, পৃ. ৪।
৩০. সৈয়দ মুজতবা আলী : অর্থমর্থম্, রাজাউজীর, পৃ. ২৩০-৩১।
৩১. রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ : সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৮১।
৩২. ঈদ-আনন্দোৎসব, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪।
৩৩. ঐ, পৃ. ৩১৪-১৫।
৩৪. রায়পিথৌরা : সপ্তপর্ণী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১শে এপ্রিল, ১৯৫৩, পৃ. ৪।
৩৫. রায়পিথৌরা : দেহলি প্রান্তে, আনন্দাবাজার পত্রিকা, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫২, পৃ. ৪।
৩৬. বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি, বড়বাবু, পৃ. ৫৯।
৩৭. ঐ, পৃ. ৬০।
৩৮. ঐ, পৃ. ৬৪।
৩৯. রায়পিথৌরা : দেহলি প্রান্তে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৫২, পৃ. ৪।
৪০. শহ্‌র-ইয়ার, পৃ. ১৯২।
৪১. হাস্যরসে ভগবান, দৈনিক বসুমতী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃ. ১৬১।
৪২. ভবঘুরে, ভবঘুরে ও অন্যান্য, পৃ. ২৫৩।
৪৩. ঐ, পৃ. ২৫৯।
৪৪. সত্যব্রত ঘোষ : সৈয়দ মুজতবা আলী, (আলোচনা), দেশ, ৯ই চৈত্র, ১৩৮০, পৃ. ৬৩৬।
৪৫. যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী, সৈয়দ মুজতবা আলী, রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩০৪।
৪৬. মুসাফির, পৃ. ৮৭।
৪৭. সত্যপীর : হ য ব র ল, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৬, পৃ. ৪।
৪৮. ঐ, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৬, পৃ. ৪।
৪৯. ঐ, ২০শে অক্টোবর, ১৯৪৫, পৃ. ৪।
৫০. ঐ, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৬, পৃ. ৪।
৫১. ঐ, ৮ই জুন, ১৯৪৬, পৃ. ৪।
৫২. সত্যপীর : প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩রা মে, ১৯৪৬, পৃ. ৪।
৫৩. সত্যপীর : হ য ব র ল, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪৫, পৃ. ৪।
৫৪. পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়, পৃ. ৬৫।
৫৫. হ য ব র ল, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৬৫।
৫৬. পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়, পৃ. ৬৩।
৫৭. পাঠকের নিবেদন, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮।
৫৮. সত্যপীর : হ য ব র ল, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, পৃ. ৪।
৫৯. সত্যপীর :'৪২-'৪৫, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৭৫।
৬০. সত্যপীর : ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই (২) সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৬৭।

৬১. পঞ্চতন্ত্র, দেশ ১৩ই পৌষ, ১৩৬৯, পৃ. ৮৩৫-৩৬।
৬২. আরব্য-রজনীর অরুণোদয়, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৬২।
৬৩. ভাই ভাই একঠাঁই (১) তে উদ্ধৃত, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭-৭৮।
৬৪. ভাই ভাই একঠাঁই (১) তে উদ্ধৃত, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮।
৬৫. সত্যপীর : পাকিস্তান ?, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৬, পৃ. ৪।
৬৬. ভবঘুরে, ভবঘুরে ও অন্যান্য, পৃ. ১৯৩।
৬৭. শহর ইয়ার, পৃ. ২৫১।
৬৮. [illegible], [illegible], সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৩৭।
৬৯. হ য ব র ল (৬), সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৪০।
৭০. সত্যপীর : হ য ব র ল, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ শে জানুয়ারি, ১৯৪৬, পৃ. ৪। .
৭১. ঐ, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৬, পৃ. ৪।
৭২. পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, নবজাতক প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৬৫।
৭৩. ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই (১), সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম, খণ্ড, পৃ. ২৭০।
৭৪. ঐ, পৃ. ২৬৯।
৭৫. ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই (২), সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ঐ, পৃ. ২৭২।
৭৬. ভাই ভাই একঠাঁই (৪), সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ঐ, পৃ. ২৮৬।
৭৭. সত্যপীর : ভাই ভাই একঠাঁই, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৬, পৃ. ৪।
৭৮. ভাই ভাই একঠাঁই (২), সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯।
৭৯. ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই (১), ঐ, পৃ. ২৬৭।
৮০. দিনলিপি, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫।
৮১. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : গ্রন্থ পরিচয় (দেশে-বিদেশে), বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৬, পৃ. ১৩৯।
৮২. সত্যপীর : নেটিভ স্টেট, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩২৩।
৮৩. পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, (নবজাতক প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭০), পৃ. ৬৫।
৮৪. বন্ধ বাতায়নে, বড়বাবু, পৃ. ১৮৮।
৮৫. বিসমিল্লায় গলৎ, উভয় বাংলা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪।
৮৬. সত্যপীর : ইতিহাস পাঠ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে জুন, ১৯৪৬, পৃ. ৪।
৮৭. সত্যপীর : বৃহত্তর ভারত, আনন্দবাজার পত্রিক, ১৭ই মে, ১৯৪৬, পৃ. ৪।
৮৮. সত্যপীর : হ য ব র ল, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই মার্চ,১৯৪৬, পৃ. ৪।
৮৯. হ য ব র ল (৫), সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭।
৯০. হ য ব র ল (২), সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫৭।
৯১. সত্যপীর : হ য ব র ল, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, পৃ. ৪।
৯২. সত্যপীর : নবীন পাঠশালা, আনন্দবাজার পত্রিক, ২০ শে জুলাই, ১৯৪৫, পৃ. ৪।
৯৩. ঐতিহ্য, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৭৪।
৯৪. ওমর খৈয়াম : ত্রিবেণী, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৭০-৭১

অধ্যায় : দশ

০১.

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবশেষে স্বরাজ তথা স্বাধীনতার সূর্যোদয় ভারতবর্ষে অত্যাসন্ন হয়ে উঠলো। শৃঙ্খলমুক্তির প্রত্যাশায় সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর ক্ষুরধার লেখনী নিরলসভাবে কাজে লাগিয়ে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। প্রাক্-স্বাধীনতা এবং উত্তর-স্বাধীনতা যুগে আলী সাহেবের লিখন শৈলীর বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্যযোগ্য না হলেও বক্তব্যের সুর-পার্থক্য সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য। এতোদিন তাঁর জেহাদ ছিল দাসত্ববন্ধনমুক্তির—পরাধীন জাতির যা একমাত্র 'রাজনীতি হওয়া উচিত'। বহু বাধাবিপত্তির অবসানে স্বাধীনতা এলো। ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে নব-উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হয়ে স্বদেশকে নোতুনভাবে নির্মাণ করতে হবে এবং তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করতে হবে এ মহাব্রতে। সুতরাং পথনির্দেশের দায়িত্ব সচল লেখনীতে মুজতবা আলীও কিছুটা পালন করেছেন।

প্রথমেই প্রশ্ন, খণ্ডিত ভারতে পাকিস্তান-বহির্ভূত এলাকার নাম কি হবে—ইন্ডিয়া, হিন্দুস্থান? না, অন্যকিছু? ভাষাতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করে মুজতবা আলী বলেছেন, " ...if we start calling the rest of India by the name Hindusthan we are bound to strengthen the impression that this new 'Hindusthan' contains only Hindus. Surely the Muslims, Sikhs, Parsis, Christians, Jains and even the Hindus—barring Mahasabha, perhaps—have no such intention.'[১] এমনকি সমগ্র ভারতবর্ষেও 'হিন্দুস্থান' শব্দটি প্রচলিত নয়। উর্দুভাষীরা ব্যবহার করে 'হিন্দুস্তান'—কখনো 'ভারত'। বাঙালী ও আসামীরা কদাচিৎ শব্দটি ব্যবহার করে এবং 'হিন্দুস্থানী' শব্দে পশ্চিম ভারত থেকে আগত বহিরাগতদের সনাক্ত করে। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয় ভারতবর্ষ। নাতিদীর্ঘ আলোচনার পর মুজতবা আলীর সুচিন্তিত অভিমত :

"I therefore feel that there is no alternative but to maintain the status quo. We shall continue to use 'India' when we write and speak English, and 'Bharatvarsha' and 'Hindussthan' according to the predilection and genius of the different Indian languages, as in the past."[২]

স্বাধীন ভারতের নামকরণে এই পন্থাই সর্বজনীনতা লাভ করেছে এবং অনুসৃত হচ্ছে।

অখণ্ড ভারতের সমর্থক মুজতবা আলী বঙ্গবিভক্তিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। এবং এটা তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিলো না। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসেবে কোলকাতাতেই থেকে গেলেন। রাজনৈতিক তথা ভৌগোলিক বিভক্তির বাস্তবতাকে না

মেনে উপায়ান্তর ছিলো না। কিন্তু উভয় বঙ্গের সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন যাতে বিনষ্ট না হয়, উভয় বঙ্গের মানুষ যেন পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে না নেয়—সে সাধনায় আলী সাহেব আজীবন নিমগ্ন থেকেছেন। শিল্পী-সাহিত্যিকগোষ্ঠীই ছিলেন উভয় বঙ্গের সেতুবন্ধন স্বরূপ। ফলে বিবিধ পীড়নে তাঁদের পর্যুদস্ত হতে হয়েছে। স্বাধীন বাঙালী জাতির নব-অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরেই মুজতবা আলী বিভাগোত্তরকালের স্মৃতিচারণায় স্মরণ করেছেন :

"পুব-বাঙলার যে সব লেখক ও অন্যান্য কলাকার এখানে রয়ে গেলেন ও ওপার বাঙলা থেকে যাঁরা এলেন, তাঁদের অধিকাংশই হিন্দু। কেউ কেউ পাঞ্জাবী-কণ্টকিত পাক সরকার কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে পুব-বাঙলা ত্যাগ করতে বাধ্য হন, এঁদের সকলেই আপন আপন সহকর্মীদের প্রতি এবং মাতৃভূমি পুব-বাঙলার প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন।...

পূর্বোক্ত দুই পক্ষই—এ বাঙলা থেকে যাঁরা ও-বাঙলা গেলেন এবং ওদিকে থেকে এদিক এলেন, এঁরাই ছিলেন উভয় বঙ্গের সর্ব প্রধান চিন্ময় বন্ধন, মূর্তিমান সেতু! পিণ্ডির পাশবিক বৈরীভাব ছিল প্রধানত এঁদেরই প্রতি। তাই সে নির্মাণ করেছিল লৌহযবনিকা প্রস্তর-প্রাচীর।"[৩]

পাশবশক্তির নির্মমতার শিকার সৈয়দ মুজতবা আলী নবীন বাঙলাদেশকে স্বাগত জানিয়ে একান্ত কামনা ব্যক্ত করেছেন :

"দুই বাঙলা ক্রমে ক্রমে একে অন্যের কাছে আসবে। পঁচিশ বৎসরের বিচ্ছেদের পর পুনরায় করে একে অন্যকে চিনতে হবে।"[৪]

বৈরী পরিবেশে অনেক সময় মুজতবা ছিলেন একক যোদ্ধা। তিনি চেয়েছিলেন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারত ও পাকিস্তানে যেন সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে গণরাষ্ট্র নির্মিত হয়। এবং কোনো অবস্থাতেই "যুদ্ধ কাম্য বস্তু নয়। অন্যের বিনাশ বাসনা সর্বথা বর্জনীয়। পাকিস্তান বিনষ্ট হলে ভারতীয় ইউনিয়নের লাভ নেই, ভারতীয় ইউনিয়ন বিনষ্ট হলে পাকিস্তানের লাভ নেই।"[৫] সাধারণের জীবনে ফলপ্রসূ স্বাধীনতার ধ্যানধারণাই একমাত্র কাম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। আলী সাহেব তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করে 'সবিনয় নিবেদনে' উল্লেখ করেন : "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যেন কোনো মহত্তর আদর্শের অনুপ্রেরণায় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। ... আমার জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অত্যল্প কিন্তু নানাদেশের গুণীদের মুখে শুনেছি, নানা সৎ গ্রন্থে পড়েছি, দীন ইসলাম বলেন, সে আদর্শ হবে রাষ্ট্রের দীনদুঃখীর সেবা করা। উভয় পাকিস্তান যদি এই আদর্শ সামনে ধরে যে তাদের রাষ্ট্রভিত্তি নির্মিত হবে চাষামজুরদেরকে অন্ন দিয়ে, দুঃস্থকে সেবা করে। অজ্ঞকে জ্ঞান দান করে, এক কথায় 'সাইল'কে (অভাবে আতুরকে) 'গণী' (অভাবমুক্ত) করে, তাহলে আর ভয় নেই, ভাবনা নেই। উভয় প্রান্তে গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যে ঐক্যসূত্রে সম্মিলিত হবে সে সূত্র ছিন্ন হওয়ার ভয় নেই।"[৫]

১৯৪৮-এর ডিসেম্বর মাসে বগুড়া কলেজের বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির ভাষণে সৈয়দ মুজতবা আলী সৎ প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব নিয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্যে ভারত-পাকিস্তানের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন। একই রাষ্ট্রে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে পার্থক্য থাকলেও "দৃষ্টিভঙ্গীর একটা ঐক্য থাকতে পারে— যেখানে ধর্মের কোনো স্থান নেই।" ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন গজনীর সুলতান মাহমুদের সভা-পণ্ডিত আল-বেরুনী ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে স্বদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার মানসে কী অসাধারণ পরিশ্রমের দ্বারা সাফল্য

অর্জন করেছিলেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "এই যে Power of assimilation বা পরের ভালোটুকু আত্মস্থ করে নেওয়ার ক্ষমতা সেটা একদিন ইসলামের ছিল—সে ক্ষেত্রে সে ধর্মনিরপেক্ষভাবেই চলেছিল।" তাই আলী সাহেব আহ্বান জানিয়েছিলেন :

"আজ পূর্ব-পাকিস্তানের এই বিরাট জনসংখ্যাকে ইসলামের ঐতিহ্য মনে রাখতে হবে এবং সেই পরমতসহিষ্ণুতাকে সম্বল করে নিজের ধর্মমতকে আর একটু পরের সমালোচনার দ্বারা সহনশীল এবং তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র করে অগ্রসর হতে হবে—তাহলে জনসংখ্যায়... পারস্যাপেক্ষা বড় এই যে পূর্ব বাংলা এ কি উন্নত হতে পারবে না!... প্রাক্-স্বাধীন যুগে ছিল ভাঙার কাজ—স্বাধীনোত্তর সময়ে হবে গড়ার কাজ। ভারত ডোমিনিয়নের কটা বন্দুক-কামান আছে এবং আমাদেরই বা কটা আছে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দেশের কোন উপকার হবে না। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা নয়—নিজের দেশের কিসে ভাল হবে, দেশের লোক কিসে পেট ভরে খেতে এবং পরতে পারবে সেই সব শুভঙ্করী বুদ্ধিবৃত্তির দিকে আপনাদের উৎসাহ প্রয়োগ করতে হবে। যদি এই কথা মনে রাখেন, দেশের সেবাই আপনাদের উদ্দেশ্য... সেটাই হবে আপনাদের রাষ্ট্রের 'দৃঢ়ভিত্তি'—তার উপর প্রতিষ্ঠিত হলে এর আর অধঃপতন নেই।"[৬] সেই সঙ্গে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, "শুধু ধর্মের বুলির উপর নিজস্ব বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে একটা নতুন দেশের পত্তন করা যায় না।"[৬]

১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার তাদের সংবিধানে ধর্মীয় জিগির তুলে 'সস্তায় কিস্তিমাত' করতে চাইলে করাচীর যুবসম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে 'দেয়ালে দেয়ালে' তাদের প্রবল আপত্তি প্রকাশ করেছিলো। মুজতবা তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যথাসম্ভব শাস্ত্রগ্রন্থে যুক্তি ও তথ্যের সন্ধান করেন।

"বাইবেলে লেখা আছে বাবিলনের রাজা বেল্‌জাৎসর ইহুদিদের প্রধান মন্দির লুট করে তারই স্বর্ণ কোষাকুষি দিয়ে মদ্য পান করতে করতে ইহুদিদের কুলদেবতা যেহোভাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ দেয়ালের গায়ে আগুনের হরফে কি যেন লেখা হয়ে গেল। বেল্‌জাৎসর ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। সেই রাত্রেই অজানা ঘাতকের হাতে বেল্‌জাৎসর প্রাণ দেন।

তারই থেকে প্রবাদ এসেছে "রাইটিং অন দি ওয়াল"—

করাচীর মহাজনরা যদি দেয়ালের উপর ছোকরাদের লেখাগুলো ঠিকঠিক পড়তে পারেন, তবেই মঙ্গল।"[৭] —তাঁরা সে লিখনের পাঠোদ্ধারে সমর্থ হননি—প্রমাণ স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলাদেশের অভ্যুদয়। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রাগ্রসর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার পরিচয় তাঁর নিবন্ধাবলীতে লভ্য। দেশ-বিভাগের সাড়ে তিন মাসের মধ্যেই ১৯৪৭-এর ৩০শে নভেম্বরে এক বক্তৃতায় এবং '৪৮-এ একটি নিবন্ধে অমোঘ ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন :

"পূর্ব-পাকিস্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তার ঘাড়ে উর্দু চাপানো হয় তবে স্বভাবতই উর্দু ভাষাভাষী বহু নিষ্কর্মা শুধু ভাষার জোরে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার চেষ্টা করবে— ...এবং ফলে জনসাধারণ একদিন বিদ্রোহ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যবে।"[৮] এবং এ' সঙ্গে উল্লিখিত, "বর্ণের কৌলীন্য যেমন শোষণের কারণ হতে পারে, ভাষার কৌলীন্যও ঠিক সেই রকম শোষণপন্থা প্রশস্ততর করে দেয়।"[৮]

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা, মুজতবা আলী বগুড়া থেকে পলায়ন করে ১৯৪৯ সালে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। আসলে '৪৯-এর জানুয়ারিতে তাঁকে কোলকাতা থেকে

ধরে এনে বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষের পদে বসানো হয়েছিলো। পরিস্থিতি জটিলাকার ধারণ করলে তিনি গোপনে পুনরায় কোলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর পাসপোর্ট প্রথার প্রচলন হলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় নাগরিক হিসেবে পাসপোর্ট সংগ্রহ করেন। সুতরাং পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে তিনি কোলকাতায় 'হিজরৎ' করেননি। বগুড়া থেকে প্রস্থানের সরস বর্ণনায় স্বয়ং আলী সাহেব বলেন :

"... ওরা (পশ্চিম বঙ্গবাসী) এবং-এ পারে (বাঙলাদেশের), বহু দূরের বগুড়াবাসীরা মাত্র গুহ্য তত্ত্বটি অবগত আছেন; পার্টিশেনের পরেই একটি বিশেষ দ্রব্য* হেথাকার নওগাঁ থেকে চালান বন্ধ হয়ে যায়। ভদ্রলোকের ছেলে সরাসরি নওগাঁ যাই কি প্রকারে? তাই সেটাকে বগুড়াবাসের কামুফ্লাজে ঢেকে সেখানে কয়েক মাস কাটাই। কিন্তু কপাল মন্দ। চীফ-সেক্রেটারী আজিজ আহমদ—আহা, কি 'আজিজ' প্যারা দোস্তই না পেয়েছিল মহাপুণ্যবান মরহুম পূর্ব পাকিস্তান—তিনি আমাকে হাতের কাছে না পেয়ে লাগলেন আমার ইষ্টিকুটুমের পিছনে। কিই বা করি তখন আমি আর! গুটি গুটি ফের কলকাতা। মেহেরবান আজমুশ্‌শান আজিজ আহমদ খান জান-প্রাণ ভরে তসল্লীর ঠাণ্ডা শাঁস ফেললেন!... মশরিকী পাকিস্তানকে বরবাদ পয়মাল করার তরে যে বদ্-বখ্‌ৎ হিন্দুস্থানী এসেছিল হেথায়, সে-ইবলিস গেছে!"[৯]

০২.

স্বাধীনতা-উত্তর কালেও মুজতবা আলী একাগ্রচিত্তে সর্বভারতীয় ঐক্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এবং এ-বিষয়ে একাধিক নিবন্ধে বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভারত বহু জাতিক ও বহু ভাষিক দেশ, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় তো রয়েছেনই এবং সকলেরই সম্মিলনে এক 'ভারতবাসী'। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বৈদগ্ধ্য দেশের বৈদগ্ধের নিয়ামক হলেও বৈদগ্ধ্য এবং ধর্ম অভিন্ন বস্তু নয়। যেমন ইংরেজ গ্রীক এবং রোমান বৈদগ্ধ্য স্বীকার করে নিয়ে তার সাহিত্য, নাটক, অলঙ্কার ইত্যাদি থেকে আহৃত ধ্যানধারণায় আপন বৈদগ্ধ্যকে সমৃদ্ধ করলেও সে গ্রীক কিংবা রোমান ধর্ম গ্রহণ করেনি। তেমনি–

"আমাদের জাতীয় জীবনে আমরা দেখব বেদ থেকে রবীন্দ্রনাথ (এমন কি নজরুল ইসলাম) পর্যন্ত আমাদের বৈদগ্ধ্য-ভাণ্ডারে কে কি কি সম্পদ দিয়ে গিয়েছেন?

এই সুদীর্ঘ চার হাজার বৎসরের ইতিহাসে বহু অ-হিন্দু আমাদের বৈদগ্ধ্যে অনেক কিছু দিয়ে গিয়েছেন, আমরা গ্রীক ... ইরানির কাছ থেকে জ্যোতিষ এবং ভাস্কর্যের (গান্ধার কলা) অনেক কছু শিখেছি এবং যুগ যুগ ধরে বহু মানবের কাছ থেকে নিয়েছি ও দিয়েছি। তাই দিয়ে আমাদের বৈদগ্ধ্য গড়া হয়েছে।

তাই আজ একবাক্যমনে ভারতভাগ্যবিধাতাকে নমস্কার করি যিনি পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাত-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খৃষ্টানীকে সম্মিলিত করেছেন—সেই দেবের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা পুনরায় ভারতের সর্ব ধর্মবিশ্বাসীকে আহ্বান করি—

মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা

* গঞ্জিকা, নওগাঁ এই বস্তুটির জন্য প্রসিদ্ধ।

সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে—
আজি ভারতের মহামানবেরর
সাগর-তীরে।"[১০]

ভারতীয় সংহতির প্রতি অনড় আস্থার ফলেই একদা মুজতবা আলী সমগ্র ভারতের জন্যে একটি রাষ্ট্রভাষা এবং একই লিপি প্রবর্তনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনার আবেদন জানিয়েছিলেন। জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই মহাত্মা গান্ধী উর্দু-হিন্দীর সংমিশ্রণে সর্ববিধ অনুভূতি প্রকাশে সমর্থ, নোতুন শব্দ গ্রহণে অকুণ্ঠিত একটি প্রাণবন্ত সজীব ভাষার কথা বলেছিলেন। "এই ভাষার নাম হিন্দুস্থানী। পণ্ডিত জওয়াহিরলাল এই জাতীয় ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চান। ... আমাদের রাষ্ট্রভাষা যখন শেষ পর্যন্ত তার জন্মভূমি যুক্ত প্রদেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্র মগধ সর্বত্রই সে ভাষা ব্যবহৃত হবে, তখন সে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে নানা প্রকারের শব্দ গ্রহণ করতে বাধ্য।...

বিশাল ভারত, বৃহত্তর ভারতবর্ষের স্বপ্ন যাঁরা দেখতে চান, একমাত্র তাঁরাই মহাত্মাজীর বাণী, পণ্ডিতজীর আবেগ বুঝতে পারবেন।" [১১]

এটা তো সহজবোধ্য, ভারতের মতো বহুভাষী বিশাল দেশের রাষ্ট্রভাষার শব্দভাণ্ডারও হবে বিরাট। বহু প্রদেশের বিচিত্র চিন্তাধারা প্রকাশক্ষম এই ভাষা প্রয়োজনবোধে দেশবহির্ভূত ভাষা থেকেও শব্দসম্পদ চয়ন করবে। তাই প্রচলিত আরবী-ফার্সী-উর্দু বিতাড়িত করে 'বিশুদ্ধ হিন্দী' প্রবর্তনের উদগ্র বাসনা দেখে বিক্ষুব্ধ মুজতবা মানস :

"ইংরেজকে যে খেদাতে হবে 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে' সেই জোরালো বাঙলা পর্যন্ত (হিন্দীতে) অনুবাদ করা যাবে না। কারণ 'আব্রু', 'ইজ্জত', 'ইমান' শব্দ ফারসী-আরবী—হিন্দী এ শব্দগুলো বরদাস্ত ... করবেন না। 'আব্রুর' সংস্কৃত জানিনে, 'ইজ্জৎ' না হয় কেঁদে-কুকিয়ে 'মান' দিয়ে চালালুম, কিন্তু 'ইমান' শব্দের সংস্কৃত নেই.... 'বেইমানির' জায়গায় 'বিশ্বাসঘাতকতা' চালাতে গেলে 'ভাষার হাটে বেইমানি' করা হয়।"[১২]

আমরা আগেই বলেছি অখণ্ড ভারতের একমাত্র প্রতিভূ হিসেবে মুজতবা আলী কংগ্রেসের ওপর ভরসা রেখেছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালেও তাতে চিড় ধরেনি।

পুরনো পার্লিমেন্টের বদলে ১৯৫২ সালে নোতুন পার্লিমেন্ট বসে এবং তাতে কংগ্রেস ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দল। প্রাক্-স্বাধীনতাকালের ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে দেশীয় ক্ষমতাসীনদের তৌল আলোচনায় আলী সাহেব লিখেছেন:

"কংগ্রেস দেশের মঙ্গল কামনা করেন, ইংরেজ ইংলন্ডের মঙ্গল কামনা করত এবং কংগ্রেস গুরু সংখ্যার সাহায্যে আইন-কানুন পাস করেন, ইংরেজ তার পরোয়া করত না।

... কংগ্রেসে এবার যে তরুণ সম্প্রদায় প্রবেশ করেছেন তাঁরা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সমস্যাগুলোর অধ্যয়ন-অভ্যাস করে পার্লিমেন্টে ধীরে ধীরে কংগ্রেসকে নবরূপ দিতে পারেন তবে সত্যকার কাজ হয়।

আমার অন্ধবিশ্বাস এঁরাই আমাদের ভবিষ্যৎ—অন্ততঃ পার্লিমেন্টের ভিতরে।"[১৩]

'অন্ধবিশ্বাস' প্রায় ক্ষেত্রেই ক্ষণভঙ্গুর। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমতার লড়াই দেখে ক্ষুণ্ন মুজতবা আলী জনগণকে তাদের দায়িত্বের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে ক্ষমতাসীনদেরও সতর্ক করেছেন যেন 'জনমত উপেক্ষা করে ফতোয়া জাহির' ও 'হাতিয়ার বাহির' না করে। সম্ভবতঃ জনমত উপেক্ষার 'আলামত' সবে দেখা যাচ্ছিলো।

মুজতবা আলীর মধ্যে অখণ্ড ভারতের প্রতি যে শর্তহীন আস্থা ধ্রুবসত্যের মতো ছিলো, স্বাধীনতা লাভের অল্পদিনের মধ্যেই তার ভিত কিছুটা নড়ে যায়—বিশ্বাসে জাগে সন্দেহ। এই অবিশ্বাস প্রথম দেখা দেয় রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বাঙালীর অবদানে মুজতবা আলী ছিলেন রীতিমতো গর্বিত। তাঁর বিবেচনায় বাঙলা ভারতের সমৃদ্ধতম ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে এ' ভাষা বিশ্ববাসীর কৌতূহল ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে—যা' অপরাপর ভারতীয় ভাষার স্বপ্নেরও অগোচর। সুতরাং, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাঙলা ভাষায় রচিত জাতীয় সঙ্গীতের নির্বাচনে তিনি অধিক উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। কেননা, তাঁর বদ্ধমূল ধারণা ছিল জাতীয় সঙ্গীতের ভাষাই রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি লাভ করবে। "ভারতভাগ্যবিধাতা"র মুখের বুলিই তো হবে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের বাহন, জাতির বরেণ্য ভাষা! তাঁকে সনাক্ত করার উপায় কি ? মুজতবা লিখেছেন :

"তিনি (ভারতভাগ্যবিধাতা) এলে আমরা তাঁকে চিনতে পারব তো ? আমার মনে হয় পারব। কারণ তিনি কোন্ ভাষায় তাঁর বাণী প্রচার করবেন তার কিছুটা সন্ধান আমরা পেয়ে গিয়েছি—তিনি স্বীকার করে নেবেন প্রথমেই জনগণমন-অধিনায়ক ভারতভাগ্যবিধাতাকে, তাঁর উদার বাণীতেও অহরহ প্রচারিত থাকবে সেই আহ্বান যে আহ্বানে সাড়া দেবে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-জৈন-পারসিক-মুসলমান-খ্রীস্টান, তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাবো সেই চির-সারথির রথচক্রঘর্ঘর, যিনি পতন-অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থার উপর দিয়ে নিয়ে এসেছেন আমাদিগকে এই নবযুগের অরুণোদয়ের সামনে।

শত মূঢ়তার মাঝখানে যে আমরা আজ কোটিকণ্ঠে ভারত-ভাগ্যবিধাতাকে স্বীকার করে নিলুম—জাতীয়-সঙ্গীত নির্বাচনে পথভ্রান্ত হইনি—এ বড় কম আশার কথা নয়।"[১৪]

বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে এক সময় মুজতবা আলী একটি মাত্র সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষার প্রবক্তা হলেও রাজনীতিকদের সঙ্কীর্ণতা ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে তিনিও তাঁর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসেন এবং প্রাদেশিক ভাষাগুলোর সপক্ষে জোরালো এবং যুক্তিপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেন। গান্ধীজীর নির্দেশিত ও পণ্ডিত নেহরু-সমর্থিত 'হিন্দুস্থানী'র বদলে 'বিশুদ্ধ হিন্দী'কে একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ায় মুজতবা আলীর প্রবল আপত্তির কারণ এতে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগুলোর পুষ্টি ও বিকাশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে। তাঁর ঋজু যুক্তি, "ইংরেজী যে পথে অন্তরায় হয়ে বসেছিল, আজ যদি ইংরেজির শূন্য আসনটি হিন্দী দখল করে বসে তবে আমরা যে আবছায়ায় ছিলুম সেই আবছায়ায়ই থাকবো।"[১৫]

স্বাধীনতা-উত্তরকালে মুজতবা আলীর চিন্তাধারায় পরিবর্তনের লক্ষণ ক্রমশঃই স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এ' সময় যে সর্বভারতীয় ঐক্যের কথা বলেছেন সেটা আপন সত্তাকে, নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিয়ে নয়, বরঞ্চ নিজের স্বাতন্ত্র্যকে পরিপূর্ণ বিকশিত করে, দেশের বৃহত্তর বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য-সংহতির সন্ধান করতে হবে। এ' উদ্দেশ্যেই মাতৃভাষার মাধ্যমে আপন বৈদগ্ধ্যকে পূর্ণতর রূপে মেলে ধরবার প্রতি তিনি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। অন্যথায় "আমাদের সর্ব প্রচেষ্টা, সর্ব অর্থব্যয় সর্ব কৃচ্ছ্রসাধন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে যদি আমরা আমাদের সর্ব পরিকল্পনা সর্ব প্রচেষ্টা জনগণের বোধ্য ভাষায় তাদের সম্মুখে প্রকাশ না করি।"[১৬] তাঁর দ্বিধার কিঞ্চিৎমাত্র অবকাশ নেই যে, ভবিষ্যতে যে ভারতীয় বৈদগ্ধ্য গড়ে উঠবে তার বুনিয়াদ প্রদেশে প্রদেশে। প্রত্যেক প্রদেশ নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য, চারুশিল্প, আপন ধর্ম ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে গভীর অনুশীলনের ফলে যে সিদ্ধিলাভ করবে "তারই উপর একদিন দাঁড়াবে বিরাট কলেবর, বৈচিত্র্য-সুশোভিত, সর্বজনগ্রাহ্য ভারতীয় বৈদগ্ধ্য।"[১৭]

অনেকে 'ঐক্য' এবং 'সমতা'কে সমার্থক শব্দ জ্ঞানে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন। আলী সাহেবের বিবেচনায় সর্ব প্রদেশের, বিভিন্নভাষী ও ধর্মসম্প্রদায়ের লোক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে অঙ্গীকার করে আপন মনীষার বিকাশের মাধ্যমে যদি বৃহত্তর ঐক্যে সম্মিলিত হতে পারে, তাহলে সেটাই হবে যথার্থ ঐক্য। তাঁর সুস্পষ্ট ঘোষণা :

"বাঙলার চর্চা যে আমি আমার কট্টর বাঙালীত্বের জন্য করছি তা নয়—বাঙলার সেবার ভিতর দিয়েই আমি ভারতীয় ঐক্যের সেবা করছি;... সেইটেই হক্ কথা, সেইখানেই খাঁটি জাতীয়তাবাদ।"[১৭]

এই জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বলেই তিনি আশাবাদ প্রকাশ করেন, শুধুমাত্র সমৃদ্ধশালী প্রদেশগুলো নয়, 'খাসি, গারো, নাগা, লুসাই এরা সকলেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর দিয়ে, আপন স্বতন্ত্র কৃষ্টি বজায় রেখে বৃহৎ ভারতে আপন স্থান খুঁজে নিক।"[১৮]

একমাত্র আত্মবিস্মৃত জাতি আপন ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করতে পারে। ঐতিহ্যের বিলুপ্তির মধ্যে একটি সভ্য জাতির ইতিহাসেরও সমাধি রচিত হয়। তাই ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বৈদগ্ধ্যের আধার ভাষাগুলোর অনাদরে মুজতবা মানস বিক্ষুব্ধ।

"মাদ্রাসাগুলো মরে যাচ্ছে—আরবী ফার্সীর চর্চা কমে আসছে।

আর সংস্কৃত তো "ডেড ল্যানগুইজ।" তাই টোলগুলো মরুক—আপত্তি নেই!!

কী দেশ!"[১৯]

০৩.

মুজতবা-মানসে ক্রমেই দৃঢ়বদ্ধ হতে থাকে যে, তাঁর স্বভাষী স্বাধীনতার প্রত্যাশিত ফসল থেকে বঞ্চিত এবং কূটচক্রান্তে প্রবঞ্চিত। রাজধানী দিল্লীতে অবস্থানকালে স্বভাষীর নিপীড়ন, সর্বক্ষেত্রে বাঙালীর পশ্চাদপদতা এবং অধিকাংশ স্থলেই বাঙালীকে পারিপার্শ্বিকতার শিকার হতে দেখে মুজতবা আলী বিচলিত বোধ করেছেন। স্বরাজ লাভের সাধনায় যে বাঙালী "আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে জ্বলেছে", যে বঙ্গভূমি "বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র"-এর মতো মহাত্মাদের জন্মদাতৃ—তারই সন্তানদের লাঞ্ছনা-অবমাননায় মুজতবার "...হাসি পায়, কান্নাও পায়—তখন আমরা কী naif (প্রায় 'ন্যাকার' মত) -ই না ছিলুম, যে বিশ্বাস করতুম—স্বরাজ পাওয়ার পরই 'পাঁচ আঙুল ঘিয়ে ' আর 'ডেগ-এর ভিতর গর্দান ঢুকিয়ে ভোজন!'

তাই কি রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী বলেছিলেন' ,... 'একদিন (স্বরাজ লাভের পর) যেন না বলতে হয়, ইংরেজই ছিল ভালো!' "[২০] তাই অল্পদিনের মধ্যেই দিল্লী তাঁর কাছে 'প্রবাসভূমি' হয়ে ওঠে এবং 'স্বদেশে' প্রত্যাবর্তনের জন্যে হৃদয় ব্যাকুল। রাজধানীর সাড়ম্বর আলো ঝলমল দেয়ালি উৎসবের দিন তাঁর মন ছুটে যায় এমন একটি ছোট শহরে যেখানে "একটি মেয়ে তার ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এ-পিদিমে তেল ঢালছে, ও পিদিমের পলতে উস্কে দিচ্ছে, পিদিমের আলো তার মুখে এসে পড়েছে, ছোট ভাইটির হাতে ধরে এক পিদিম থেকে আরেক পিদিম জ্বালাতে শেখাচ্ছে, তখন মনের উপর যে-ছবিটি আঁকা হয় সে ছবি বহু বৎসর পরে স্মরণ করেও প্রবাসীর মনে আনন্দ হয়, তার সঙ্গে খানিকটে মধুর মধুর বেদনাও এনে দেয়।"[২১]

দিল্লী মনোরম, কিন্তু মুজতবার ভালোবাসার শহর কোলকাতা। তাই 'ভিন্-দেশ' ছেড়ে কোলকাতায় আসার বাসনা। মুজতবার বন্ধু তাকে বলেছিলো, 'এ-লোকটা বিদেশে ঘোরে স্বদেশ আপন পকেটে রেখে।' কোলকাতা প্রত্যাবর্তনে তাঁর এ অপবাদ যেন ঘুচলো, "এইবার দেশে ফিরেছি। স্বদেশ আর পকেটে পুরে রাখতে হবে না।"[২২] একি শুধু অভিমান ? না, হতাশাগ্রস্ত মনের অভিব্যক্তি ? প্রাদেশিকতার বীজ তো তাঁর চরিত্রে পূর্বে দেখা যায়নি। তাহলে মুজতবার দেশ কোন্‌টি—ভারত, না পশ্চিম বঙ্গ? ২৮শে ফেব্রুয়ারি, '৬৮-তে তিনি ঢাকা থেকে ভানু রায়কে কোলকাতা প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দান করছেন, 'মার্চের শেষ সপ্তাহে বা এপ্রিলে দেশে ফিরবো।' ১৯৭০-এ 'জরাসন্ধ'কেও জানাচ্ছেন, '(সিলেট থেকে) দেশে ফিরে আসা মাত্রই মোকা জুটে যায় জর্মনি যাওয়ার।' সুতরাং তাঁর 'দেশ' যে কোলকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গ, কাগজেকলমে তার স্বীকৃতির অভাব নেই।—অবশ্য এটা যে নিতান্ত ঘরোয়া অর্থেই ব্যবহার করেছেন সে-বিষয়ে আমরা নির্দ্বন্দ্ব। ভারত যখনই কোনো বৃহত্তর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে, তখন যে-কোনো দেশপ্রেমীর মতোই উত্তেজনা-উদ্দীপনা-আবেগে মুজতবার হৃদয়মন হয়েছে প্রকম্পিত। ১৯৬২ সনে চীন-ভারত যুদ্ধকালে তিনি লিখেছেন, 'স্বাধীন জাতি আক্রান্ত হলে তার একমাত্র রাজনীতি আক্রমণকারীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা।' এবং দেশ শত্রু মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মুজতবাও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ধ্বনি তোলেন 'আরাম হারাম হ্যায়।' সুপ্রাচীনকাল থেকে চীন-ভারত মৈত্রী তথা ভাব-বিনিময়ের সুবিস্তৃত আলোচনার পর চৈনিক পরিব্রাজক-শ্রমণদের ভারতে যে রাজসম্মান প্রদর্শন করা হতো তার উল্লেখ করে দৃঢ় প্রত্যয়ী মুজতবা আলী বজ্রনিনাদে ঘোষণা করেন :

> "আজ যদি চীন সে সখ্য ভুলতে চায়, ভুলুক।
> ভারতও তার রুদ্ররূপ দেখাতে জানে।
> জয় হিন্দ।"[২৩]

০৪.

রাজনৈতিক পাকেচক্রে একটি দেশ দ্বিখণ্ডিত হলো। অতঃপর ক্রমেই তারা পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে অপরিচিত, অচেনা হয়ে যাচ্ছে—মুজতবা আলী আত্যন্তিকভাবে এর অবসান কামনা করেছেন। অন্ততঃ এরা যেন পরস্পরকে চিরশত্রু করে না তোলে। ১৯৬০ সালে রাজশাহীতে স্ত্রী-পুত্রদের সঙ্গে কিছুদিন ছিলেন। সে-সময় তাঁর ডায়েরিতে নানা কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। রয়েছে প্রকৃতি, বিশেষ করে পদ্মার বর্ণনা। ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭-তে লিখেছেন :

"শেষ বালুকণা আকাশ থেকে বিলীন হয়েছে বলে ওপারের হিন্দুস্থান দেখা যাচ্ছে। আমার শালীর ছেলের বয়স ১৫/১৬, সে কত অনায়াসে বললে 'ওপারে ? ওপারে ইন্ডিয়া।'

এই জেনারেশনের কাছেই পরদেশ 'ইন্ডিয়া'। প্রার্থনা করি, তার পরের জেনারেশন যেন ইন্ডিয়াকে মিত্রের চোখে দেখে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই দুই দেশ যদি ঠিকমত সহযোগিতা করে তবে চীনকেও সর্বক্ষেত্রে হারাতে পারবে।"[২৪]

একদিকে নাড়ীর বন্ধন, মাটির আকর্ষণ—যেখানে বসবাস করছে তাঁর প্রিয়জন,

বিবেকবুদ্ধি-বিচার-বিবেচনা এবং পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে গেল তাঁকে অপর প্রান্তে। এই দু'-এর টানাপোড়েনে অসহায় মুজতবা আলী ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন অনেকটা নিয়তির অমোঘ বিধানে। মুক্তির পথ ছিল নিরুদ্ধ।দু'দেশের মানসিক সম্মিলন ও সৌহার্দ্য কামনা ব্যতিরেকে তিনি আর কি-ই বা করতে পারেন। তাঁর আন্তরিকতার, স্বদেশচেতনার এবং মানবাহিতৈষণার মূল্যই বা কতোটুকু পেয়েছিলেন ? ডঃ পূরবী রায় বলেছেন, "পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক কারণের শিকার হয়েই তিনি (মুজতবা আলী) বিদেশ-বিভুঁইকে আপন দেশ করে নিয়েছিলেন।... আমি যখন ১৯৬৯ সনে পাঁচ বছরের জন্য রাশিয়া যাই, তখন তিনি বারবার বলেছিলেন, 'দেখিস, আবার যেন বিদেশে থেকে যাসনি। আমার মতো অবস্থা যেন না হয়। মাতৃভূমি ছেড়ে থাকার দুঃখ অনেক।' " (সা-৪৬)। যদিও ভারতের প্রতি তাঁর আনুগত্যে এতোটুকু খাদ ছিলো না, তবু মুজতবার চিত্তলোক পরিপূর্ণ করে ছিলো বঙ্গদেশ। বংশপরম্পরায় যে দেশে বাস, যে দেশের মাটিতে পিতৃপুরুষের দেহাস্থি মিশে রয়েছে, সে-দেশ তো স্বাভাবিক কারণে কেউ পরিত্যাগ করে না, করা সম্ভবও নয়।

১৯৬৬ সনের ৮ই নভেম্বর, বোলপুর থেকে ডঃ আলী সিলেটের তাঁর এক বাল্যবন্ধুকে লিখেছেন :

"জর্মনরা বলে

Heimat=Homeland; Heimatliebe=Love for homeland.
Vaterland=Land of the fore fathers.
Vaterlandliebe=Love for fatherland.

কোনো লোকের পক্ষে nationalism গ্রহণ করা অসম্ভব নাও হতে পারে, কারণ nationalism একটা পলিটিকাল কনসেপ্ট্। কিন্তু তার গভীর ভালোবাসা থাকতে পারে ফর হিজ Heimat, Vaterland. এমন কি জর্মনে একটি সমাস আছে Heimat-Stadt–Liebe (Homeland-town (or city)- love)। লক্ষ্য করো, এখানে সে-শহরকে 'জন্মের শহর' বলেনি। তোমার ভালোবাসা গভীর—সিলেট শহর, সুর্মানদী, মগলাবাজার-সিলেট রাস্তা, দুপাশের ক্ষেত ইত্যাদির প্রতি। এবং সেইখানেই সমাপ্তি। আমার ভালোবাসা সিলেট, মৌলবীবাজার এবং কিছুটা শান্তিনিকেতনের প্রতি। এবং সেইখানেই আমারও সমাপ্তি।

অশোক আকবর আমার আপনজন বলে মনে হয় না। এমন কি যে-বাঙলা সাহিত্য আমি এনজয় করি তার সঙ্গেও আমার গভীর একাত্মবোধ নেই। ইংরেজের যে রকম আছে, এবং গর্ব অনুভব করে।

পাকিস্তানীরা আপন দেশের জন্য গর্ব অনুভব করে। সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু এটার দানা বাঁধতে শ' দুত্তিন বছর লাগবে। কারণ একটা tradition না গড়ে ওঠা পর্যন্ত এ-গর্ব অনেকটা 'চরুয়া'দের মতো, অর্থাৎ যারা চরে বাস করে।

হিন্দুস্থানের দীর্ঘ ঐতিহ্য বা ট্রাডিশন আছে এবং বহু হিন্দু তার প্রতি লয়েল, কিন্তু এদের সকলেই পাঠান কর্তৃক দিল্লী জয় থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কেমন একটা hiatus অনুভব করে। ইংরেজ যে রকম Norman Conquest স্বীকার করে নিয়েছে এরা সে রকম পারে না।" (প-১৩৮)। এ'থেকে সুস্পষ্ট যে, অনতিক্রম্য কারণে মুজতবা ভারতের নাগরিক হলেও সিলেট তথা বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, গভীর সহানুভূতির অভাব ছিলো না। তাঁর অন্তিম বাসনার মধ্যেও এই অনুভূতিরই প্রকাশ। মুজতবা আলী 'শহর-ইয়ার' উপন্যাসটি অনুজপ্রতিম শ্রীপশুপতি খানকে উৎসর্গ করেন বিশেষ একটি শর্তে—শর্তটি স্বহস্তে লিখে দেন :

"শর্ত এই, সে যেন আমাকে ভালো করে,
আমার মায়ের গোরের পাশে কবর দেয়।"

—মুজতবা-জননীর সমাধি বৃহত্তর সিলেটের মৌলবীবাজার শহরে। জীবদ্দশায় যে-দেশে বাস করতে পারেননি, জীবনান্তে সেই দেশেরই মৃত্তিকায় মাতৃসান্নিধ্যে অন্তিমশয্যা গ্রহণের বাসনা এবং ডঃ আলীর বহু অপূর্ণ কামনা-বাসনার মতো তাঁর অন্তিম ইচ্ছাটিও অপূর্ণ। তবে 'চরুয়া' পাকিস্তানের চেয়ে 'খানদানী' ভারতীয় ঐতিহ্য যে তাঁকে অধিক আকৃষ্ট করেছিলো, সে তথ্যটি তিনি সংগোপন রাখেননি। উল্লিখিত পত্রটিতে তাঁর আরেকটি হৃদয়াকৃতি প্রকাশ পেয়েছে :

"আমাদের তো ওপারে যাবার সময় হল। এখন শুধুমাত্র একটি কামনা। হিন্দুস্থান পাকিস্তানে যেন একটা আন্তরিক সমঝাওতা হয়।" (প-১৩৮)।

বঙ্গ-ভঙ্গ মুজতবা আলীর নিকট বরাবর 'আজগুবি' মনে হলেও বাস্তবতাকে স্বীকার করতেই হয়েছে। দেশ-বিভক্তি যে কোনো পরিবারে কিংবা ব্যক্তিজীবনে কী বিষময় পরিণতি ঘটিয়েছে মুজতবা আলী আপন জীবনে তা' পলে পলে উপলব্ধি করেছেন। তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন, সার্বভৌম সত্তা অক্ষুণ্ন রেখে যদি শুধুমাত্র মানবিক কারণে উভয় দেশ পরস্পরের প্রতি সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে আন্তরিকতা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে মিলিত হতে পারে তাহলে উভয়েরই বৃহত্তর কল্যাণসাধনের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। বিশেষ করে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ উভয় বঙ্গের জন্যেই হবে কল্যাণপ্রদ। পৃথিবীর বহু দেশ রাজনৈতিক কারণে বিভক্ত হলেও তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার একই ধারায় প্রবাহিত হওয়ার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে মুজতবা আলী লিখেছেন :

"বাঙলার বিদগ্ধ সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয় প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে পশ্চিম বঙ্গের কলকাতাকে কেন্দ্র করে।...

মাত্র সেদিন পূব-বাঙলার লোক সাহিত্যের আসরে নামলেন।... ঢাকা যে সাহিত্যের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি, তার প্রধান কারণ ঢাকা কখনো কলকাতার মতো তামাম ভারত এবং বাংলার রাজধানী হয়ে উঠতে পারেনি।"[২৫] মুজতবা আলী আশা প্রকাশ করেছেন, পরিবর্তিত পরিবেশে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বঙ্গের সাহিত্যে ও সাংস্কৃতিক জীবনে নোতুন জোয়ার আসবে। এবং তার মহত্তর ফল উভয় বাঙলারই আস্বাদ্য হবে। পশ্চিম বঙ্গে অনেকে কিছুটা আতঙ্কিত ছিলেন, পূর্ববঙ্গের ভাষায় অন্যাবশ্যক আরবী-ফারসী শব্দের সমাবেশহেতু হয়তো এক সময় ঢাকার বাঙলা কোলকাতার চোখে অপরিচিত বলে মনে হবে। তাঁদের অমূলক আশঙ্কা নিরসনের উদ্দেশ্যে আলী সাহেব লিখেছেন :

"এন্তার আরবী-ফারসী মেশানো বাঙলা বোঝার মতো এলেম পূর্ব-বাঙালীর এবং আপনার আমার পেটে তো নেই।...

আর যদি বলেন, নজরুল ইসলামের মতো কোনো শক্তিশালী লেখক এসে সেই কর্মটি করে দেবেন তবে উত্তরে বলি, একদা পশ্চিম-বাঙলাতেই এবং আরবী-ফারসী-অনভিজ্ঞ রসিক সম্প্রদায়ের ভিতরই তাঁর কদর হয়েছিল প্রথম—পূর্ব বাঙলা তাঁকে আদর করে বহু পরে। আজ যদি ঢাকায় নজরুল ইসলামের মত কবি জন্মান, তবে কলকাতা তাঁর কেতাব আগেরই মতো উদ্‌গ্রীব স্তম্ভিতনিঃশ্বাস হয়ে পড়বে। তাতে করে তাবৎ বাঙলা সাহিত্যই

শক্তিশালী হবে, শুধু পূব-বাঙলার সাহিত্যই না।"[২৫] সুতরাং কাল্পনিক ভূতকে স্কন্ধচ্যুত করে বাঙালী জাতির বৃহত্তর স্বার্থে স্বাধীনতা দিবসের আনন্দঘন মুহূর্তে ডঃ আলীর নিবেদন : "রাজনৈতিকরা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। ভারতীয় অন্ততঃ বাঙালী সাহিত্যিক যেন সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের ভিতর দিয়ে সে শান্তি পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেয়।"[২৬]

ইতিহাসের অমোঘ ধারায় স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়—অন্ধ অমানিশার বক্ষে নবীন সূর্যোদয়। আপামর বাঙালীর মতো বাঙাল মুজতবার বহু আকাঙ্ক্ষিত দেশ। বহুদিন থেকেই আলী সাহেবের ধ্যান ছিলো উভয় বঙ্গের মৈত্রী সাধন। সেদিন সমাগত। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উভয় বঙ্গ সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক জীবনে সমৃদ্ধমান হয়ে উঠবে। শাশ্বত ঐতিহ্যিক বন্ধন বাঙালীর ব্যক্তিক জীবনেও হবে সুফলপ্রসূ। বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ সাহিত্য সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলী বলেন :

"... উভয় বাংলার সার্থক সাহিত্য সৃষ্টিতে পার্থক্য থাকবে অত্যল্প এবং সেগুলো রসের বিচারে গৌণ। পূব বাঙলার অধিকাংশ লেখক মুসলমান—তাঁদের সৃষ্টিতে মুসলিম সমাজ চিত্রিত হবে অপেক্ষাকৃত বেশী। পশ্চিম বাঙলায় চিত্রিত হবে হিন্দু সমাজ।... এক শ' বছর পূর্বে যখন বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়ছিলেন তখন বাঙলাদেশের অনেকেই আশা করেছিলেন এঁরা তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ নগরের আলেখ্য অঙ্কন করবেন, অন্ততপক্ষে দূর দেশে বাঙালীর জীবনধারা তাঁদের নির্মিত অশ্রুজলে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি রসের মাধ্যমে কিছুটা চিনতে শিখব।... ঠিক সেই রকম পুব বাঙলা থেকে আমরা সার্থক সাহিত্য তো আশা করিই। তদুপরি সে-সাহিত্যে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু অজানা অচেনা নয়া নয়া ছবি দেখতে পাবেন নিছক ফাউ হিসেবে গ্রেস মার্কের মতো।" [২৭]

নোতুন বাঙলাদেশ স্বভাবতঃই দারুণভাবে আকর্ষণ করেছে মুজতবা আলীকে। সেখানকার মানুষ প্রকৃতি সবই তাঁর চিরচেনা। তবু একটা নোতুনত্ব। এমন কি তাঁর বিবেচনায় :

"... পুব বাঙলার তরুণ তরুণী যখনই রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রোগ্রাম তৈরী করে বা প্রাণের আনন্দে গায় তাদের নির্বাচন প্রায় ব্যত্যয়হীন চমৎকার। তারা লিরিকাল শব্দের সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য হৃদয় দিয়ে চিনে নেয় অক্লেশে, গান গায় অতি সহজ ভঙ্গিতে। মাস কয়েক পূর্বে টেলিভিজনে দেখলাম, শুনলুম, এক বিলিতি পাদ্রী সাহেব রবীন্দ্র সঙ্গীতে বাপ্তিস্ম হয়ে গাইলেন, বাঙালের সরল ভঙ্গিতে 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো, প্রভু!' অপূর্ব! অপূর্ব!!" [২৮]

০৫.

স্বাধীন বাঙলাদেশে মুজতবা আলী এসেছেন—যেমন আসতেন পাকিস্তানী আমলে—পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তাদের সুখ-দুঃখ-সংগ্রামের কাহিনী শুনেছেন, কিন্তু বাঙলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেননি। কোলকাতাকে শেষবারের মতো বিদায় জানালেন ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। শুভানুধ্যায়ী-বন্ধুবর্গ অসুস্থ ডঃ আলীকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঢাকায় স্ত্রী-পুত্রদের নিকট পাঠিয়ে দেন। '৭৩ সনেও আলী সাহেব নিজেকে ভারতীয় নাগরিক হিসেবেই পরিচয় দিয়েছেন।[২৯] আর কোলকাতার পরিচিত

পরিবেশ ও অভ্যস্থ জীবন ছেড়ে তাঁর পক্ষে অন্যত্র বাস করাও ছিল কঠিন। অবশ্য কোলকাতায় শেষ জীবন তাঁর পক্ষে কোনোক্রমেই সুখকর ছিলো না। বরঞ্চ বলা যায় সে-জীবন ছিলো বেশ কিছুটা ক্লেদাক্ত। দীর্ঘদিনের অভ্যাস মুজতবাকে সে-জীবনই আকর্ষণ করেছে। বাঙলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুজতবা আলী মাস কয়েক ঢাকায় ছিলেন। এ' সময় অনেকেই মনে করেছিলেন, তিনি হয়তো আর কোলকাতায় প্রত্যাবর্তন করবেন না। তাঁর আত্মীয়স্বজনও চেয়েছিলেন আলী সাহেব জীবনের শেষ ক'টা দিন তাঁদের সঙ্গেই অতিবাহিত করুন। এতে মুজতবা আলীর অনুমোদন ছিলো না।

ডঃ আলী কোলকাতার ৫ নং পার্ল রোডের অ্যাপার্টমেন্টটি শেষ পর্যন্ত ছাড়েননি এবং এ' বাসা নিয়ে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। সে-বাড়ি থেকে তাঁকে ওঠানোর চেষ্টা বেশ কিছুদিন থেকেই চলছিলো। এ' নিয়ে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে মুজতবার মনোমালিন্যের কথা চিঠিপত্রে পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৭২ সনের ২৪ শে জুলাই, ঢাকা থেকে একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন : "... ওরা চায় না বলে শুধু নয়, আমিও ওদের সঙ্গে থাকতে চাইনে। কাজেই যতদিন না অন্য ব্যবস্থা করতে পারি, বাড়ির সন্ধানে শহরটা আমাকেই চষতে হবে।...

আমি ইহ সংসারে কলকাতার মতো শান্তি কোথাও পাইনে।" (প-১২৬)। সুতরাং, আলী সাহেব স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে জীবনের শেষ দিনগুলো নিরুপদ্রবে আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে বাঙলাদেশেই কাটাতে চেয়েছিলেন—এ বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

দীর্ঘদিন পর ঢাকা এসে তাঁর মনে হয়েছে এখানেও তিনি অবাঞ্ছিত, ব্রাত্য! এবং মাস কয়েকের মধ্যেই কোলকাতায় ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ৩০শে মে, '৭২-এ ঢাকা থেকে জনৈক ভক্তের উদ্দেশে মুজতবা আলীর পত্র :

"আমার যে বন্ধু কলকাতা থেকে এলেন তিনি বললেন, 'কলকাতার কে একজন বললে, "আমি বড্ড মদ খাই কলকাতায়, আমার কলকাতায় না ফেরাই ভালো।"... Whoever it is I am furious that people should have the audacity to decide my future. কলকাতায় মদ খাই; লিখিও। কলকাতায় আমার কাছে লোক লেখার জন্য আসে। I am somebody there. I am nobody here. বিশ্বাস করো, আজ পর্যন্ত এক কলেজের ছোকরা ভিন্ন লেখার জন্য (for college Magazine & naturally free!) কেউ আমার কাছে আসেনি!!! None! রেডিয়োর কাছ থেকে এসেছিল—for the simple reason that Delhi AIR had sent an Indian on deputation to organize ঢাকা বেতার। তিনি আমার সঙ্গে একদা দিল্লীতে কাজ করেছিলেন বলে porgramme নিয়ে যান। Television আসেনি। We West Bengalis are not wanted here. In short আমি এখানে permanently থাকলে আমার লেখা চিরতরে বন্ধ হবে। এবং মদও হয়তো ধরবো!" (প-৫৯)।

স্বাধীন বাঙলাদেশে এসে সৈয়দ মুজতবা আলী সবিস্ময় আবিষ্কার করলেন, তিনি পশ্চিম বঙ্গীয়! আমাদের মনে হয় অনিকেত মুজতবা কোথাও কখনো স্ব-নিকেতনের সন্ধান পাননি—এটা তাঁর জীবনের গভীরতম ট্র্যাজিডি। এবং অনিবার্য এই ট্র্যাজিডির বীজ তাঁর চরিত্রেই নিহিত :

"আমি (মুজতবা আলী) বললুম, 'আপনাদের ইহুদিদের মতো আমারও লয়েলটি দ্বি-ধা। আমাকে আমার পারিবারিক মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রাখতে হয় আর যে দেশে পুরুষানুক্রমে আছি তার অতীত গৌরবেও আমার হিস্যে আছে।"[৩০] ফলে এই অনুদার দেশে অসহিষ্ণু সমাজের ভ্রূকুটি-উপেক্ষা তাঁকে আজীবন সহ্য করতে হয়েছে।

০৬.

সৈয়দ মুজতবা আলীর ঐতিহ্যপ্রীতি, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তা, বাঙলা ও বাঙালীর প্রতি তাঁর অন্তহীন মমত্ববোধ ও দুর্বলতার আখ্যান দীর্ঘ উদ্ধৃতি সহযোগে দীর্ঘতর আলোচনার হেতুটি আদৌ সুখকর নয়। 'বিষম বেপরোয়া' "সৈয়দ সাহেব একদিক থেকে ভাগ্যবান। এই পর-গুণ-অসহিষ্ণু দেশেও জীবৎকালেই গুণকীর্তন যথেষ্ট শুনে গিয়েছেন।"— শুধু গুণকীর্তনই নয় এই সোনার বঙ্গভূমিতে আরো অনেক কিছু তাঁকে শুধু শ্রবণ নয়, গলাধঃকরণ করতে হয়েছে; যার ফলে কোনো দুর্বল মুহূর্তে তাঁরই এক গুণগ্রাহী সাহিত্যিকের কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, "এক একটা লোক থাকে যে সব জায়গায় ছন্দপতন ঘটায়— আমি বোধ হয় সেই রকম লোক।"[৩১] আলী সাহেব যাদের কথা ভেবেছেন, যাদের কথা লিখেছেন—মর্মান্তিক আঘাতগুলো আপ্তবাক্যের অভ্রান্ততা প্রমাণ করে তাদের কাছ থেকেই এসেছে। ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে জেহাদ ছিলো তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র এবং সর্বাবস্থায় মনুষ্যত্বের জয়গানে যাঁর লেখনী ছিল স্বতঃস্ফূর্ত—অথচ সাম্প্রদায়িকতার কাল্পনিক আচ্ছাদনে আবৃত করে তাঁকে লোকসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা হয়েছে উভয় বঙ্গে। এই সম্প্রদায় পশ্চিম বাঙলায় তাঁর উদার ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীকে 'ধুরন্ধর পাকিস্তানী এজেন্ট'-এর "একটা eye wash" বলে অপপ্রচারে মেতে উঠেছিলো, তেমনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এদেরই সগোত্রীয়দের বিচারে ইনি ছিলেন 'ধুতি-চাদরপরা, তিলক-কাটা এবং নামাবলী গায়ে' 'পৌত্তলিকতার এজেন্ট, তেত্রিশ কোটি দেবতার মুসলমান পূজারী' 'বাংলা ভাষার হালজামানার পশ্চিম বঙ্গীয় খ্যাতনামা লেখক'! পশ্চিম বাঙলার ঈর্ষাকাতর হীনমন্যজন তাঁর জীবন বিষময় করে তুলেছিলো, তেমনি এ'-পারের স্বধর্মীয় গোঁড়া কূপমণ্ডুকদের ক্ষমাহীন আচরণ বীভৎস কুৎসিততম রূপ ধারণ করে তাঁর প্রাণ সংহারেও ছিলো অকুণ্ঠিত! মুজতবার বৃহত্তর বাঙালী চেতনাকে অনুসরণ করার মতো বৈদগ্ধ্য ও উদার সহিষ্ণু মানসিকতা এদের আদৌ ছিলো না। এর পরেও যেটা সুখের বিষয়, আনন্দের সংবাদ, সুস্থ মনের জন্যে প্রত্যাশিত—তা' হচ্ছে এই মর্কটের দলই শেষ 'সত্য' নির্দেশ করেনি। সত্য-সুন্দর-মঙ্গলের সাধক মুষ্টিমেয় হলেও আছেন এবং ছিলেন। তাঁরা নির্ভীকচিত্তে অসত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অশ্লীলতার প্রতিবাদ করেছেন, মুজতবা আলীরা বৈরী পরিবেশেও আবিষ্কার করেছেন তাঁরা একা নন, নিঃসঙ্গ নন, সুতরাং ভরসা হারাবার কোনো হেতু নেই। আলী সাহেব পরবর্তীকালে পরম শ্রদ্ধায় দুর্দিনের বন্ধু সমমর্মীদের প্রতি তাঁর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সর্বোপরি বাঙলার বিদগ্ধ পাঠক সমাজ তাঁকে হৃদয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন একান্ত আপনজন হিসেবেই। যুগে যুগে লাঞ্ছিত হলেও তাঁদের দুঃখের কারণ নেই। বিশেষ করে মুজতবা আলী সম্যক অবগত ছিলেন :

"বাঙলাদেশে একটা দল আছে। ... এ-দল পর পর রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচরণ করে উপস্থিত ... অন্তঃসলিলা। মোকা পেলে বুজ্‌বুজ্ করে বেরুতে চায়।"[৩২] এই 'বুজ্‌বুজের' দল বিভিন্ন সময়ে মুজতবা আলীর মর্মান্তিক মানসিক নির্যাতনের কারণ হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু ছিলো জ্ঞানপাপী— যারা জাগ্রত অবস্থায়ও সুপ্ত থাকে এবং এরাই ভয়ঙ্কর। সামান্য স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে অন্যের জীবন বিপন্ন করতে এদের বিবেক বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। অপর দল

অজ্ঞতাবশত মূর্খতা প্রকাশ করে থাকে মাত্র। এক সময় উভয় বঙ্গে দু' দলেরই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী।

রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মাতৃভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তারই ফলে ঢাকায় স্থাপিত হয় 'বাংলা একাডেমী'। জন্মলগ্নেই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানটিকে কুক্ষিগত করে নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির সোপান হিসেবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলো। প্রতিকূল পরিবেশে কুটিল চক্রান্তের হাত থেকে এটিকে বাঁচিয়ে রাখার ইতিহাস দীর্ঘতর। প্রতিষ্ঠানটির মুখপত্র 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলে সৈয়দ মুজতবা আলী সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ পঞ্চতন্ত্র কলামে উক্ত শিরোনামে পত্রিকাটির বলিষ্ঠ উদ্যোগের প্রশংসা করে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সুতরাং, তাঁর আলোচনা পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এবং নিবন্ধকারদের মহত্তর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে তিনি আন্তরিক স্বাগত জানিয়েছিলেন। উক্ত পত্রিকায় এমন কয়েকটি প্রবন্ধ ছিলো— যার মূল বক্তব্য— মাতৃভাষা চর্চায় বাঙালী মুসলমানের অবদান। কারণ সুস্পস্ট। তখনো পূর্ববঙ্গে সুপরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চলছিলো বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের কোনো যোগসূত্র নেই এবং ছিলোও না। এমনকি তাঁদের মাতৃভাষা বাঙলা কি-না সে প্রশ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে উপস্থাপন করা হতো। প্রকাশিত নিবন্ধগুলো ছিলো তারই অভ্রান্ত জবাব। সম্ভবতঃ পত্রিকা-পরিচিতিমূলক নিবন্ধটির মূল সুর উপলব্ধি করতে অসমর্থ জনৈক পাঠক মুজতবা আলীকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিসেবে চিহ্নিত করে 'দেশ'-এর সম্পাদককে লেখেন, "এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির বিবরণ হইতে মনে হইবে যে পূর্ববঙ্গের সাহিত্য একমাত্র মুসলমানদিগেরই জিনিষ। উক্ত পত্রিকার কর্মকর্তারা ভুলিয়া যাইতে চান যে হিন্দু মুসলমানের সমবেত চেষ্টার ফলেই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি। (হিন্দু কবিদের নাম) ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে।... অবশ্য কেহ যদি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতার সর্বনাশা সীমারেখা টানিতে চান সে কথা স্বতন্ত্র।" (প-৭৩)। লেখক একটু সতর্কতা অবলম্বন করলেই বুঝতে পারতেন আলোচ্য পত্রিকাটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নয়, একটি সাময়িক পত্রিকামাত্র। চিঠিটি পড়ে মনে হয়, পত্র লেখক সরল চিত্ত ধারণ করেন। পত্রিকাটির পীঠস্থান এবং সেখানকার সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হলে সম্ভবতঃ তিনিও পত্রিকাটিকে সাদর সম্ভাষণ জানাতেন। পত্রটি সম্পর্কে আলী সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি সাগরময় ঘোষকে লেখেন :

"সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ, তার প্রতিবাদ তস্য উত্তর করে করে যে কোলাহল এবং তিক্ততা তৈরী হয় তার থেকে এই ৫৩ বছর কোনো গতিকে গা বাঁচিয়ে প্রাণরক্ষা করতে পেরেছি। আশীর্বাদ করো জীবনের বাকি কটি বৎসর যেন ঐ করে কাটাতে পারি।

এই চিঠি, তার প্রতিবাদ, তার উত্তর ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ প্রশ্নই দাঁড়াবে 'মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক কি না?' এর উত্তর প্রত্যেক হিন্দু এবং মুসলমান মনে মনে ঠিক করে রেখে দিয়েছে। আমার মত উভয়ের সঙ্গেই মেলে না; দু' পক্ষের কিল খেয়ে লাভ কি?" (প-৭২)।

মুজতবা আলী নীতিগতভাবে এ' ধরনের তর্ক-বিতর্কে অংশ গ্রহণ কিংবা নিজেকে জড়াতে চাইতেন না। কিন্তু তাঁর নির্বিকার তুষ্ণীম্ভাব সত্ত্বেও অপ্রত্যাশিত আঘাত থেকে অনেক সময় আত্মরক্ষা করতে পারেন নি।

১৯৬৪ সালের ৩রা অক্টোবর, আকাশবাণীর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে মুজতবা আলীর একটি 'সত্য ঘটনামূলক' কথিকা 'কোষ্ঠীবিচার' নামে গল্পাকারে প্রচারিত এবং শারদীয় বেতার জগতে প্রকাশিত হয়। বন্ধুপত্নী (স্বর্গীয়া) রাধারাণী মুখোপাধ্যায় তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী সরযু গঙ্গোপাধ্যায়ের দুর্ভাগ্যের কাহিনী আলী সাহেবকে শুনিয়েছিলেন। সরযু দেবীর স্বামী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমাবর্ষণে বোম্বাই বন্দরে কর্মরত অবস্থায় নিহত হন। ঘটনাটি অত্যন্ত নৈপুণ্য এবং সহৃদয়তার সঙ্গে মুজতবা তুলে ধরেছেন 'কোষ্ঠী-বিচার'-এ। ভাগ্যহতা সরযুই হচ্ছেন কোষ্ঠী-বিচারের মাধুরী এবং বোম্বাই বন্দর রূপান্তরিত হয়েছে মাদ্রাজে—এইটুকু মাত্র পরিবর্তন। (সা-৪৬)। কথিকাটি শ্রবণ ও পাঠ করে জনৈক বিক্ষুব্ধ শ্রোতা-পাঠক ২৪শে অক্টোবর, ১৯৬৪-র 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় লেখেন :

"এরূপ একটি জাতিবিদ্বেষমূলক কথিকা (বেতারজগতে গল্প) প্রচার ও প্রকাশ করা মোটেই সমীচীন হয়নি, যখন ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত। যে কোনো হিন্দু বাঙালী ভদ্রলোক... লেখকের এই হিন্দু-বিদ্বেষমূলক আচরণে বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হবেন। লেখক সাহিত্যের মধ্যে অশ্লীলতাকে যে কী ভাবে স্থান দিলেন এবং তা আবার বেতার কর্তৃপক্ষ কী করে অনুমোদন করলেন, তা চিন্তার কথা। ...হিন্দু ও বাঙালীর দেব-দেবীর পূজার উপর লেখকের বিদ্বেষ ও বিদ্রূপ-কটাক্ষ আদৌ সহ্য করা যায় না।... 'ওঁয়ারা তো ছিলেনই, এঁয়ারাও এসে জুটলেন'। এইরূপে হিন্দু দেবতা সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যকর মন্তব্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কী ? ... এ রকম সাম্প্রদায়িক অসৎ মনোভাবের পরিচয় আরও মেলে।... এরূপ অশালীন ও ধর্মবিদ্বেষমূলক 'গল্প' 'বেতার জগৎ' ও বেতার কর্তৃপক্ষ...কী করে ... প্রকাশ ও প্রচার করলেন।"[৩৩]

'মুজতবা আলীর এমন চমৎকার একটি কথিকার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আবিষ্কার করার দৃষ্টান্তে' 'স্তম্ভিত' বিশিষ্ট সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী তীব্রতম ভাষায় এর প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর শাণিত যুক্তির কয়েকটি :

'৭।...আচার সর্বস্বতা যদি হিনডুইজম হয় তা হলে তাতে প্রথম আঘাত হেনেছেন শ্রীচৈতন্যদেব। সতীদাহ যদি হিনডুইজম হয় তা হলে রামমোহন রায় তার অপমান করেছেন। চিরবৈধব্য রক্ষা যদি হিনডুইজম হয় তা হলে তার উপর আঘাত হেনেছেন বিদ্যাসাগর। পুরোহিত প্রথা যদি হিনডুইজম হয় তবে বিবেকানন্দ "আগে পুরুতগুলোকে দূর কর" বলে তাকে অপমান করেছেন।

৮। মুজতবা আলী গণৎকারের ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করতে যান নি, গল্পের দাবিতেই যা কিছু ঘটেছে।...

৯। ... আলোচ্যমান গল্পের লেখকের নাম আলী না হয়ে কোনো দেবশর্মা হলে কোনো প্রশ্নই উঠত না।'[৩৪]

শ্রীযুক্ত গোস্বামীর পত্রালোচনাটি পড়ে বিমুগ্ধ আলী সাহেব তাঁকে লেখেন—"খাসা লিখেছ। আর শেষ কথাটাই আসল। ইতি

তোমার 'দেবশর্মা'।"[৩৫]

অপর একটি পত্রে একই প্রসঙ্গে মুজতবা আলী পরিমল গোস্বামীকে লিখেছিলেন, "... ঢাকায় একটি কাগজে editorial রূপে সিরিয়াল বেরচ্ছে—আমি হেঁদু হয়ে গিয়েছি।... এসব লড়াইয়ে তুমি কি জিতবে! আর আমিই বা যাই কোথায়? ওরা বলে আমি কাফের, এরা বলে আমি লেড়ে। ভালোই, রাইকুল শ্যামকুল দুই-ই গেল। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।"[৩৫]

এ-সমস্ত আক্রমণ হাসিমুখে গ্রহণ করলেও মুজতবার দীর্ণ-বিদীর্ণ হৃদয় বন্ধুবান্ধবদের পত্রে প্রকট। এ-সময় সাগরময় ঘোষকে জানিয়েছিলেন, — 'ঢাকায়... বেরুচ্ছে.... আমি কাফির। যুগান্তরে বেরুচ্ছে, আমি সাম্প্রদায়িক, হিন্দু ধর্মের অপমান করেছি। আমি শান্ত, সমাহিত! আশীর্বাদ করো, এই ভাবে যেন শেষ কটা দিন কাটে।' (প-৯৪)।

আলী সাহেবের কল্পনাশক্তিও সম্ভবতঃ তখন কল্পনা করতে পারেনি অদূর ভবিষ্যতে কী দুর্দৈব ভীষণ মুখব্যাদান করে তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। যদিও যুগের সমস্যার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন এবং অবহিত ছিলেন। সে-সমস্যা কি ? "ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমষ্টির অন্যায় আধিপত্য। এই সমষ্টি কখনও সরকার, কখনও রাজনৈতিক দল, কখনও ট্রেড ইউনিয়ন, কখনও জয়েন্ট স্টক কোম্পানি, রাইটার্স ইউনিয়নের রূপ গ্রহণ করে বিভিন্ন দেশে ইনডিভিজুয়েলকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে।" (সা-২৪)। এই সমষ্টি কখনো পূর্বকথিত 'বুজবুজ'-এর দলভুক্ত হয়ে প্রাদুর্ভূত অভিশাপের ন্যায় সামাজিক তথা ব্যক্তিক জীবনে যে কী অনাসৃষ্টি করার সামর্থ্য রাখে মুজতবা আলী নাকের জলে চোখের পানিতে তা' উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সেই লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করে অপরিসীম লজ্জা ও ঘৃণায় 'শংকর'-এরও প্রশ্ন, 'এপার বাংলায় আমরাও বা কী দিতে পেরেছি তাঁকে।'

১৯৬৫ সনে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং '৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম— উপমহাদেশের ইদানীংকালের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। এবং দুটো ঘটনাই মুজতবা আলীকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে।

'৬৫ সনে অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্বভারতী থেকে চাকুরীর মেয়াদ সমাপ্তির বিজ্ঞপ্তি পেয়ে আলী সাহেব শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে আসেন বোলপুরের 'নিচাপট্টি'তে। এর কিছুদিন পরই যুদ্ধ। শান্তিনিকেতনে মুজতবার বিরোধী পক্ষ একটা ছিলো। কিন্তু তাদের দুষ্ট বুদ্ধি এবং চরিত্র হননের অসাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে সম্ভবতঃ তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন না। এঁদের মধ্যে লেখক এবং সঙ্গীত-শিল্পীও ছিলেন। এঁরাই রটিয়ে দিলেন 'পাকিস্তানী গুপ্তচর হিসেবে মুজতবা আলীকে গৃহবন্দী করা হয়েছে।' সম্ভবতঃ কোলকাতার একটি পাক্ষিক পত্রিকাতে এ' ধরনের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো। যোগাযোগ করা হলে উক্ত পত্রিকার কর্তৃপক্ষ জানান যে, ১৯৬৫ সনের তাঁদের সমস্ত পত্রিকা চুরি হয়ে গেছে! এই রটনাটি কি নির্ভেজাল 'গুজব', না এর পশ্চাতে কোনো অনুদ্ঘাটিত সত্য লুকিয়ে আছে তা' প্রমাণসাপেক্ষ হলেও সবচেয়ে মর্মান্তিক, 'জনরব'টির প্রসূতিকাগার শান্তিনিকেতন! গুজবটি দিল্লীতেও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছিলো এবং তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী (মরহুম) হুমায়ূন কবীর সাহেবের কন্যা শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষকে টেলিফোন করে বিষয়টি জানতে চেয়েছিলেন।

মুজতবা আলী এ বিষয়ে 'নীরবতাই হিরণ্ময়' নীতি অবলম্বন করলেও তাঁর লিখিত পত্রাবলী এবং বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে ঘটনাটিকে একবারে 'বায়বীয়' বলে অগ্রাহ্য করা যায় না।

ডাঃ দিলীপ বসু বলেন, "১৯৬৫ সনে শ্রীমতী গৌরী আইয়ূবের একটি চিঠি কোলকাতার কোনো পত্রিকায় পড়ি। তাতে শ্রীমতী আইয়ূব মুজতবা আলীর গ্রেফতার সম্পর্কিত গুজবে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রকৃত কারণ বা তথ্য জানতে চেয়েছিলেন...। এ চিঠি পড়ে আমি ডঃ আলীর বোলপুরের নীচাপট্টির বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে এ' সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করি। আলী সাহেব বললেন, 'পুলিশ এসেছিলো। তাঁরা সবিনয় আমার কাছে তাদের লজ্জা প্রকাশ করে বিদায় নেয়—এ' পর্যন্ত'।" (সা-৪৯)। শ্রীমতী আইয়ূবও উল্লিখিত ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে পত্র লিখেছিলেন বলে জানিয়েছেন। শ্রীযুক্ত স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য :

" '৬৫ সনে যখন নিচাপট্টির বাসায় গিয়ে মুজতবা আলীর খোঁজ-খবর জানতে চাইলাম, তখন তিনি বললেন, 'দেখতেই পাচ্ছিস কেমন আছি। দরজা জানালা বন্ধ করে বসে আছি। এক পুলিশ অফিসার এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তাঁকে আমার একটি বই শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ দিই। এতে অনেক রটিয়ে দেয় যে, পুলিশ আমার বাড়ী থেকে নিষিদ্ধ বই উদ্ধার করেছে! আমি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই মেলামেশা করি। এটা অনেক মুসলমান খুব সুনজরে দেখেন বলে মনে হয় না। তাদের বিবেচনায় আমি হিন্দু ঘেঁষা। আবার হিন্দুদের অনেকেও প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। এই তো অবস্থা।" '(সা-৪২)

২৫শে অক্টোবর, '৬৫-তে মুজতবা আলী তাঁর এক ভক্তকে অবহিত করেছেন, 'আমার কাছে একদিন একটি অতি ভদ্র মুখুজ্যে সন্তান, থানার second এসেছিল, ফিরোজের খবর নিতে। আমার না।

আমি আমাশয়ে ভুগছি। বাড়ি থেকে এমনিতেই বেরুই না, অসুখ নিয়ে বেরইনি। House arrest সংবাদ বিচিত্র নয়!!' (প-৪৪)

অকারণে (!) থানা থেকে তাঁর বারো বৎসরের পুত্রের সন্ধানে সেকেন্ড অফিসারের আগমন অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। একেতো চাকুরিবিহীন, আর্থিক অনটন তো রয়েছেই, তদুপরি পরিচিত জনের অপরিচিত আচরণে আলী সাহেব গভীর আঘাত পান। সম্ভবতঃ আপন চৈতন্য ভুলে থাকবার জন্যে এ' সময় থেকে 'পানের' পরিমাণও অস্বাভাবিক রকম বাড়িয়ে দেন। লেখার কাজ প্রধানতঃ তিনি মধ্যরাত্রিতেই করতেন। জেগে থাকবার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় ঘুম-নিরোধক ট্যাবলেট সেবন করার ফলে তাঁর ঘুম হতো না এবং আহারও কমে গিয়েছিলো। সামান্যতেই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। ১৯৬৫-তে ডাঃ দিলীপ বসুর অনুরোধে সৈয়দ মুজতবা আলীকে বেনামীতে 'মেরিল্যান্ড নার্সিং হোম'-এ ভর্তি করা হয় এবং দশ-বারো দিন সেখানে ছিলেন। কিন্তু অত্যধিক পানাসক্তির ফলে অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৯৬৬ সনের প্রথমার্ধে পুনরায় তাঁকে 'মেরিল্যান্ডে' ভর্তি করা হয়। কিন্তু তাঁর আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে উঠলে আলী সাহেবকে আরেকটি নার্সিং হোম 'নিউ লাইফ'-এ স্থানান্তরিত করতে হয়েছিলো। এ' প্রসঙ্গে ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী জানিয়েছেন :

"ডঃ আলীকে সেখানে (নিউ-লাইফে) নিয়ে যাওয়া একটা সমস্যার ব্যাপার ছিলো। কেননা 'নিউ-লাইফ'-এ মানসিক রোগগ্রস্ত কিংবা অবসাদগ্রস্ত লোকদেরই চিকিৎসা করা হয়। সুতরাং তাঁকে কি করে বলি যে, আপনার মানসিক অস্থিরতার চিকিৎসা প্রয়োজন। যাই হোক, আমি এবং আলী সাহেবের আরো দু'-একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত তাঁকে 'নিউ-লাইফ'-এ ভর্তি করে দিই। এবং চিকিৎসায় যথেষ্ট ফললাভ-ও করেছিলেন।" (সা-৫৮)।

আলী সাহেব ঘুম-নিরোধক Miderine tablet নিয়মিত খেতে শুরু করেছিলেন। প্রথম অবস্থায় এ ঔষধ মানুষকে চাঙ্গা করে তুললেও এর পরবর্তী ফল মারাত্মক হয়ে ওঠে এবং স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। তাঁকে 'নিউ-লাইফে' কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে রাখা

হয়েছিলো। কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতেরও অনুমতি ছিলো না। কিন্তু তিনি সকলের অগোচরে একটা রহস্যজনক উপায়ে এই ট্যাবলেট অনেকদিন পর্যন্ত সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাত চারটা অবধি নিয়মিত জেগে থেকে লিখতেন। অতঃপর ঘুমের ঔষধ খেয়ে শুয়ে পড়তেন এবং প্রায় সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমোতেন। 'পান' বন্ধ থাকায় এবং অনিয়মের সুযোগ ছিলো না বলে তিনি 'নিউ লাইফে' থেকে প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলেন। এ পর্যায়ে মুজতবা আলী সম্পর্কে 'নিউ লাইফ'-এর মালিক শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ রায় :

"ডঃ আলীর মদ্যপান বাড়ার পেছনেও একটা গূঢ় কারণ রয়েছে। অবশ্য বহুদিন থেকেই তিনি মদ্যাসক্ত ছিলেন। কিন্তু '৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় তাঁর বাড়ী তল্লাসী হয় এবং তাঁর পাসপোর্ট আটক করা হয়। ফলে মানসিক দিক থেকে তিনি অত্যন্ত আঘাত পান। প্রায়ই এ' ঘটনার উল্লেখ করে বলতেন. 'আমার পাসপোর্ট আটকে দিল!' এ' সময়ই ডঃ আলীর মদ্যপানের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এবং ক্রমেই যেন মানসিক ভারসাম্য অল্প অল্প করে হারিয়ে ফেলছিলেন।" (সা-৫৭)।

১৯৬৬ সনের এপ্রিলের ৯/১০ তারিখে 'নিউ-লাইফ' থেকে মুজতবা আলী শ্রীসোমেন চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন, '...আসল কথা, নবাব সাহেবকে বলেছে তো এরা পাকিস্তান কেটে দিতে পারে ? নবাব সায়েবকে কি authorisation letter দিতে হবে, for rcceiving the passport for and on my behalf ?'—উল্লিখিত 'নবাব সাহেব' জলপাইগুড়ির নবাব এবং ৬ নং রডন স্ট্রীটে বাস করতেন। মুজতবা আলী কি নোতুন করে পাসপোর্ট সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন ? না, কি, পুরোনোটাই উদ্ধার করার জন্যে এবং যাতে পাসপোর্টে উল্লিখিত দেশগুলো থেকে পাকিস্তানের নাম কেটে না দেয় সে-জন্য তদ্বির করতে বলেছিলেন ? 'আবার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সময় অনেকে রটিয়েছে আলী সায়েব ... পাকিস্তানের সাপোর্টার।'[৩৬] দেশ দুর্যোগের মুখোমুখি হলে অনেক সময় সাধারণ মানুষের জীবনেও অকারণ অহেতুক নানা দুর্ভোগ নেসে আসে। এবং উন্নয়নশীল দেশের দাস-মনোবৃত্তি সম্পন্ন আমলাতন্ত্রই এতে ইন্ধন যোগায়। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় স্মৃতিচারণে লিখেছেন :

"...বাংলাদেশে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের ঠিক তিন দিন আগে দিল্লিতে একটা টেলিফোন এল। রাত তখন সাড়ে এগারোটা। টেলিফোন করছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আবদুস সাত্তার। সাত্তার সাহেব বললেন, তিনি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পেরেছেন যে, সেই রাত্রিতেই নাকি পশ্চিমবঙ্গের সব বিশিষ্ট মুসলমানদের গ্রেপ্তার করা হবে। আমি খবরটা শুনে বিস্মিত হলাম।...আমি তখন পশ্চিম বঙ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

এরপর আমি প্রথম যে কাজটা করলাম তা হল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে ওই রাত্তিরেই টেলিফোন করা (পশ্চিমবঙ্গে তখন রাষ্ট্রপতির শাসন চলছে)। রাজ্যপালকে বললাম, 'আপনি সাময়িকভাবে গ্রেপ্তারের আদেশ মুলতবী রাখুন; প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আমি আবার আপনাকে টেলিফোন করছি।'...

তখন মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত।...গিয়ে শুনলাম ইন্দিরা ঘুমোচ্ছেন। আমি খুব জরুরী বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি শুনেই ইন্দিরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি ওঁকে সব কথা বললাম। শুনে প্রধানমন্ত্রী স্তম্ভিত!

... সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল স্বরাষ্ট্র দফতরের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের। তাঁরা জানালেন, গ্রেপ্তারের আদেশের খবর সত্যি।... শুনে ইন্দিরা রাগে ফেটে পড়লেন। অবিলম্বে এই আদেশ রদ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে অফিসারদের নির্দেশ দিলেন। সেদিন ইন্দিরা বিরক্ত হয়েছিলেন সেই সব সঙ্কীর্ণমনা আমলাদের উপর যাঁরা এই আদেশ দিয়েছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতিকে তোয়াক্কা না করেই।"[৩৭]

সুতরাং, ১৯৬৫ সনের রটনা কিংবা আলী সাহেবের বাড়িতে দারোগাবাবুর শুভ-পদার্পণ অথবা এতদ্‌সংক্রান্ত 'গুজব' সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে অগ্রাহ্য করা চলে না। কারণ, এই আমলা বা এদের পূর্বসুরিরা বছর ছ'-এক পূর্বেও বহাল তবিয়তে নিজ নিজ দপ্তরে বর্তমান ছিলেন। মোটকথা, ছিদ্রান্বেষী অর্বাচীনদের অপপ্রচার এবং আমলাতন্ত্রী মূর্খতা যে সাময়িকভাবে আলী সাহেবের মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট করেছিলো এতে সন্দেহ পোষণ করবার কোনো কারণ নেই। 'নার্সিং হোম' থেকে লেখা একটি পত্রে মুজতবার চক্ষু থেকে অশ্রু নয়, তপ্ত শোণিত ঝরছে,–

'ভাই সাগর,
আমি তো খাঁচায় বন্ধ;
... ...
উর্দুতে আছে
মুর্গ্*-ই-দিল্ মৎ রো ইহাঁ,
অসূঁ বহানা হৈ মানা
ইন্ কফ্স্** কে বুলবুলোঁকো
চেহচানা হৈ মানা—
মৎকৃত অনুবাদ—
পাখীর পরাণ কঁদিসনে ওরে
এখানে রোদন মানা
এ খাঁচায় পুরা বুলবুলে যত
কলক্রন্দন মানা॥'

এর পরের লাইন আরো বিরূপ! "মুসলমান পশু জবাইয়ের পূর্বে তাকে জল খেতে দেয়; কিন্তু মুহম্মদের আজ্ঞাবহ তোমাকে আমাকে জল পর্যন্ত খেতে দেয় না— আমাদের কুরবানী দিয়ে কুরবানী করার আগে!" (প-৯৯)

সৈয়দ মুজতবা আলীর গ্রেফতার প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী :

১. শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় :

'... ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় শান্তিনিকেতনের কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক বিদেশী অর্থাৎ পাকিস্তানের দালাল বলে মুজতবা আলীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে চেষ্টা করে। প্রতিটি সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক এজন্য লজ্জিত না হয়ে পারে না। বস্তুতঃ মুজতবা কখনো

* পাখী
** খাঁচা

শান্তিনিকেতন তথা পশ্চিম বঙ্গ ছেড়ে যেতে চাননি। এমনকি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরেও তিনি কলকাতায় বাস করারই পক্ষপাতী ছিলেন। যদিও শারীরিক কারণে তাঁকে যেতে হয়েছিল।' (সা-২৩)।

২. শ্রীসাগরময় ঘোষ :

'আমার ধারণা শান্তিনিকেতনে কিছু অর্বাচীন লোকজন এসে জড়ো হয়। তাঁরা মুজতবাকে ভালোভাবে জানতেন না। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তাঁরাই রটিয়েছিলেন যে, মুজতবার পরিবার-পরিজন থাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং তিনি এখানে। সুতরাং সৈয়দদা পাকিস্তানের চর।' (সা-২৪)।

৩. শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ (রূপদর্শী) :

'ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ... ১৯৬৫ সনে মুজতবা আলীর গ্রেফতার সংক্রান্ত একটি জনরব উঠলেও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি। এমনকি শান্তিনিকেতনের কিছু ব্যক্তিও মুজতবা আলীকে পাকিস্তানের গুপ্তচর বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। ফলে এ' সময় তিনি মারাত্মক মানসিক আঘাত পান। এবং আমাদের জন্যেও এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতেই তাঁকে এভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।'(সা-২৫)।

৪. শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী :

"সৈয়দদার দেশপ্রেম সম্বন্ধে কণামাত্র সন্দেহ করা পাপ।... এর সবই ধাপ্পাবাজদের কুচিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়।" (সা-২৬)।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেও এক শ্রেণী মুজতবা আলী সম্পর্কে নানাবিধ অপপ্রচারে আত্ম-সুখজনিত তৃপ্তি পেতো এবং তাদের অপকর্মটি চলেছে ধর্মের নামে। এদের সাফল্য-অসাফল্যের চেয়েও ভয়াবহ সত্যটি হলো— আলী সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে থাকলে আক্ষরিক অর্থেই এই পাষণ্ডদের হাতে তাঁকে মর্মন্তুদ মৃত্যুবরণ করতে হতো— যেমনটি বাংলাদেশের বহু সুসন্তানের ভাগ্যে ঘটেছে ১৯৭১-এর স্বাধীনতা-সংগ্রামকালে। এদেরই একজন জনৈক আবদুল ওয়াহাব চৌধুরী একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন —'সৈয়দ মুজতবা আলির সাহিত্য প্রসঙ্গে' — প্রকাশকাল ১৯৬৯। যাঁর মনের গ্রন্থিটি সুদৃঢ় ছিল 'সুরমা উপত্যকা'র সঙ্গে— পুস্তিকাটি প্রকাশিত তারই অঙ্গ শ্রীহট্ট শহর থেকে! উৎসর্গপত্র এবং ভূমিকাটিই বিষয়বস্তু প্রণিধানের জন্যে যথেষ্ট। গ্রন্থটি উৎসর্গিত তাদেরই উদ্দেশে "পাকিস্তানে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য যে সব তরুণ প্রাণপাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, ইসলামের উৎসর্গীকৃত প্রাণ সেই বীর সৈনিকদের হাতে।" ভূমিকার অংশবিশেষ: "...মুসলমানদের পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, মাননীয় আলী সাহেব একজন সৈয়দ বংশীয় বিশিষ্ট লেখক হওয়া সত্ত্বেও আল্লা-রসুল, নামাজ-রোজা, মক্কা-মদীনা, কোরান-হাদিস অর্থাৎ এক কথায়, মুসলমানদের সমস্ত কিছুকে যেরূপ একচেটিয়াভাবে অসংযত এবং আপত্তিকর ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন, তা দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়।" অতঃপর

মুজতবা আলীর সাহিত্য কিভাবে তরুণ সমাজের মধ্যে বিষক্রিয়া সঞ্চারিত করে তাদের ধর্মের প্রতি 'পরিহাস-পরায়ণ' ও 'অসহিষ্ণু' করে তুলছে তার বয়ান দিয়ে এবংবিধ গ্রন্থ প্রণয়নে আপন সদিচ্ছার হেতু নির্দেশ করেছেন—"... আলি-ভক্ত একজাতীয় মুসলমান তরুণ সম্প্রদায়ের উৎকট ইসলামভীতিই আমাকে এ কাজে অনুপ্রাণিত করেছে।" এ' বক্তব্যে একমাত্র সত্যনিষ্ঠ তথ্য—তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সৈয়দ মুজতবা আলীর অসাধারণ জনপ্রিয়তা। আলী সাহেবের নজরে নিশ্চয়ই 'স্বদেশী'-প্রণীত এই অভিনব কৃতি-কীর্তিটি এসেছিলো এবং সম্ভবতঃ 'কর্মকার'টিও তাঁর অপরিচিত ছিলেন না— যেমন পশ্চিম বঙ্গের 'বুজবুজ দলটি'র স্বভাব-চরিত্র ও ক্রিয়াকর্মাদি ছিলো তাঁর নখদর্পণে। চরিত্র-হননের সঙ্কীর্ণতা আলী সাহেবের মধ্যেই ছিলো না এবং মানুষের প্রতি বরাবর শ্রদ্ধা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'সংসার যাত্রাপথে...প্রিয় সহচর' হিসেবে ওমর খৈয়ামের যে-রুবাঈটিকে বরণ করেছিলেন, সেটি :

'কারুর প্রাণে দুখ দিও না,
করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনে শান্তি নাশি
বাড়িও না তার মনস্তাপ।

তবু অনেক সময় মনোবেদনা, ক্ষোভ, বঞ্চনাজাত অভিমান দীর্ঘশ্বাস মোচনের অন্তরালে হাস্যরসে কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে অবরে-সবরে প্রকাশ করে ফেলেছেন। তাঁর অনুগত সঙ্গী 'মাস্টার'কে দেখিয়ে একজন মন্তব্য করেছিলেন, ' "কুকুরটি আপনার আদরণীয় এবং খুবই প্রভুভক্ত বলে মনে হচ্ছে।" ব্যঙ্গভরে জবাব দিলেন, "হবে না! চিরকাল আমি কুকুরের সঙ্গে বাস করেছি—মানুষের সঙ্গে বাস করার তো সুযোগ পাইনি।"'[৩৮]

উল্লিখিত পুস্তিকাটিতে অশোভন ভাষায় মুজতবা আলীর বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গার করা হয়েছে তা শুধু রুচিবিগর্হিতই নয়, চরম মূর্খতার সঙ্গে সত্যের অপলাপও তাতে সুপ্রচুর। আলী সাহেবের অপরাধ, তাঁর "ব্যবহৃত উপমা-উৎপ্রেক্ষা, কবিত্ব কল্পনার সর্ব্বত্র, তৌহিদবিরোধী ঘোর পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ..।" উপস্থাপিত উদাহরণের কয়েকটি :

'"সাক্ষাৎ মা দুগ্‌গা"
"বাক্যব্রহ্ম তার ওষ্ঠাগ্রে বিরাজমান"
"বৃষ্টির ফোঁটা...আঙিনায় হরিলুটের বাতাসা ছড়াতে আরম্ভ করেছে।'

—এমন সব চমৎকার উপমা-চিত্রকল্পও যে নিন্দনীয় তা' একমাত্র উম্মাদ বিকারগ্রস্তের পক্ষেই কল্পনীয়। অন্যত্র বলেছেন, '...তৌহীদের পরিপন্থী সেই ঘৃণ্য পৌত্তলিকতাই তাকে (মুজতবাকে) আল্লার নাম নিয়েও বর্ব্বরোচিত পৈশাচিক রসিকতা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে দুর্মুখ এবং দুঃসাহসী করে তুলেছে।"[৩৯] উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন—

"এ সংসার আল্লা তাল্লার ছায়া"—এতে 'বিদ্রূপ' কিংবা 'রসিকতা' কোন্ রন্ধ্রে আত্মগোপন করে আছে, আমরা আবিষ্কার করতে অসমর্থ। অথবা, "দশের মুখ খোদার তবল"—এই সুপরিচিত প্রবাদটি একাধিক লেখায় আলী সাহেব ব্যবহার করেছেন। এবং একস্থানে প্রবাদটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

(ক) 'খুদা যখন কোনো সত্য ইহলোককে জানাতে চান তখন তাঁর পাবলিসিটি আপিসার "দশের মুখ"। দশজন যখন কোনো তথ্য বা ঘটনার বর্ণনা দেয় তখন তিনি তাদের মুখে তবল বা তবলা বাজাচ্ছেন। হজরৎ মুহম্মদও বলেছেন, "আমার

পরবর্তীকালে যখন দশজন গুণীজ্ঞানী একমত হয়ে কোনো বিধান দেবেন তখন সেটা আমার বিধান বলেই মেনে নিয়ো।" পাদটীকায় মুজতবা আরো বিস্তারিত ভাবে লিখেছেন, "(খ) মুসলিম শাস্ত্রে এই সম্মিলিত বিধানকে বলা হয় "ইজমা"। কথাটা আরবী 'জমা' শব্দ থেকে এসেছে। বাংলায়ও আমরা "জমা" "জমায়েৎ" (জমায়েতুল উলেমা=বিদ্বজ্জন সম্মেলন) "একত্রিত" অর্থে ব্যবহার করি।"[৪০]—এর পরেও ধর্মের ভাঁড়দের হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলেনি। তাদের উদ্ঘাটিত মুজতবার বহুবিধ 'পাপাচারের' অন্যতম তিনি শিন্‌ওয়ারী ডাকুর সমর্থকদের 'মৌলানা-মৌলবী' অভিধায় সম্মানিত না করে 'মোল্লা' বলেছেন, মুঘল স্থাপত্যের মধ্যে ভারত ও ইরানী সংস্কৃতির মিশ্রণ আবিষ্কার করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের সুচিন্তিত রায় আলী সাহেব 'মুসলমান নামধারী হিন্দু'! 'নও হিন্দু'!! এবং তাঁর 'রক্তমাংস, তাবৎ চিন্তা, ভাবনা কতোখানি পৌত্তলিকতার দুর্গন্ধে দূষিত, তা' তার লিখিত হিন্দুপ্রথা মতো দিনক্ষণ দেখে পুস্তক উৎসর্গ করার হিন্দু-অনুসৃত পৌত্তলিক পদ্ধতিতেই প্রকাশিত। পুস্তকের ভূমিকা রচনা বা উপহার প্রদানের দিনটিও প্রায়ই একটা না একটা পূজাপার্ব্বনের দিন দেখেই ধার্য্য করে থাকেন। যথা— "রাখী পূর্ণিমা—১৪৬৭ সাল" (শব্‌নম্‌), "পৌষ-পার্ব্বণ-১৩৬৩ সাল" (জলে-ডাঙায়)।'[৪১]

আসলে আলী সাহেব অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ উৎসর্গ পত্রে বাংলা সন-তারিখ ব্যবহার করেছেন এবং 'মুসাফির'-এর উল্লিখিত তারিখ 'নিরানন্দ ঈদ ("আনন্দ") দিবস, ১৩৭৮'। তিনি যেমন 'দেশে-বিদেশে' "জিন্নতবাসিনী জাহানারা"কে উৎসর্গ করেন, তেমনি 'চাচা-কাহিনী' উৎসর্গিত "শ্রীমতী রাবেয়া আলী"কে।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে প্রাক্‌-স্বাধীনতাকাল থেকে উত্তর-স্বাধীনতা সময়েও সৈয়দ মুজতবা আলী সংস্কৃত-আরবী-ফারসী ভাষা এবং টোল-চতুষ্পাঠী মক্তব-মাদ্রাসাগুলো রক্ষার জন্য এবং উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের জীবনধারার মানোন্নয়ন করে দেশীয় ঐতিহ্য ও বৈদগ্ধ্যের ধারাকে চলিষ্ণু রাখার উদ্দেশ্যে কী আপ্রাণ মসীযুদ্ধ চালিয়েছিলেন। আর এই 'রামপণ্ঠক' যে গুহ্য তথ্যের সন্ধান পেলেন তা' হলো, '...পরম বৈদান্তিক আহ্লাদে একেবারে বাগ্‌বাগ্‌ করে বগল বাজিয়ে সৈয়দ সাহেব সবাইকে সংবাদ দিচ্ছেন—"রাষ্ট্রভাষা হিন্দী তার শব্দভাণ্ডার থেকে লাথি-ঝাঁটা মেরে আরবী-ফারসী শব্দ বের করে দিচ্ছেন। ...তার যত আক্রোশ কেবল বেচারা আরবী-ফার্সী শব্দাবলীর ওপর।... তিনি তার হিন্দী-ওয়ালাদের আরবী-ফার্সী বিতাড়নে যে প্রক্রিয়ার এবং যে দুটি উপকরণের উল্লেখ করেছেন, তাতেই আরবী-ফার্সী সম্বন্ধে তার মনোবৃত্তির পরিষ্কার নিঃসংশয় ছায়াপাত হয়েছে।'[৪২] —আলী সাহেবের মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে, অগ্র-পশ্চাতের বক্তব্য বেমালুম গায়েব করে দিয়ে প্রমাণ করলেন, মুজতবা আলী আরবী-ফারসীর দুশমন! মাতৃভাষা সুপ্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর সংগ্রামের তথ্য আমরা অন্য একটি গ্রন্থে* সন্নিবিষ্ট করেছি; 'ভাষা বিশুদ্ধির' নামে কূপমণ্ডুকতার প্রতিবাদে তাঁকে উচ্চকণ্ঠ হতে দেখেছি। তাই শেষ পর্যন্ত—সৈয়দী ভাষাই এস্তেমাল করতে হয়—'তাতী হালাই' হলো আরবী-ফারসীর রক্ষক!!

এই শ্রেণীর মর্মদাহের গূঢ় রহস্যের সূত্রটিও উল্লিখিত কেতাবটিতে রয়েছে। "লেখক (মুজতবা আলী) বাঙালী বলতে কি বোঝেন, তা' তার এক পুস্তকের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি বলছেন—'উভয় বাংলার এবং বঙ্গের বাইরে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান', তাবৎ বঙ্গ-ভাষাভাষীজনকেই তিনি বাঙালী বলেন। তাই, আমরা আশা

---

* মুজতবা সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী, চতুর্থ অধ্যায়

করি, বাঙালী হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকলের খেদমতে রামকৃষ্ণকে অনুকরণ অনুসরণ করে সৈয়দ সাহেবের মতোই ধন্য হবার সৈয়দ সাহেবী আকুল আবেদন মাঠে মারা যাবে না!" —আসলে অন্তর্জ্বালাটি এখানেই। পাকিস্তানী নয়, পাঞ্জাবী নয়—বাঙালী? তা-ও তাবৎ বঙ্গভাষীজনই বাঙালী! —এই চিরসত্য সাম্প্রদায়িক মননে ভীতির সঞ্চার করেছিলো। ফল, তাদের প্রলাপোক্তি। মুজতবা আলী-ই তো ছদ্মনামে আনন্দবাজার পত্রিকায় ভাষা আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশে সালাম জানিয়ে নিবেদন করেছিলেন :

'বাংলা সাহিত্যের চর্চা যে জায়গায় হয় সেখানকার মানুষই বাঙালীর আত্মজন।

পূর্ব বাঙলায় আজ যাঁরা বাঙলা ভাষার জন্য মৃত্যুবরণ করল তাঁরা আমাদের নমস্য।'[৪৩]

'বিশুদ্ধ হিন্দী'কে ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কি ধ্বনিত হয়নি ?

"ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও এমন উদাহরণ পাবেন না যে মাতৃভাষায় সেবা, মাতৃভাষাকে বৈদগ্ধ্য-সংস্কৃতির মাধ্যম না করে কোনো জাতি উন্নতি করতে পেরেছে। ইংরেজকে না তাড়িয়ে ইংরিজি ভাষার জগদ্দল পাথর সরাবার উপায় ছিল না—তাই আপন বৈদগ্ধ্য গড়ে তুলবার জন্য স্বরাজ সাধনা করতে হয়।

... প্রাদেশিক ভাষা এবং সাহিত্যগুলো যদি স্বরাজ লভের পরও যে কোনো কারণে উন্নতি লাভ করতে না পারে তবে আমাদের স্বরাজ লাভ নিষ্ফল।"[৪৪]

ভারতে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দী জগদ্দল পাথরের মতো অনড় হয়ে বসলে এবং হিন্দী না শিখলে জাতীয় পার্লিমেন্টে পরস্পরকে জানার-বোঝার পন্থা কি—এই ধুয়োর উত্তরে আলী সাহেব জাতিসঙ্ঘের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন—যেখানে প্রায় প্রত্যেক সদস্য আপন আপন ভাষায় বক্তৃতা করেন এবং অন্যান্য সদস্য 'ইয়ার ফোনের' মাধ্যমে বোধ্য ভাষায় অনুবাদটি শুনে নেন। সুতরাং, 'দিল্লী পার্লিমেন্টেই বা এ ব্যবস্থা হতে পারে না কেন! ভারতশুদ্ধ লোককেই কেন হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানী শিখতে হবে...?'[৪৫] —প্রকারান্তরে এ যে গণতান্ত্রিক ভারতে বসে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিদ্রাহরণ! এ ঢেউ যদি সমস্ত পাকিস্তানে উত্তাল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রূপ পরিগ্রহ করে ? সুতরাং এ ধ্যান-ধারণাও দেশদ্রোহিতার সামিল। অতএব, পাকিস্তানী কর্তাভজা এ' শ্রেণীর বিবেচনায় মুজতবা আলীদের সংশ্রব বিষবৎ পরিত্যাজ্য! এবং ইতোমধ্যেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহী কণ্ঠস্বর সামষ্টিক রূপ নিয়ে তাদের শিরোপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানেই প্রশ্ন উঠেছে :

১. '...বুতপরস্তের আরবী, আগুন-পূজকের ফারসী এবং পৌত্তলিকের উর্দু (ভাষা-বিজ্ঞান মতে বাক্যরীতির (Syntax) ধরণ দিয়েই ভাষার জাত বিচার হয়, এই দৃষ্টিতে উর্দু ভারতীয় আর্যভাষাভুক্ত) যদি ইসলামি ভাষায় পরিণত হতে পারে, তবে সংখ্যা-গরিষ্ঠ বাঙালী মুসলমানের ভাষা অবিকৃতভাবেই ইসলামি হতে বাধা কি ?'[৪৬]

২. 'ধর্মান্তরে জাত্যন্তর হয়, কিন্তু দেশান্তর বা ভাষান্তর হয় না। ...কাফিরের ভাষা বলে আরবী ত্যাগ করেনি মুসলমান আরব। কোরআন তো নাযেল হ'ল সে ভাষাতেই! বাঙালী মুসলমানের চিরকালের মুখের বুলি, প্রাণের ভাষা, স্বপ্নের বোল কি করে হয় হিন্দুয়ানী ভাষা ?'[৪৭]

৩. 'যতদিন না আমরা চণ্ডীদাস, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ,

শরৎচন্দ্র, অতুলপ্রসাদ, অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে নিজেদের সাহিত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক হিসাবে গণ্য এবং স্বীকার করতে শিখবো ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে সৃষ্টির গতিবেগ সঞ্চার করতে আমরা সমর্থ হবো না। আমাদের চারিধারে নানা প্রকার কৃত্রিম বাধার দেওয়াল তুলে আমরা নিশ্চল ডোবার পানিতেই শুধু অবগাহন করবো। এর বেশী অন্য কিছু সংস্কৃতিক্ষেত্রে আমাদের দ্বারা আর সম্ভব হবে না।'[৪৮]

৪. 'রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হলেও তিনি নাকি হিন্দু। ...মাইকেল খৃষ্টান হলেও ঐ একই কারণে হিন্দু। ঈশ্বরচন্দ্র নাস্তিক হলেও তাই। বঙ্কিম-শরৎচন্দ্রের তো কথাই নেই। এ যুক্তিস্রোতের ফল দাঁড়ায় এই যে পূর্ব পাকিস্তানীদের ঈমান রক্ষার জন্য সব হিন্দু সাহিত্যকদের বাদ দেওয়া প্রয়োজন। এমনকি যে-সমস্ত মুসলমান লেখক 'হিন্দু-ঘেঁষা', তাঁদেরকেও সমানভাবে বাতিল করা দরকার। এই বাতিলকার্য সুচারুভাবে সমাধা করার পর যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য-গগনে নিজেদের স্বর্গীয় আলোক দান করবেন, তাঁরা জন্মগ্রহণ না করলেও মানবজাতি অথবা বাংলা সাহিত্যের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হতো না।'[৪৯]

৫. "পূর্ব পাকিস্তানের সংস্কৃতিক্ষেত্রে বর্তমানে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছে তার ফলে এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থ আজ বিপন্ন। তাঁরা ধর্মের ব্যবসা করেন এবং সাম্প্রদায়িকতা তাঁদের এই ব্যবসার প্রধান মূলধন। ...বিদেশী বলতে তাঁরা সকলেই সত্য অর্থে বৈদেশিক কোনো কিছু বোঝেন না। তাঁদের মতে বিদেশীয় অর্থে হিন্দু। ...এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই সমগ্র বাংলার হাজার বছরের বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে তাঁরা আজ পশ্চিম বাঙলার সংস্কৃতি এবং 'বিদেশী' বলে চালাতে আগ্রহশীল।...

কিন্তু কোন্ উদ্বেগ থেকে এই বক্তব্যের উদ্ভব ? সংস্কৃতিক্ষেত্রে হিন্দু বিতাড়ন না হলে মুরুব্বীদের নিজেদের ব্যবসা এবং রাজ্যবিস্তার ঠিকমতো...সম্ভব হচ্ছে না।...জোনাকীর রাজত্ব কায়েম করতে হলে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র তাড়াতেই হবে। কাজেই তারা আজ বাংলাদেশের উনিশ শতকের সংস্কৃতি ও সাহিত্য সাধনাকে 'বিদেশী' আখ্যা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়ন করতে বদ্ধ পরিকর। ...যাঁরা তাঁদের সাথে এ ব্যাপারে একমত নন তাঁরা নাকি পাকিস্তান-বিরোধী রাষ্ট্রদ্রোহী!'[৫০]

আত্মপ্রসার এবং ব্যক্তিক ও জাতিক ধ্যানধারণা-মননশীলতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রসারণের নিমিত্তই মানুষ স্বাধীনতার অভিলাষী। অন্যথায় তা নিরর্থক। গৌরবময় অতীত ও ঐতিহ্য তার পথনির্দেশক। তাই তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর কঠোর বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে বাংলাদেশের নির্ভীক বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :

৬. "আত্মবিকাশের ও আত্মাবিস্তারের সুযোগ মেলে বলেই স্বাধীনতা মানুষের কাম্য। যে নামসার স্বাধীনতা প্রবল পক্ষের কাছে আত্ম বিক্রয়ে দুর্বল পক্ষকে বাধ্য করে, সে-স্বাধীনতা তো বর নয়—অভিশাপ।

আমরা জাতে বাঙালী। আত্মবিকাশের সুযোগ পাব বলেই আমরা পাকিস্তান গড়েছি—আত্মবিলোপের জন্যে নয়। আমরা বাঙালী থেকেই বাঙালীত্ব রেখেই পাকিস্তানী। কেননা, বাঙালী হিসেবে বাংলার আবহাওয়ায় বাঙালী জীবনের প্রসার লক্ষ্যেই পাকিস্তান চেয়েছি,—ইসলামের সেবার মহৎ উদ্দেশ্যেও নয়, ইসলামী সংস্কৃতির হাওয়াই সৌধ নির্মাণের স্বপ্নেও নয়।...

কেউ তার স্বদেশের ঐতিহ্যকে অবহেলা করে না। কেননা, ঐতিহ্যকে ভিত্তি করেই

আত্মবিকাশ সহজে সম্ভব। তাই আমরাও স্বদেশের ঐতিহ্যকে পরিহার করব না। আমরা বাঙালী-চেতনা নিয়ে বিদেশী গুপ্ত শাসনে গ্লানি বোধ করব, পাল-গৌরবে গর্বিত হব, স্বাধীন সুলতানী আমলের ঐশ্বর্যগর্বে উল্লসিত হব, মুঘল শাসনে হতবাঞ্ছার বেদনা বোধ করব, ব্রিটিশ শাসনে অপমানের জ্বালা অনুভব করব।

আমরা বৌদ্ধ-যুগের মূর্তি-শিল্পে পিতৃপুরুষের নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করব, সেন আমলের সংকীর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদের নিন্দা করব, মসলিন শিল্পের গৌরব করব, বাঙলা ঘরের আকর্ষণে আকুল হব। ধনপতি-চাঁদসদাগরে বাঙালীর উদ্যম দেখে খুশী হব, সত্যপীর-বড় খাঁ গাজীতে বাঙালীর কল্যাণ বুদ্ধির বিকাশ দেখে আশ্বস্ত হব। বাউল দর্শনের গৌরব করব। ...সে সঙ্গে চর্যাগীতির রহস্য উদ্ঘাটন করব, বেহুলা লখিন্দরের গল্প পড়ব, বৈষ্ণব পদাবলী আস্বাদন করব, বিদেশী তুর্কী-মুঘল শাসক বিদ্বেষী বঙ্কিম সাহিত্যের রস গ্রহণ করব, রবীন্দ্র সাহিত্য সমুদ্রে অবগাহন করব। কেননা, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় জাতীয়তার চেয়ে দেশ, গোত্র ও ভাষাগত ঐক্যের বন্ধন যে অনেক দৃঢ় তার সাক্ষ্য রয়েছে ইতিহাসের সর্বত্র।"[৫১]

ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকারের দাবী এবং স্বচ্ছ ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ডঃ আহমদ শরীফের রচনার অন্যত্রও প্রত্যক্ষ :

৭. "পাক-ভারতের দশ কোটি মুসলমানের কিছু সংখ্যক লোক আরব-ইরানী-তুরানীর বংশধর হলেও নিশ্চয়ই আর সব মুসলমান দেশজ, তা হলে দাতার উপমা দিতে হলে বিদেশী বিজাতি কাফের 'হাতেম-তাই'-র চেয়ে দেশী এবং সম্ভবত জ্ঞাতি কর্ণের উপমা মনে জাগাই স্বাভাবিক ও শোভন। তেমনি কাফের কবি ইমরুল কায়েসের চেয়ে কালিদাসের দাবী কম নয়।"[৫২]

ফলে রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং ধর্মের নামে একটি শ্রেণী মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠলেন; তাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির অভিনব ব্যাখ্যা প্রদানে আগ্রহী হলেন এবং তাঁদের মূল লক্ষ্য—

৮. "যা তাঁরা প্রচ্ছন্ন রাখতে চান, খোলাখুলি ভাবে তার নাম দেয়া যায় 'পশ্চিম বঙ্গীয় হিন্দু ও হিন্দুয়ানী ভীতি।' এ কারণেই তাঁরা বলছেন—হরফ বদলাও, বানান বদলাও, শব্দ বদলাও, ভাষা বদলাও, ভঙ্গি বদলাও, বদলাও বিষয়বস্তু, বদলাও নাম, বদলাও ভাব, বদলাও চিন্তা। কেবলই বদলাও যাতে বাঙলা ও বাঙালীত্বের নাম-নিশানা ঘুচে যায়, বিলীন হয় সাদৃশ্য, প্রতিষ্ঠা পায় পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য (স্বাতন্ত্র)।"[৫৩]

দুষ্ট ভ্রূণের মতো সমাজে অবস্থান করে এরা দেশে-দেশে মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলছে। আহমদ শরীফ মনে করেন :

৯. "আজো যারা সাহত্যে-সংস্কৃতিতে, ধর্মে-আদর্শে, সমাজে-সম্পদে স্বাতন্ত্র্যের কামনা-সাধনা করে তারা মানবতার শত্রু! কারণ, ধর্ম, সমাজ আর সংস্কৃতি মানুষের মনুষ্যত্ব সাধনার উপায় ও পন্থা স্বরূপ। এগুলো উপলক্ষ্য মাত্র—সিদ্ধি নয়, সুতরাং ব্যক্তির পরম ও চরম পরিচয় সে মানুষ। ... যারা লক্ষ্য হারিয়ে উপলক্ষ্য নিয়ে লাঠালাঠি, মারামারি করে তারা শুধু হিন্দু, শুধু মুসলমান অথবা শুধু খৃষ্টান, কিন্তু মানুষ নয়।"[৫৪]

নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িকদের হাতে মানবতা ও মনুষ্যত্বের সাধকরা যুগে যুগে লাঞ্ছিত হয়েছেন—সৈয়দ মুজতবা আলীও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর সম্পর্কে উল্লিখিত শ্রেণীর আতঙ্কের কারণ :

"স্কুলে, কলেজে, লাইব্রেরীতে ও সাধারণ গ্রন্থাগারে সৈয়দ সাহেবের ইসলাম-

বিরোধী ও পুতুল পূজা-মার্কা বিষাক্ত পুস্তকগুলোর যে উদ্ধত দৌরাত্ম্য পাকিস্তানে চলছে অর্থাৎ এ জাতীয় পৌত্তলিকতাপূর্ণ ভাবধারার নিরঙ্কুশ পরিবেশন করে আমাদের ছাত্র ও জনসমাজের মাথা তিনি যেভাবে চিবিয়ে খাচ্ছেন, তাতে কোনো ক্ষুদ্রতম সমাজসেবকও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না।"৫৫

বাঙালীচেতনা যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানে শিরদাঁড়া দৃঢ় করে দাঁড়াতে না পারে এবং 'বাঙালী' নিজেদের পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে চিহ্নিত করার অবকাশ না পায় সেই উদ্দেশ্যেই 'ইসলামের স্বার্থে এ বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের আশু দৃষ্টিপাত ও হস্তক্ষেপ' কামনা করে আবদুল ওয়াহাব চৌধুরীর আবেদন :

"... পৌত্তলিকতার এজেন্ট, তেত্রিশ কোটী দেবতার মুসলমান পূজারী, ...সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেব নিরাপদ যবনিকার অন্তরালে থেকে তার হিন্দুত্ব সর্বস্ব, দুরভিসন্ধিমূলক ও ইসলামবিরোধী সাহিত্যের মাধ্যমে বাঙ্গালী মুসলমানদের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য কোমর বেঁধেছেন।... আমাদের নাকের ডগার উপর দিয়ে এ জাতীয় পৌত্তলিকাতাপূর্ণ, দুরভিসন্ধিমূলক এবং আপত্তিকর এবং ইসলামের সাক্ষাৎ অপমানজনক তথাকথিত ভারতীয় সৎসাহিত্যে পূর্ব্ব-পাকিস্তান সরগরম! সুতরাং এ সম্বন্ধে অবিলম্বে জনমত গঠিত হয়ে এ ধরনের বিষবৃক্ষকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের বুক থেকে আমূল উৎপাটিত করার বিনীত আবেদন জানিয়ে গ্রন্থের যবনিকাপাত করি॥"৫৬

কাজী নজরুল ইসলাম এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর মধ্যে নানা সাদৃশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি। উদার মানব ধর্মের পৃষ্ঠপোষণার কারণে স্বধর্মীয়দের হাতে কাজী সাহেবকেও বিড়ম্বিত হতে হয়েছে, তাঁর সামাজিক জীবন হয়েছিলো বিপর্যস্ত। নজরুলের সমালোচনায়ও এদের ভাষা ও শব্দচয়ন তথা রুচি ও শালীনতাবোধ ইতরতার নিম্নতম স্তরে পৌঁছেছিলো।

১. "যখন "ধূমকেতু" প্রথম উদয় হয়, এবং বসরা প্রত্যাগত উদ্দাম যুবক "হাবিলদার" কাজী নজরুল ইসলাম উহার "সারথি" বলিয়া জানিতে পারি, তখনই বুঝিয়াছিলাম, "ধূমকেতু" মোসলেম গগনে প্রকৃত ধূমকেতুরূপেই উদয় হইতেছে। মোসলেম ভারতের "বিদ্রোহী" কবিতায়ই কাজীর কারামৎ জাহির হইয়াছিল। তারপর "ধূমকেতু" প্রত্যেক সংখ্যায় পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গরল উদ্‌গিরণ করিতেছে। এই উদ্দাম যুবক যে ইসলামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই, তাহা ইহার লেখার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দুয়ানী মাদ্দায় ইহার মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ। হতভাগ্য যুবকটি ধর্ম্মজ্ঞান সম্পন্ন মুসলমানের সংসর্গ কখনও লাভ করে নাই, অন্ততঃ সেটুকু লাভ করিলেও পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে স্বীয় পৈশাচিক খড়্গ উত্তোলন করিত না। থাকুক তাহার লেখার যথেষ্ট শক্তি, হউক সে বিখ্যাত কবি, তজ্জন্য মুসলমানের গৌরব করিবার কিছুই নাই।...

... নরাধম ইসলাম ধর্ম্মের মানে জানে কি ? খোদাদ্রোহী নরাধম নাস্তিকদিগকেও পরাজিত করিয়াছে। ...লোকটা শয়তানের পূর্ণাবতার। ইহার কথা আলোচনা করিতেও ঘৃণা বোধ হয়।... দুঃখের বিষয়, একদল ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য মুসলমান "ধূমকেতু"র এই সকল শয়তানী ও পৈশাচিক উক্তি পাঠ করিয়া লেখককে "বাহবা" দিয়া তাহার মাথাটি বিষম বিগড়াইয়া দিয়াছে। তাহাতে উহার বুকের পাটা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কলমের মুখে যা আসিতেছে, তাই লিখিতেছে। খাঁটি ইসলামী আমলদারী থাকিলে এই ফেরাউন বা নমরুদকে শূলবিদ্ধ করা হইত বা উহার মুণ্ডপাত করা হইত নিশ্চয়ই।" (লোকটা মুসলমান

না শয়তান ? : মুনসী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ, ইসলাম-দর্শন, কার্ত্তিক, ১৩২৯।)[৫৭]

২. "নজরুল ইসলাম নামক হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষের বাহ্‌বা-প্রাপ্ত জনৈক উচ্ছৃঙ্খল যুবকের 'অগ্নিবীণা' এবং আরও কি একখানি বই পড়িয়াছি। উক্ত দুইখানি পুস্তক পাঠ করিলে উহার লেখক যে একজন ধর্ম্মদ্রোহী কুলাঙ্গার, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।...সত্য ও তথ্য ছাড়া, ধর্ম্মভাব বিবর্জ্জিত, আধ্যাত্মিকতার আস্বাদশূন্য লেখা কখনও সাহিত্য নামে অভিহিত হইতে পারে না। সুতরাং সেই হিসেবে নজরুলের লেখাকেও আমরা সাহিত্য বলিতে পারি না। তাহার অধিকাংশ কবিতাই সত্য ও তথ্য ছাড়া গাঁজাখোরের ভাব, ভাষা ও ছন্দহীন অসংবদ্ধ প্রলাপ মাত্র। তদ্ব্যতীত চিঁহিঁ, চিঁহিঁ, হিঁ হিঁ, হাহা, হিহি, ইতি ইতি, হুর্‌র্‌ হুর্‌র্‌, দূর্‌র্‌ দূর্‌র্‌, চন্‌ চন্‌, ফন্‌ ফন্‌, থম্‌ থম্‌,বম্‌ বম্‌ ববম্‌ ববম্‌ ... প্রভৃতি বহু নিরর্থক শব্দের আমদানী করিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে একটি অর্থহীন অদ্ভুত সং সাজান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শিবের পূজা, কালীর স্তব, দুর্গার আরাধনা, সরস্বতীর বন্দনা প্রভৃতি অংশবাদিতায় তাহার লেখা ভরপুর। সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাপার এই যে, ঐ হতভাগ্য ধর্ম্মদ্রোহী পাষণ্ড হজরত ইব্রাহিমের (আঃ) সঙ্গে মিঃ সি. আর. দাসের এবং বিবি মরীয়মের সহিত চরিত্র হীনা বারাঙ্গনার তুলনা করিয়া এবং রোজা, নামাজ, হজ, জাকাত, কেতাব, কোরান ও পীর পয়গম্বর সম্বন্ধে মরদুদ কাফেরের ন্যায় মুখে যা আসে তাই বলিয়া অভিশপ্ত ইবলিস অপেক্ষাও পামরতার পরিচয় দিয়াছে। ... অবশ্য তাহার কোন কোন লেখায় কবিত্বের বিকাশ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সেই কবিত্ব এত বিষাক্ত যে, কোন সুরুচিপ্রিয় ভদ্র সন্তানই তাহা গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ নহে।" (বঙ্গীয় মোসলেম সাহিত্য ও সাহিত্যিক: আবু নুর, ইসলাম-দর্শন, ফাল্গুন, ১৩৩২।)[৫৮]

৩. '..."ইন্দ্রপতন" কবিতায় যে ধর্ম্মের অবমাননাকর বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে কবি নজরুল ইসলাম সমগ্র মুসলমান সমাজের নিকট অপরাধী। যাহাতে ভবিষ্যতে তিনি সংযমী হইয়া লেখনী ধারণ করেন অর্থাৎ ইসলামের অবমাননাকর কোন বিষয়ের উল্লেখ না করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে এক্ষণে যথোচিত শাসিত করা সমাজের পক্ষে একটি কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। ...কবির ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ইসলামের এইরূপ অবমাননা করিলে খোদার গজব সত্বরই নাজেল হইবে। (ইসলাম-বৈরী মুসলমান কবি, মোসলেম দর্পণ, আগষ্ট,১৯২৫।)[৫৯]

নজরুল ইসলামের কবিত্বশক্তিতে বিমুগ্ধ স্বাতন্ত্র্যপন্থী অনেকে তাঁর প্রতি সহানুভূতির পরিচয়ও দিয়েছেন। তাঁদের মতে—

১. "...তাঁহার (নজরুলের) ইসলামী ভাবপূর্ণ অনেক সুন্দর কবিতা বিবিধ পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। ... অধুনা তিনি "বিদ্রোহী" হইয়া বিপথে গিয়াছেন সত্য, কিন্তু ধীর ও উদারভাবে তাঁহার গুণ ও দোষের সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে সুপথে আহ্বান করিলেই আমরা আবার তাঁহাকে ফিরিয়া পাইতাম।" (সাহিত্য সমালোচনার কয়েকটি কথা : পথিক, ইসলাম-দর্শন, বৈশাখ, ১৩৩৩।)[৬০]

সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত স্বল্প হলেও নজরুল-প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন মুসলমান সমাজেও হয়েছে। তাঁরা কবিকে সাদর সম্ভষণ জানিয়েছেন বাংলার কাব্যকাননে।

১. "নজরুল ইসলাম বাঙলার জাতীয় কবি। জাতির বেদনার কথাই তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দু এবং মুসলমান লইয়া বাঙালী জাতি। সুতরাং এ জাতির বেদনার কথা প্রকাশ করিতে হইলে রচনায় ইসলামী এবং হিন্দুয়ানী উভয় জাতীয়

প্রকাশভঙ্গীর ছাপই দিতে হইবে, নতুবা রচনা সহজ ও সুন্দর হইবে না।" (কাব্য সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমান : আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, সওগাত, পৌষ, ১৩৩৩।)[৬১]

২. "... বিষের বাঁশীর বাদক কবি (নজরুল) মরণোন্মুখ মোসলেমের—শুধু মোসলেমের নয়, অমোসলেমের ও প্রাণে এক অভিনব স্পন্দন আনিয়া দিয়াছে। তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য, ছন্দনৈপুণ্য, শব্দচয়ন চাতুর্য্য ও উদ্দাম উদ্দীপনাময় বিচ্ছুরিত বহ্নি শিখা বঙ্গ-সাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে। আর মুসলমান আজ তাহার একজন ভাইকে বঙ্গ-সাহিত্যের সুউচ্চ আসনে সমাসীন দেখিয়া জাতীয় অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছে।" (নজরুল সম্বর্ধনা প্রসঙ্গে একটি কথাঃ সম্পাদক, মোয়াজ্জিন, কার্ত্তিক, ১৩৩৫।)[৬২]

সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর বিরুদ্ধে উদ্গীরিত ইতরজনদের অক্ষম সমালোচনার জওয়াব দান-ও তাঁর ব্যক্তি-মর্যাদার পক্ষে হানিকর বিবেচনায় এ' ধরনের কুশ্রী বিতর্ক থেকে সযত্নে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। মুক্ত বাংলাদেশের ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় আলোচনা প্রসঙ্গে এ' বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোকপাত করেছিলেন। কিংবা বলা যায় দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ একটিমাত্র দীর্ঘশ্বাসে মোচন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

"ইতিপূর্বে একাধিক পাঠক পাকী-ওজনে, নসিকে কর্কশ কণ্ঠে আমাকে 'গণ্ডমূর্খ' খেতাব দিয়ে...পাঠক-পঞ্চায়েতের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সেটা অপ্রমাণ করার জন্য হুলিয়া শমন জারী করেছেন, এ-পার গঙ্গায় আমার স্বধর্মীজন আমার বিরুদ্ধে কাফের ফতোয়া ঝেড়েছেন (তেনাদের প্রাণঘাতী ফতোয়ার চেয়ে তেনাদের বিজাংগা বিটকেল রচনা আমাকে ঘায়েল করেছে ঢের ঢের বেশী) ; ওনাদের অত্যুৎসাহী জনৈক ফকীহ্ প্রবর ঐ মর্মে প্যামফলেট ছাপিয়ে মেলাতে ফেরি করে বিলক্ষণ টু' পাইস কামিয়েছেন; ওপার গঙ্গায় আমাকে হিন্দু ধর্মবিদ্বেষী, সনাতন ধর্মের অপমানকারী প্রতিপন্নার্থে দৈনিকে কঠোর মন্তব্য করেছেন জনৈক উত্তেজিত লেখক। এর কঠোরতর উত্তর অবশ্য দিয়েছেন কলকাতাবাসী পাবনার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের এক ব্যঙ্গ-নিপুণ পণ্ডিত*; পক্ষান্তরে আমি মুসলমানের কলঙ্ক এর প্রতিবাদ পূব বাংলার কেউ করেননি, না করে ভালোই করেছেন; আমি বঙ্গভাষা জননীকে প্যাঁজ রসুন (আরবী-ফার্সী যাবনিক শব্দ এস্তেমাল করে) খাইয়ে মা-জননীকে ধর্মচ্যুত করবার পাপ-প্রচেষ্টায় অষ্টাহ সচেষ্ট কেষ্ট-বিষ্টুবৎ-ইত্যাকার অভিযোগ ঝাড়া সিকি শতাব্দী ধরে আমার বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে। যে সব অভিযোগ ওপার বাঙলার কোনো সম্পাদকই ছাপাতে রাজী হননি সেগুলো ব্যক্তিগত পত্ররূপে সরাসরি ডাক-মারফত, মমালয়ে হানা দিয়ে টিটিক্কার দিয়েছে, আমি পাকিস্তান দরদী ইয়াহিয়া ভুট্টোর স্পাই। পক্ষান্তরে এ পার বাংলায় আমি হিন্দু মহাসভার স্পাই এ-অভিযোগ কখনো শুনিনি। কিন্তু এদের তুলনায় আমার প্রতি অহেতুক মেহেরবান পাঠক বেশুমার, বিস্তরে বিস্তর। এঁদেরই নীরব দোওয়ার বরকতে এ–অধম চাঁদপানা চেহারা করে মুখ বুজে সুখ নিদ্রায় দিব্য কাল যাপন করেছে, ... সিকি শতাব্দী ধরে।"[৬৩]

এতে বিন্দুমাত্র দ্বিধার অবকাশ নেই যে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ বাঙালী কাজী নজরুল ইসলাম এবং সৈয়দ মুজতবা আলীকে যেভাবে বরণ করেছেন—তেমনটি অপর কোনো বাঙালী কবি-সাহিত্যিকের ভাগ্যে জোটেনি। তবু অনস্বীকার্য, বহু জ্বালা, অজস্র

* পরিমল গোস্বামী

হতাশা পুঞ্জীভূত হয়েছিলো সৈয়দ মুজতবা আলীর ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে। তাঁর অনুজতুল্য প্রয়াত সাহিত্যিক সন্তোষ ঘোষের কণ্ঠেও ঝরে পড়ে বিষণ্ণতা, "যথার্থ অর্থে মুজতবা আলী স্বভূমি খুঁজে পাননি। তিনি ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও মনে-প্রাণে কি এদেশ তাঁকে গ্রহণ করেছিল ?" (সা-৩১)।

আমাদেরও দৃঢ় প্রত্যয়, সেই যে কিশোর মা-জননীর অশ্রুজল অগ্রাহ্য করে একদিন ঘর ছেড়েছিলো—সে আর ফেরেনি।

তথ্য-নির্দেশ

১. What is in a name? সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৯৫।
২. ঐ, পৃ. ১৯৭।
৩. 'গজভুক্ত পিণ্ডিবৎ', উভয় বাংলা, ঐ, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৪১৪-১৫।
৪. বিসমিল্লায় গলৎ, ঐ, পৃ. ৩৮৫।
৫. সৈয়দ মুজতবা আলী : পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (নবজাতক প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭০), পৃ. ৮৩।
৬. রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৮৩।
৭. রায়পিথৌরা : দেহলি প্রান্তে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৫২, পৃ. ৪।
৮. পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (নবজাতক প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭০), পৃ. ৮৩।
৯. পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়, পৃ. ১৯।
১০. দেহলি প্রান্তে-১, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৬৯।
১১. জাতীয় মহাশঙ্খের স্বরূপ, ঐ, পৃ. ৮৪।
১২. ভাষার হাটে বেইমানি, ঐ, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩০৭।
১৩. রায়পিথৌরা : দেহলি প্রান্তে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ মে, ১৯৫২, পৃ. ৪।
১৪. জয় হে ভারতভাগ্য বিধাতা, ময়ূরকণ্ঠী, পৃ. ১৬৩।
১৫. গণভাষা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০।
১৬. রায়পিথৌরা, সপ্তপর্ণী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩ মার্চ, ১৯৫৩, পৃ. ৪।
১৭. রায়পিথৌরার কলমে-১৫, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১৫৩।
১৮. রায়পিথৌরা : দেহলি প্রান্তে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ নভেম্বর, ১৯৫২,পৃ. ৪।
১৯. রায়পিথৌরার কলমে-২৩, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৯৩।
২০. রবি-মোহন-এনড্রুজ, পঞ্চতন্ত্র (দ্বিতীয় পর্ব), পৃ. ১৪২।
২১. রায়পিথৌরা : দেহলি প্রান্তে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১ অক্টোবর, ১৯৫২, পৃ. ৪।
২২. রায়পিথৌরা : সপ্তপর্ণী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ জানুয়ারী, ১৯৫৩, পৃ. ৪।
২৩. পঞ্চতন্ত্র, দেশ, ১৩ পৌষ, ১৩৬৯, পৃ. ৮৩৭।
২৪. দিনলিপি, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১-৪২।
২৫. যোগাযোগ, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৭২-৭৩।
২৬. ঐ, পৃ. ২৭৪।
২৭. বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯-৩০।
২৮. ফুরায় যাদের ফুরাতে, ঐ, পৃ. ৪২৪।
২৯. ইরান-আফগান-পাকিস্তান, শারদীয় কথাসাহিত্য, কার্ত্তিক ১৩৮০, পৃ. ২৩।
৩০. দু-হারা, পৃ. ২৮।
৩১. শংকর : তুলনাহীন মুজতবা আলী, দেশ, ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ. ৮৩৯।
৩২. দ্বন্দ্বপুরাণ, কত না অশ্রুজল, পৃ. ২২০।

৩৩. বৈতারিক : অথ বেতার কথা (বেতার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত শ্রোতাদের মতামত)।
৩৪, পরিমল গোস্বামী : পত্রস্মৃতি, পৃ. ৩৪১।
৩৫. ঐ, পৃ. ৩৪১-৪২।
৩৬. শংকর : তুলনাহীন মুজতবা আলী, দেশ, ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ. ৮৩৯।
৩৭. দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ নভেম্বর, ১৯৮৪, পৃ. ৪।
৩৮. মহম্মদ আব্দুল ওয়ালী : সৈয়দ মুজতবা আলীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ, দেশ, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১, পৃ. ১১।
৩৯. আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী : সৈয়দ মুজতবা আলির সাহিত্য প্রসঙ্গে, পৃ. ১০।
৪০. রবি কাহিনী, শারদীয়া প্রসাদ, ১৩৭৮, পৃ. ৪০।
৪১. আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী : সৈয়দ মুজতবা আলির সাহিত্য প্রসঙ্গে, পৃ. ৬৪-৬৫।
৪২. ঐ, পৃ. ৭৬।
৪৩. রায়পিথৌরা : দেহলি প্রান্তে, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২, পৃ. ৮।
৪৪. রায়পিথৌরা : দেহলি প্রান্তে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ মে, ১৯৫২, পৃ. ৪।
৪৫. ঐ, ২৮ অক্টোবর, ১৯৫২, পৃ. ৪।
৪৬. আহমদ শরীফ : ভাষার কথা, বিচিত চিন্তা, ২য় মুদ্রণ, ১৯৭৫, পৃ. ৬।
৪৭. ঐ : স্বদেশ, স্বভাষা ও স্বাজাত্য, ঐ, পৃ. ২২৭।
৪৮. বদরুদ্দীন উমর : বাঙালী সংস্কৃতির সংকট, সংস্কৃতির সংকট, পৃ. ১০-১১।
৪৯. ঐ, রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতি, ঐ, পৃ. ১০৮।
৫০. বদরুদ্দীন উমর : পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতিতে বিদেশী প্রভাব, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা, পৃ. ২২।
৫১. আহমদ শরীফ : দেশ, জাত ও ধর্ম; বিচিত চিন্তা (২য় মুদ্রণ), পৃ. ২৬২-৬৪।
৫২. ঐ, : সাহিত্যে রূপপ্রতীক, ঐ, পৃ. ২০।
৫৩. ঐ, দুর্দিন, ঐ, পৃ. ২৭২।
৫৪. ঐ, বিশ্বের নাগরিক, ঐ, পৃ. ২৮৯।
৫৫. আব্দুল ওয়াহাব চৌধুরী : সৈয়দ মুজতবা আলির সাহিত্য প্রসঙ্গে, পৃ. ২৫-২৬।
৫৬. ঐ, পৃ. ৭৮।
৫৭. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, (১৯৭৭), পৃ. ৩৭২-৭৩।
৫৮. ঐ, পৃ. ৩৭৫-৭৬।
৫৯. ঐ, পৃ. ৩৭৬-৭৭।
৬০. ঐ, পৃ. ৩৭৭।
৬১. ঐ, পৃ. ৩৭৭।
৬২. ঐ, পৃ. ৩৭৮।
৬৩. নট্ গিলটি, সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৩।

অধ্যায় : এগার

০১.

প্রায় নয় বৎসর শান্তিনিকেতনে বসবাস করে ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে সৈয়দ মুজতবা আলী ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বোলপুরের নিচাপট্টিতে জনাব আবদুর রউফ (মধু মিয়া)-এর বাড়িতে চলে আসেন। নিজের খরচেই উক্ত বাড়ির ওপর তলায় একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছিলেন। এখনো সে-বাড়িতে তাঁর দুটো সিলিং ফ্যান, একটি প্যাডেস্টাল ফ্যান ও সোফা রয়েছে—সেগুলো কখনো নিয়ে আসেননি (সা-৫৫)। অভিমানবশতঃ শান্তনিকেতন পরিত্যাগ করলেও সেই মুহূর্তেই তিনি অন্য কোনো শহর কিংবা কোলকাতায় বাস করার ইচ্ছে পোষণ করেননি। সম্ভবতঃ শান্তিনিকেতনের আশেপাশে থেকে সাহিত্যচর্চা করে শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দেয়ার বাসনা ছিলো। নিচাপট্টির বাড়িটি কিংবা পরিবেশ আলী সাহেবের মতো ব্যক্তির বসবাস করার যথোপযুক্ত স্থান বলা যায় না। সেখানে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর কাটিয়ে মুজতবা আলী স্থায়ীভাবে কোলকাতায় চলে আসেন। ৯ই ডিসেম্বর ১৯৬৮-র একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন :

"..I am seriusly toying with the idea of striking the tent at Bolpur & settle down in Calcutta, till my bones are gathered unto my fore-fathers—may Allah hasten the day!... I propose to shift mid-December." (প-১৪৫)। অপর একটি পত্রে সোমেন চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন, তিনি যেন বোলপুর গিয়ে কোলকাতায় প্রত্যাবর্তনে তাঁকে এবং পরিচারক 'কাটু'কে সাহায্য করেন। "কাটু বলেছে, তুমি বৃহস্পতিবার দিন না এলে সে কিছুই করতে পারবে না।...এখন থেকে (১৫/১২/৬৮) তার সঙ্গে তোমাকে একই শহরে বাস করতে হবে। কতকাল কে জানে ?" (প-৫৮)

সুতরাং, মুজতবা আলীর ১৯৬৮ সনের ১৫ই ডিসেম্বরে কোলকাতা প্রত্যাবর্তনের তারিখটি আমরা গ্রহণ করতে পারি। প্রথমে তিনি ১১ডি, নাসিরুদ্দীন রোডে ওঠেন এবং কয়েক মাস এখানেই ছিলেন। ১৯৬৯-এ মে এবং জুন মাসে এ' ঠিকানা থেকে লেখা তাঁর চিঠি পাচ্ছি। ৩রা জুন, ১৯৬৯-এর এড্‌ভোকেট অংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছেন, "আমি....এখানে (১১ডি, নাসিরুদ্দীন রোড) অন্ততঃ কয়েক মাসের জন্য, চিকিৎসার্থে ডেরা পেতেছি।" (প-২৬১)। সম্ভবতঃ অল্পদিনের মধ্যেই বাড়ি পরিবর্তন করে ৫ নং পার্ল রোড, কোলকাতা-১৭-তে উঠে যান। এবং কোলকাতার শেষ দিন পর্যন্ত ডঃ আলী সেখানেই ছিলেন। (মরহুম) আবু সয়ীদ আইয়ুবও ছিলেন এ বাড়ির অন্যতম ভাড়াটে। এ' ঠিকানা থেকে '৬৯-এর অক্টোবরে লেখা পত্র আমাদের হাতে রয়েছে।

মুজতবা আলী 'সোরাইসিস'-এ ভুগতেন। ১৯৭০-এ ইউরোপ ভ্রমণের সময় এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ মিত্র তাঁকে সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে 'প্রেসিডেন্সি নার্সিং হোম'-এ দীর্ঘ তিন মাস রেখে তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং আলী সাহেব সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে বাড়ি ফেরেন।

অত্যধিক পানাসক্তি, অনিয়ম, আর্থিক অনটন—সবকিছু মিলিয়ে আলী সাহেবের কোলকাতার শেষদিনগুলো ছিল অত্যন্ত করুণ, নির্মম—যদিও তিনি সর্বদা এদিকটা সংগোপনে, অন্যের অগোচরে রেখেছেন।

নিষ্ঠাবান ও রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান মুজতবা আলী ১৯২৯ সালে জার্মান গেলে তাঁর এক শিক্ষক যুবা-ছাত্রটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—সেখানকার তরুণী সম্প্রদায় হৃদয়বতী এবং পানীয় অতি সস্তা—দুটো বস্তুই তরুণটিকে আকর্ষণ করেছিলো এবং আমৃত্যু সে-আকর্ষণে ভাটা পড়েনি। বরঞ্চ উত্তরোত্তর তৃষ্ণা বেড়েছে। তাঁর জীবনের করুণ পরিণতি ভয়াবহ এবং ত্বরান্বিত করার পশ্চাতে মুখ্য কারণ তৃষ্ণা, মদই মুজতবা আলীকে গ্রাস করেছে। তাঁর পানাসক্তি প্রসঙ্গে শেখ দিল্‌জান্ (কাটু) বলেছেন, "...সাহেব মদ একটু বেশী মাত্রায় পান করতেন। অনেক সময় রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও মদ চাইতেন। ঘরে না থাকলে মধ্যরাত হলেও আমাকে দোকান থেকে মদ আনতে হতো। যখন কোলকাতা থেকে সাহেবের বন্ধুবান্ধবরা আসতেন তখন একটু বেশী মাত্রায় খেতেন এবং লেখার কাজকর্ম বন্ধ করে শুধু গল্প করতেন।" (সা-৫৩)। ডঃ আলীর মদ্যাসক্তি সম্পর্কে কিছু ঘটনা শোনা যায়—তার অনেকগুলোই বেশ মুখরোচক। এ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত যোগানন্দ গুপ্ত (নসু গুপ্ত) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ১৯৪৮ সনের প্রথম দিকে, তখনো পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়নি। তিনি কার্যোপলক্ষে শিলং থেকে বাসে সিলেট যাচ্ছিলেন। বেলা প্রায় আড়াইটা নাগাদ 'ডাউকী' সীমান্তে পৌঁছেন। সেখানে তাঁর এক অতি পরিচিত কাস্টম'স অফিসার আলাপ প্রসঙ্গে জানালেন যে, কর্তব্যের খাতিরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দু' জন খ্যাতিমান ব্যক্তিকে—এঁদের একজন ব্যবসায়ী এবং অপরজন খ্যাত পণ্ডিত ও সাংবাদিক হিসেবে—যাত্রাপথে বাধা দিতে হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণ পানীয় দ্রব্য ছিলো। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয় তখন ডাক-বাঙলোতে বিশ্রাম করছিলেন। "আমি (যোগানন্দ গুপ্ত) আনুমানিক সাড়ে তিনটার দিকে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় দেখি সেই খ্যাতিমান ব্যক্তিদ্বয় স্বয়ং সৈয়দ মুজতবা আলী এবং তাঁর বন্ধু প্যারীমোহন মুখার্জী। দু' জনই আমার পরিচিত। তাঁরা 'প্রাইভেট কারে' সিলেট যাচ্ছেন। সীমান্ত অতিক্রম করার সময় সৈয়দ মনোরম ভঙ্গীতে সিলেটী সংলাপে আমার পরিচিত পূর্বোক্ত কাস্টম'স অফিসারকে বললেন, 'ক্বিতা বা! আর দরতায় নি ? পেটো করি নিলাম।' (সা-৫৯)

ব্যক্তি হিসেবে মুজতবা ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর বন্ধু বাৎসল্য এবং স্নেহকোমল অন্তর্লোক আমাদের আলোচনায় এসেছে। মদ্যাসক্তি সীমা লঙ্ঘন করলেও মুজতবার ভেতরকার অনিন্দ্যসুন্দর মানুষটির কোমল রূপ কখনো বিনষ্ট হয়নি। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী আলী সাহেবের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন বিদ্যার্থীদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ডঃ আলী শ্রীযুক্ত বিশীকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিলো অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ। দিল্লীতে গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে কোন এক বাড়ীতে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এবং মুজতবা আলীও

ছিলেন। নানারকম পানীয়ের মধ্যে প্রমথ বিশী ঘোলের শরবৎই পান করলেন। কেননা, পরিবেশিত অন্য কোনো পানীয়ের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিলো না —অভ্যাসও ছিলো না। রাত্রিতে সেই বাড়িতেই পুনরায় যখন পানীয় পরিবেশন করা হলো—প্রমথনাথ বিশী বলছেন :

"তখন শুধুমাত্র আমি যে গোঁড়া নই তা প্রমাণ করবার জন্য একটি 'Cold বিয়ার' পান করলাম। তাতে অবস্থার কোন ইতরবিশেষ আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু যখন ঘরে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং সৈয়দের কানে গেল আমি বিয়ার পান করেছি, সে আমার পা জড়িয়ে ছেলেমানুষের মতো হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো—'বিশীদা ওটা আর খাবেন না।' আমি বললাম, 'আরে না, মাত্র একদিন। ওতে কিছু হবে না।' সৈয়দ বললে, 'না, না। ওভাবেই ওগুলো নেশা ধরিয়ে দেয়। আমিও ওভাবেই ধরেছিলাম। আজ আমার অবস্থা দেখুন। না খেলে আমি থাকতে পারি না। আমি শেষ হয়ে গেলাম।" (সা-২৮)। এই ধ্বংস থেকে আলী সাহেব নিজেকে আর কখনো রক্ষা করতে পারেননি। এবং সে-চেষ্টাও নির্লক্ষ্য। এ' ক্ষেত্রে 'গেলাস-বন্ধুদের' অবদানও কম নয়। এঁদের অনেকে আলী সাহেবের পয়সায় মদ খেয়েছেন, আবার অনেকে স-বোতল স-বান্ধব হাজিরা দিতেন—তাঁদের আকর্ষণ স্বয়ং মুজতবা আলী।

ডঃ আলীর সঙ্গে শংকরের শেষ সাক্ষাৎ ৫নং পার্ল রোডে। তিনি "নিজের ছোট্ট ঘরে বিছানার ওপরে আধশোয়া অবস্থায় ছিলেন। সামনে সেই পরিচিত হুইস্কির বোতল।" নিজের অসহায় করুণ অবস্থার কথা অসঙ্কোচে এককালের প্রিয় শিষ্যের নিকট ব্যক্ত করেন।—

"এখন মুজতবা আলী গলিতনখদন্ত—এখন লোকে তার লেখা দয়া করে পড়ে,তার মাথায় আর আইডিয়া আসতে চায় না।"—অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই যেন উচ্চারণ করেন, "সংস্কৃতে একটা গল্প আছে। এক তৃষ্ণার্ত হাতি সরোবরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সামনে পাঁক থাকায় জলের ধারে যেতে পারছে না। একটা কাক কেমন নির্ভয়ে তরতর করে কাদার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে চলে গেল। আমি হচ্ছি ওই জাতি—আমার পাণ্ডিত্যই আমার শত্রু। সুতরাং ভ্রাতঃ, ...কখন হাতী হবার চেষ্টা কোরো না।"[১] বাঙলার এক কালের নন্দিত লেখকের এই পরিণতি সম্পূর্ণ তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। শেষদিকে মুজতবার দেহ-মন দুই-ই ভেঙ্গে গিয়েছিলো। মমত্ব এবং অন্যান্য কারণে ও-দেশ ত্যাগ করেননি। আবার ওখানকার কিছু ঘটনায় মানসিক চাঞ্চল্য তাঁকে স্বাভাবিক মানুষের ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছে অনেক সময়। মানসিক দিক থেকে এই প্রাণবান পুরুষটি ছিলেন বড় অসুখী, অত্যন্ত একা—একটা যন্ত্রণায় ছিলেন আজীবন কাতর।

সৈয়দ মুজতবা আলী ডায়েরিতে পুত্রদের উদ্দেশে কতগুলো পত্র লিখে গেছেন—বড় হয়ে তারা পড়বে, সে প্রত্যাশাতেই। প্রতিটি চিঠিতে সন্তান বৎসল পিতৃহৃদয়ের বুভুক্ষা ও আর্তি সুপ্রকট। একটিতে লিখেছেন,—"আজ সপ্তদশী। এখন আটটা বেজেছে। সপ্তদশীর চাঁদ কখন ওঠে ঠিক জানিনে। বাইরে অন্ধকারটা জমাট নয়। আকাশ যেন কোন ঘোর রঙের চশমা পরে তাকিয়ে আছে। বাতাস যেন ভিজে কাঁথা পরে আমার চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে।...

সমস্ত জীবন কাটলো এই রকম একা বসে বসে।"[২]

সৈয়দ মুজতবা আলীকে সর্বশেষ দর্শনের বর্ণনায় শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর ঘোষ

লিখেছেন, "...গত বছরেই (১৯৭৩-এ) শেষ সাক্ষাৎ। কোথায় সেই উজ্জ্বল কান্তি। অবসন্ন পাণ্ডুর চেহারাটাকে একটা নকসী কাঁথায় ঢেকে রেখেছিলেন ; নকশী কথার মালা গেঁথে বরাবরই যেমন ঢেকে রাখতেন আপন স্বরূপ।"[৩] ১৯৭৩-এ পার্ল রোডে তাঁকে দেখে শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীরও বিস্ময়ের অবধি থাকে না। প্রথম দেখা মুজতবার সঙ্গে আজকের 'সৈয়দদার' সাদৃশ্য কোথায় ? কিছুদিন আগেই কোলকাতায় তিনি 'সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস'-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন। সদাসপ্রতিভ সুবেশী "সৈয়দদা শুয়ে আছেন। দাড়ি কামানো হয়নি। ময়লা লুঙ্গি-গেঞ্জি পরিহিত। রীতিমতো একটি নোংরা বিছানা ও পরিবেশে পড়ে আছেন। ...সৈয়দদা শুয়ে শুয়েই কথা বলছিলেন। তাঁর একটি হাত অসাড় হয়ে আসছিল। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'বিধিদত্ত আঙ্গুলগুলো আর বোধহয় কাজে লাগাতে পারবো না।' কণ্ঠে তাঁর বিষণ্ণতা।... হঠাৎ তিনি বললেন, 'আমি যে এ অবস্থায় আছি, এ-কথা কাউকে বলবে না। এমনকি কানাইকেও* না। আমি চাইনে কেউ এসে আমাকে সহানুভূতির নামে করুণা প্রদর্শন করুক।' " (সা-২৬)। নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখবোধটা যতদূর সম্ভব অলক্ষ্যেই রাখতে চেষ্টা করেছেন। শ্রীদ্বারিক মিত্রের ভাষায়, "কোলকাতায় মুজতবা আলীর শেষ দিনগুলো ছিলো দুর্বিষহ। অবর্ণনীয়। প্রথমতঃ আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য, তদুপরি অনাচারের পঙ্কিল আবর্তে তখন তিনি আকণ্ঠ মজ্জিত।" (সা-৪৫)। শেষ বয়সে আলী সাহেব পশ্চিম বঙ্গেই স্থায়ীভাবে বসবাস করার ইচ্ছে অন্ততঃ একসময় পোষণ করতেন। "ভেবেছিলেন বাড়ী করবেন, জমি থাকবে, ধান ফলবে, মুরগী পুষবেন" ইত্যাদি (সা-৪৫)। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি ঘটলে ১৯৭৩-এ প্রায় চলৎ-শক্তিহীন সৈয়দ মুজতবা আলীকে তাঁর শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ শেষ ক'টা দিন যাতে তিনি গৃহসুখ থেকে বঞ্চিত না হন এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থেকেই পৃথিবীকে শেষ প্রণতি জানাতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যেই আলী সাহেবকে তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঢাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যেন ক্রমেই নিজেকে সংবৃত করে নিচ্ছিলেন। বন্ধুবান্ধবের আনাগোনা কমে আসছিলো। নিঃসঙ্গতা ক্রমান্বয়েই ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে মূর্তিমান। "যে নৈঃসঙ্গ পৃথিবীর সব সৃষ্টিকারদের হৃদয়কে ঘিরে থাকে, মুজতবার বেলায় সে হয়তো আরো দুর্লঙ্ঘ্য বিশাল রূপ ধরেছিল।"[৪] একে অতিক্রম করা ছিলো তাঁরও সাধ্যাতীত। পরিজনদের মধ্যে আলী সাহেবকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত সদয় বন্ধুবান্ধবদের সুবিবেচনারই পরিচায়ক।

তৎপূর্বে সুহৃদবর্গ মুজতবা আলীকে কোলকাতার একটি খ্যাতনামা 'নার্সিং হোমে' ভর্তি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বাড়ি ফিরে আসবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েন। বাড়ি এলেই অনবরত 'পান' করবেন—এই আশঙ্কায় বন্ধুরা তাঁকে ক্লিনিকে রাখতেই ছিলেন সমধিক আগ্রহী। মনে হয় নিজেকে ধ্বংস করাই ছিলো মুজতবা আলীর শেষ জীবনের ব্রত! সকাল থেকে গভীর রাত অবধি চলতো নিরলস বিরামহীন মদ্যপান। লেখার ক্ষমতাও গিয়েছিলো কমে। স্মৃতিশক্তির প্রবাদবাক্যতুল্য ধার অনেকটা নিষ্প্রভ। আহারের প্রতিও বিমুনা। এমনি অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীযুক্তা গৌরী আইয়ুব :

"... আমাদের ধারণা হয়েছিলো যে, একমাত্র তাঁর (মুজতবার) স্ত্রী বা সন্তানরাই তাঁকে এ ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারেন। আমরা মিসেস আলীকে অনুরোধও করেছিলাম তাঁকে ঢাকা নিয়ে যেতে। এতে আলী সাহেব আমাদের ওপর অত্যন্ত বিরক্তও

* (প্রয়াত) কানাইলাল সরকার।

হয়েছিলেন। তাঁকে বেপরোয়া জীবন থেকে রক্ষার জন্যেই আমরা মুজতবা সাহেবকে ঢাকা পাঠাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের কিছুটা ভুল বোঝেন। এবং অভিমানভরে বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে এ বাড়ী থেকে তাড়াতে চাইছো।' " (সা-৩৮)। কিন্তু শ্রীমতী গৌরী কথিত আলী সাহেবের উক্তি যে নিছক 'অভিমান'-জনিত ছিলো না, তাঁর কয়েকটি পত্র তারই সাক্ষ্য দেয়। বন্ধু আবু সঈদ আইয়ুবকে নিকটতম প্রতিবেশী রূপে লাভ করতে নিশ্চয়ই মুজতবা আলী প্রলুব্ধ হয়েছিলেন এবং মুজতবার মতো যশস্বী ব্যক্তিকে ভাড়াটে হিসেবে পেতে অনেক 'বাড়িওয়ালার'ও আগ্রহ থাকতে পারে। আলী সাহেবকে ৫নং পার্ল রোডে সাদরেই গ্রহণ করা হয়েছিলো। প্রথমাবস্থায় তাঁর আহার-বিহারের দায়-দায়িত্বও বাড়ির মালিক–পত্নী গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এক কক্ষ বিশিষ্ট 'এপার্টমেন্টে' তিনি অনেকটা 'পেয়িং-গেস্ট'-এর মতোই ছিলেন। কিন্তু 'বাড়িওয়ালী'র সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বেশি দিন বজায় থাকেনি। হয়তো এ জন্য আলী সাহেবও অনেকটা দায়ী। তাঁর কক্ষে নিত্য সুরাসহযোগে মজলিশ নিশ্চয়ই পারিবারিক সুস্থ পরিবেশের অনুকূল ছিলো না। যত ঘনিষ্ঠতাই থাকুক, আইয়ুব সাহেবের মতো মর্যাদাসম্পন্ন সদাচারী ব্যক্তি যে এ পরিবেশ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দিনের পর দিন সহ্য করতে চাইবেন না, সেটাই স্বাভাবিক। অবশ্য আইয়ুবও ছিলেন অগ্রজের বাড়ির ভাড়াটে। মোটকথা মালিক কিংবা বাড়ির অন্য বাসিন্দা, কেউ-ই আলী সাহেবের জীবন-যাপন পদ্ধতি নয়নশোভন তথা স্বাস্থ্যবর্ধক বিবেচনা করেননি। ফলে অল্প কিছুদিন পরই সম্ভবতঃ মুজতবা আলীকে সে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং শেষ দিকে তা' প্রায় নোংরামির পর্যায়ে নেমে আসে।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর সৈয়দ মুজতবা আলী ১৯৭২ সনের ১৫ই জানুয়ারি ঢাকা এসে 'দশ মাস' কাটিয়ে কোলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর অসুস্থ হয়ে পড়েন (প-২৬৭)। তিনি স্থায়ীভাবে ঢাকায় পাড়ি জমাননি। কাজেই কোলকাতার 'এপার্টমেন্টটি'ও ছাড়েননি। এবং নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করেছেন। ঢাকা থেকে লেখা ৩০শে মে, '৭২-এর এক পত্রে আলী সাহেব উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর লোক ভাড়া পরিশোধ করতে গেলে মিসেস ... ভাড়া 'নিতে অস্বীকার করেন।' মিসেসের জনৈকা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া 'ফিরে এসে' আলী সাহেবের ঘরের 'তালা ভাঙার' হুমকি দিয়েছেন। শ্রীসোমেন চট্টোপাধ্যায়কে এ সংবাদে উদ্বিগ্ন আলী সাহেবের পত্র :

"খানে (পশুপতি খান) আমাতে স্থির করা ছিল, এ-পরিস্থিতি দেখা দিলে সে rent controller-এর কাছে টাকা জমা দেবে, ও আমাদের area-র O. C. কে report দেবে, আমার flat এর তালা ভাঙবার সম্ভাবনা আছে।" (প-৬০)। অতঃপর তিনি অনুরোধ করেছেন সোমেনবাবু যেন পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রয়োজনবোধে ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে যান এবং rent controller-কে বলতে কোনো বাধা নেই, income tax ফাঁকি দেবার জন্য Mrs....আমাকে (মুজতবাকে) (এবং আইয়ূবকেও) কোনো রসীদ দিতেন না। এখন আর ঘোমটা টেনে হবে না। বিশেষত Mrs. -র এখন দর্প বেড়েছে। MLA স্বামী; CPI very very friendly with India Govt, & Bangladesh too." (প-৬০)। সুতরাং মুজতবা আলী বাংলাদেশে আসবার পূর্ব থেকেই যে ভাড়াটে-বাড়িওয়ালীর মধ্যে একটা মনোমালিন্য দানা বেঁধে উঠেছিলো, তাতে সন্দেহ নেই।

মুজতবা আলীর পত্রানুযায়ী দেখা যাচ্ছে '৭২-এর নভেম্বর মাসে তিনি কোলকাতা

ফিরে যান এবং সেখানে গিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ দফায় কয়েক মাস কোলকাতায় ছিলেন। এবং '৭৩-এর মার্চ ও এপ্রিল মাসে কোলকাতা থেকে তাঁর লেখা চিঠি পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবতঃ জুন বা তার পূর্বেই তিনি ঢাকা ফিরে আসেন। জুলাই মাসের প্রথমার্ধে কোলকাতা থেকে শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আলী সাহেবকে জানিয়েছেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে কোলকাতা 'শহরটাও যেন ফাঁকা ফাঁকা' ঠেকছে। ১৯৭৩-এর ২৯শে অক্টোবর (মতান্তরে ২১শে অক্টোবর) শেষবারের মতো তিনি কোলকাতা যান এবং দিনকয়েক পরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন।[৫] ঘুমন্ত অবস্থায় এই আক্রমণ হয়েছিলো। শ্রীসোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাধারণতঃ রোববার কিংবা অন্যান্য ছুটির দিনগুলোতে আলী সাহেবের ঘরে গিয়ে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গের অপেক্ষা করতেন। "একদিন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন (ডঃ আলীর) ঘুম ভাঙলো না, তখন কাটুকে ডেকে আনলুম। কাটু এসে তাঁর শোবার অপরিচিত ভঙ্গী দেখে গায়ে হাত দিয়ে দেখে তিনি অজ্ঞান। ডাক্তার-বদ্যি আসতে জানা গেল সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্ হয়েছে। চিকিৎসায় সুস্থ হলেও ডান হাত এবং ডান পা অকেজো হয়ে গেল। লিখতে গেলে হিজিবিজি ছাড়া কিছু বোধগম্য হত না। স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে এই আতঙ্কে মাঝে মাঝে তিনি রবীন্দ্র রচনাবলীর কোন একটি খণ্ড আমার হাতে দিয়ে বড়সড় কবিতা আগাগোড়া নির্ভুল ভাবে মুখস্থ বলে যেতেন।" (সা-৪৪)

০২.

কিছুটা সুস্থ হয়ে ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩-এ শেষবারের মতো তাঁর বহু স্মৃতিবিজড়িত, বহু কাঙ্ক্ষিত শহর কোলকাতা থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন বাংলাদেশে—ঢাকায়। ১৮ই ডিসেম্বর, তাঁকে ভর্তি করা হলো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। যখন যেখানে যে অবস্থায়-ই থাকুন না কেন, জীবনের শেষ লগ্নেও প্রমাণ করে গেছেন— তিনি অনন্য, অসাধারণ—সৈয়দ মুজতবা আলী। "মুজতবা সাহেব হাসপাতালে। শরীরের ডানদিকে পক্ষাঘাত। দেখে খুব খারাপ লাগলো। কিন্তু মুজতবা সাহেব নিজে যথারীতি স্ফূর্তির ফোয়ারা। একটু পরেই মনে হলো, একজন রোগীকে দেখতে আসিনি। এসেছি একটি উৎসবে।"[৬] স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় ১৯৭৪-এর ৪ঠা জানুয়ারি তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। অবশ্য সোহ্‌রাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অসাড় ডান হাতটিতে কয়েকদিন 'ইলেকট্রিক রে' দেয়া হয়।

বোলপুরের সংবাদপত্রের এজেন্ট শ্রীঅনিল দাস মুজতবার অসুস্থতার সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ করায় কৃতজ্ঞ ডঃ আলী ১১ই জানুয়ারি, '৭৪-এ তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে অবহিত করেন, "কোলকাতা থেকে চলে আসার পর দিন পনেরো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছিলুম। ওখানে আমার শরীরের পুরোপুরি 'চেক আপ' করা হয়েছে এবং তাতে সব কিছু মোটামুটি স্বাভাবিক। তবে ডান হাত এবং ডান পায়ের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়।... শুধুমাত্র হাতের ব্যায়াম চলছে। মাঝে মাঝে মনে হয় অবস্থা একটু ভালোর দিকে।" (প-২৬৮)। চিঠিটি স্বহস্তে লিখতে পারেননি। ঢাকা থেকে বকলমে লিখিত সন্ধানপ্রাপ্ত মুজতবা আলীর শেষ পত্রদুটো ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৭৪-এ লেখা—একটি শ্রীযুক্ত অনিল

দাসকে এবং অপরটি তাঁর এক কালীন পরিচারক আবদুল মজনূন (মজন)-কে। দু' জনেরই অসুস্থ মুজতবা আলীকে দেখার ইচ্ছে ছিলো এবং এ' ব্যাপারে আলী সাহেব তাঁদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে পত্র লিখেছিলেন। তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়নি।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪-এর রাতে আলী সাহেব স্নানাগারে পড়ে যান এবং ৯ই ফেব্রুয়ারির রাতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। পরদিন তাঁকে ঢাকার 'স্নাতকোত্তর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল'-এ স্থানান্তরিত করা হয়। জ্ঞান আর ফেরেনি। ১১ই ফেব্রুয়ারি, বেলা দশটা পঞ্চাশ মিনিটে ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময় জীবনলীলার পরিসমাপ্তি ঘটে। এবং সেইদিন রাতে তাঁকে ঢাকার পুরনো গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। আজীবন তিনি মাতৃভাষার সেবা করেছেন, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় ছিলেন অকুতোভয় অগ্রণী সৈনিক। মৃত্যুর পরও তাঁর অন্তিম শয্যা রচিত হয়েছে মহান ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদ আবুল বরকত ও শফিকুর রহমানের পার্শ্বে।

১৯৭৩-এর ৭ই জুলাই, 'দেশ' পত্রিকায় 'সনাতন পাঠক' 'আলী পরিবার'-এর পরিচয় দান করতে গিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন, "হাসন রাজার পর আমাদের কাছে রসের রাজা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজশেখর বসু এবং শহীদুল্লা—এই তিনজনের গুণাবলীর সংমিশ্রণে যে বিস্ময়কর লেখক—তিনিই মুজতবা।" অতঃপর তাঁর জিজ্ঞাসা ও প্রত্যাশা—"বড় দুই দাদার অনুসরণে সৈয়দ মুজতবা আলী নিজে একটি আত্মজীবনী কবে লিখবেন ? আমরা যে সেই দিনটির জন্য অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করছি।"—এই প্রত্যাশাকে অপূর্ণ রেখে—যা পূর্ণ করার সামান্যতম সম্ভাবনাকেও তিনি কখনো প্রশ্রয় দেননি—বাংলা সাহিত্যের 'পরমাশ্চর্য লেখক' অনন্তলোকে পাড়ি জমালেন।

সৈয়দ মুজতবা আলীর পরলোকগমনের সংবাদে বঙ্গভাষীজনমাত্রই আত্মীয় বিয়োগের যন্ত্রণায় কাতর হয়েছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ-সাংবাদিক এবং তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহী মরহূমের বাড়িতে সমবেত হন। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, পশ্চিম বঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শোকবাণীতে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার ভারতের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ঢাকার বাঙলা একাডেমী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, বিভিন্ন শিক্ষায়তন, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দল তাঁর মহাপ্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ ও আলোচনা সভার আয়োজন করেন। উভয় বঙ্গের পত্র-পত্রিকায় গুরুত্বের সঙ্গে এই শোকাবহ সংবাদটি পরিবেশিত হয়, প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় নিবন্ধ এবং মুজতবা স্মরণে বিশেষ সংখ্যায় নিবেদিত হয় গুণগ্রাহীদের শ্রদ্ধাঞ্জলি, ভালোবাসার অর্ঘ্য। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গুণীজন তাঁর মূল্যায়ন করেছেন। মুজতবা আলীর লোকান্তরে বিমূঢ় খ্যাতিম্যান সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুভূতি :

"...সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞানের জগতে ইন্দ্রপতন ঘটে যাচ্ছে। ঢাকা থেকে হঠাৎ ...খবর এলো, সৈয়দ মুজতবা আলী আর নেই।...

...পৃথিবীর কঠিনতম বিষয় নিয়ে লিখলেও তিনি সব সময় পাঠকদের খুব কাছাকাছি ডেকে আনতেন।

...এই মানুষটি একটা জীবনেই যেন অনেকগুলি জীবন কাটিয়ে গেছেন। ছন্নছাড়ার

মতন ঘুরেছেন বিভিন্ন প্রান্তে, পৃথিবীর অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, কিন্তু বাংলা ভাষার জন্যই যে তিনি সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।...

...সেই সময় এক একজন অচেনা লেখক অকস্মাৎ এসে রাজ্য জয় করেছিলেন—তাদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য চাপা পড়ে গেছেন যথাসময়ে—কিন্তু মুজতবা আলী চিরকালের জন্য থেকে গেলেন।"[৭] অকারণে কখনো কখনো আলী সাহেব বৈরী পরিবেশের মুখোমুখী হয়েছেন। অপ্রত্যাশিত লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় তাঁর সংবেদনশীল হৃদয় হয়েছে শোণিতাক্ত। এ-সমস্ত অবাঞ্ছিত হীনমন্যতার স্মরণে বেদনা-বিধুর 'শংকর'-এর অভিব্যক্তি :

"আরও মনে পড়ছে তাঁর (মুজতবা আলীর) প্রতি আমাদের নানা অমার্জনীয় অপরাধের কথা। বাঙালী পাঠকের অবিশ্বাস্য ভালবাসা তিনি লাভ করেছিলেন। একথাও সত্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পর ইদানীংকালের তিনি সর্বাপেক্ষা উদ্ধৃত (most quoted) লেখক। কিন্তু আকাদমী ও রবীন্দ্র পুরস্কারের সঙ্কীর্ণমনা মালিকগণ তাঁকে অবহেলা করে যে মহাপাপ করেছেন তার কোনো তুলনা নেই। বাংলা সাহিত্যের এই শ্লীলতাহানির জন্যে ভাবীকালের কাঠগড়ায় একদিন এই সব গুণী জ্ঞানী আচার্যগণকে জবাবদিহি করতে হবে।"[৮]

সৈয়দ মুজতবা আলীর সামান্য মূল্যায়নে আমরাও 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজো'র মহাজনী পন্থার আশ্রয় নেবো। 'যা দেখেছি যা শুনেছি'-র রম্যরচনাকার (প্রয়াত) শশিশেখর বসু সম্পর্কে আলী সাহেব যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আমরাও তাঁর সম্বন্ধে একই মত পোষণ করি। নিম্নের উদ্ধৃতাংশে শুধুমাত্র 'শশিশেখর'-এর স্থলে 'মুজতবা আলী' পাঠ করতে হবে :

"...ঐ এক ধরনের মানুষ হয় যাদের কোনো 'কাণ্ডজ্ঞান' নেই। কালোজাম কত রকমের হয়, বিধবারা হিং দেওয়া আলুর দম খান কি না খান, প্রসব বেদনায় কাতর বানরী কোন্ মুষ্টিযোগ ব্যবহার করে, আবার মিউটিনি কখন আরম্ভ হল, কি ভাবে আরম্ভ হল, ভারতের ইতিহাসে ঠিক কোন্ জায়গায় স্থান এ সব-কিছু জানতেই তাঁর উৎসাহ একই মেকদারে। ভদ্রলোক এটা বুঝলেন না, ফুটনোট কণ্টকিত বিরাট ভলুম না ছাড়লে 'সোনার বাঙলায়' কল্কে পাওয়া অসম্ভব।

...সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তিনি যে মাঝে মাঝে শশিশেখরের মত মাল ছাড়েন। আমি কালো জাম খেতে ভালোবাসি, বট়ীয়া ফরোঁদে কোথায় পাওয়া যায় শশিশেখর বাৎলে দিয়েছেন, আমি তাতেই খুশী, এবং আমার মত আর পাঁচ ভাই-বেরাদরও খুশী হবে। শশিশেখর 'গদরের' প্রামাণিক নিখিরকিচ ইতিহাস লিখলেন না বলে আদপেই শোকাতুর হব না।

কিন্তু এ সত্যও এই সুবাদে স্মরণ করি, পাণ্ডিত্যের লুকনো পুঁজি "না থাকলে কালোজাম সম্বন্ধে রসিয়ে লেখা যায় না।... বিদ্যেসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ সবাই পণ্ডিত ছিলেন। তাই পাতলামি না করেও মস্করা করতে পেরেছেন। শশিশেখর ঐ সব অতিকায় মানবদের শেষ সন্তান। তিনি বইখানা আমাদের হাতে রেখে আপন মনে মুচকি মুচকি হেসে চলে গিয়েছেন। আমার বিশ্বাস এই অতিকায় বংশ এঁর সঙ্গেই লোপ পেল।"[৯] —আমাদের বিবেচনায় এই ধারার সর্বশেষ প্রতিনিধি সৈয়দ মুজতবা আলীর তিরোধানে যথার্থ অর্থেই 'অতিকায় বংশ'-এর অবলুপ্তি ঘটলো। অনেকের আফসোস—

"সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলতেন, মুজতবা আলী তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে প্রচণ্ড গবেষক হতে পারতেন, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে সার্থক অন্বেষণ চালাতে পারতেন, ভারতীয় ইতিহাসের অনুদ্‌ঘাটিত দিক উন্মোচন করতে পারতেন কিন্তু কিছুই করেননি। শুধু ব্যঙ্গ-রসিকতায় নির্বাসন নিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করলেন।"[১০] কিন্তু আমরা মহাখুশী ধূম্র-মদ্য-মৎস্য-এসপেরেগাস-কাসুন্দোর স্বাদ গ্রহণ করে, পাবে-কফিখানায় আড্ডা জমিয়ে এবং তারই অবকাশে সাবিত্রী, বেণীমাধব, পণ্ডিতমশাই, সমীরুদ্দী, মাটিল্‌ডে, হেলেনা, সিবিলা, কোদণ্ড মুখহানা, আম্বরউল্লা, উইলি, অস্কার, টেরেমের খাণ্ডারনী সহধর্মিণী প্রমুখের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। সে-সঙ্গে স্মরণযোগ্য, পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে দরাজ্ দিল্ এবং সহানুভূতির দৃষ্টির অভাবে এরা অনাবিষ্কৃতই থেকে যেতো।

সৈয়দ মুজতবা আলীর উদ্দেশে উভয় বঙ্গের শোকার্ত মানুষ তাঁদের অন্তরনিঃসৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। শোকসভার আয়োজনও হয়েছে। আলী সাহেব সম্ভবতঃ দু'-একটি ঘটনা উপলক্ষে অলক্ষ্যে থেকে তাঁরই একটি লেখা স্মরণে এনে মৃদু মৃদু হাসছেন। 'ভূতনাথ এবং তস্য বন্ধু মদনগোপাল' পরোপকারার্থে নিমতলা-কেওড়াতলায় গমনাগমনের সঙ্গে সঙ্গে 'গঞ্জিকাসক্ত'ও হয়ে পড়ে। গুরুজনদের ভর্ৎসনা এবং সহৃদয়তায় তারাও নির্বাক প্রতিশ্রুতি দিলো 'পালা-পার্বণে, অবরে-সবরে' 'কিঞ্চিৎ সম্মার্গভ্রষ্ট' হলেও ও-পথে নিত্য নয়। অতঃপর "গৃহের দেহলি প্রান্তে গোধূলি লগ্নে ভূতনাথ এবং মদনগোপাল নির্জীবের মত পড়িয়া আছে। গঞ্জিকালগ্ন গতপ্রায়—ধূম্ররস না পাইয়া উভয়ই অতিশয় বিরসবদন। কিন্তু উপায়ান্তরই বা কি ? গুরুজনকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে, পালাপার্বণ ব্যতীত গঞ্জিকারসে নিমজ্জিত হইবে না।

হঠাৎ রোদনধ্বনি শোনা গেল। মদনগোপাল তৎক্ষণাৎ সংবাদ নিতে প্রস্থান করিল। মুহূর্তেক মধ্যেই দ্রুতগতিতে প্রত্যাগমন করিয়া চিৎকার করিল, ওরে ভূতো, ঝপ্ করিয়া একটা চিলিম সাজো। চুনীর মাতা গত হইয়াছেন।

ভগবান দয়াময়। পালা-পার্বণের সন্ধানে থাকিলে চুনীর মাতার মৃত্যুও পালারূপেই গণ্য করা যাইতে পারে।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শান্তিনিকেতনে 'যে আড্ডার ট্রাডিশনটি গড়ে দিয়েছিলেন' স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার্থীরা পরবর্তী জীবনেও তা থেকে বড় একটা বিচ্যুত হননি। 'আড্ডা জিনিসটা এঁদের প্রতিভায় অনেকখানি পুষ্টি জুগিয়েছে। আবার আড্ডার বেলায় সৈয়দ এঁদের সকলকে ছাড়িয়ে।"[১২] অনর্গল আলাপচারীর মধ্য দিয়ে অননুকরণীয় ভঙ্গীতে তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে হাল্‌কা লঘু চালে অন্যের মধ্যে এমনভাবে সঞ্চারিত করেছেন যে, কেউ টেরও পেতো না, তাঁর সাহচর্যে জ্ঞানরাজ্যের দিগন্ত অলক্ষ্যে কতোখানি প্রসারিত হয়ে গেলো। মনের বদ্ধ জানালাগুলো অনর্গল করে বিমল আলো-হাওয়ায় আমাদের চিত্তলোক প্রাণবন্ত এবং কলুষমুক্ত করার আপ্রাণ প্রয়াস আলী সাহেবের বচন ও রচনার মূল উদ্দেশ্য। বহু তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, বহু দেশী-বিদেশী চরিত্রকে "এমন অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন যে চোখের পলকে তারা আমাদের আপনজন হয়ে উঠেছে, আমরা নিঃসংশয়ে জেনেছি যে ভাষা ও পোষাকের পার্থক্যে কিছুই এসে যায় না, মানুষের গভীর পরিচয় অন্যত্র নিহিত।"[১৩] এমন প্রচ্ছন্ন শিক্ষক বড় বিরল। শান্তিনিকেতনে, বার্লিনের হিন্দুস্থান হৌসে, কি, 'বন্'-এর পাবে-

পানশালায়, কিংবা তাঁর নিজস্ব ডেরায় নিরলস অবিরাম কথার মালা গেঁথেছেন, ফুলঝুরি ছড়িয়েছেন। পরলোকেও যদি ত্রি-মকার—মদ্য-মহিলা-মজলিশের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সৈয়দ মুজতবা আলী সে-লোকেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপ্রতিরোধ্য!

স্বজন-স্বভাষী-স্বদেশী কোনো মহল বা মুষ্টিমেয় জন তাঁর ব্যক্তি-মানস কখনো কখনো অহেতুক অবাঞ্ছিত আঘাতে শোণিতাক্ত করলেও মুজতবা ছিলেন সমগ্র বঙ্গভাষী জনের মনের মানুষ, আপন মানুষ, তাঁর মজলিশের অনুরক্ত সদস্য এবং এঁদের সকলের কণ্ঠেই যেন 'বনফুল'-এর প্রত্যয় ও প্রত্যাশা প্রতিধ্বনিত :

"শুধু জানি এই বাংলাদেশেই
রসিকদের হৃদয়স্বর্গের খুব উঁচু থাকে
রাখবে তারা তাদের মুজতবাকে।"[১৪]

তথ্য-নির্দেশ

১. শংকর : তুলনাহীন মুজতবা আলী , দেশ, ১৩এপ্রিল,১৯৭৪, পৃ. ৮৪৩।

২. পত্রাবলী : সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪।

৩. চাচাকাহিনী : দেশ, ২মার্চ, ১৯৭৪।

৪. লীলা মজুমদার : সৈয়দ মুজতবা আলি, অমৃত, ১৩ ফালগুন, ১৩৮০, পৃ. ১২।

৫. সৈয়দ মুর্তাজা আলী : মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ১৯।

৬. রশীদ করীম : ব্যতিক্রম ব্যক্তিত্ব সৈয়দ মুজতবা আলী, দৈনিক বাংলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪।

৭. সনাতন পাঠক (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) : সাহিত্য সংবাদ, দেশ, ২ মার্চ, ১৯৭৪, পৃ. ৩৫৯-৬০।

৮. তুলনাহীন মুজতবা আলী, দেশ, ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৪, পৃ. ৮৪৩।

৯. দেশ, পুস্তক পরিচয়, ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭, পৃ. ১২১।

১০. সৈয়দ আলী আহসান : সৈয়দ মুজতবা আলী সম্পর্কে, বই, অক্টোবর, ১৯৮১, পৃ. ১।

১১. রায়পিথৌরার কলমে : সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৫০।

১২. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত : সৈয়দ মুজতবা আলী, দেশ, ৬ মার্চ, ১৯৭৪, পৃ.৫১৪-১৫।

১৩. ইন্দ্রমিত্র : আরেক পঞ্চতন্ত্র, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭৬, পৃ. ১৮৫-৮৯।

১৪. বনফুল : 'সৈয়দ মুজতবা আলির মৃত্যুতে', অমৃত, ১৭ ফালগুন, ১৩৮০, পৃ. ১১।

পরিশিষ্ট–ক

ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য যাঁদের সাক্ষাৎকার নে'য়া হয়েছে

ক্রমিক নং	নাম ও পেশা	সম্পর্ক	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ
১.	(প্রয়াতা) সৈয়দা হিফজুন্নেসা খানম	ভগ্নি	২রা আগষ্ট, ১৯৮৩
২.	সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন, গৃহবধূ	ঐ	১৩ই আগস্ট, '৮৩
৩.	সৈয়দা জেবুন্নেসা খাতুন,গৃহবধূ	ঐ	২৮শে জুলাই ও ১লা আগস্ট, '৮৩
৪.	সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন,গৃহবধূ	ঐ	২৩ শে জুলাই, '৮৩
৫.	জনাব সোলায়মান চৌধুরী, ব্যাঙ্কার	ভাগিনেয়	২রা আগস্ট, '৮৩
৬.	(প্রয়াত) আবু সয়ীদ মাহমুদ, ব্যবসায়ী	ঐ	৯ই আগস্ট, '৮৩
৭.	মিসেস সালমা চৌধুরী, অধ্যাপিকা	ভাগিনেয়ী	২৩ শে জুলাই, '৮৩
৮.	জনাব আবদুল কাদের, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা	ভাগিনেয়	২২ শে জুলাই, '৮৩
৯.	সৈয়দ মশাররফ আলী, ব্যাঙ্ক–অফিসার	পুত্র	১৮ই নভেম্বর, '৮৩ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী, '৮৪
১০.	(প্রয়াত) অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	আত্মীয়	১১ই জুলাই, '৮৩
১১.	এড্ভোকেট সয়ফুল আলম খান	বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী	২৯শে জুলাই, '৮৩
১২.	জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা	অনুজতুল্য	২৯শে জুলাই, ;৮৩
১৩.	(প্রয়াত) আমীনুর রশীদ চৌধুরী, প্রাক্তন সম্পাদক, সাপ্তাহিক যুগভেরী, সিলেট	আত্মীয় ও বন্ধু	২৮শে জুলাই, ১৯৮৩
১৪.	মিসেস ফাহ্মিদা চৌধুরী, সংবাদপত্রসেবী	ঐ	২৯শে জুলাই, '৮৩
১৫.	(প্রয়াত) মুহম্মদ নূরুল হক, সম্পাদক, মাসিক আল্-ইসলাহ্, সিলেট	পরিচিত	২৮শে জুলাই, '৮৩
১৬.	ডঃ প্রীতীশচন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক	সহকর্মী	৫ই জুলাই, '৮৩
১৭.	(প্রয়াত) অধ্যাপক আবুল খায়ের আহমদ	সহকর্মী	২১শে জুলাই, ১৯৮৩
১৮.	(প্রয়াত) ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার, প্রাক্তন অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্র	১৫ই ফেব্রুয়ারি, '৮৩
১৯.	সৈয়দ মহবুব আলী	ভ্রাতুষ্পুত্র	২৪শে ফেব্রুয়ারি, '৮৩
২০.	(প্রয়াত) আবদুল মতিন, কার্যনির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক উত্তরবার্তা, বগুড়া	ছাত্র	৬ই আগস্ট, '৮৩
২১.	জনাব জালালউদ্দীন আকবর, প্রধান শিক্ষক, বগুড়া পৌর উচ্চবিদ্যালয়, বগুড়া	ঐ	৫ই আগস্ট, '৮৩
২২.	অধ্যক্ষ আবদুল ওয়াদুদ	সহকর্মী	১২ই আগস্ট, '৮৩
২৩.	(প্রয়াত) অন্নদাশঙ্কর রায়, সাহিত্যিক	বন্ধু	২৫শে ডিসেম্বর, '৮৩
২৪	(প্রয়াত) সাগরময় ঘোষ, সম্পাদক, সাপ্তাহিক দেশ	অনুজপ্রতিম	২৪শে জানুয়ারি, ১৯৮৪
২৫.	(প্রয়াত)গৌরকিশোর ঘোষ, সাহিত্যিক-সাংবাদিক	অনুজপ্রতিম	১৯শে জানুয়ারি, '৮৪

ক্রমিক নং	নাম ও পেশা	সম্পর্ক	সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ
২৬.	শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী, প্রাক্তন বার্তা সম্পাদক, দৈনিক যুগান্তর (কলকাতা)	অনুজপ্রতিম	১৬ জানুয়ারি, '৮৪
২৭.	(প্রয়াত) কানাইলাল সরকার, সংবাদপত্রসেবী	বন্ধু	৩১শে জানুয়ারি, '৮৪
২৮.	(প্রয়াত) প্রমথনাথ বিশী, সাহিত্যিক-সমালোচক	অগ্রজতুল্য	১৩ ই জুন, '৮৩
২৯.	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক, সাহিত্যিক-সমালোচক	সহকর্মী ও বন্ধু	৫ই আক্টোবর, '৮৩
৩০.	শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কবি-সাংবাদিক	অনুজতুল্য	২৭শে ফেব্রুয়ারি, '৮৪
৩১.	(প্রয়াত) সন্তোষ ঘোষ, সাহিত্যিক-সাংবাদিক	ঐ	৩রা জানুয়ারি, '৮৪
৩২.	(প্রয়াত) মনোজ বসু, সাহিত্যিক	বন্ধু	৩রা জানুয়ারি, '৮৪
৩৩.	জনাব আবুল হোসেন, কবি	ঐ	১৮ই জুলাই, '৮৩
৩৪.	(প্রয়াত) পুলিন বিহারী সেন, রবীন্দ্রবিশারদ	বন্ধু	২৩শে অক্টোবর, '৮৩
৩৫.	(প্রয়াত)গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সাহিত্যিক ও প্রকাশক	পরিচিত	৬ই জুলাই, '৮৩
৩৬.	(প্রয়াতা) অর্চনা মিত্র, লেখিকা	কন্যাস্থানীয়া	১৭ই জানুয়ারি, '৮৪
৩৭.	(প্রয়াত) নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	বন্ধু	৬ই অক্টোবর, '৮৩
৩৮.	(প্রয়াতা) গৌরী আইয়ুব, অধ্যাপিকা-লেখিকা	বন্ধু-পত্নী	১লা সেপ্টেম্বর, '৮৩
৩৯.	শ্রীক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন (কঙ্কর সেন)	অনুজতুল্য	১০ই অক্টোবর, '৮৩
৪০.	বিচারপতি এস. এ. মাসুদ	বন্ধু	২৫শে অক্টোবর, '৮৩
৪১.	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক	লেখক-প্রকাশক	৪ঠা জানুয়ারি, '৮৪
৪২.	শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক	ঐ	ঐ
৪৩.	শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আকাশবাণী	অনুজপ্রতিম	৩রা নভেম্বর, '৮৩
৪৪.	শ্রীসোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্মচারী, কোলকাতা কর্পোরেশন	ভক্ত	৮ ও ১৪ই জানুয়ারি ২৮শে অক্টোবর, '৮৪
৪৫.	শ্রীদ্বারিকানাথ মিত্র	পুত্রতুল্য ও ভক্ত	৬ই মে, '৮৪
৪৬.	ডঃ পূরবী রায়, অধ্যাপিকা	বন্ধু-কন্যা	২৩শে আগস্ট, '৮৪
৪৭.	ডাঃ মোহাম্মদ আবদুল ওয়ালী চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ	ভক্ত	২১শে অক্টোবর, '৮৪
৪৮.	(প্রয়াত)পশুপতি খান	ভক্ত	১৮ই জানুয়ারি, '৮৪
৪৯.	ডাঃ দিলীপ বসু, চিকিৎসক	ঐ	২রা সেপ্টেম্বর, '৮৪
৫০.	শ্রীরীতিন বাগ্‌চি (ঘন্টুদা)	ঐ	৯ই জানুয়ারি, '৮৪
৫১.	শ্রীমতী বীণাপাণি চৌধুরী (শান্তিনিকেতন)	পরিচিতা	৬ই অক্টোবর, '৮৩
৫২.	মিসেস সালেহা গনী,	বাড়ির মালিক	২রা সেপ্টেম্বর, '৮৩
৫৩.	জনাব শেখ দিল্‌জান্ (কাটু)	পরিচারক	৬ই অক্টোবর, '৮৩
৫৪.	জনাব মোঃ জামিল	ঐ	২রা সেপ্টেম্বর, '৮৩
৫৫.	(প্রয়াত) আবদুল মওদুদ (গোলাপ)	পরিচিত	২৪শে অক্টোবর, '৮৩
৫৬.	শ্রীঅনিল দাস	ভক্ত	২৭শে নভেম্বর, '৮৪
৫৭.	শ্রীকুমারকৃষ্ণ রায়, মালিক, নিউ লাইফ নার্সিং হোম	—	২১শে অক্টোবর, '৮৪
৫৮.	ডা সমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, চিকিৎসক এবং মেরীল্যান্ড নার্সিং হোমের মালিক	গুণগ্রাহী	১০ই অক্টোবর, '৮৪
৫৯.	শ্রীযোগানন্দ গুপ্ত (নসু গুপ্ত)	পরিচিত	৩০শে আগস্ট, '৮৪

পরিশিষ্ট—খ

সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা, সৈয়দ মুজতবা আলীকে লেখা এবং মুজতবা আলী সংক্রান্ত লেখা পত্রাবলী

পত্র সংখ্যা	পত্রদাতার নাম
১-৩০	শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী
৩১-৬১	শ্রীসোমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৬২-১০৬	(প্রয়াতা) সাগরময় ঘোষ
১০৭-১২২	শ্রীমতী সুলেখা দাশগুপ্ত
১২৩-১২৯	(প্রয়াত) পশুপতি খান
১৩০-১৩২	(প্রয়াতা) অর্চনা মিত্র
১৩৩-১৩৮	এডভোকেট সয়ফুল আলম খানকে লিখিত এবং শ্রীসুনির্মল কুমার দেব, মীন-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।
১৩৯-১৪২	(প্রয়াতা) গৌরী আইয়ুব
১৪৩-১৪৬	(প্রয়াত) আমীনুর রশীদ চৌধুরী
১৪৭-১৫১	শ্রীসমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
১৫২-১৫৪	শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
১৫৫,১৫৫ক,১৫৬	ডাঃ দিলীপ বসু
১৫৭	শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১৫৮-১৬০	সৈয়দা জেবুন্নেসা খাতুন (মাখন্নুআই)
১৬১-১৬৮	সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন (খাতুন বুবাই)
১৬৯-১৭২	জনাব সোলায়মান চৌধুরী
১৭৩-১৮১	অধ্যাপিকা সালমা চৌধুরী
১৮২-১৮৩	অধ্যাপিকা আসমা আব্বাসী
১৮৪-১৮৭	ডাঃ এম. এ. ওয়ালি
১৮৮-১৮৯	(প্রয়াত) নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
১৯০	সৈয়দ মহবুব আলী
১৯১-২১০	সৈয়দ মশাররফ আলী (ফিরোজ)
২১১-২১৪	(প্রয়াত) আবদুল মওদুদ (গোলাপ)
২১৫-২১৯.০৯	ব্যক্তিগতভাবে আমাকে লেখা
২২০	(প্রয়াত) ডঃ মমতাজুর রহমান তরফদার
২২১-২২৯.০২	বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সৈয়দ মুজতবা আলীর এবং মুজতবা আলী সংক্রান্ত পত্রাবলী
২৩০-২৫২	বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগার'-এ সংরক্ষিত (প্রয়াত) অমলেন্দু সেনকে লেখা ডঃ আলীর পত্রাবলী
২৫৩-২৫৭	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা এবং ডঃ হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত পত্রাবলী
২৫৮	শ্রীগুণদা মজুমদার
২৫৯-২৬২	শ্রীঅংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৬৩-২৭২	শ্রীঅনিল দাস
২৭৩-২৭৪	শ্রীমতী রূপা রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত
২৭৫-২৭৬	(প্রয়াত) সলিল ঘোষ
২৭৭-২৮২	শ্রীমলয় সরকার
২৮৩	শ্রীশঙ্কু মহারাজ

পরিশিষ্ট—গ

সাহায্যকারী গ্রন্থ ও গ্রন্থকার এবং ব্যবহৃত পত্র-পত্রিকা

গ্রন্থকার	গ্রন্থ
শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী	শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত (পূর্ব্বাংশ ও উত্তরাংশ)
আবদুল ওয়াহাব চৌধুরী	সৈয়দ মুজতবা আলির সাহিত্য প্রসঙ্গে (১৯৬৯)
আহমদ শরীফ	বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড (১ম প্রকাশ), বিচিত চিন্তা (২য় মুদ্রণ, ১৯৭৫)
ডঃ ওয়াকিল আহমদ	উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, ১ম খণ্ড (১ম প্রকাশ)
খোন্দকার সিরাজুল হক	মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম (১ম প্রকাশ)
দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী	জালালাবাদের কথা (১৯৮৩)
পরিমল গোস্বামী	পত্রস্মৃতি (১৯৭১)
	স্মৃতিচিত্রণ, ২য় পর্ব (১ম প্রকাশ)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী (১ম খণ্ড)
বদরুদ্দীন উমর	সংস্কৃতির সংকট, (১ম প্রকাশ)
	সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা (১ম প্রকাশ)
বিপিনচন্দ্র পাল	সত্তর বৎসর, আত্মজীবনী (১ম প্রকাশ)
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত (১ম প্রকাশ)
সাগরময় ঘোষ	সম্পাদকের বৈঠকে (১ম প্রকাশ)
শ্রীসাধনা কর	শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায় (১ম প্রকাশ)
সৈয়দ আবদুল আগফর	তরফের ইতিহাস (১ম প্রকাশ)
সৈয়দ মুজতবা আলী	রচনাবলী
সৈয়দ মুর্তাজা আলী	আমাদের কালের কথা (১ম প্রকাশ)
	মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১ম প্রকাশ)
	হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস
সৈয়দ মোস্তফা আলী	আত্মকথা (১ম প্রকাশ)
Govt. of Assam	Assam District Gazetteers, Vol. II
Govt. of Baroda	Baroda Administrative Report: 1935-36; 1936-37; 1937-38; 1938-39; 1939-40; 1940-41 & 1941-42
Robert Lindsay	Oriental Miscellanies : Anecdotes of an Indian Life (1840)
University of Calutta	Service Register of the University of Calcutta.
Sudhirkumar Dasgupta	Pakistan and Self-Determination (1946)
Sunitikumar Chatterjee	Languages And Literatuers of Modern India (1962)
	The Calcutta Gazette, June 17, 1926 (Part IB)
W. W. Hunter	A Statistical Account of Assam, Vol. 2

পত্র-পত্রিকা

অমৃত, সাপ্তাহিক (কোলকাতা) : ফাল্গুন, ১৩৮০
আজাদ, দৈনিক (ঢাকা) : ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
আনন্দবাজার পত্রিকা, দৈনিক (কোলকাতা) : ১২মে, ১৯৬৯; ১২ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
এবং ৬ নভেম্বর, ১৯৮৪
আল্-ইস্লাহ্, মাসিক (সিলেট) : ভাদ্র, ১৩৪৭
ইত্তেফাক, দৈনিক (ঢাকা) : ১ ফাল্গুন ১৩৮০
কথাসাহিত্য, মাসিক (কোলকাতা) : মাঘ, ১৩৬৬; জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ এবং
শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০
কম্পাস, পাক্ষিক (কোলকাতা) : ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
কালান্তর, মাসিক (কোলকাতা) : কার্তিক, ১৩৫৫
কৃত্তিবাস, অনিয়মিত (কোলকাতা) : বিশেষ বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৮০
জলসা, মাসিক (কোলকাতা) : শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৫
দেশ, সাপ্তাহিক (কোলকাতা) : সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৯ ও ১৩৯১; ২, ৬ ও ২৩ মার্চ, ১৯৭৪;
৬ ও ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৪; ১১ ও ২৫ মে, ১৯৭৪,
১৮ ফাল্গুন ও ৯ চৈত্র, ১৩৮০; ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪;
১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ এবং ১১ আগস্ট, ১৯৮৪
পূর্বদেশ, দৈনিক (ঢাকা) : ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
প্রবাসী, মাসিক (কোলকাতা) : শ্রাবণ, ১৩৩৩
বই (ঢাকা) : অক্টোবর, ১৯৮১
বগুড়া আজিজুল হক কলেজ ম্যাগাজিন (বগুড়া), ১৯৪৯
বসুমতী, দৈনিক (কোলকাতা) : ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
বসুমতী, মাসিক (কোলকাতা) : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩
বাংলা, দৈনিক (ঢাকা) : ১২ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
বিভাব, অনিয়মিত (কোলকাতা) আশ্বিন, ১৩৮৭ এবং শারদ সংখ্যা, ১৩৮৮
বিশ্বভারতী পত্রিকা : কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৬
বেগম, সাপ্তাহিক (ঢাকা) : ৩১ আগস্ট, ১৯৭৫
যুগান্তর, দৈনিক (কোলকাতা) : ২৪ অক্টোবর, ১৯৬৪ এবং ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪
শাশ্বত, বার্ষিক (সিলেট) : মৌলবীবাজার মহকুমা সমিতি স্মরণিকা, ১৯৮১ এবং ১৯৮৩

পরিশিষ্ট - ঘ

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত, বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর বর্ণানুক্রমিক তালিকা

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
অটোপ্রমোশন	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	বেতার বাংলা	ঈদ সংখ্যা, ১৩৭৯
অদৃষ্টের রঙ্গরস	দু-হারা	আনন্দবাজার	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭২
'অদ্যাপিও সেই খেলা—'	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	৫ কার্তিক, ১৩৭২
অনাদিদেব! অনন্তভব! শতংজীব সহস্রং জীব!!	গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	ইন্দিরা সঙ্গীত শিক্ষায়তন স্মারক গ্রন্থ	—
অনুকরণ না হনুকরণ?	চতুরঙ্গ / হাস্যমখুর	—	—
অনুবাদ সাহিত্য			
অনুবাদ সাহিত্য	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	৭ আগস্ট, ১৯৬৫
অর্পণার পারণা বা স্যালাড	বড়বাবু	উল্টোরথ	ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩
অপ্রকাশিত পত্রাবলী	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	—	—
অবনীন্দ্রনাথ	ঐ	—	—
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ময়ূরকণ্ঠী / গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	দেশ	১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫১
অবিশ্বাস্য	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৫ম খণ্ড	দেশ	৭ নভেম্বর, ১৯৫৩ থেকে ৩ এপ্রিল, ১৯৫৪
'অভাবে শয়তানও মাছি ধরে খায়'	রাজা উজীর	দেশ	২৪ ভাদ্র, ১৩৭৩
অভিধান পাঠ	—	দেশ	২৪ ফেব্রুয়ারি,১৯৫১
অর্থং অর্থং	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	৬ নভেম্বর, ১৯৬৫
অর্থমর্থম	রাজা উজীর	দেশ	২৬ শ্রাবণ, ১৩৭৪
অল্-মসজিদ্-উল্-আক্সা	কত না অশ্রুজল	দেশ	২৭ ভাদ্র, ১৩৭৬
অল্পে তুষ্ট	রাজা উজীর	দেশ	১৭ ও ২৪ কার্তিক এবং ১ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪
অশ্রুসিক্ত সিন্ধুবারি	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	বেতার বাংলা	জুলাই, ১৯৭৩, ২৪ ও ৩১ মার্চ এবং
অ্যার ট্রাভেল ('সপ্তপর্ণী' কলামে প্রকাশিত)	ধূপছায়া	আনন্দবাজার	৭ এপ্রিল, ১৯৫৩

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন	চতুরঙ্গ/ গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	দেশ	২৬ মার্চ, ১৯৬০
আঁদ্রে জিদ	রাজা উজীর	দেশ	১৪ আশ্বিন, ১৩৭৩
আচার্য তুচ্চি	ময়ূরকণ্ঠী/গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	—	—
আচার্য তেজেশচন্দ্র সেন	ভবঘুরে ও অন্যান্য/ গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	দেশ	১৩ আগস্ট, ১৯৬০
আজব শহর কলকেতা	পঞ্চতন্ত্র	—	—
আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের সমর-সঙ্গীত	ময়ূরকণ্ঠী	দেশ	১০ নভেম্বর, ১৯৪৫
আড্ডা	রাজা উজীর/পঞ্চতন্ত্র/ সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	দেশ	২০ মে, ১৯৬৭
আড্ডা	—	দেশ	১২ ও ১৯ মে, ১ ও ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১
আড্ডা-তামাক	—	দেশ	২৬ মে. ১৯৫১
আড্ডা-পাসপরট্	রাজা উজীর	দেশ	৩ জুন, ১৯৬৭
আত্মজীবনী লেখার প্রচেষ্টা	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	—	—
আধ পাগল×২ =পুরো পাগল	হাস্যমধুর	আল্-ইসলাহ	বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৭২
‘আধুনিক’ কবিতা	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	১৮ ভাদ্র, ১৩৭২
আধুনিকা	ঐ	দেশ	২০ নভেম্বর, ১৯৬৫
আধুনিকের আত্মহত্যা	কত না অশ্রুজল/ দু-হাঁরা	কথাসাহিত্য	পৌষ, ১৩৭২
আন্ ফ্রাঙ্ক	কত না অশ্রুজল	দেশ	১৭, ২৪ ও ৩১মে, ১৯৬৯
আনিকি পাসিকিভি	পঞ্চতন্ত্র	দেশ	৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
আন্তন চেখফের “বিয়ের প্রস্তাব”	টুনি মেম/ হাস্যমধুর	উল্টোরথ	জানুয়ারী, ১৯৬৩
আফগান ইতিহাসের মদনাঙ্ক	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	দেশ	পূজা সংখ্যা, ১৯৪৫
আফগান দাবী (‘বৈদেশিকী’ নামে প্রকাশিত)	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	মাতৃভূমি	আষাঢ়, ১৩৫৫
আব্দুর রহমান	সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	—	—

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
আবার আবার সেই কামান গর্জন!	রাজা উজীর/হিটলার	এলোমেলো	শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৫
আমরা হাসি কেন ?	ময়ূরকণ্ঠী	—	—
আমার ভাণ্ডার আছে ভরে	পঞ্চতন্ত্র	—	—
আরব্য-রজনীর অরুণোদয়	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	আনন্দবাজার	১৯ ও ২২ জুলাই, ১৯৫৮
আর্ট না অ্যাকসিডেন্ট	চতুরঙ্গ	দৈনিক বসুমতী	নববর্ষ সংখ্যা, ১৩৬৭
আলবের্ট শোয়াইৎসার্	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫
আসা-যাওয়া	ধূপছায়া	—	—
আহারাদি	পঞ্চতন্ত্র/ সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	—	—
ইয়োরোপ ও রবীন্দ্রনাথ	গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	আনন্দবাজার	৮ মে, ১৯৬১
ইঙ্গ-ভারতীয় কথোপকথন	ময়ূরকণ্ঠী/ সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	আনন্দবাজার	৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫
ইংরেজী বনাম মাতৃভাষা ('সপ্তপর্ণী' কলামে প্রকাশিত)	ধূপছায়া	আনন্দবাজার	১০, ১৭ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩
'ইজরায়েল বিশ্বের প্রবাদ-সত্য রূপে গণ্য হবে'	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	২৩ এপ্রিল, ১৯৬৬
ইয়োরোপে ভারতীয় শাস্ত্র-চর্চা ('সপ্তপর্ণী' কলামে প্রকাশিত)	পঞ্চতন্ত্র	দেশ	১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১
ইন্টারভ্যু	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	১৩ কার্তিক, ১৩৭২
ইতিহাস পাঠ	—	আনন্দবাজার	২৮ জুন, ১৯৪৬
ইতিহাস ও ভাষা	—	দেশ	১২ চৈত্র, ১৩৭২
ইন্দ্রলুপ্ত	ময়ূরকণ্ঠী	চতুরঙ্গ	কার্তিক, ১৩৫৫
ইভান সের্গেভিচ তুর্গেনেফ	চতুরঙ্গ	আনন্দবাজার	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৫
ইরান	—	আনন্দবাজার	১৪ জুন, ১৯৪৬
ইরানের অত্যধিক আদবকায়দা	বহুবিচিত্র	—	—
ইরান-আফগান-পাকিস্তান	—	কথাসাহিত্য	শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
ইরানে দাম্পত্য প্রেম	হাস্যমধুর	—	—
ইস্কিলাস-শেলি-স্পিটলার	পঞ্চতন্ত্র	—	—
ইয়োরোপে ভারতীয় শাস্ত্র-চর্চা ('পঞ্চতন্ত্র' কলামে প্রকাশিত)	পঞ্চতন্ত্র	দেশ	১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১
ঈদ-আনন্দোৎসব	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	বেতার বাংলা	১৬ অক্টোবর, ১৯৭৩
'ঈস্ট ইজ ঈস্ট্ অ্যান্ড্ —'	রাজা উজীর	দেশ	২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪
উইন্টারনিৎস্কৃত কবি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন	—	দেশ	৫ মে, ১৯৬২
উচ্চারণ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	আনন্দবাজার	১৬ নভেম্বর ও ২১ ডিসেম্বর,১৯৪৫
উচ্ছে ভাজা সন্দেশ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	আনন্দবাজার	২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১
উনো, হিন্দী, ক্রিকেট	ধূপছায়া	—	—
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — নির্বাসিতের আত্মকথা	ময়ূরকণ্ঠী	দেশ	১৭ ও ২৪ নভেম্বর এবং ১ ডিসেম্বর ১৯৫১
উভয় বঙ্গে—আধুনিক গদ্য কবিতা	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড	দেশ	১৯ ফালগুন, ১৩৭৯
উভয় বাঙলা— অকস্মাৎ নিবিল দেউটি দীপ্ততেজা রক্তস্রোতে	ঐ	ঐ	১৫ বৈশাখ, ১৩৮০
উভয় বাঙলা— গজভুক্ত পিণ্ডিবৎ	ঐ	ঐ	২৪ চৈত্র, ১৩৭৯
উভয় বাঙলা— নীলমণি	ঐ	ঐ	৩ চৈত্র, ১৩৭৯
উভয় বাঙলা— পুস্তকসেতুভঙ্গ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড	ঐ	১২ ফালগুণ, ১৩৭৯
উভয় বাঙলা— ফুরায় যা দে রে ফুরাতে	ঐ	ঐ	৮ বৈশাখ, ১৩৮০
উভয় বাঙলা— বর্বরস্য পূর্বরাগ	ঐ	ঐ	৫ ফালগুণ ১৩৭৯
উভয় বাংলা— বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা	ঐ	ঐ	২২ বৈশাখ, ১৩৮০

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
উভয় বাংলা — বিস্‌মিল্লায় গলৎ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড	দেশ	২৭ মাঘ, ১৩৭৯
উভয় বাঙলা — রিপ্‌ভান উইঙ্কল্‌	ঐ	ঐ	২০ মাঘ, ১৩৭৯
উভয় বাঙলা — শত্রুর তূণীর মাঝে খোঁজো বিষবাণ	ঐ	ঐ	১৭ চৈত্র, ১৩৭৯
উভয় বাঙলা — সদাই হাতে দড়ি, সদাই চাঁদ	ঐ	ঐ	২৬ ফালগুন, ১৩৭৯
উভয় বাঙলা — স্বর্ণসেতু রবীন্দ্রসঙ্গীত	ঐ/ গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	ঐ	১ বৈশাখ, ১৩৮০
বাঙলা— "হুজ্জৎ -ই- বাঙ্গাল"	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড	ঐ	১০ চৈত্র, ১৩৭৯
উমেদারী	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	কালি ও কলম	ফালগুন, ১৩৭৫
উল্‌টা-রথ	টুনি মেম	—	—
ঋতালী	ময়ূরকণ্ঠী / শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	—	—
'এ তো মেয়ে নয়—'	ময়ূরকণ্ঠী	জলসা	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৫
A Letter From India	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	—	—
এক ঝাণ্ডা ('পঞ্চতন্ত্র' কলামে প্রকাশিত)	টুনি মেম	দেশ	২৯ ডিসেম্বর,১৯৬২
এক পুরুষ	টুনি মেম / পছন্দসই	—	—
এক বচন বহু বচন কালেকটিভ নাউন্‌	—	দেশ	৫ চৈত্র, ১৩৭২
একটি অনমিত নাম বনবিহারী মুখোপাধ্যায়	দু-হারা	যুগান্তর	শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭২
একদা যাহার বিজয় সেনানী	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	মাসিক বসুমতী	—
এ-পার গঙ্গা ও-পার গঙ্গা	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	দৈনিক সত্যযুগ	—
এমেচার ভার্সস স্পেসালিস্ট	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
এষাস্য পরমা গতি ?	—	দেশ	২৮ জুলাই, ১৯৪৫

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
এষাস্য পরমাগতি	ময়ূরকণ্ঠী	দেশ	২৪ চৈত্র, ১৩৫৭
এ্যান্‌ড্‌রুজ সাহেব	গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	—	—
এ্যার-ইণ্ডিয়া (রচনাবলীর ৮ম খণ্ডে সংকলিত 'বিদেশে'র ১ম কিস্তি)	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড	দেশ	৩০ জানুয়ারি, ১৯৭১
এ্যারোপ্লেন	বড়বাবু	—	—
ঐতিহাসিক উপন্যাস	পঞ্চতন্ত্রম,২য় পর্ব	দেশ	২৫ আষাঢ়, ১৩৭২
ঐতিহ্য	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	দৈনিক বসুমতী	—
ও ঘাটে যেও না বেউলো	টুনি মেম	—	—
ওয়ার এম্‌	টুনি মেম	দেশ	২৬ জানুয়ারি, ১৯৬৩
কই সে ?	ভবঘুরে ও অন্যান্য	বেতার জগৎ	শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬০
কচ্ছের রাণ	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	১ শ্রাবণ, ১৩৭২
কত না অশ্রুজল	কত না অশ্রুজল	দেশ	২৭ পৌষ, ১৩৭৫ থেকে ২০ বৈশাখ, ১৩৭৬
কন্‌রাট্‌ আডেনাওয়ার	রাজা উজীর / হিটলার	কথাসাহিত্য	কার্তিক, ১৩৭৪
কন্যাস্থল	—	আনন্দবাজার	১৯ এপ্রিল, ১৯৪৬
কবিগুরু গুরুদেব	গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	দেশ	৬ মে, ১৯৬১
কবিগুরু ও নন্দলাল	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব / গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	দেশ	১৪ মে, ১৯৬৬
কবি মনীষী	—	দেশ	২৯ মাঘ, ১৩৭২
কবিরাজ চেখফ	টুনি মেম	উল্টোরথ	পূজা সংখ্যা, ১৩৭০
কর্ণেল	চাচা-কাহিনী / সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প	মাতৃভূমি	শ্রাবণ, ১৩৫৫
কর্মখালি	—	আনন্দবাজার	৩১ মে, ১৯৪৬
কলকাতার কালীপূজো	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	—	—
কলচর	পঞ্চতন্ত্র / হাস্যমধুর / শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	—	—
কাইরো	পঞ্চতন্ত্র / হাস্যমধুর / শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	—	—
কাঠ-বেরালি ?	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	—	—

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
কাফে-দ্যে-জেনি	চাচা-কাহিনী	দেশ	৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫
কাবুলের বাজার	সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	—	—
কাব্যলোক	—	কৃত্তিবাস	এপ্রিল-জুন, ১৯৭৩
কালো মেয়ে	ময়ূরকণ্ঠী / সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	—	—
কিংকর্তব্যবিমূঢ়	—	আনন্দবাজার	২১ জুন, ১৯৪৬
কিসের সন্ধানে	পঞ্চতন্ত্র	—	—
কী বিপদ!	ময়ূরকণ্ঠী	—	—
কুট্টি	বড়বাবু	—	—
কৈফিয়ৎ	—	দেশ	৯ নভেম্বর, ১৯৬৮
কোদণ্ড মুখহানা	পঞ্চতন্ত্র / পছন্দসই	দৈনিক বসুমতী	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৬
কোন গুণ নেই তার	ময়ূরকণ্ঠী	—	—
কোন্-ভিনারের মা ('পঞ্চতন্ত্র' কলামে প্রকাশিত)	পঞ্চতন্ত্র	দেশ	১২, ১৯ ও ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫২
কোষ্ঠীবিচার	দু-হারা	বেতার জগৎ	শারদীয়া সংখ্যা,১৯৬৪
ক্রন্দসী	চতুরঙ্গ / পছন্দসই / সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	জলসা	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৬
ক্রিকেট	বহুবিচিত্র	মৌচাক	বৈশাখ, ১৩৬৭
ক্লাইন এর্না	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	আনন্দবাজার	৮ মার্চ ও ৫ জুলাই ১৯৭১
খালাসী	—	আনন্দবাজার	৫ জুলাই, ১৯৪৬
খালাসীর খালাস-প্রাপ্তি	—	আনন্দবাজার	১২ জুলাই, ১৯৪৬
"খুঁজে দেব" না "খুজে নেব"?	—	দেশ	৩ ও ১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩
খৃষ্ট	ভবঘুরে ও অন্যান্য	দেশ	৭ জানুয়ারি, ১৯৬১
খেলাচ্ছলে	ধূপছায়া	—	—
খেলেন দই রমাকান্ত	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	২১ মে, ১৯৬৬
খৈয়ামের নবীন ইরানী সংস্করণ	টুনি মেম	দেশ	৪ মে, ১৯৬০
খোশ গল্প	ভবঘুরে ও অন্যান্য/ হস্যমধুর	—	—

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
গণভাষা	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	দৈনিক সত্যযুগ	—
গাঁজা	চতুরঙ্গ / শ্রেষ্ঠ গল্প / হাস্যমধুর / শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	আনন্দবাজার	২২ নভেম্বর, ১৯৫৯
গাঁধী-ঘাট	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	আনন্দবাজার	—
গাইড	ময়ূরকণ্ঠী	—	—
গান	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	—	—
গানের কথা ঃ ভারত ও কাবুল	ধূপছায়া	—	—
গান্ধীজীর দেশে ফেরা	বড়বাবু	—	—
গাড়োলস্য গাড়োল	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব / হিটলার	দেশ	৩০ এপ্রিল, ১৯৬৬
গীতা-রহস্য	ময়ূরকণ্ঠী	—	—
গুরুদেব	ময়ূরকণ্ঠী/গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	—	—
গুরুদেব	গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন / সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	—	—
গুরুদেব	—	বেতার জগৎ	৭ অক্টোবর, ১৯৫৩
গেজেটেড অফিসার কবি	ভবঘুরে ও অন্যান্য / হস্যমধুর	দেশ	১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১
ঘরে-বাইরে	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	আনন্দবাজার	২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫
ঘরে-বাইরে শ্রমিকনীতি	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	আনন্দবাজার	৩ আগস্ট, ১৯৪৫
চতুরঙ্গ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	আনন্দবাজার	—
চরিত্র পরিচয় ('পঞ্চতন্ত্র' কলামে প্রকাশিত)	সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা / পঞ্চতন্ত্র	দেশ	২০ অক্টোবর, ১৯৫১
চরিত্র-বিচার	বড়বাবু / ধূপছায়া	দেশ	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৩
'চলো' খেলা	—	—	—

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
চাচা কাহিনী	দ্বন্দ্বমধুর / সৈয়দ মুজতবা আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প	আনন্দবাজার	বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৫৯
চাপরাসী ও কেরানী	ধূপছায়া / হাস্যমধুর	—	—
চার্লি চ্যাপলিন	চতুরঙ্গ / শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	—	—
চিল্কা	ধূপছায়া	দেশ	সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬১
চুম্বন	কত না অশ্রুজল	—	—
চোখের জলের লেখক	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৫
ছাত্র বনাম পুলিশ	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	১১ ও ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৫ এবং ১ জানুয়ারি ১৯৬৬
ছুছুন্দর কা সির্‌পর চামেলি কা তেল	চতুরঙ্গ	দৈনিক বসুমতী	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৪
জনমত	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	দৈনিক সত্যযুগ	—
জলে ডাঙায়	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৭ম খণ্ড	মাসিক বসুমতি	বৈশাখ, ১৩৬১ থেকে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩
জয় হে ভারতভাগ্য-বিধাতা	ময়ূরকণ্ঠী	দেশ	২৮ জানুয়ারি, ১৯৫০
জাতীয় মহাশঙ্খের স্বরূপ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	—	—
জতীয় সংহতি ('পঞ্চতন্ত্র' কলামে প্রকাশিত)	টুনি মেম	দেশ	২৮ অক্টোবর, ১৯৬১
জিদ-ওয়াইল্‌ড্‌	ময়ূরকণ্ঠী	দেশ	৩১ চৈত্র, ১৩৫৭
জীবন-বিচিত্রা	—	কথাসাহিত্য	বৈশাখ, ১৩৬৯
জেরুস্‌লম	রাজা উজীর	দেশ	২৩ আষাঢ়, ১৩৭৪
জ্ঞানসঞ্চয় না চাকুরী-সন্ধান	—	আনন্দবাজার	১০ আগস্ট, ১৯৪৬
টলি-হলি কোলাকুলি	—	মাসিক বসুমতী	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬
টুনি মেম	টুনি মেম	দেশ	২৬ মে ও ১০ নভেম্বর, ১৯৬২
Tagore as nationalist	গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	—	১৪ জানুয়ারি, ১৯৬২
ঠাকুর ঘরে কে ?	—	আনন্দবাজার	২৯ মার্চ, ১৯৪৬
"ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার সম্মুখে ঘন আঁধার —"	টুনি মেম	দেশ	২৭ এপ্রিল, ১৯৬৩

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
তপঃ-শান্ত	বড়বাবু	আনন্দবাজার	২৫ নভেম্বর, ১৯৪৫
তলস্তয়	টুনি মেম	দেশ	১০ ডিসেম্বর, ১৯৬০
তীর্থহীনা	চাচা-কাহিনী	কালান্তর	চৈত্র, ১৩৫৫
তুলনাহীনা	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড	—	—
তোতা কাহিনী	পঞ্চতন্ত্র	দেশ	২১ এপ্রিল, ১৯৫১
তোমার আসন পাতবো কোথায় ?	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	দৈনিক সত্যযুগ	—
ত্রাহি বিশ্বকর্মা	পঞ্চতন্ত্র	দেশ	১০ চৈত্র, ১৩৫৭
ত্রিবেণী	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	দৈনিক সত্যযুগ	—
ত্রিমূর্তি	চতুরঙ্গ/ শ্রেষ্ঠ গল্প/ হাস্যমধুর/ শ্রেষ্ঠ রম্যরচানা	দেশ	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৫
ত্রিমূর্তি	কত না অশ্রুজল	দেশ	১ কার্তিক, ১৩৭৬
দরখাস্ত	বড়বাবু	সাপ্তাহিক বসুমতী	শারদীয় সংখ্যা,১৩৭১
দর্পণ	কত না অশ্রুজল	দেশ	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭৬
দর্শন চর্চা ('সপ্তপর্ণী' কলামে প্রকাশিত)	ধূপছায়া	আনন্দবাজার	২০ জানুয়ারি, ১৯৫৩
দর্শনাতীত	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	৮ শ্রাবণ, ১৩৭২
দশের মুখ খুদার তবল	টুনি মেম	দেশ	৮ ডিসেম্বর, ১৯৬২
দাবা খেলার জন্মভূমি কোথায় ?	ধূপছায়া	—	—
দাম্পত্য জীবন	পঞ্চতন্ত্র / শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	দেশ	১৭ চৈত্র, ১৩৫৭
The spirit of Tagore	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	—	—
দিনলিপি	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	—	—
দিনেন্দ্রনাথ	ময়ূরকণ্ঠী / গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	দেশ	২৩ আগস্ট, ১৯৫২
দিল্লী স্থাপত্য	চতুরঙ্গ	—	—
দিস্ ইয়োরোপ!	ময়ূরকণ্ঠী	দেশ	২৫ আগস্ট, ১৯৫১
"দুঃখ তব যন্ত্রণায়"	রাজা উজীর	দেশ	৯ আষাঢ়, ১৩৭৪
দু-হারা	দু-হারা / পছন্দসই	দেশ	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭২
দেয়ালী	ধূপছায়া	—	—
দেশভ্রমণ	ধূপছায়া	দেশ	১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
দেশি-বিদেশে	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম ও ১০ম খণ্ড	দেশ	১৩ মার্চ,১৯৪৮ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮
দেহলি প্রান্তে	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	আনন্দবাজার	৩০ অক্টোবর, ১৯৫১
ঐ	ঐ	ঐ	৬ নভেম্বর, ১৯৫১
ঐ	—	ঐ	১৩ নভেম্বর, ১৯৫১
ঐ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	ঐ	২০ নভেম্বর, ১৯৫১
ঐ	ঐ	ঐ	২৭ নভেম্বর, ১৯৫১
ঐ	ঐ	ঐ	৪ ডিসেম্বর, ১৯৫১
ঐ	—	ঐ	১১ ডিসেম্বর, ১৯৫১
ঐ	—	ঐ	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৫১
ঐ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	ঐ	২৫ ডিসেম্বর, ১৯৫১
ঐ	ঐ	ঐ	১ জানুয়ারি, ১৯৫২
ঐ	ঐ	ঐ	৮ জানুয়ারি, ১৯৫২
ঐ	ঐ	ঐ	১৫ জানুয়ারি, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	২৯ জানুয়ারি, ১৯৫২
ঐ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	ঐ	৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
ঐ	ঐ	ঐ	১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
দেহলি প্রান্তে	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	আনন্দবাজার	৪ মার্চ, ১৯৫২
ঐ	ঐ	ঐ	১১ মার্চ, ১৯৫২
ঐ	ঐ	ঐ	১৮ মার্চ, ১৯৫২
ঐ	ঐ	ঐ	২৫ মার্চ, ১৯৫২
ঐ	ঐ	ঐ	১ এপ্রিল, ১৯৫২
ঐ	ঐ	ঐ	৮ এপ্রিল, ১৯৫২
ঐ	ঐ	ঐ	১৫ এপ্রিল, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	২৯ এপ্রিল, ১৯৫২
ঐ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	ঐ	৬ মে, ১৯৫২
ঐ	ঐ	ঐ	১৩ মে, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	২০ মে, ১৯৫২

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
দেহলি প্রান্তে	—	আনন্দবাজার	২৭ মে, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	৩ জুন, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	১০ জুন, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	১৭ জুন, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	২৪ জুন, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	১ জুলাই, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	৮ জুলাই, ১৯৫২
ঐ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	ঐ	১৫ জুলাই, ১৯৫২
ঐ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	ঐ	২২ জুলাই, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	২৯ জুলাই, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	৫ আগস্ট, ১৯৫২
ঐ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	ঐ	১২ আগস্ট, ১৯৫২
ঐ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	ঐ	১৯ আগস্ট, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	২৭ আগস্ট, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২
ঐ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	ঐ	৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২
ঐ	—	—	১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২
ঐ	—	আনন্দবাজার	২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২
ঐ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	ঐ	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	৭ অক্টোবর, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	১৪ অক্টোবর, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	২১ অক্টোবর, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	২৮ অক্টোবর, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	৪ নভেম্বর, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	১২ নভেম্বর, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	১৮ নভেম্বর, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	২৫ নভেম্বর, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	৩ ডিসেম্বর, ১৯৫২
ঐ	—	ঐ	৯ ডিসেম্বর, ১৯৫২

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
দেহলি প্রান্তে	—	আনন্দবাজার	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬১
দেহলি-প্রান্ত ('দেহলিপ্রান্তে' কলামে প্রকাশিত)	ধূপছায়া / হাস্যমধুর	ঐ	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৫২
দেহি দেহি	ভবঘুরে ও অন্যান্য	জলসা	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৭
দ্য গল ('পঞ্চতন্ত্র' কলামে প্রকাশিত)	টুনি মেম	দেশ	১৬ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩
দ্বন্দ্ব পুরাণ	কত না অশ্রুজল / গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	—	—
দ্বিজ	দু-হারা	বেতার জগৎ	২২ সেপ্টেম্বর,১৯৬৫
দ্বিজ-দাসত্ব	—	আনন্দবাজার	১০ মে, ১৯৪৬
ধন্য অবাঙালী ('পঞ্চতন্ত্র' কলামে প্রকাশিত)	কত না অশ্রুজল	দেশ	৮ নভেম্বর, ১৯৬৯
ধবলদন্ত	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	আনন্দবাজার	১৯ অক্টোবর, ১৯৪৫
ধর্ম	টুনি মেম	দেশ	৩০ মার্চ, ১৯৬৩
ধর্ম ও কম্যুনিজম	টুনি মেম	দেশ	১৩ এপ্রিল, ১৯৬৩
ধর্ম না জাতীয়তাবাদ	—	আনন্দবাজার	১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬
ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা	টুনি মেম	দেশ	৬ এপ্রিল, ১৯৬৩
ধর্মং শরণং ?	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	দৈনিক সত্যযুগ	—
ধূপ-ছায়া	পঞ্চতন্ত্র	দেশ	২২ ডিসেম্বর, ১৯৫১
ধূর্ত নাপিত	ময়ূরকণ্ঠী	—	—
ধের্যং কুরু! পুনঃ গচ্ছং ঢাকায়ে	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	—	—
ধ্বনি	—	দেশ	৩, ১০, ১৭ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২
নজরুল ইসলাম ও ওমর খৈয়াম	চতুরঙ্গ / বহুবিচিত্র	—	—
নটরাজনের একলব্যত্ব	দু-হারা / পছন্দসই	কথাসাহিত্য	শারদীয় সংখ্যা,১৩৭২
নট গিলাটি	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	সাপ্তাহিক বিচিত্রা	—
নট্-গিলটি!	কত না অশ্রুজল	দেশ	১৪ জুন, ১৯৬৯

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
নটিংহাম	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	আনন্দবাজার	৭ ও ২১ মার্চ, ১৯৭১
নন্দলালের দেয়াল-ছবি	ময়ূরকণ্ঠী	দেশ	১৫ সেপ্টম্বর, ১৯৪৫
নববর্ষ, ১৩৬৮	বহুবিচিত্র	অলকনন্দা	পূজা সংখ্যা, ১৩৬৯
নব-হিটলার	টুনি মেম	দেশ	২২ ডিসেম্বর, ১৯৬২
নবাব-জাদী	বহু বিচিত্র / শ্রেষ্ঠ গল্প	—	—
নবীন পাঠশালা	—	আনন্দবাজার	২০ জুলাই, ১৯৪৬
নর্তকী	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	মাসিক বসুমতী	অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা, ১৩৫৬
নয়রাট	ময়ূরকণ্ঠী / শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	দেশ	২৪ মে, ১৯৫২ থেকে ১১ অক্টোবর, ১৯৫২
নস্‌রুদ্দীন খোজা (হোকা)	চতুরঙ্গ	দেশ	৮ আগস্ট, ১৯৫৯
নাগা	ময়ূরকণ্ঠী	দেশ	৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১
নাতুচ্ছশিক্ষা	ভবঘুরে ও অন্যান্য	দেশ	১৪ জানুয়ারি, ১৯৬১
নানা প্রশ্ন	টুনি মেম	দেশ	১৩ ও ২২ জনুয়ারী, ১৯৬২
নারীর অধিকার	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	দেশ	—
নিরলঙ্কার	ভবঘুরে ও অন্যান্য	দেশ	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৭
নিশীথদা	ময়ূরকণ্ঠী	দেশ	২ জুন, ১৯৫১
নেটিভ স্টেট	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	—	—
নেতাজী	পঞ্চতন্ত্র	—	—
নেতাজী(‘পঞ্চতন্ত্র’ কলামে প্রকাশিত)	বড়বাবু	দেশ	২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩
নেভার রাধা	ময়ূরকণ্ঠী	—	—
নেড়ে	পছন্দসই	বিশ্বভারতী (দেয়াল পত্রিকা)	১৩৩০ সাল
নোনাজল	দ্বন্দ্বমধুর / শ্রেষ্ঠ গল্প	দেশ	৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩
নোনামিঠা	দ্বন্দ্বমধুর / শ্রেষ্ঠ গল্প	দেশ	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬১
‘—ন্যাংটাকে ভগবানও ডরান—’	রাজা উজীর	দেশ	৩১ ভাদ্র, ১৩৭৩
ন্যাকামো	কত না অশ্রুজল	দেশ	১০ আশ্বিন, ১৩৭৬
পঁচিশে বৈশাখ	পঞ্চতন্ত্র / গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	দেশ	৫ মে, ১৯৫১

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
পঁচিশে বৈশাখ	—	দেশ	১০ মে, ১৯৫২
পঞ্চতন্ত্র	—	দেশ	২৫ অক্টোবর, ১৯৫২
পঞ্চতন্ত্র	—	দেশ	২৭ জানুয়ারি, ১৯৬২
'পঞ্চাশ বছর ধরে —'	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	১৬ অক্টোবর, ১৯৬৯
পত্রাবলী	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	—	—
পথমধ্যে আত্মচিন্তা	—	দেশ	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১
পপ্‌লারের নগডালে	রাজা উজীর	দেশ	৩ ভাদ্র, ১৩৭৩
পরাজিত জর্মনী	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	আনন্দবাজার	১৮, ২১ ও ২৫ জুলাই, ১৯৪৫
পরিচিতি	বড়বাবু	কথাসাহিত্য	শ্রাবণ, ১৩৭১
পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড	দৈনিক পূর্বদেশ	২১ জুলাই থেকে ২৪ অক্টোবর, ১৯৭৩
পরিমল রায়	ময়ূরকণ্ঠী	দেশ	২৭ অক্টোবর, ১৯৫১
পল্‌ডি	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	—	—
৫৭০—১৯৭০/১৪০০ বৎসর হজরৎ মুহম্মদ (দঃ)-এর চতুর্দশ জন্মশত বার্ষিকী	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	আনন্দবাজার	১৮ মে, ১৯৭০
পাঞ্চজন্য	—	আনন্দবাজার	১২ এপ্রিল, ১৯৪৬
পাঠকের নিবেদন	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	—	ঈদ দিবস, ১৩৭২
পাণ্ড্র	ময়ূরকণ্ঠী	—	—
পাদটীকা	চাচা-কাহিনী / শ্রেষ্ঠ গল্প	কালান্তর	শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫৫
পাসপরট্	রাজা উজীর	দেশে	২৭ মে, ১৯৬৭
পিকনিকিয়া	ধূপছায়া	—	—
পিটার ও শয়তান	হাস্যমধুর	—	—
পুচ্ছ-(প্র) দর্শন	দু-হারা	অমৃত	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭২
পুনরপি প্রাচ্য	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	আনন্দবাজার	২৫ নভেম্বর, ১৯৬৯
পুনশ্চ	চাচা-কাহিনী / পছন্দসই / শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	দেশ	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫
পুলিনবিহারী	পঞ্চতন্ত্র	—	—
পুষ্পধনু	চতুরঙ্গ/ শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	দেশ	১ নভেম্বর, ১৯৫৮

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
পুস্তক সমালোচনা	—	দেশ	৭ জানুয়রী,১৯৫০
পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	চতুরঙ্গ	বৈশাখ ও শ্রাবণ, ১৩৫৫
পোলেমিক	ধূপছায়া	—	—
পৌষমেলা	ভবঘুরে ও অন্যান্য/ গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	দেশ	২৪ ডিসেম্বর, ১৯৬০
প্রদীপের তলাটাই অন্ধকার কেন ?	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড / বহুবিচিত্র	সন্দেশ	বৈশাখ, ১৩৬৯
প্রবাসীর চিঠি	বহুবিচিত্র	মৌচাক	কার্তিক, ১৩৬০
প্রব্রজ্যা	ময়ূরকণ্ঠী	—	—
প্রমথ চৌধুরী–ভাষা ও শৈলী	—	দেশ	২৩ নভেম্বর, ১৯৬৮
প্রমথ চৌধুরী-সবুজ পত্র	—	দেশ	১৬ নভেম্বর,১৯৬৮
প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান	—	আনন্দবাজার	৩ মে, ১৯৪৬
প্রাগ	—	দেশ	৫ অক্টোবর, ১৯৬৮
প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	আনন্দবাজার	১১ নভেম্বর, ১৯৬৯
প্রিন্স গ্রাবিয়েলে দান্নুন্দজিয়ো	টুনি মেম	দেশ	২৩ মার্চ, ১৯৬৩
প্রিয় কণা মিয়া	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	—	২১ নভেম্বর, ১৯৪৭
প্রেম	—	উল্টোরথ	পূজা সংখ্যা, আশ্বিন, ১৮৮৬, শকাব্দ
প্রেম	রাজা উজীর	—	—
প্রেমের প্রথম ভাগ	দু-হারা	—	—
প্রোটকল	রাজা উজীর	—	—
প্যারিস	পঞ্চতন্ত্র / শ্রেষ্ঠ রম্যচনা	—	—
প্যালেস্টাইন	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	আনন্দবাজার	২৮ সেপ্টেম্বর ও ৫ অক্টোবর, ১৯৪৫
প্যালেস্টাইন	—	আনন্দবাজার	৫ এপ্রিল, ১৯৪৬
প্যালেস্টাইন	—	মাতৃভূমি	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫
ফরাইজ্	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	২৭ নভেম্বর, ১৯৬৫
ফরাসী-র্জমন	ময়ূরকণ্ঠী	আনন্দবাজার	২৯ আগস্ট, ১৯৪৫
ফরাসী-বাঙলা	চতুরঙ্গ	দেশ	১৬ জুলাই, ১৯৫৫

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
ফিল্মের ভাষা	চতুরঙ্গ	—	—
ফুটবল ('দেহলি প্রান্তে' কলামে প্রকাশিত)	ময়ূরকণ্ঠী / শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	আনন্দবাজার	৭ অক্টোবর, ১৯৫২
ফের্ডিনান্ট্ জাওয়ারক্রুখ	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	৪ ভাদ্র, ১৩৭২
ফ্রাঙ্কেন্স্টাইন	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	দৈনিক বসুমতী	—
বই কেনা	পঞ্চতন্ত্র / শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	—	—
বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি	বড়বাবু	বিশ্বভারতী পত্রিকা	শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০
বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী	ভবঘুরে ও অন্যান্য	দেশ	১৮ মার্চ, ১৯৬১
বড়দিন	ময়ূরকণ্ঠী / হাস্যমধুর	—	—
বড়বাবু	বড়বাবু / গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	দেশ	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৭১
বড়লাটি লাঠি	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	আনন্দবাজার	২৯ জুলাই, ১৯৪৫
বন্	ময়ূরকণ্ঠী	—	—
বনে ভূত না মনে ভূত	কত না অশ্রুজল	দেশ	১৫ নভেম্বর, ১৯৬৯
বন্ধ-বাতায়নে	বড়বাবু	—	—
বর-কনে-বর	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	—	২ জানুয়ারি, ১৯৬২
বর্বর জর্মন	ময়ূকণ্ঠী	শনিবারের চিঠি	পৌষ, ১৩৫২
বর্ষা	পঞ্চতন্ত্র	—	—
বাঁশবনে	ধূপছায়া/শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	দেশ	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৪
বাঁশী 'পেঞ্চতন্ত্র' কলামে প্রকাশিত)	দ্বন্দ্বমধুর / হাস্যমধুর	দেশ	১৫ মার্চ, ১৯৫৮
বাঙলাদেশ	ভবঘুরে ও অন্যান্য	—	—
বাঙলাদেশ	ভবঘুরে ও অন্যান্য	দেশ	২৮ জানুয়ারি ও ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১
বাঙলাদেশ– অখণ্ড পাকের চাঁই / ভুট্টো বিনে কেউ নেই	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড	দেশ	১৪ আশ্বিন, ১৩৭৯
বাংলাদেশ : অবতরণিকা	ঐ	ঐ	২০ ও ২৭ মে এবং ৩ ও ১০ জুন, ১৯৭২

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
বাংলাদেশ–আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে–	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড	দেশ	১৭ ভাদ্র, ১৩৭৯
বাংলাদেশ—Even Gandhi would have marvelled!	ঐ	ঐ	৬ শ্রাবণ, ১৩৭৯
বাংলাদেশ–ইস্তের	ঐ	ঐ	৩ আষাঢ়, ১৩৭৯
বাংলাদেশ–ইয়েহিয়া-ভুট্টো সংবাদ	ঐ	ঐ	১৭ আষাঢ়, ১৩৭৯
বাংলাদেশ– "দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালীর জয় —"	ঐ	ঐ	১০ ভাদ্র, ১৩৭৯
বাংলাদেশ–পিণ্ডির পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	ঐ	ঐ	৩ ভাদ্র, ১৩৭৯
বাংলাদেশ–"বিচিত্র ছলনাজাল"	ঐ	ঐ	৩১ আষাঢ়, ১৩৭৯
বাংলাদেশ–"বীরের সবুর সয়।"	ঐ	ঐ	১৩ শ্রাবণ, ১৩৭৯
বাংলাদেশ–বুড়ীগঙ্গা	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড	দেশ	১১ নভেম্বর, ১৯৭২
বাংলাদেশ–ভুট্টাঙ্গ পুরাণ	ঐ	ঐ	২৪ আষাঢ়, ১৩৭৯
বাংলাদেশ–মুজিব আউট!	ঐ	ঐ	৬ আশ্বিন, ১৩৭৯
বাংলাদেশ–যক্ষ রক্ষ গুপ্ত	ঐ	ঐ	২০ শ্রাবণ, ১৩৭৯
বাংলাদেশ–রক্ষী বনাম নর্তকী	ঐ	ঐ	৩১ ভাদ্র, ১৩৭৯
বাংলাদেশ–শেখের জয়	ঐ	ঐ	১০ আষাঢ়, ১৩৭৯
বাংলাদেশ–সংখ্যালঘুর অনধিকারমত্ততা	ঐ	ঐ	২৭ শ্রাবণ, ১৩৭৯
বাংলাদেশ–"সাত জর্মন/এক জগাই তবু জগাই লড়ে!"	ঐ	ঐ	৪ নভেম্বর, ১৯৭২
'বাংলা-একাডেমী পত্রিকা'	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	দেশ	৮ জুন, ১৯৫৭
বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দ	—	মাসিক মোহাম্মদী	পৌষ, ১৩৩৯
বাঙলার গুণ না জর্মন গুণী	ধূপছায়া	—	—
বাঙালী ('সপ্তপর্ণী' কলামে প্রকাশিত)	ধূপছায়া	আনন্দবাজার	৬ জানুয়ারি, ১৯৫৩

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
বাঙ্গালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ সাহিত্য	—	মাসিক মোহাম্মদী	চৈত্র, ১৩৪১
বাঙালী মেনু ('সপ্তপর্ণী' কলামে প্রকাশিত)	ধূপছায়া / শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা	আনন্দবাজার	১৭ মার্চ ১৯৫৩
বাচ্চুভাই শুক্ল	ভবঘুরে ও অন্যান্য / গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	দেশ	১১ মার্চ, ১৯৬১
বাবুর শাহ্	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	১৪ আগস্ট, ১৯৬৫
বার্লাম ও য়োসাফ্ট্	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	২৬ চৈত্র, ১৩৭২
বিচার	—	আনন্দবাজার	২৬ অক্টোবর, ১৯৪৫
বিচিত্র ছলনাজাল	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী,১১শ খণ্ড	দৈনিক পূর্বদেশ	৫ আগস্ট, ১৯৭৩
বিদেশী ভাষা— ক্লাইন এর্না	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	আনন্দবাজার	২৯ মার্চ, ১৯১৭
বিদেশে (১ম কিস্তি 'দেশভ্রমণ' নামে 'পঞ্চতন্ত্র' কলামে প্রকাশিত)	পঞ্চতন্ত্র	দেশ	১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ থেকে ৩ মে, ১৯৫২
বিদেশে (১ম কিস্তি 'এ্যার-ইণ্ডিয়া' এবং অন্যান্য কিস্তি 'বিদেশে' নামে 'পঞ্চতন্ত্র' কলামে প্রকাশিত)	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৮ম খণ্ড	দেশ	৩০ জানুয়ারি, ১৯৭১ থেকে ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২
বিদ্রোহী	রাজা উজীর	কথাসাহিত্য	আশ্বিন, ১৩৭৩
বিধবা-বিবাহ	চাচ-কাহিনী / পছন্দসই	দেশ	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৬
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়	—	শনিবারের চিঠি	বৈশাখ, ১৩৫৩
বিশ্বভারতী	ময়ূরকণ্ঠী / গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	দেশ	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১
বিশ্বভারতী প্রাগ্	কত না অশ্রুজল / গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন	দেশ	২ কার্তিক, ১৩৭৫
বিষবৃক্ষ	রাজা উজীর	দেশ	২ আষাঢ়, ১৩৭৪
বিষের বিষ	টুনি মেম/ শ্রেষ্ঠ গল্প / হাস্যমধুর	দেশ	শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৮
বিষ্ণুশর্মা	পঞ্চতন্ত্র, ২য় পর্ব	দেশ	১৯ চৈত্র, ১৩৭২

রচনা	সংকলন গ্রন্থ	পত্রিকা	প্রকাশনার তারিখ
'৪২-'৪৫	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	দেশ	২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫
বুদ্ধং শরণং	ধূপছায়া	—	—
বুড়ো-বুড়ী	দু-হারা	দেশ	১২ মার্চ, ১৯৬৬
বৃহত্তর ভারত	—	আনন্দবাজার	১৭ মে, ১৯৪৬
'বেঁচে থাকো সর্দি কাশি—'	চাচা-কাহিনী/শ্রেষ্ঠ গল্প	—	—
বেজো না চরণে চরণে	চতুরঙ্গ	সাহিত্যের খবর	বৈশাখ, ১৩৬৫
বেদে	পঞ্চতন্ত্র	দেশ	৩ মার্চ, ১৯৫১
বেমক্কা	ময়ূরকণ্ঠী	—	—
বেলজেন, স্টেট্‌স্‌মেন	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	আনন্দবাজার	৭ ও ৯ নভেম্বর, ১৯৪৫
বেলতলাতে দু-দুবার	চাচ-কাহিনী/হাস্যমধুর	—	—
বৈদেশিকী	—	মাতৃভূমি	আষাঢ় ও ভাদ্র, ১৩৫৫
বৈদেশিকী	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১০ম খণ্ড	—	—
বৈশাখী রবি	—	দেশ	১ জুন, ১৯৪৬
ব্রেন-ড্রেন	কত না অশ্রুজল	দেশ	৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯
ব্যক্তি-ব্রহ্মের সন্ধানে	—	মাতৃভূমি	মাঘ ও চৈত্র, ১৩৫৪
ভক্তি	পঞ্চতন্ত্র	—	—
ভঙ্গ বনাম কুলীন	রাজা উজীর	দেশ	২৫ নভেম্বর, ১৯৬৭
ভবঘুরে	ভবঘুরে ও অন্যান্য / হাস্যমধুর	দেশ	২৫ মার্চ, ১৯৬১ থেকে ৭ অক্টোবর, ১৯৬১
ভরা-ডুবি	কত না অশ্রুজন	দেশ	৭ জুন, ১৯৬৯
ভাই ভাই একঠাঁই	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	আনন্দবাজার	৩০ নভেম্বর, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৫ এবং ১১ জানুয়ারি ও ৮ মার্চ, ১৯৪৬
ভাই ভাই একঠাঁই	—	আনন্দবাজার	২৬ এপ্রিল, ১৯৪৬
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	আনন্দবাজার	১৩ আগস্ট ও ২ নভেম্বর, ১৯৪৫
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই না ভাই ভাই এক ঠাঁই?	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ৯ম খণ্ড	আনন্দবাজার	২৪ নভেম্বর, ১৯৪৫
ভারত-নাট্যম	সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী, ১১শ খণ্ড	—	—
ভারতীয় নৃত্য	ময়ূরকণ্ঠী	—	—